কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী স্মারক

১৯৯৯

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব, "সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।"
— কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী স্মারক

১৯৯৯

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব, "সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।"
— কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি

www.pathagar.com

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার
নজরুল জন্মশতবার্ষিকী স্মারক
১৯৯৯

উপদেষ্টা সম্পাদক	:	কবি আল মাহমুদ
প্রধান সম্পাদক	:	শাহাবুদ্দীন আহমদ
সম্পাদক	:	মাসুদ মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক	:	খন্দকার আবদুল মোমেন
সদস্য	:	হাফিজুর রহমান
”	:	আবদুল ওয়াহিদ
”	:	হাসান আলীম
”	:	আসাদ বিন হাফিজ
”	:	মোশাররফ হোসেন খান
”	:	গোলাম মোহাম্মদ
”	:	মাহফুজুর রহমান আখন্দ
”	:	জাকির আবু জাফর
প্রকাশকাল	:	১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬/ ২৫ মে ১৯৯৯/ ৭ সফর ১৪২০
প্রচ্ছদ	:	ফরিদী নু'মান
মুদ্রণ	:	আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা
দাম	:	বসুন্ধরা সাদা – ১৫০ টাকা অফসেট – ২০০ টাকা

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি কর্তৃক

৫/৫, গজনবী রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ যে উৎসব ও অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করেছে এরই একটা প্রামাণ্য স্মারকগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হল এই বইটি। এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে নজরুল গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বলা বাহুল্য একাজে তার মত দক্ষ লোকও সহজলভ্য নয়। এই স্মারকগ্রন্থই প্রমাণ করে যে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু তার কালেই নয়, বর্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎ অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতেও এক মহান মানবতাবাদী, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চির-বিদ্রোহী কবি। তিনি তাঁর জাতি ও ধর্ম ইসলামের জন্য বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করে গেছেন। তাঁর কালে তাঁর চেয়ে অসাম্প্রদায়িক আধুনিক মানুষ অবিভক্ত বাংলায় অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিক ছিলেন বলে মনে করি না। সম্ভবত তাঁর সময়ে তাঁর মত উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কোনো কবিপ্রতিভা বৃটিশ উপনিবেশগুলোতে আর একজনও ছিলেন না। এর খেসারতও কবিকে দিতে হয়েছে বর্ষকাল কারাভোগ করে।

তাঁর কালে তাঁর অসাধারণ কবি-প্রতিভার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচকও কম ছিলেন না। ররবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তখন যে কবি-বলয় সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন নজরুল-বিরোধী। এই বিরোধিতা যত না ছিল সাহিত্যগত তার চেয়ে বেশি ছিল সম্প্রদায়গত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভক্তদের এই মনোভাবকে উৎসাহিত করতেন না। তিনি নজরুলকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে স্বাগত জানাতেও দ্বিধা করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বিপুল কবি-প্রতিভার বাইরে নতুন প্রতিভার উদয় হয়েছে এবং তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেনই। বিশ্বকবির এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সঠিক। কাজী সাহেবকে তৎকালীন বাংলায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হলেও তিনি নিজের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি উজ্জীবনের অগ্রদূত হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর কাজী নজরুল ইসলামকে জনগণ জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করলেও এদেশের মুখচেনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবী তার সমালোচনা শুরু

www.pathagar.com

করেন। তাদের সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল তাঁর ইসলামী কবিতা ও প্রাণ-প্রাচুর্যে উপচেপড়া ইসলামী গীতসম্ভার। অথচ নজরুল যদি চিরায়ত কিছু সৃষ্টি করে থাকেন তবে তা নিঃসন্দেহে তার ইসলামী কাব্য ও গীতসম্ভার। ঐসব রচনাই কবিকে চির-অমরতা দান করেছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের শত বিরোধিতার মধ্যে তখনও যেমন তিনি দীপ্তগৌরবে বেঁচে ছিলেন ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবেন।

এই স্মারকগ্রন্থটি নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সংকলনের চেষ্টা করা হয়েছে। কাজী সাহেবের ওপর বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের আলোচনার আকরগ্রন্থ এই সংকলন। গ্রন্থটি প্রকাশনায় কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কার্যসম্পাদনে 'প্রেক্ষণ' সম্পাদক ও এই স্মারক গ্রন্থের নির্বাহী সম্পাদক অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন যে অবদান রেখেছেন তা আমাদের স্মারক কমিটির কর্মতৎপরতার গৌরবই বৃদ্ধি করেছে। আমি বিশ্বাস করি এই স্মারকগ্রন্থটি জাতীয় কবির প্রতি তাঁর জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে অনন্তকাল পর্যন্ত বিবেচিত হবে।

২৫-৫-৯৯ আল মাহমুদ
মীরবাগ, বড় মগবাজার, ঢাকা উপদেষ্টা সম্পাদক

www.pathagar.com

কবি নজরুল-কে আমাদের বড় প্রয়োজন

কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম জগতের বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি আমাদের রেনেসাঁর অগ্রদূত, ইসলামী বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের রূপকার। নজরুল না জন্মালে অবহেলিত বঞ্চিত শোষিত বাঙালী মুসলমানের আত্মদর্শন সম্ভব হতোনা।

১৯ শতকের বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস নিদারুণ নিগৃহীত জীবনের ইতিহাস। শিক্ষাহীন, চাকরীহীন ব্যবসাহীন মুটে, মাঝি, মিস্তি, কৃষক, ক্ষেতমজুর মুসলমানদের তথাকথিত বাঙালী বাবুদের ক্রীতদাস হয়ে ধুঁকে ধঁকে বেঁচে থাকার ইতিহাস। নজরুল বলেন। ভোরের নকীব হয়ে জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বললেন—

"কোথা সে আজাদ কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান?"
আল্লাহ ছাড়া করেনা কারেও ভয় কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে আরিফ, কোথায় সে ইমাম, কোথা সে শক্তিবীর
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভূবন থরথর।"

তিনি বাঙালী মুসলমানের আত্মবিস্মৃতি, অসচেতনতা নিদ্রাচ্ছন্নতা কে চাবুক মেরে জাগিয়ে তুলে বললেন—

"ভূবনজয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান
খোদার রাহে আনলে যারা দুনিয়া না-ফরমান।
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকাতে যাহাদের তকবীর,
হুঙ্কারিল উড়ল যাদের বিজয় নিশান"

নজরুল খরা জ্যৈষ্ঠে এসে ভরা ভাদরে চলে গেলেন। তাঁর জন্মটিও বাঙালী মুসলমান জীবনের যেন প্রতীকী রূপ। শুষ্ক, নীরস, দগ্ধীভূত বাঙালী মুসলমানের জীবনে নজরুল সরস বর্ষণ এনেছিলেন। তার আগমন যেন খরার ভিতর দিয়ে রসের অভিযাত্রা।

নজরুল সম্পর্কে জনাব আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন—

"এটা অবধারিত সত্য যে, কবি নজরুল জন্মগ্রহণ না করলে অন্তত: বাংলাভাষী মুসলমান সমাজে আজিকার জয়যাত্রার অগ্রগতি থেকে অন্তত একশতাব্দী পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হতো। নজরুল ইসলাম একদিন বিনা নোটিশে 'আল্লাহু আকবার' তকবীরের 'হায়দরী হাঁক' মেরে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা সাহিত্যের দূর্গ জয় করে বসলেন, মুসলিম বাংলার ভাঙা কেল্লায় নিশান উড়িয়েছিলেন। একদিন দূর করেছিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনমন্যতা। মনের দিক থেকে জাতীয় জীবনে এ একটা বিপ্লব। এ বিপ্লবের এক ইমাম নজরুল ইসলাম।"

www.pathagar.com

সত্যিই তো– নজরুল বিহনে কে শোনাত সেই জাগরণের গান—

বাজিছে দামামা বাঁধ রে 'আমামা'—
শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওয়াত এসেছে নয়া জমানার—
ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান।

কিংবা কে শোনাত সেই অভয় শক্তিমন্ত্র—

"দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে, দ্বীন-ই-ইসলামী লাল মশাল,
ওরে বে-খবর তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।

কবি নজরুল, চারণের বেশে মুসলিম সমাজের দ্বারে দ্বারে ঘুরে নব জাগরণের বাণী শুনিয়েছিলেন। আজ কেউ কেউ তাঁকে সেক্যুলার বানাতে চান। আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি কবি, উদারতাই তার ধর্ম, কিন্তু আপন কওমের প্রতি তাঁর টান ছিল স্বত:সিদ্ধ।

সেখানে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তাঁর সমসাময়িক হিন্দু মুসলমান লেখকরা যখন মুসলমানদের কথা বলতে ইতস্তত করতেন, 'পাছে লোকে কিছু বলে' ভেবে কলমের লাগাম টেনে রাখতেন, তখন নজরুল ইসলামের কলম থেকেই ঝরে পড়তো সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ :

"ইসলাম! জাগো! মুসলিম জাগো! আল্লাহ্ তোমার একামাত্র উপাস্য, কোরআন তোমার সেই ধর্মের সেই উপাসনার মহাবাণী— সত্য তোমার ভূষণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তোমার লক্ষ্য, তুমি জাগো। মুক্ত বিশ্বের বন্য শিশু তুমি, তোমায় পোষ মানাবে কে? দূরন্ত চঞ্চলতা, দূর্দমনীয় বেগ, ছায়ানটের নৃত্যরাগ তোমার রক্তে, তোমায় থামায় কে? উষ্ণ তোমার খুন, মস্ত তোমার জিগর, দারাজ তোমার দিল, তোমাকে রুখে কে? পাষাণ কবাট তোমার বক্ষ, লৌহ তোমার পাঞ্জর, অজেয় তোমার বাহু- তোমায় মারে কে? জন্ম তোমার আরবের মহামরুতে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা তোমার পর্বত গুহায়, উদাত্ত তোমার বিপুল বাণীর প্রথম উদ্বোধন কোহ্-ই-তূরের নাঙ্গা শিখরে, তুমি অমর, তুমি চির জাগ্রত। 'আল্লাহু আকবার তোমার ওঙ্কার, 'আলি' তোমার হুঙ্কার, তুমি অজেয়। বীর তুমি, তোমার চিরন্তন মুক্তি, শাশ্বত বন্ধনহীনতা, আজাদীর কথা ভূলায় কে? তোমার অদম্য শক্তি, দূর্দমনীয় সাহস, তোমার বুকে খঞ্জর চালায় কে? ইসলাম ঘুমাইবার ধর্ম নয়, মুসলিম শির নত করিবার জাতি নয়। তোমার আদিম জন্মদিন হইতে তুমি বুক ফুলাইয়া শির উচ্চ করিয়া দূর্লংঘ্য মহাপর্বতের মত দাঁড়াইয়া আছ।... বল বল বীর, বল আজ তোমার সেই শক্তি কোথায়? বল ভীরু তোমার সে প্রচণ্ড উগ্র মহাশক্তিকে কে পদানত করিল? উত্তর দাও! তোমায় আল্লাহর নামে আহ্বান করিতেছি উত্তর দাও। তোমার অপমান কেহ কখনও করিতে পারে নাই, ইসলাম অবমাননা সহে নাই।

তুমি সত্য, ইসলাম সত্য, তোমার আমার বা ইসলামের অপমান যে সত্যের অপমান। তাহা যে সহ্য করে সে ভীরু- সে ক্ষুদ্র।.... বল ইসলাম ভিক্ষা করেনা, যাঞ্চা করেনা। বল– দুর্বলতা আমাদের ধর্মে নাই। বল আমাদের প্রাপ্য, আমাদের মুক্তি, আমরা নিজের শক্তিতে লাভ করিব"। (সত্যবাণী: কাজী নজরুল ইসলাম)

www.pathagar.com

এটাই নজরুল, এখানেই নজরুলের প্রকৃত পরিচয়। তিনিই স্পষ্ট করে বলতে পেরেছিলেন—

"মুখেতে কলেমা, হাতে তলওয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার
হৃদয়ে লইয়া ইশক আল্লাহর
চল আগে চল বাজে বিষাণ,

ওরে ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ
বাঁধা মোর ঐ পাক কুরআন।"

নজরুল এসে দেখলেন হিন্দু সংস্কৃতির জোয়ারে বাঙালী মুসলমানরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। দূর্গা, কালী স্বরস্বতী পূজা, চড়ক, দোল, শ্যামা কীর্তন ভজন কৃষ্ণ যাত্রা এগুলিই বাঙালী সংস্কৃতি নামে পরিচিত। বাংলার ৬০ ভাগ মুসলমানের যে ঈদ উৎসব আছে, রমজানের বিশেষ কালচার আছে মুহররম আছে সেগুলোর কোন প্রতিফলনই জাতীয় ভাবে বা জাতীয় মিডিয়ায় খুঁজে পাওয়া যেতনা। ১৯৪১ সালের ২৩শে অক্টোবর ঈদ-উল ফিতরের দিন। তৎকালীন ইঙ্গ-হিন্দু পরিচালিত অল-ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে প্রথম আজানের ধ্বনি ভেসে এল– মুয়াজ্জিন কে? কাজী নজরুল ইসলাম। সেই বৈরী সময়ে রেডিও থেকে পাক কুরআনের তেলাওয়াত ঝংকৃত হল। ক্বারী কে; কাজী নজরুল ইসলাম।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ সহ বাংলার বড় বড় লেখিয়েরা, উৎসব বোঝাতে যখন, দূর্গোৎসব আর ঢাকের বাদ্য নিয়ে কাব্য-চর্চায় মেতেছিলেন, তখন সেই ১৯৩১ সালে' হিজ মাস্টারর্স ভয়েস' রেকর্ডে তিনি আব্বাস উদ্দীনকে দিয়ে গাওয়ালেন "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ"। ঈদ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে দুটি মাত্র নাটক রচিত হয়েছে, সে দুটির রচয়িতাও কাজী নজরুল ইসলাম।

তাঁর কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের ঈদ, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম, ফাতেহা-ই-ইয়াজ দহম, মহররম কিংবা মুসলিম ইতিহাসের বীর শ্রেষ্ঠরা, যেমন খালেদ, তারেক, মুসা, আমানুল্লাহ্, ওমর ফারুক, মওলানা মুহম্মদ আলী, কামাল আতাতুর্ক, আনোয়ার পাশা যেভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে তেমন উপমা আর কোথায়?

তাঁর কাব্য পড়েই সেদিনের আত্মবিস্মৃত বাঙালী মুসলমানরা আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) আযান, অজু, কাবা, মসজিদ, মুয়াজ্জিন, নামগুলোর সাথে পুনঃ পরিচিত হতে পেরেছিল। তিনি তাঁর গানে কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্যবাহী 'জুলফিকার' 'খয়বর' শেরে খোদা হাসান-হোসেন, মদিনা, বাগদাদ, হামজা, বেলাল, বীর ওলিদ, ওমর, হারুন আল-রশীদ, সালাহউদ্দীন রুমী, সাদী, হাফিজ, জামী, খৈয়াম, তবরিজ, মা-আমিনা, আম্মা খাদিজা, নবী নন্দিনী ফাতেমা, মা আয়েশা, সতী রহিমা, খাওয়ালা, জেবুন্নিসা, রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, লায়লা, খালেদ, এদিব, আবে জমজম, ফোরাত, ইমাম মেহেদী, আদম, নূহ, ইব্রাহীম, দাউদ সোলেমান, মুসা, ইউনুস, ইউসুফ-জুলেখা, আলিফ লায়লা, জিবরাইল, মিকাইল, আজরাইল, ইসপাহান, বোগদাদ, প্রভৃতি নামগুলোর সাথে আমাদের যে সম্পর্ক তৈরী

www.pathagar.com

করেছিলেন তার উপমা সেদিনও যেমন ছিলনা আজও তেমন নেই। নজরুলের স্বাতন্ত্র্য এখানেই। নজরুলই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের জাতিসত্তা। নজরুলই আমাদের স্বাধীনতা।

নজরুল ছিলেন এই জাতির প্রতি আল্লাহর রহমত স্বরূপ। তাঁর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর কবি প্রতিভা, সঙ্গীত মনীষা আমাদের অভিভূত করে। তিনি ইকবাল হয়ে মুক্তির গান গেয়েছেন, গালিব হয়ে কল্যাণের গজল শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথসহ তৎকালীন লেখিয়েদের একদেশদর্শিতাপূর্ণ কাব্য-সাহিত্য জগতে তিনিই একমাত্র কবি যিনি ইসলামের সাম্য, মৈত্রী মানবতার বাণী শুনিয়ে গেছেন।

নজরুল বাঙালী মুসলমানের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং আধুনিকতাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে গেছেন। নজরুলকে বাদ দিলে আজকের বঙ্গীয় মুসলমানদের আধুনিকতাকে ধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং বাঙালী মুসলমানদের 'বেসিক নীড' পাঁচটি নয়, ছয়টি হওয়া উচিত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত হওয়া উচিত নজরুল চর্চা।

আজ আবার বাঙালী মুসলমানের জীবনে খরা নেমে এসেছে। সামনে পিছনে ডাইনে-বামে যখন হতাশার অন্ধকার ঘিরে ধরেছে আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য চেতনা যখন ঘোলাপানির প্লাবনে তলিয়ে যেতে বসেছে তখন নজরুলকে আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন।

১৯৯৯ এর ২৪ মে এই মহামনীষীর জন্মশতবার্ষিকী। সেদিন হয়তো সরকারীভাবে কিছু বেলুন উড়বে, গানবাদ্য হবে, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সত্য মিথ্যা সাজিয়ে তাঁকে সেক্যুলারিস্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আসল নজরুল পড়ে থাকবেন নিভৃতে।

নজরুল নামটিই শতবর্ষ। তাঁর শতবর্ষ পালিত হোক, নাই হোক, বা যেভাবে খুশি হোক, তাতে কবির কিছুই এসে যায়না। কিন্তু আমরা যারা আজ অন্ধকারে নিমজ্জিত, পথ হাতড়িয়ে ফিরছি, তারা নজরুলের আলোকে আলোকিত হয়ে আবার পথের নিশানা খুঁজে পেতে চাই। তাঁরই সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই—

> "খালেদ! খালেদ! দু'ধারী তোমার কোথা সেই তলওয়ার
> তুমি ঘুমায়েছ, তলওয়ার তব সেতো নহে ঘুমাবার।

আরিফুল হক

২৫-৫-৯৯ আহ্বায়ক

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি

www.pathagar.com

প্রধান সম্পাদকের কথা

আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র! নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, আন্তরিকতা ও উদ্যোগে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বৃহৎ সংকলন প্রকাশ হ'তে পারল। কমিটির সদস্যদের নজরুল-প্রেম এবং সেই সঙ্গে দেশ ও জাতিপ্রেম যে এই নিশ্ছিদ্র আন্তরিকতার প্রেরণা যুগিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমিটির প্রতিটি সদস্য এই সংকলন প্রকাশে তাদের উৎসাহ ও পরিশ্রমের সবটুকু নিংড়ে ব্যবহার করেছেন। আমি প্রথমে সে জন্যে তাদের অকুণ্ঠ মোবারকবাদ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য এই বৃহৎ সংকলন প্রকাশ করতে যাঁরা অকৃপণভাবে ব্যয়ভার বহন করেছেন তাদেরও এই সঙ্গে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। অবশ্য নজরুলের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব পালনের এটা আরম্ভ মাত্র।

নজরুল ইসলামকে নিয়ে ইতোপূর্বে একাধিক সংকলন হ'য়েছে। এই স্মারক সংকলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে তাদের যে কিছু পার্থক্য থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরও বেশি সময় অবসর ও পরিকল্পনা নিয়ে মনোহারিত্বে ও চমৎকারিত্বের সুন্দরতর স্মারক সংকলন হয় তো আমাদের দ্বারা সম্ভব হ'ত; কিন্তু চিন্তা-পরিকল্পনার সেই দীর্ঘ সময় আমাদের হাতে না থাকাতে অম্লান ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তা করতে পারিনি। ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক নজরুল-গবেষক ও বিশেষজ্ঞ এবং জাতীয় আদর্শ ও প্রেমে উজ্জীবিত লেখকের লেখা এখানে মুদ্রিত করতে আমরা ব্যর্থ হ'য়েছি বলে দুঃখিত। এই অপারগতার জন্যে ঐসব হিতাকাঙ্ক্ষী লেখকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

নজরুল ইসলামের কাছে আমাদের ঋণের কোন সীমা নেই। ১৯৪১-এ লেখা 'আমার লীগ-কংগ্রেস' নামক স্ব-স্বাক্ষরিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

"মুসলমানের জন্য আমার দান কোন নেতার চেয়ে কম নয়; যে-সব মুসলমান যুবক আজ নব জীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের জন্য সাহায্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা-ঝুলি থেকে।" —এই বাক্যে কিঞ্চিৎ অহঙ্কার প্রকাশ পেলেও এর চেয়ে সত্য বোধ করি আর কিছু নেই। তিনি হয়ত নিজেও জানতেন না যে তিনি বাঙালী মুসলমানের অহঙ্কার। সে জন্যে বেশ কিছু বাঙালী মুসলিম মনীষী একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, বাঙালী মুসলমানের জন্য তিনি আল্লাহ্‌র দান। প্রিন্সিপাল ইব্‌রাহীম খাঁ ত তাঁকে লেখা এক চিঠিতে বলেই ছিলেন, 'বাঙালী মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি!' এর কারণ তাঁরা দেখেছিলেন বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে সহস্র বছরে এত বড় প্রতিভার, বিশেষ ক'রে কাব্য ও সঙ্গীত প্রতিভার জন্ম হয়নি— হয়ত বা গোটা

www.pathagar.com

বাঙালী জাতির মধ্যে হয়নি। কবি নজরুল-ই-বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি যিনি সাংবাদিকতা ও রাজনীতিকে সাহিত্য ও কাব্যের প্রাণবাণী করে তুলেছিলেন। সাহিত্য ও কাব্য যে যুদ্ধ-মারণাস্ত্রের মত অমোঘ হ'তে পারে এবং জাতীয় দুর্দিনে জাতি যে তা ঢালের মত ব্যবহার করে একই সঙ্গে আত্মরক্ষা করতে এবং শত্রুহৃদয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের পশ্চাদপসরণে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ হ'তে পারে তার তুলনাহীন উদাহরণ তিনি। শত্রুর হৃদয়ে আতঙ্ক সঞ্চারণে তাঁর সমান কবি যে বাংলা সাহিত্যে একজনও নেই— দ্বিধাহীন চিত্তে গর্বিতভাবে সে কথা যে-কোন বাঙালী পাঠক বলতে পারেন।

এ সংকলনটি এই দ্বিধাহীন বক্তব্যেরই প্রকাশ কিছুটা। এখানে কবির কবিতা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে যেমন আলোচনা করা হ'য়েছে তেমনি কবির রচনা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অনেকগুলো রচনার উদ্ধৃতি দেয়া হ'য়েছে যেগুলো বহু পিপাসু পাঠক-চিত্তের অন্তরালে থেকে গেছে। এখানকার সমস্ত রচনায় পূর্ণ নজরুল ইসলাম উন্মোচিত হ'য়েছেন— একথা বলব না; তবে নজরুলের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিতে এই সংকলন অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নজরুল লিখেছিলেন— অন্ধকারে এসেছিলাম, থাকতে আঁধার যাই চলে'। কথাটা একশ' ভাগ সত্যি। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন উপমহাদেশ বৃটিশ শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট। যে জন্যে তাঁকে স্বদেশবাসীকে ধিক্কার দিয়ে বলতে হ'য়েছিল— 'দিনকানা তুই দেখতে পাস্‌নে দন্ডে দন্ডে পলে পলে,/ কেমন করে মরছে মানুষ পিশাচ জাতির জাঁতাকলে'। এই পিশাচ জাতির, জাঁতাকল থেকে উদ্ধার করার জন্যে যে মহানায়কের প্রয়োজন ছিল— সেই নায়কের দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন।

তিনি যুগ সৃষ্টি করেছিলেন সত্য; কিন্তু যুগও তাঁকে সৃষ্টি করেছিল। কারাবন্দী স্বদেশবাসীর ক্রন্দসী আত্মার আর্তনাদে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হ'য়েছিল বলে উন্মত্ত শক্তি ভর করেছিল তাঁর কলমে; ফলে খয়বর জয়ী আলী হায়দরের মত খয়বরের দুর্গ কপাট ভাঙ্‌বার দুঃসাহস তিনি দিতে পেরেছিলেন গোটা উপমহাদেশের জাতিকে। সেই কৃজ্ঞতারই উপহার এই সংকলন। নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি এই সংকলন প্রকাশ করে সেই অপার ঋণের ক্ষুদ্র অংশ পরিশোধ করেছে এবং তাদের পরিকল্পিত বিভিন্ন কাজের দ্বারা সে ঋণ পরিশোধের যে প্রস্তুতি নিয়েছে তার বাস্তবায়ন করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখবে না বলে আমাদের ধারণা। আশা করি তাঁরা এ জন্যে জাতির তরফ থেকে অকুণ্ঠ মোবারকবাদ পাবেন।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির হাতে এই ক্ষুদ্র উপহার তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

ঢাকা
২৫-৫-৯৯

শাহাবুদ্দীন আহমদ
১৯৫/১/এ শান্তিবাগ
ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সম্পাদকের কথা

কাজী নজরুল ইসলাম, নামটি উচ্চারিত হলেই বাঙ্গালী মুসলমানদের মানসপটে বহুমাত্রিক প্রতিভা, ব্যতিক্রমী ও আশ্চর্য প্রকৃতির একজন পৌরুষের চিত্র ভেসে উঠে। যার সাথে আর দশজন মানুষের মিল কম, তাঁর উপলব্ধি ও বর্ণাঢ্য প্রকাশভঙ্গির রূপ বৈচিত্র্যই আলাদা।

এমন একটি সময়ে তাঁর জন্ম, বেড়ে উঠা, সময়কে ধারণ করে, প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে নিজের মত সব কিছুকে দেখা ও প্রকাশ করার আশ্চর্য প্রতিভা সমসাময়িককালে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না।

বহমান স্রোতের প্রতিকূলে শক্ত অবস্থান নিয়ে আমৃত্যু টিকে থাকার দুঃসাহসী একজন লড়াকু মানুষ চাইলে নজরুলের বিকল্প কোথায়!

ভাগ্যহত লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিপীড়িত একটি জাতি যখন স্বাধীনতা হারিয়ে ঘরে-বাইরে শত্রু পরিবেষ্টিত, আধমরা, আড়ষ্ট এবং ম্রিয়মান, তখনই যুগস্রষ্টা এই সাহসী সন্তানটি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' বলে যুগের নকীব-এর মত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন। স্বাধীনতার গান শোনালেন। আশার ভাষা দিলেন। বাঁচার স্বপ্ন দেখালেন। অস্তিত্ব রক্ষা নয় শির উঁচু করে দাঁড়াবার হিম্মত জোগালেন। স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধকরে একটি জাতি-সত্তার ভিত গড়লেন। সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আজ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও কবি নজরুল এক ও অবিভাজ্য।

যে কবি আমাদের জাতিসত্তার অন্যতম রূপকার। স্বাধীনতার পথিকৃৎ। সামনে চলার প্রেরণা। যার অবিনাশী গান, কবিতা, গজল, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নাটক, গল্প ও উপন্যাস আমাদের পথ দেখায়, হাঁটতে হাঁটতে হেরা স্পর্শের অনুপ্রেরণা যোগায়, অনাচার-অত্যাচার, জুলুম পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে আহ্বান জানায়; ভাঙার গান গেয়ে যিনি আবার গড়ার স্বপ্নে বিভোর করেন তিনি তো জাতির আত্মার স্পন্দন; শরীরের তাগত, মনের শক্তি। জাতীয় কবির মর্যাদায় যাকে অধিষ্ঠিত করে আমরা গৌরবান্বিত।

সেই অমর কবির যাদুময় প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হলে আমরা মনের অজান্তেই সমস্ত অর্জনকে বিসর্জন দিয়ে কাঙাল হয়ে পড়বো। যারা কাঙাল হতে আগ্রহী কিংবা বাঙাল সেজে

www.pathagar.com

পর দুয়ারে ভিখ মাগে তাদের কথা আলাদা। আমরা চাই জনম জনম ধরে কবি কীর্তির পরশ নিয়ে ধন্য হতে। জন্মশতবার্ষিকী পালনের ভেতর সেই আকুতিটুকুই প্রাধান্য পেয়েছে।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির অনুষ্ঠানমালায় আমরা সেই নজরুলকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি– যেখানে নজরুল অখণ্ড। সরকারী আয়োজনের বিপরীতে পূর্ণাঙ্গ নজরুলকে উপস্থাপনের তাগিদ থেকেই সেমিনার, স্মারক, র‌্যালী সহ যাবতীয় অনুষ্ঠানমালা, আয়োজন ও উদ্যোগ।

আমাদের আয়োজনের ভেতর প্রয়োজনের সকল তাগিদ থাকলেও সীমাবদ্ধতা মুক্ত হতে পারেনি। এই অতৃপ্তি আমাদেরকে কিছুটা বিব্রত করলেও সরকারীভাবে খণ্ডিত নজরুল উপস্থাপনের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মার আহাজারী ও প্রচণ্ড প্রতিবাদটুকু রেখে যেতে চাই। আগামী প্রজন্মকে দায়বদ্ধ করে আহ্বান জানাতে চাই—যতবার নজরুল আমাদের জাতীয় জীবনের ব্যাপক আঙ্গিকে ঝলসে উঠবেন ততবারই আমরা মাথা না নোয়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারবো। 'অগ্নি-বীণা' 'বিষের বাঁশী' দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবো। 'মরু ভাস্করের' হাতছানিতে, 'খেয়াপারের তরণী' দিয়ে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো ইন্‌শাআল্লাহ। স্মরণিকা আমাদের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ছোঁয়া সমৃদ্ধ এই স্মরণিকা অখণ্ড নজরুল উপস্থাপনের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা। আমরা সকল সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ স্মরণিকা কমিটির প্রতি, প্রধান সম্পাদক ও উপদেষ্টা সম্পাদকের প্রতি। উপদেশ, পরামর্শ এবং স্মরণিকা কমিটির টিমওয়ার্ক আমাদেরকে এমন একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সবার প্রতি আবার কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর প্রতি অফুরন্ত শুকরিয়া জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকল প্রয়াস কবুল করুন।

২৫-৫-৯৯

মাসুদ মজুমদার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা

www.pathagar.com

নির্বাহী সম্পাদকের কথা

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী দেশময় একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই আন্দোলনে আন্দোলিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকা। সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি জাতীয় কমিটি। সরকারী আয়োজন পর্যাপ্ত নয় বিবেচনায় বেসরকারী উদ্যোগে জন্মলাভ করেছে আরেকটি সংগঠন—"নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি"। এ কমিটির ঐকান্তিক ইচ্ছায় নজরুল স্মারক-গ্রন্থ "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" প্রকাশের কাজ নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে স্মারক কমিটির সদস্যদের অতন্দ্র প্রহরায় ও মমত্ববোধের তাড়নায় দুর্বার গতিতে নিষ্পন্ন হতে পারলো দেখে সেই মহান আল্লাহকে স্মরণ করছি বার বার। প্রকাশনার কাজ ধীরে-সুস্থে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঝড়ো গতির প্রকাশনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাই স্বাভাবিক। তাই স্মারক কমিটির পক্ষে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সবার কাছে আমি সবিনয় ক্ষমাপ্রার্থী।

জাতিসত্তার নিরিখে আমরা আজ ম্রিয়মান- মৃতপ্রায় মেরুদন্ডহীন দুর্বল এক জাতিতে পরিণত হয়েছি। এ দুরবস্থা থেকে জাতিকে মুক্ত করে শির উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি যোগাতে পারে একমাত্র নজরুলেরই গান, কবিতা ও গদ্য-সাহিত্য। কবির অসংখ্য গান, কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষণ-অভিভাষণ বৃটিশ শাসন ও শোষণের সময় জাতিকে যেভাবে উজ্জীবিত করেছে আজও সেই গান ও কবিতাই জাতির জন্য শক্তি ও সাহস। কবি যখন বলেন—

১. উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্ আরবির,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,—

২. বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি; আমারি
নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!

৩. সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন
লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় প্রাণ দিতে আজ
ডাক পড়েছে তাদের।

৪. দিকে দিকে পুন: জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল॥

www.pathagar.com

তখন ম্রিয়মান নুয়ে পড়া জাতির জীবনে সঞ্চারিত হয় প্রচন্ড শক্তি— আধমরা জাতি জীবিত হয়ে ওঠে—শুরু হয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম। '৪৭ ও '৭১-এর মতো বিজয় তখন জাতির পদচুম্বন করে— এভাবে অনন্তকাল নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের জীবনে শক্তি যোগাবে— সাহস যোগাবে নজরুলের গান ও কবিতা। ষড়যন্ত্রের কালো-হাত সেই কবিকে আড়াল করছে আমাদের জাতীয় জীবন থেকে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে নজরুলের যথার্থ পরিচয় থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এমনটি কখনো হতে দেয়া যায় না। সেদিন বেশি দূরে নয় নজরুল-প্রেমিক বাংলাদেশের মানুষ দেশের স্বার্থে, দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে নজরুলের বাণী-চিরন্তনীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে "শক্তি-সিন্ধু" মাঝে অবগাহন করে শির উঁচু করে দাঁড়াবে ইন্‌শাআল্লাহ।

স্মারক প্রকাশের কাজে উপদেষ্টা সম্পাদক, প্রধান সম্পাদক, সম্পাদক, স্মারক কমিটির অন্যান্য সদস্য ও নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির অনেক সম্মানিত সদস্য বুদ্ধি, পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। সে জন্য তাদের সবাইকে অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে মোবারকবাদ জানাই। বিশেষ করে স্নেহভাজন এম আবদুছ ছালাম, এ সংকলনের ব্যাপারে যে খাটাখাটুনি দিয়েছে তা মনে রাখার মতো।

মুদ্রণ কাজে আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেসের সকল কর্মচারী আমাদেরকে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়েছে। তাদেরকেও অসংখ্য মোবারকবাদ।

এ স্মারক-গ্রন্থটির অধিকাংশ লেখাই পুনর্মুদ্রণ। পুরনো লেখা ও ছবি নজরুল একাডেমী পত্রিকা, নজরুল ইনস্টিটিউট অ্যালবাম, দৈনিক ইনকিলাব ও প্রেক্ষণ সাহিত্য ত্রৈমাসিক থেকে সংগৃহীত।

আমাদের হাতে যেসব লেখা জমা হয়েছিল স্মারক-গ্রন্থের পরিসর সে অনুপাতে যথেষ্ট না হওয়ায় অনেকের লেখা ছাপানো সম্ভব হয়ে উঠলো না। সে জন্য আমরা নিরতিশয় দু:খ প্রকাশ করছি। আর তা ছাড়া আরেকটি দুর্বলতা এ সংকলনে আছে। লেখক-এর বয়স অনুসারে বিন্যাসের সুযোগ আমরা পাইনি দুটো কারণে : এক. ঝড়োগতিতে কর্ম-সম্পাদন; দুই, যথাসময়ে যথার্থ লেখাটি না পাওয়া। তাই বিন্যাসের দুর্বলতার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন।

নি:সন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক স্মারক-গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি প্রকাশে যে বা যাঁরাই সামান্যতমও সহযোগিতা করেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহান আল্লাহ তাদেরকে কবুল করবেন।

পরিশেষে কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি আমার প্রিয় দেশবাসীকে ডাক দিয়ে যাই—

> সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন/ লক্ষ্য শুধু যাদের
> খোদার রাহায় প্রাণ দিতে আজ/ ডাক পড়েছে তাদের

খন্দকার আবদুল মোমেন
২৫-৫-৯৯ ১৩/৫ পি সি কালচার হাউজিং
ব্লক-খ মোহাম্মদপর, ঢাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম-অধ্যায় (নজরুল রচনা থেকে)

প্রবন্ধ
বর্তমান বিশ্বসাহিত্য-১৯ ◆ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ-২৫ ◆ আমার লীগ-কংগ্রেস-৩৩ ◆
অভিভাষণ
বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও-৩৭ ◆ মুসলিম সংস্কৃতি চর্চা-৪১ ◆ তরুণের সাধনা-৪৭ ◆ জনসাহিত্য-৫৭ ◆ আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ-৬১ ◆ যদি আর বাঁশি না বাজে -৬৯ ◆
চিঠিপত্র ও হস্তলিপি
নজরুলের প্রতি প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর পত্র-৭৩ ◆ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর প্রতি নজরুল ইসলামের পত্র-৭৬ ◆ হিন্দি হস্তলিপি-৫৫ ◆ বাংলা হস্তলিপি-৫৬ ◆ ইংরেজী হস্তলিপি-৬০ ◆ উর্দুহস্তলিপি-৮৭ ◆

দ্বিতীয়-অধ্যায় (নজরুল-সাহিত্য ও ব্যক্তিত্ব)

প্রবন্ধ
নজরুল-সাহিত্যে বিশ্বমানস-দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-৯১ ◆ নজরুল ইসলাম : একটি নতুন বিবেচনা-সৈয়দ আলী আহসান-৯৯ ◆ নজরুল ইসলাম-ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন-১০৭ ◆ নজরুল-কাব্যের পটভূমি-আবুল কালাম শামসুদ্দিন-১০৯ ◆ নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সৈয়দ আলী আশরাফ-১১৭ ◆ নজরুল প্রতিভা-ড. আশরাফ সিদ্দিকী-১২৫ ◆ শিল্প : জীবন : নজরুল ইসলাম-তালিম হোসেন-১৩০ ◆ ইকবালের 'ইনসানে কামিল' ও নজরুল ইসলামের 'পুরুষোত্তম-শাহেদ আলী-১৩২ ◆ কাজী নজরুল ইসলাম : এক মহান কবিপুরুষ-আল মাহমুদ-১৩৬ ◆ কাজী নজরুল ইসলামের নাটক-আরিফুল হক-১৪১ ◆ নজরুল-কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ-মুনির চৌধুরী-১৫২ ◆ নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ-আহমদ সফা-১৫৭ ◆ প্রভাবিত প্রতিভা ও নজরুল ইসলাম-শাহাবুদ্দীন আহ্মদ-১৭১ ◆ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলিত নজরুল-সাহিত্য-ড. এস. এম. লুৎফর রহমান-১৮৭ ◆ কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস-ড. আবুল হাসান শামসুদ্দিন-২০৭ ◆ উপমহাদেশের তিন কবি- আবদুল মান্নান তালিব-২১৭ ◆ নজরুল-কাব্যে নারী-জাহানারা আরজু-২২২ ◆ নজরুলের মানব দর্শন-আল মুজাহিদী-২৩১ ◆ নজরুলের গদ্য সাহিত্য-অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিউর রহমান-২৩৬ ◆ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নজরুল-মোশাররফ হোসেন খান-২৪৬ ◆ নজরুল-কাব্যে সাম্যবাদ : দার্শনিক ভিত্তি-হাসান আলিম-২৫১ ◆ নজরুল : পথিকৃত কবি-ফাহমিদ-উর-রহমান-২৫৮ ◆

তৃতীয়-অধ্যায় (জাতিসত্তার প্রয়োজনে নজরুল)

নজরুল কেন জাতীয় কবি ?-মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ -২৬৩ ◆ কাজী নজরুল ইসলাম এবং আমরা-আখতার-উল-আলম-২৭৫ ◆ হারিয়ে যাওয়া মুক্তোর সন্ধানে-কমোডর (অব:) এম. এ. রহমান-২৭৯ ◆ জাতীয় কবি ও বিশ্বকবি-ওবায়দুল হক সরকার-২৮৩ ◆ নজরুলর জন্মশতবর্ষ এবং কতিপয় প্রস্তাব-মুন্সী আবদুল মান্নান-২৯১ ◆ নজরুল প্রতিভা : আমাদের জাতিসত্তার নিরিখে-মাসুদ মজুমদার-২৯৫ ◆ নজরুলের ব্যথার দান : প্রেম এবং দেশপ্রেম–রফিক মুহাম্মদ-৩০১ ◆

www.pathagar.com

চতুর্থ-অধ্যায় (স্মৃতিকথা)

নজরুল-স্মৃতি-ইবরাহীম খাঁ-৩০৭ ◆ ঢাকায় নজরুল-আবদুল কাদির-৩১৩ ◆ আগুনের ফুল্‌কি-কাজী আবুল কাসেম-৩২৫ ◆ ভুলি কেমনে.... মোহাম্মদ মোদাব্বের-৩৩৩ ◆ কুড়িগ্রামে কবি নজরুল-মাহফুজুর রহমান খান-৩৩৮ ◆

পঞ্চম-অধ্যায় (দেশ-বিদেশে নজরুল)

নজরুলের সিরাজগঞ্জ সফর-আবদুল মান্নান সৈয়দ-৩৪৯ ◆ বাংলাদেশে নজরুল চর্চা : মুখোশ ও বাস্তবতা-আবদুল হাই শিকদার-৩৫৫ ◆ তরুণ রাশিয়ার চোখে নজরুল-বিশ্বজিৎ রায়-৩৬৪ ◆ জাপানে নজরুল চর্চা-কিওকো নিওয়া-৩৬৯ ◆ উত্তর আমেরিকায় নজরুল চর্চা-সাজেদ কামাল-৩৭৩ ◆

ষষ্ঠ-অধ্যায় (নজরুল-সঙ্গীত)

নজরুল-সঙ্গীতে মহানবী : বিচিত্র অনুভবে- লাল মোহাম্মদ দিদার-৩৮৫ ◆ সঙ্গীতস্রষ্টা নজরুল-আবু হেনা মোস্তফা কামাল-৪১৭ ◆ নজরুলের একটি গান : একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা-আসাদুল হক-৪২২ ◆ নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত-খালিদ হোসেন-৪২৭ ◆ কাজী নজরুলের গজল গান-নারায়ণ চৌধুরী-৪৩০ ◆ নজরুলের গান-সাজজাদ হোসাইন খান-৪৩৭ ◆ উর্দু ভাষায় নজরুল সঙ্গীত-আবদুল ওয়াহিদ-৪৪১ ◆

সপ্তম-অধ্যায়
নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ (৪৫৫-৪৭৪ পৃ:)

গানের কবি নজরুল-কাজী কাদের নওয়াজ ◆ নজরুল-জসীম উদ্‌দীন ◆ হে কবি-বন্দে আলী মিয়া ◆ নজরুল-গোলাম মোস্তফা ◆ আমাদের কবি-ফররুখ আহমদ ◆ নজরুলকে মনে করে-আহসান হাবীব ◆ নজরুল ইসলামের ছবি দেখে-আবুল হোসেন ◆ নজরুল-আবদুস সাত্তার ◆ নজরুল-সিকান্‌দার আবু জাফর ◆ বিদ্রোহী কবিকে-আজিজুর রহমান ◆ নজরুল এবং একটি লাল চিরুনি-আবিদ আজাদ ◆ এসো মহাকবি-আবদুল মুকিত চৌধুরী ◆ নজরুলের ভালোবাসা-মতিউর রহমান মল্লিক ◆ দৌলতপুরে একদিন-সোলায়মান আহসান ◆ নজরুল-আসাদ বিন হাফিজ ◆ তোমার হাতে অগ্নিবীণা-আহমদ মতিউর রহমান ◆ নজরুল ইসলাম-আহমদ আখতার ◆ নজরুল-গোলাম মোহাম্মদ ◆ সেই সে দরাজ বুক-কামরুল ইসলাম হুমায়ুন ◆ প্রেমিক তুমি বিদ্রোহী-জাকির আবু জাফর ◆ বায়ুময় বৃষ্টির আগে-না'ঈম মাহমুদ ◆ ঘুমহীন ফুল-ওমর বিশ্বাস ◆ শতাব্দীর মোহন সমুদ্র-মৃধা আলাউদ্দিন ◆ পাখি কাব্য-নিয়াজ শাহিদী ◆ বিদ্রোহী সুর-আমিন আল-আসাদ ◆ একদিন নজরুল এসে-হোসাইন হাফিজুর রহমান ◆

পত্রসাহিত্য, জীবনপঞ্জি ও কমিটিসমূহ

নজরুলের পত্রসাহিত্য ও নজরুল-মাহফুজুর রহমান আখন্দ-৪৭৫ ◆ নজরুল-জীবনপঞ্জি-নাসির হেলাল-৪৮২ ◆ নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি-৪৮৭ ◆ নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় নির্বাহী কমিটি-৪৯০ ◆ নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির সাব-কমিটিসমূহ-৪৯১ ◆ বিভিন্ন কার্যক্রম ◆

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

নজরুল রচনা থেকে

প্রবন্ধ

বর্তমান বিশ্বসাহিত্য

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

আমার লীগ-কংগ্রেস

অভিভাষণ

বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও

মুসলিম সংস্কৃতি-চর্চা

তরুণের সাধনা

জনসাহিত্য

আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ

যদি আর বাঁশি না বাজে

চিঠিপত্র

নজরুলের প্রতি প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর পত্র

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর প্রতি নজরুলের পত্র

হস্তলিপি

বাংলা-ইংরেজী-উর্দু-হিন্দি

www.pathagar.com

শক্তি-সিন্ধু মাঝে রহি' হায় শক্তি পেল না যে
মরিবার বহু পূর্বে, জানিও মরিয়া গিয়াছে সে।
– কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য
কাজী নজরুল ইসলাম

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তাঁর দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মত, মিল্টনের Birds of Paradise- এর মত ধূলি-মলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে স্বর্গের সন্ধান করে, তাঁর চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না; কেবলি ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উঠে স্বপনলোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে—অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে- তরুলতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী-মাতাকে ধরে থাকে—তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না, তা নয়। তবে সে এই দু:খের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে :স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলির ধরাতে নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এই এ-ঔদ্ধত্যে সুর-লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন : অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামি! এরাও চোখ পাকিয়ে বলে : আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা!

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন : দৈত্যের এ-ঔদ্ধত্য কোনোকালেই টেকেনি। নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে : কেন যে টেকেনি তার কৈফিয়তই ত চাই, দেবতা! আমরা ত তারই আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুই দিকেই বড় বড় রথী-মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি Dreamers স্বপ্নচারী, আর একদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাঁতে প্রভৃতি। আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

এর অন্যরূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme-এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দু:খে সে অশ্রু বিসর্জন করে, পক্ষীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই বলে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে- স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসি-মা। তবে সে তার মায়ের মত দু:খিনী নয়, সে রাজরাণী, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোনো দু:খ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী—কিন্তু তাই বলে তার উপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়- তার দু:খিনী মাকে শোনায়।—তার আর ভাইদের মত, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি, সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোড়ে না।

এঁদের দলে—লিওনিদ, আঁদ্রিভ, ক্নুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল, রেমঁদ প্রভৃতি।

বার্নার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মত হলাহল এরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্‌গার করেননি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী—তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন : এ দু:খ, বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্ত-মাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল-নলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন :

> A thing of beauty is a joy for ever. [ENDYMION]
> Beauty is truth, truth beauty.

প্রত্যুত্তরে মাটির মানুষ Whitman বলেন :

> Not physiognomy alone—
> Of physiology from top to toe I sing,
> The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হল না, সেই Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদের বলে হনুমান। এই লোভ—রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রজারপাইন যমরাজ প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা দেয় লেজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, লেজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই—তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব—বলেই দেয় লম্ফ।

www.pathagar.com

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে—এ আপনারা যে কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধহয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দুরবিনের দরকার হবে না।
রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করার পুণ্যবলে মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজো পূজা পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে সে দু:সাহসীদের মুখ পুড়ছে—তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পূজো পাবে না— এ কথা কে বলবে?
এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙাতে হবে। অবশ্য বড় বড় পেট যাদের, তাঁদের বলছিনে, হয়ত তাতে করে তাঁদের মাথা হেঁটই হবে।....
এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে 14th December—১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের 14th December—এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি Merezhkovsky-র বেদনা-চিৎকার "14th December!" এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর রুশ-সম্রাট নিকোলায়ের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস। এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে লটকানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি। এই দিনই নির্যাতনের কংস-কারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী শিশু। বীণাবাদিনী সরস্বতী এইদিন বীণা ফেলে খগড় হাতে চামুণ্ডা-রূপ পরিগ্রহ করে। এর পরেই পাতাল ফুঁড়ে আসতে লাগল দলে দলে অগ্নিনাগ-নাগিনীর দল। কেতকী-বিতানের শাখায় শাখায় দুলে উঠল বিষধর ভুঝঙ্গের ফণা।
এই নির্বাসনের সাইবেরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির Crime and Punishment। রাস্কলনিকভ যেন দস্তয়ভস্কিরই দু:খের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাস্কলনিকভ এই বহু-পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে বলল, "I bow down not to thee, but to suffering humanity in you! সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে-ব্যথায় শিউরে উঠল। নিখিল-মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জিভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠল। টলস্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে। সে মহাপ্লাবনে Noah-র তরণীর মত ভাসতে লাগল সৃষ্টি—প্লাবন শেষ নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।
তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মত- ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। চেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললে : তোমার সৃষ্টির জন্যেই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল! বৃদ্ধ ঋষি টলস্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠলেন : That man has only one God and that is Satan ! কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারলে না।

www.pathagar.com

গোর্কি বললেন : দু:খ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীতে শুচি করব।

"লক্ষ কণ্ঠে গুরুজির জয়" আরাবে বাসুকীর ফণা দোল খেয়ে উঠল। নির্জিতের বিক্ষুব্ধ অভিযানের পীড়নে পায়ের তলার পৃথিবী চাকার নীচের ফণিনীর মত মোচড় খেয়ে উঠল।

দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস যে মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রসাদে-লুক্কায়িত শত্রুতে দংশন করলে। জার গেল—জারের রাজ্য গেল-ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মত গোর্কি আজ ক্লাব শ্রান্ত—হয়তবা নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তার প্রভাব আজ রুশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্কসের ইকনমিক্স্-এর অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।

গোর্কির পরে যেসব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কি-না তা আজও বলা দুষ্কর।

রাশিয়ার পরেই আসে স্ক্যান্ডেনেভিয়া। আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবি রাশিয়া যেমন করে—তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবি করে।

আজকের নরওয়ের ক্লুট হামসুন, সোহান বোয়ার—শুধু নরওয়ের কথাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইবসেনের মানস-পুত্র। হামসুন, বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক Dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। বোয়ারের Great Hunger এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপেপূণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্ছিদানন্দ। হামসুনের Growth of the Soilএর pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মত স্তবের আকুতি। যে করুণ-সুন্দর দু:খের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো তরুর মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—তার তুলনা কোন কালের কোন সাহিত্যেই নেই।

এই দু:সহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে—মাতৃহারা শিশু যেমন করে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দু:খকে লুকাতে চায়, তেমনি রাশিয়া দিয়েছে Revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা; স্ক্যান্ডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি; নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখভরা জল। রাশিয়া বলে এ বেদনাকে পুরুষ-শক্তিকে অতিক্রম করব, ভুজবলে ভাঙব এ দুঃখের অন্ধ কারা। নরওয়ে বলে, প্রার্থনা কর। উর্ধ্বে আঁখি তোলো! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না।

www.pathagar.com

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায় হঠাৎ কোন অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রুপ করে। চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রুপ-হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। পিছন ফিরে দেখি, চার্বাকের মত, জাবালির মত, দুর্বাশার মত দাঁড়িয়ে ভ্রুকুটি-কুটিল বার্নার্ড' শ, আনাতোল ফ্রাঁস, জেসিঁতো বেনাভাঁতে। তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড। শ' বলেন : Love-টাভ কিছু নয়- ও হচ্ছে মা হবার insticnt মাত্র, ওর মূলে Sex। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, কি হে ছোকরারা, খুব ত লিখছ আজকাল। বলি, ব্যালজ্যাক-জোলা পড়েছ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Leonardo-র মুখ দিয়ে বলে ঃ 'বন্ধু! যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল— তাকে ভুলতে হলে ভাল করে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙক্ষা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়—সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে তবে তার মরাই মঙ্গল।"

তাঁর মতে হয়ত আমাদের তাজমহল- শাহজাহানের মোমতাজকে ভাল করে কবর দিয়ে, ভাল করে ভুলবারই চেষ্টা।

বেনভাঁতে হাসে, সে নির্মম : কিন্তু সে বার্নার্ড শ'র মত অবিশ্বাসী নয়।

এরি মঝে আবার দুটি শান্ত লোক চুপ করে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দু:খের কথা বলে যাচ্ছে—তাদের একজন ওয়াদিশ্‌ল্ রেমন্ট—পোলিশ, আর একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা—ইতালিয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না। হঠাৎ চমকে উঠে শুনি—আবার যুদ্ধ-বাজনা বাজছে—এ যুদ্ধ-বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি তালে তালে পা ফেলে আসছে—সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যু-অনন্‌ৎসিও, কিপলিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনি এবং তার কৃষ্ণ সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশির ধ্বনির মত শ্রেষ্ঠ স্বপনচারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী— "The sound of the bell that leaves the bell itself". তারপরেই সে বলে : "আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না। ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্বব্ধতা আনে তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্য আমার এ গান শোনা।" শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। ধুলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্ব-গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়! স্বপ্নে শুনি—পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র চালকের বাঁশি,—তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মত দেহ!

তখনো চারপাশে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি-খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি— "Thou wast not born for death, immortal bird!"

www.pathagar.com

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দলমাদল কামানের পাশে ২৫ বছর বয়সে নজরুল

www.pathagar.com

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

কাজী নজরুল ইসলাম

তখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদি। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনী বলে ফেলেছিলাম। ...

এরি মধ্যে একদিন এসিস্ট্যান্ট জেলার এসে খবর দিলেন, "আবার কি মশাই, আপনি ত নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবিঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেছেন।"

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু'একটি কাব্য-বাতিকগ্রস্ত রাজকয়েদি। আমার চেয়েও বেশি হেসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে।

কিন্তু ঐ আজগুবি গল্পও সত্য হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যিসত্যিই আমার ললাটে "অলক্ষণের তিলক রেখা" এঁকে দিলেন।

অলক্ষণের তিলক-রেখাই বটে, কারণ, এরপর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাজবন্দী বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যাঁরা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার করে প্রশংসা করেছেন, তাঁরাই পরে সেই লেখার পনের বার করে নিন্দা করলেন। আমার হয়ে গেল 'বরে শাপ!'

জেলের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্ষা-সিন্ধু ফেনায়িত হয়ে উঠছে। বিশ্বাস হল না। বিশেষ করে যখন শুনলাম, আমারই অগ্রজ-প্রতিম কোনো কবি-বন্ধু, সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুর-পক্ষ 'লীড্' করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসার কথা শুধু যে আমরা দু'জনেই জানতাম, তা নয়, দেশের সকলেই জানত তাঁর গদ্যে-পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা-গানের ঘটা দেখে।

সত্য-সুন্দরের পূজারী বলে যাঁরা হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হয়ে ওঠে,–শুনলে আর দু:খ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ-খবর শুনে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি, বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার! মনে মনে কেঁদে বললাম, "হায় গুরুদেব! কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে?:

www.pathagar.com

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। এমনকি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্রবিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজো অক্ষয় হয়ে লেখা আছে! এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ কথা ফাঁস করে দিলেন। কবি হেসে বললেন, "যাক, আমার আর ভয় নেই তাহলে!"

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দু'চারটে কবিতা-গানও শুনিয়েছি ...অবশ্য কবির অনুরোধেই। এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশত তার অতি-প্রশংসা লাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কোনদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভাল বলবার চেষ্টা দেখিনি।

সঙ্কোচে দূরে গিয়ে বসলে সস্নেহে কাছে ডেকে বসিয়েছেন। মনে হয়েছে, আমার পূজা সার্থক হল, আমি বর পেয়ে গেলাম।

অনেকদিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় বসে মন্ত্র গ্রহণের অবসর করে উঠতে পারলাম না, বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।

এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন-"তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচছ-তোমাকে জনসাধারণ একেবারে খানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে"—ইত্যাদি।

আমি দেখছি, এ-গৌরবে আমার মুখ যত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম-করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাই এমনি করে শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন চার বছর ধরে এই 'শুভানুধ্যায়ী'রা গালি-গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ মিটল না। বাপরে বাপ! মানুষের গাল দেবার ভাষা ও তার এত কর্‌তবও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ফি শনিবারে চিঠি! এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানি রসিকতা, আর সে মেছোহাটা থেকে টুকে-আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধহয় আমি এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ্।

বাংলায় 'রেকর্ড' হয়ে রইলো আমায়-দেওয়া এই গালির স্তূপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ। ফি হপ্তায় মেল (ধাপা-মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল। এতদিন তবু সান্ত্বনা ছিল যে, এ হচ্ছে তন্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদন্তহীন নিরামিষাশী কবি, তোর কেন এ ঘোড়া-রোগ-এ স্বদেশ প্রেমের বাই উঠল? কোথায় তুই হ্যাঁ করে খাবি গুল-বদনীর গুলিস্তানে মলয়-হাওয়া, দেখবি ফুলের হাই-তোলা, গাইবি, "আয়লো অলি কুসুম-কলি" গান,—তা না করে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোঁচা! গেলি জেলে, টানলি ঘানি, করলি প্রায়োপবেশন, পরলি শিকল—বেড়ি, ডাণ্ডাবেড়ি, বইগুলোকে

www.pathagar.com

একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত, এ কোন রকম রসিকতা তোর? কেনই বা এ হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুৎ?

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে! সাহিত্যের বেণু-বনে। এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশি অসুরের কোঁৎকা হয়ে উঠেছে! ছুট্ ছুট্! যত মোলায়েম করেই বেণু-বন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরন্তন বাঁশবনই হয়ে ওঠে তা কোন্ পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে?

বেচারি তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্তমহারথীর সমাবেশ! বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল। ঘন ঘন হাততালি! বলে, "এই! বাঁশ-বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়!: কিন্তু শুধুই কি সপ্তমহারথীর মার? তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধুলো-কাদা-গোবর-মাটি-কোনো রুচির বাচ-বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে! মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আসা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামিতে সাহিত্যের বেণু-বন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশবাগান হয়ে উঠল।

পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিকটিকে পুলিশের চেয়েও ক্রূর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক, এতদিনে একবার প্রাণ ভরে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন করে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!

কপাল! কপাল! পালিয়েও কি পার আছে? হঠাৎ একদিন সপ্তরথীর সপ্ত-প্রহরণে চকিত হয়ে উঠলাম। ব্যাপার কি?

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ আমি তরুণ। তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তারা আমার লেখার ভক্ত!

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আজ্ঞে, এতে আমার অপরাধটা কিসের হল?—বহু কণ্ঠের হুঙ্কার উঠলো, ঐটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তোমায় নিয়ে নাচে।

বললাম, আপাতত আপনাদের ভয়ে আজই ত বুড়ো হয়ে যেতে পারছিনে। ওর জন্য দু'-দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে! আর, যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে। আমায় নিয়ে কেন টানাটানি?

আবার নেপথ্যে শোনা গেল, —তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠরক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কবুল করতে দেরি লাগবে না।

দেখাই যাক ....

এতদিন আমি উপেক্ষাবশতই এ ধোঁয়া বাণের প্রত্যুত্তরে ধোঁয়া ছাড়িনি—না উনুনের, না সিগারেটের! ভেবেছিলাম সম্রাটে-সম্রাটে যুদ্ধ, দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু হাতিতে-হাতিতে লড়াই হলেও নল-খাগড়ার নিস্তার নাই দেখছি। কাজেই, আমাদের এবার

www.pathagar.com

আত্মরক্ষা করতে হবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ায় কোন পৌরুষ নেই।...

পলিটিক্সের পক্ষকে যাঁরা এতদিন ঘৃণা করে এসেছেন, বেণু-বনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লজ্জা করছে—বাইরের লোক কি বলছে তা না-ই বললাম।

এ বাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির লক্ষ্য করে না ছুঁড়ে এঁরা ছুঁড়ছেন একেবারে দল লক্ষ্য করে। কারণ তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লজ্জা নেই। বীর বটে! এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ করে থাকি বলেই ও পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে-বেছেই বাঁশ ছোঁড়া হচ্ছে—বাণ নয়! অবশ্য, সে-বাঁশ বাঁশির মত গোটাকতক ফুটো করে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্থূলত্বই বলে, ও বাঁশি নয়—বাঁশ।

বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে, দুঃখও হয়, হাসিও পায়। পালোয়ানি মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা ত বলা দুষ্কর ....

আজকের "বাঙ্গলার কথা"য় দেখলাম, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যু-বধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন—এইটেই এ-যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে করে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপি-পায়জামা পরেন, অথচ, আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু-বংশের অনেকেই পায়জামা-শেরওয়ানি-টুপি ব্যবহার করেন, এমনকি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রুপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব'! মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাঁড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল; তবু ও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপের আর অন্ত নেই।

আমি ত টুপি-পায়জামা-শেরওয়ানি-দাড়িকে বর্জন করে চলেছি শুধু ঐ 'মিয়া সাহেব' বিদ্রুপের ভয়েই—তবুও নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকে না হয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির-পেশকার-উকিল-মোক্তারকে কী বলব?

কবি-গুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালিকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা

www.pathagar.com

লিখেছেন। তাতে-"উতারো ঘোমটা" তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। 'ঘোমটা খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায়, তা'ত কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভালো শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিন-দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদের মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পিছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানি বা বলশেভিকি রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও দু'টোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু "খুন" নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব–কাব্যলক্ষীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

বাঙলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানি 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়।

আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানি ঢং-এর। বাইরের এ-ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তাছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবি-গুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায় 'কালার -বক্সে' (Colour box-এ) এবং তা "খুন করা", "খুন হওয়া" ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও খুন-খারাবি হতে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।

আমার একটা গান আছে—

"উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।"

এই গানটি সেদিন কবি-গুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে-"উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার" ও করা চল্‌ত। চল্‌ত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে "খুন" শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশনাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে "রক্তধারা" লিখবার, সেখানে জোর করে "খুনধারা" লিখি নাই। তাই বলে "রক্ত খারাবি"ও লিখি নাই, হয় "রক্তারক্তি" না হয় "খুন-খারাবি" লিখেছি।

কবি-গুরু মনে করেন, রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু ওতে "রাগ" মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন "খুন" ফোটে না তেমনি

www.pathagar.com

"রক্ত"ও ফোটে না—নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে "খুন-খুনী" খেলি না, কিন্তু "খুন-সুড়ি" হয়ত করি।

কবি-গুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য-সভায় ভিড় না করে হিন্দু-সভারই মেম্বার হন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নতুন শব্দ-ভীতি দেখে বিস্মিত হই। মনে হয়, তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক কেহ এবং অনেক কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শত্রু সাহিত্যিকগণের অনেক দিনের অনেক মিথ্যা অভিযোগ জমে জমে ও'র মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নৈলে আরবি-ফার্সি শব্দের মোহত আমার আজকের নয় এবং কবিগুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন ত কোনে কথা উঠল না এ নিয়ে!

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি কতকগুলো জোনাকিপোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবিত্বের আস্ফালন করে। ভক্ত কি শুধু ঐ নোংরা লোকগুলোই, যারা রাতদিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত-সুন্দর মনকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ করে তুলছে? আর আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁর শত্রু?

কবি-গুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়। আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতেই চাই।

ওর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি।

কি ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয় লক্ষ্মীর কৃপায় কবি-গুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবি-গুরু কোনদিন আমাদের মত সাহিত্যিকের কুটিরে পদার্পণ করেননি—হয়ত তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ন হত না তাতে—নৈলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবন-যাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন-মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের

www.pathagar.com

একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগান্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে বসে সর্বদাই মন খুঁত খুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ করে ফেলেছি। বাইরের দৈন্য অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

কবি-গুরুর কাছেও শুধু ঐ দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনি। ভয় হয়, এ লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুর-সভায় প্রবেশ করতে দেবে না।

দীনভক্ত তীর্থযাত্রা করতে পারল না বলে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তাহলে এই পোড়া কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কীই বা বলবার আছে!

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়ত সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ঐ নির্মমতাটাই সইবে না।

কবি-গুরুর চরণে,—ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন যদি আমাদের দোষক্রটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নিব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিত বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে তাঁকে তাদেরি বাহন হতে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায়, বেদনায় আপনি হেট হয়ে যায়। বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন —রবিলোক-কাদা—ছোঁড়াছুঁড়ির বহু উর্ধ্বে।

কথাসাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র "শনিবারের চিঠি" ওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন আর যাই করুন (জানি না এ সংবাদ সত্য কি-না) ঐ দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেননি। অসহায় মানুষের দু:খ বেদনাকে তিনি এত বড় করে দেখেছেন বলেই আজ তাঁর আসন রবি- লোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথা-শিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরি করে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় যে-সব হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ঐ মঠে ফ্রি অব চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, মরে কুকুর হয়েছে। শুনলাম ঐ মর্মে নাকি উইলও হয়ে গেছে।

ঐ গল্প শুনে আমি বারংবার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছিলাম, "শরৎ-দা সত্যিই একজন মহাপুরুষ। সত্যিই আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা না খেয়ে এবং কামড়াকামড়ি করে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার-রূপ দেখতে পেয়েছেন।

আজ তাই একটিমাত্র প্রার্থনা, —যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দুমুঠো খেয়ে বাঁচব।

www.pathagar.com

৩২/এ কলেজ স্ট্রিটের এই বাড়িটির দোতলায় ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে যুদ্ধফেরত নজরুল দোতলার ডানদিকের আঁধার হয়ে যাওয়া ঘরটিতে লেখকদের সহকক্ষবাসী হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আমার লীগকংগ্রেস

কাজী নজরুল ইসলাম

আমার স্বধর্মী কোন কোন ভাই বা তাঁদের কাগজ প্রচার করছেন— আমি নাকি মুসলিম লীগ বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমার আল্লাহ্ নিত্য-পূর্ণ-পরম-অভেদ, নিত্য পরম-প্রেমময়, নিত্য সর্বদ্বন্দ্বাতীত। কোন ধর্ম, কোন জাতি বা মানবের প্রতি বিদ্বেষ আমার ধর্মে নাই, কর্মে নাই, মর্মে নাই। মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ্ ও তাঁর বিচারকেই মানি। তবু যাঁরা ভ্রান্ত ধারণা বা বিদ্বেষবশতঃ আমার এই নিন্দাবাদ করছেন তাঁদের ও আমার প্রিয় মুসলিম জনগণের অবগতির জন্য আমার সত্য অভিমত নিবেদন করছি।

আমি "নবযুগে" যোগদান করেছি, শুধু ভারতে নয়, জগতে নবযুগ আনার জন্য। এ আমার অহঙ্কার নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এই বিদ্বেষ-কলহ-কলঙ্কিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে— আল্লার বান্দা রূপেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। "ইসলাম" ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে— কোরান মজীদে এই মাহ্‌বাণীই উত্থিত হয়েছে।. . . এক আল্লাহ্ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তার আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানব-ধর্ম। আমি যদি আমার অতীত জীবনে কোনো "কুফর" বা "গুণাহ" ক'রে থাকি, তার শাস্তি আমি আমার প্রভু আল্লার কাছ থেকে নেবো, তার শাস্তি কোনো মানুষের দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ্ লা-শরীক, একমেবাদ্বিতীয়ম। কে সেখানে "দ্বিতীয়" আছে যে আমার বিচার করবে? কাজেই কারও নিন্দাবাদ বা বিচারকে আমি ভয় করি না। আল্লাহ্ আমার প্রভু, রসূলের আমি উম্মত, আল্-কোরান আমার পথপ্রদর্শক।

এ ছাড়া আমার কেহ প্রভু নাই, শাফায়ত দাতা নাই, মুর্শীদ নাই। আমার আল্লাহ্ "আল্-ফাদালীল্ আজিম"— পরমদাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোন দান নিতে দেননি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তার কৃপা ভিক্ষা করেছি তাঁর

www.pathagar.com

দাক্ষিণ্য ছাড়া কারুর দানে সে-হাত কলঙ্কিত হয়নি। আজ তিনিই এই পথভ্রষ্ট, অন্ধ, আশ্রয়-ভিক্ষুকের হাত ধরে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমা-সুন্দর আল্লাহ্‌র পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি, সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ আর কোনো অভাব নাই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই।

আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লার দেওয়া শক্তি— আমি উপলক্ষ মাত্র। বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তারই। আমার কবিতা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই সাক্ষী : আমি মুসলিমকে সংঘবদ্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাঙলার মুসলমানকে শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য— যে শির এক আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সম্রাটের কাছেও নত হয়নি— আল্লাহ্‌ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই দিয়ে বলেছি, লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার কাব্যশক্তিকে তথাকথিত 'খাট' করেও গ্রামোফোন রের্কডে শত শত ইসলামী গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ইমান অটুট রাখারই চেষ্টা করেছি।* আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে জাতির কাছে কিছু চাইনি। এ আমার আল্লার হুকুম, আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজও আমি একমাত্র তাঁরই হুকুমবর্দাররূপে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছি– আমার দীর্ঘদিনের গোপন তীর্থযাত্রার পর।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি : আমি লীগের মেম্বার নই বলে কি কোনো লীগ-কর্মী বা নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি? আজও "নবযুগে" এসেছি শুধু মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে— তাদের প্রবল করে তুলতে— তাদের আবার "মার্টায়ার"— শহীদী সেনা করতে। বাঙলার মুসলমান বাঙলার অর্ধেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্যে জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গকে প্রবল না করলে বাঙলা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাঙলার এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে, এক ঈদগাহের ময়দানে সমবেত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি। "নবযুগে" এসেও সেই কথা বলেছি ও লিখেছি। এই "নবযুগে" আসার আগে বাঙলার মুসলমান নেতায় নেতায় যে ন্যাতা টানাটানির ব্যাপার চলেছিল— সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ ও কলহকে দূর করতেই আমি লেখনী ও তলোয়ার নিয়ে, আমার অনুগত নির্ভীক, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী "নৌ-জোয়ানদের" নিয়ে— ভাই-এ ভাই-এ পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে এসেছি। আমি কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আসিনি। আল্লাহ্‌ জানেন, আর জানেন– যাঁরা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁরা— আমি কোনো প্রলোভন নিয়ে এই কলহের কুরুক্ষেত্রে যোগদান করিনি। "লীগ" কেন, "কংগ্রেস"কেও আমি কোনদিন স্বীকার করিনি। আমার "ধূমকেতু" পত্রিকা তার প্রমাণ। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোনদিন কিছু লিখিনি– কিন্তু তার নেতাদের বিরুদ্ধে লিখেছি। যে কোনো আন্দোলনেরই হোক

* তখন অখণ্ড বাংলার অধিবাসী ছিল তিন কোটি বর্তমানে যা প্রায় বিশ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। —স

www.pathagar.com

নেতারা যদি পূর্ণ নির্লোভ, নিরহঙ্কার ও নির্ভয় না হন, সে-আন্দোলনকে একদিন না একদিন ব্যর্থ হতেই হবে।

লীগের আন্দোলন যেমন "গদাই লস্করী" চালে চলছিল তাতে আমি আমার অন্তরে কোনো বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি।. . . আমি "লীগ" "কংগ্রেস" কিছুই মানি না, মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্বজনগণের মুক্তিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্যদেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি– কিন্তু স্বীকার করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জেল-কয়েদীদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হ'ল না, অথচ তারা তালঠুকে এ ওঁকে টুঁস মারে! দেখে হাসি পায়!

মুসলমানের জন্য আমার দান কোন নেতার চেয়ে কম নয়; যে–সব মুসলমান যুবক আজ নব জীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহায্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা-ঝুলি থেকে।

আল্লার সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দরে, নির্যাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি– 'ভাইসরয়।' মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ চেষ্টা করলে সমস্ত ফেরেশতাকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, ত্রি-লোকের বাদশাহী পেতে পারে— এ আল্লাহ্র নির্দেশ। মানুষ মাত্রই আল্লার সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্ব নির্যাতন, সর্ব অশান্তি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে মানুষের জন্ম। আমি সেই কথাই আজীবন বলে যাব, লিখে যাব, গেয়ে যাব; এই জগতের মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশকে আবার পূর্ণ শুদ্ধ, পূর্ণ নির্মল করব— এই আমার সাধনা। পূর্ণ চৈতন্যময় হবে আল্লার সৃষ্টি এই আমার সাধ। পূর্ণ আনন্দময়, পূর্ণ শান্তিময় হবে এ পৃথিবী— এ আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আল্লাতে বিশ্বাসের মতই অটল! "ফিরদৌসআলা"— পূর্ণ আনন্দধাম থেকে আমরা এসেছি। পৃথিবীতে সেই আনন্দধামেরই প্রতিষ্ঠা করব— এই আমাদের তপস্যা। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ্। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবী করে তারা শয়তান। সে শয়তানদের সংহার করে আমরা আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব। যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়। যে ভীরু সে মুসলমান নয়। এই ভীরুতা, এই তামসিকতা, এই অপৌরুষকে দূর করাই আমার লীগ, আমার কংগ্রেস। এ-ছাড়া আমার অন্য লীগ-কংগ্রেস নাই!

www.pathagar.com

দিকে দিকে পুন: জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল ॥
– কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও

কাজী নজরুল ইসলাম

[১৩৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।]

আপনারা আমাকে আপনাদের ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ করে যে গৌরব দান করেছেন, তার জন্য আমার প্রাণের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি বর্তমানে সাহিত্যের সেবা থেকে, দেশের সেবা থেকে, কওমের খিদমতগারি থেকে অবসর গ্রহণ করে সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগর-দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছি। সেই সাথীহীন নির্জন দ্বীপ ঘিরে দিবারাত্রি প্রতি-ধ্বনিত হচ্ছে একটানা জলকল্লোল-সঙ্গীত ; আর সেই শব্দয়মান সুর-উর্মির মুখরতার মাঝে বসে আছি বন্ধুহীন-একা। এই বিশ্বজুড়ে যে মহীমৌনীর স্তবগান নি:শব্দ-ঝঙ্কারে রণিত হচ্ছে যদিও আমি সেই ধ্যানীর মৌন-মহিমার পূজারী, তবু এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমার নির্জনতার বক্ষ জুড়ে শুনেছি অবিরাম বিষাদিত রোদনধ্বনি, শান্তিহীন বিলাপ। মৃত্যুর পরে অশান্ত আত্মা যদি কেঁদে বেড়ায় তার কান্না বুঝি এমনি নীরব, এমনি মর্মন্তুদ! কত বিপুল বিরাট ভিত্তির উপর আমি আমার ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, কী অপরিণাম আশা, দুর্জয় সাহস নিয়েই না আমি নতুন জাতি নতুন মানুসের কল্পনা করেছিলাম। আমার সেই ভিত্তিকে জানিনা কার অভিশাপে ধরণীতল গ্রাস করেছে, সেই স্বপ্নকে নিষ্ঠুর বস্তুর জগৎ অভাবের সংসার ভেঙে দিয়েছে। পরাজয় স্বীকার আমি আজো করিনি, কিন্তু ধৈর্য্যের দুর্গম দুর্গে আর কতদিন আত্মরক্ষা করব?

বেশি দিনের কথা নয়, সেদিনও আমার আশা ছিল, এই ছাত্র সমাজকে অগ্রদূত করে নব বিজয়-অভিযানের আমি হব তূর্যবাদক, নকিব, সৃষ্টি করব সুন্দরের জগৎ – কল্যাণী পৃথ্বী, ধরণীর পঙ্কিল বক্ষ ভেদ করে আনব পবিত্র আব-জমজম ধারা। সে আশা আমার আজও ফলল না। বুঝি মুকুলেই তা পড়ল ধুলায় ঝরে। আমি তাই এতদিন নিজেকে দেশের কাছে, জাতির কাছে মনে করেছি মৃত। কতদিন মনে করেছি আমার জানাজা পড়া হয়ে গেছে। তাই যারা কোলাহল করে আমায় নিতে আসে, মনে হয় তারা নিতে

www.pathagar.com

এসেছে আমায় গোরস্থানে— প্রাণের বুলবুলির স্থানে নয়। কত দিক থেকে কত আহ্বান আসে আজও; যত সাদর আহ্বান আসে, তত নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলি — ওরে হতাভাগ্য, তোর দাফনের আর দেরি কত? কত দিন আর ফাঁকি দিয়ে জয়ের মালা কুড়িয়ে বেড়াবি? কওমের জন্য, জাতির জন্য, দেশের জন্য কতটুকু আমি করেছি — তবু তার প্রতিদান অতি কৃতজ্ঞ জাতি যে শিরোপা আনে,তাতে শির আমার লজ্জায় মাটিয়ে মিশে যেতে চায়। তাই আপনাদের দাওয়াত পেয়ে যখন ধন্য হলাম, তখন দ্বিধাভরে অসঙ্কোচে তা কবুল করতে পারিনি। যে ভাগ্যহীন নির্জনতার অন্ধ-কারায় অভাবের শৃঙ্খলে বন্দী, সে কোথায় পাবে মুক্তির বাঁশি? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার অক্ষমতা নিবেদন করেছি আপনাদের কাসেদের কাছে, দূতের কাছে –— কিন্তু তাঁরা আমার আর্জি মঞ্জুর করেনি। এক দিন যারা ছিল আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম, আত্মার আত্মীয়, তারা যখন তাদের প্রতি আমার ভালবাসার দোহাই দিল তখন আর থাকতে পারলাম না। জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত, অবসন্ন, দু:খশোকের শত জিঞ্জিরে বন্দী হয়েও আসতে হল আমাকে আপনাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে। ফরিদপুরের তরুণ ফরিদ দলের নেতৃত্ব করার অধিকার নেই এই সংসারের চিড়িয়াখানায় বন্দী সিংহের — যে সিংহ আজ হিজ মাস্টার্স ভয়েসের ট্রেডমার্কের সাথে এক গলাবন্ধে বাঁধা পড়েছে। আমার এক নির্ভীক বন্ধু আমাকে উল্লেখ করে একদিন বলেছিলেন, "যাকে বিলিতি কুকুরে কামড়েছে তাকে আমাদের মাঝে নিতে ভয় হয়।" সত্যি, ভয় হবারই কথা। তবু কুকুরে কামড়ালে লোকে নাকি ক্ষিপ্ত হয়ে অন্যকে কামড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে আমার কিন্তু সে শক্তিও নেই, আমি হয়ে গেছে বিষ-জর্জরিত নির্জীব।

কিন্তু এ শুনাতে ত আমায় আপনারা আহ্বান করে আনেননি। আপনারা শামাদানে এনে বসিয়েছেন সেই প্রদীপকে যা একদিন হয়ত বা অত্যুগ্র আলোক দান করেছিল। আপনাদের এ আদরের অসম্মান আমি করব না, নিভবার আগে আমি আমার শেষ শিখাটুকু জ্বালিয়ে যাব। তাতে আপনাদের পথের হদিস মিলবে কিনা — সকল পথের দিশারী খোদাই জানেন। আমি নিভভার আগে এই সান্ত্বনা নিয়েই নিভব যে, আমি আমার শেষ স্নেহ-বিন্দুটুকু পর্যন্ত জ্বালিয়ে আলো দিয়ে যেতে পেরেছি।

তোমরা আমার সেই প্রিয়তম ছাত্রদল, যাদের দেখলে মনে হয়, আমি যেন কোটিবার কাবা শরিফ জিয়ারত করলাম, যাদের চোখে দেখেছি তৌহিদের রওশনি, যাদের মুখে দেখেছি খালেদ-তারেক-মুসার ছবি, যাদের মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-কলেজকে মনে হয়েছে দর্গার চেয়েও পবিত্র। যাদের বাজুতে দেখেছি আলী হায়দারের বেদেরেগ তেগের শান ও শওকত, কণ্ঠে শুনেছি বেলালের আজান-ধ্বনি। তোমরা আমার সেই ধ্যানের মহামানব গোষ্ঠী। এ আমার এতটুকু অত্যুক্তি-কল্পনা নয়। তোমাদেরে আমি দেখেছি তোমাদের অতিক্রমকরে সহস্রাধিক বৎসর দূরে— ওহোদের যুদ্ধে, বদরের ময়দানে, খয়বরের

www.pathagar.com

জঙ্গে। দেখেছি ওমর ফারুকের বিশ্ববিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিকরূপে, দেখেছি দূর আফ্রিকার মুসা-তারিকের দক্ষিণে, দেখেছি মিসরের পিরামিডের পার্শ্বে—পিরামিড ছাড়িয়ে গেছে তোমাদের উন্নত শির। দেখেছি ইরানের বিরান-মূলক আবাদ করতে, তার আলবোর্জের চূড়া গুঁড়া করে দিতে। দেখেছি জাবলুত তারেকের জিব্রাল্টারের আকুল জলাশির মধ্যে নাঙ্গা শমশের হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। দেখেছি সেই জলরাশি সাতরে পার হয়ে স্পেনের কর্ডোভায় বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত করতে। দেখেছি ক্রুসেডের রণে, জেহাদের জঙ্গে সুলতান সালাউদ্দীনের সেনাদলের মাঝে — দেখেছি কুরূপা য়োরোপকে সুরূপা করতে। সেদিনও দেখেছি — রীফ-সর্দার আবদুল করিমের সাথে, বিশ্বত্রাস কামালের পাশে, পহলভীর দক্ষিণে, ইবনে সঈদের সন্মুখে। যুগে যুগে তোমরা এসেছ ভাবী নেশনের নিশান-বর্দার হয়ে। তোমরা যে পথ দিয়ে চলে গেছ, মনে হয়েছে— আমি যদি ঐ পথের ধূলি হতাম! আমি প্রাণ-মন পেতে দিয়েছি তোমাদের অভিযানের ঐ পায়ে চলা পথে। আমি যেন তোমাদেরই সেই পায়ে চলা পথের ধূলিসমষ্টি, মূর্তি ধরে এসেছি তোমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিতে, তোমাদের আর একবার তেমনি করে আমার বুকের উপর দিয়ে চলে যেতে।

কোথায় সে শমশের, কোথায় সে বাজু, সেই দরাজ দস্ত? বাঁধো আমামা, দামামায় আঘাত হানো আর একবার তেমনি করে। যে কওম যে জাতি চলেছে গোরস্থানের পথে, ফেরাও তাকে সেই পথে- যে পথে চলে তারা একদিন পারস্য সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্য জয় করেছিল, আঁধার বিশ্বে তৌহিদের বাণী শুনিয়েছিল। তোমাদেরই মাঝে থেকে বেরিয়ে আসুক তোমাদের ইমাম—দাঁড়াও তাঁর পতাকাতলে তহরিমা বেঁধে। বলো আল্লাহু আকবর, হাঁকো হায়দারি হাঁক, সপ্ত আসমানে চাক হয়ে ঝরে পড়ুক খোদার রহমত, নবীর দোওয়া। চাঁদ সেতারা গলে পড়ুক কল্যাণের পাগল-ঝোরা।

আর্ত-পীড়িত কোটি কোটি মজলুম ফরিয়াদ করছে - কে করবে এদের ত্রাণ? তোমাদের চর্বি জ্বালিয়ে জ্বালাও আবার দ্বীনের চেরাগ, এই অন্ধ পথহারা জাতিকে আলো দেখাও, তোমাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে গড়ে তোল পুলসেরাত — সেই পুলের উপর দিয়ে জয়যাত্রা করুক নূতন জাতি। তোমাদের শিক্ষা তোমাদের জ্ঞান তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জন করো এ জ্ঞানার্জন। নওকরির জন্য, দাসখৎ লিখার কায়দা-কানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নামে যাক তোমাদের এই শিক্ষাপদ্ধতি, এই শিক্ষালয়।

তোমাদের শিক্ষায়তন — তা স্কুলই হোক, আর কলেজই হোক, আর মাদ্রাসাই হোক পীরের দর্গার চেয়েও পবিত্র, মসজিদের মতই পাক। এর অঙ্গনে যে দীক্ষা গ্রহণ কর, যে নিয়ত কর, জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয় তবে কাজ কি এই জীবনের এক-তৃতীয়াংশ বাজে খরচ করে?

জরাগ্রস্ত পুরাতন পৃথিবী চেয়ে থাকে যুগে যুগে তোমাদের এই কিশোরদের — এই তরুণদের মুখের পানে। তোমরা শোনাও তাকে তাজা-ব-তাজার গান, আর তোমাদের সেই প্রাণচঞ্চল সঙ্গীতের যাদুতে সে পাক নব-যৌবনের কান্তিশ্রী! তোমাদের বরণ করে

www.pathagar.com

দুলহিনের সাজে সেজে ষড়ঋতুর ডালা শিরে ধরে আজও সে চেয়ে আছে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তোমাদের পানে — তোমাদের দক্ষিণ হস্তের দানে তার প্রতীক্ষার শূন্যতা কি পূর্ণ হবে না? কত কাজ তোমাদের — ধরণীর দশদিক ভরে কত ধূলি, কত আবর্জনা, কত পাপ, কত বেদনা — তোমরা ছাড়া কে তার প্রতিকার করবে? কে তার এলাজ করবে? তোমাদের আত্মদানে, তোমাদের আয়ুর বিনিময়ে হবে তার মুক্তি। শত বিধি-নিষেধের, অনাচারের জিঞ্জিরে বন্দিনী এই পৃথিবী আজাদির আশায় ফরিয়াদ করছে তোমাদের প্রাণের দরবারে, তার এ আর্জি কি বিফল হবে? এই বাংলার নাকি শতকরা পঞ্চান্ন জন মুসলমান। কিন্তু গুনতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাড়া এই পঞ্চান্ন জনকে নিয়ে বাংলার সত্যকার গৌরব করবার কতটুকু আছে, তা হিসাব করতে গেলে মনে হয় — আমরা শতকরা পাঁচজনই হলেই এ লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। বড় দু:খে তাই বলেছিলাম,

ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত।

এ লজ্জা, এই অপমানের গ্লানি থেকে তোমরা তরুণ ছাত্রদল বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও। সমাজের স্তরে স্তরে, তার গোপনতম কোণে কোণে, বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তার নিরাকরণ করো।
ইসলামের প্রথম উষার ক্ষণে, সুবহ্-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারীশক্তি রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহধর্মিণী নয়, সহকর্মিনী হয়েছিলেন - যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে — তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী করে — সকল আনন্দের, সকল খুশির হিসসায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভ-কাজ, কল্যাণ-উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশাল-বর্দার — তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা — যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন-পথের দুরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-ফেলব। কর্মে পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। সম্মান দেওয়ার নামে এইদিন আমরা আমাদের মাতা–ভগিনী-কন্যা-জায়াদের যে অপমান করেছি আজও তার প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি তবে কোনো জন্মেও এ জাতির আর মুক্তি হবে না।
তারও আগে তোমাদের কর্তব্য সম্মিলিত হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। যে ইখাওয়াৎ সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যে একতা ছিল মুসলিমের আদর্শ, যার জোরে মুসলিম জাতি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ আমাদের সে একতা নেই - হিংসায়, ঈর্ষায়, কলহে, ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন। দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দানখানার সৃষ্টি করেছি : কত তার নাম — সিয়া, সুন্নি, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফি, শাফি, হাম্বলি, মালেকি, লা-মজহাবি, ওহাবি ও আরও কত শত দল। এই শত দলকে একটি বোঁটায়, একটি মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পার তোমরাই। শতধা-বিচ্ছিন্ন এই শতদলকে এক সামিল করো, এক জামাত করো সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে ফেল।

www.pathagar.com

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা

কাজী নজরুল ইসলাম

[১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন]

আজ আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে আগে মনে হচ্ছে কবির একটা লাইন, —'ঝড় আসে নিমিষের ভুল!' সেদিনের পশ্চিমে-ঝড় যখন এসেছিল বদ্ধ দ্বারের জিঞ্জিরে নাড়া দিতে, সেদিন যখন সে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল—

কারাগারে দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভেতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা—

তখন আপনারা তাকে বরণ করেছিলেন খাঞ্চা-ভরা সওগাত, রেকাবি-ভরা শিরনি দিয়ে, শিরিন নজরের নজরানা দিয়ে। আপনাদের হাতের ফুলে তার কণ্ঠের নীল বুকের কাঁটা ঢাকা পড়ে গেছিল। আপনাদের শিরোপার ভারে তার শির সেদিন আপনি নুয়ে পড়েছিল। সে-বার শুধু যে তার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি।

আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণ– তীর্থ জিয়ারত করতে। সে-বারে সে বলেছিল—

খুলব দুয়ার মত্ত বলে,
তোদের বুকের পাষাণ–তলে
বন্দিনী যে ঝর্ণাধারা
        মুক্তি দেবো মুক্তি তায়।

হারিয়ে গেছে দোরের চাবি,

www.pathagar.com

তাই কেঁদে কি লোক হাসাবি?
আঘাত হেনে খুলব দুয়ার,
আয় যাবি কে সঙ্গে আয়!
দ্বারের মায়া করে তোরা
বন্দী রবি নিজ কারায়?
নাই ক চাবি, হাত আছে তোর,
খুলব দুয়ার তার সে ঘায়!

সেই ঝড় আবার এসেছে— হয়ত বা তেমনি নিমেষের ভুলেই। এবার সেই ঝোড়ো হাওয়া 'পুবের হাওয়া' হয়ে। তার রূপ সুর দুই-ই হয়ত বদলে গেছে। আজ হয়ত সে বলতে চায়—

'ঘা দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খুলবো!

সে-বার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল-ফোটানোর মন্ত্র শিখে। এমনিই হয়। ফাল্গুনের মলয়-সমীর বৈশাখে দেখা দেয় কালবৈশাখী-রূপে, শ্রাবণে সেই আসে পুবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভরে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দুলে ওঠে তারি হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।

* * * * *

ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়ত আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই বলে তাকে আমি ফেলেও দেইনি। আমি গোধূলিবেলায় রাখাল ছেলের সাথে বাঁশি বাজাই, ফজরের মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দেই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলাই বাঁশি হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা। সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে— সেই অসুরের জন্য।

কিন্তু কিছু বলবার আগে আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে যার কীর্তি শুধু তাঁকে মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের —তথা বাঙ্গলার সারা মুসলিম সমাজকে নর-নারী-নির্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পুণ্যশ্লোক মরহুম খানবাহাদুর আব্দুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে—তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, এ sublime মহিমাময়!

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে জানবার সুবিধা পাইনি। চাঁদ দেখিনি, কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার দেখেছি। জোয়ার শুধু পূর্ণিমার চাঁদই জাগায় না, মৃত্যুর অমাবস্যার অন্তরালে

www.pathagar.com

ঢাকা পড়ে যে চাঁদ— সেও জোয়ার জাগায়। তাঁকে দেখিনি কিন্তু তাঁকে অনুভব করেছি এবং আজও করছি আপনাদের জাগরণের মাঝে— আমাদের নারী-জাগরণের উদয়-বেলায়।

এমনি করে এক একটা সর্বভোলা সর্বত্যাগী মানুষ আসে আমাদের মাঝে। আমাদের স্বার্থের কালো চশমা দিয়ে তখন তাঁকে দেখি মলিন করে। তাঁকে বলি হয় পাগল নয় স্বার্থপর। কোকিল যখন আসে বাগে বাহারের খোশ-খবরি নিয়ে, কর্তব্যপরায়ণ কাক তখন দল বেঁধে তাকে তাড়া করে। তার গানকে তারা মনে করে উৎপাত। অভিমানী কোকিল বসন্ত শেষে উড়ে যায় নতুন বুলবুলিস্তানের সন্ধানে, তখন সারা কানন জুড়ে জাগে বিরাট একটা অভাব-বোধ, পেয়ে হারানোর তীব্র বেদনা।

পাখি উড়ে যায় —তারপর আসে সেই সুদিন যার আগমনী গান সে গেয়েছিল। তখন সেই সুদিনের সুন্দর আলোকে স্মরণ করি সেই সকলের-আগে-জাগা গানের পাখিকে। কিন্তু পাখি তখন থাকে না ক, থাকে পাখির স্বর।

আমি তাঁরির মত গানের পাখি —আপনাদের এই স্মরণ-বেলায় আমিও এসেছি তাই তীর্থযাত্রী হয়ে তাঁকেই স্মরণ করতে —যিনি আমাদের বহু আগে জেগেছিলেন! তাঁর পাক কদমে আমার হাজার সালাম।

তিনি আজ আমার সালাম নিবেদনের বহু উর্ধ্বে, বহু দূরে; তবু এ ভরসা রাখি যে আমার এই অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া ফুল তাঁর চরণ ছুঁয়ে ধন্য হবেই। আমি জানি, এ বিশ্বে কোন কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপে যে লোকেই হোক তিনি আছেন এবং আমার এই ভাসিয়ে দেওয়া-সালামি-ফুলও সেই না জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।

আমরা বড় কাউকে যখন হারাই, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি –তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাধনাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে। যে বিরাট আত্মার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, তার দু:খ বহু পরিমাণে ভুলতে পারব, যদি তাঁরই অসমাপ্ত সাধনাকে আমাদের সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারি। চট্টলের আজিজ নাই, কিন্তু বাংলার আজিজরা— দুলাল ছেলেরা আজও বেঁচে আছে —তাদেরই মধ্যে তাঁকে ফিরে পাব পরিপূর্ণরূপে, এই হোক আপনাদের —এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধনা! এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই।

তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। তাঁর 'বাহারে'র মত বাহার হয়ত বা থাকতেও পারে কিন্তু তাঁর 'নাহারে'র মত নাহার আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।

তিনি সুর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন একে 'সমে' পৌছে দেওয়া আপনাদের কাজ। উস্তাদ নেই, শিষ্যরা ত আছেন। একজন উস্তাদের অভাব কি শত শিষ্যেও পূরণ করতে পারবে না? বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি আপনাদের উস্তাদের লক্ষ্য ছিল অসীম, আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্খা ছিল বিরাট।

www.pathagar.com

সাগর যাদের চরণ ধোয়ায়, পর্বত মালা যাদের শিয়রের বিনিদ্র প্রহরী, নদী-নির্ঝরিণী যাদের সেবিকা, অগ্নিগিরি যাদের বুকের ওপর, উচ্ছল জলপ্রপাত যাদের অবিনাশী প্রাণধারা, কানন-কুঞ্জ যাদের শ্রী-নিকেতন, বন্য-হিংস্র শার্দূল-সর্প যাদের নিত্যসহচর, তারা সেই মহান পুরুষের বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণ করতে ভয় করে একথা আর যে বলে বলুক, আমি বলব না।

* * * * * *

আপনাদের শিক্ষা-সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে আপনাদের সমিতির মারফতে বাংলার সমগ্র মুসলিম সমাজের বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে, —আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা-রাত্রি ধরে দেখেছি, —তাই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই তা নয়। এই স্বপ্ন বাংলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধরে উঠুক।

আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরায় খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়-দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোক : আদাওতি করে আসন জয় করা নয়—দাওত দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান— আরফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থ-যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না —ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব —এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করাবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ-লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে! আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মত আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন —আমাদের মত শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্খা জীবন অঞ্জলির মত করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যি সত্যিই বুলবুলিস্থানে পরিণত হোক—ইরানের শিরাজের মত। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শমশি-তবরেজ এই সিরাজবাগে — এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকির মত আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ 'কালচারাল সেন্টারের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

www.pathagar.com

পলিটিক্সের নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলব। এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। আমি তাই একটু খুলে বলব মাত্র। ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি —শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে— তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনিই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ-মজুরদের- আর তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি —দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়ত বা যথা পূর্বং তথা পরং। দরিদ্র মূর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে অ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সঙ্গীতে সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয়, তারা জানেই না, কিংবা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না; মনে করে —ও শুধু কাহিনী। হয়ত একদিন ছিল যখন হিন্দুরা মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করত না। তখন রাজভাষা State Language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন —এখন যেমন আমরা ইংরেজি শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের বিশ্ব-সভ্যতায় দানের কথা ভাল করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত কোন মুসলমান নওয়াব বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেননি। শিবাজী প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজেব আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে Person এর against এ— গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, আমরা সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায়, ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্জ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যানডিনেভিয়ান, চীন, জাপানি, হনলুলু, গ্রিনউইচের ভাষা জানি, ইতিহাস জানি, তাদের সভ্যতার খবর নেই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর ঘর তারই কোনো কবর রাখিনে বা রাখার চেষ্টাও করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয়, Penny wise pound Foolish!

হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না! অথচ আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দী। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু করে ভাঙ্গতে শুরু হয়েছে, ওদের মুখের বোরকাও খুলছে,

www.pathagar.com

কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকা-মুক্ত হলো না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোন কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্য আমরাও অনুস্বারের সঙ্গিন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙ্গিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ করে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গীত-উচানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে যে, অন্তত বাংলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম সভ্যতার ইত্যাদির সাথে।

কোন মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোন কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভাল করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভাল করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি। কাজেই ন'মন তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা 'পড়ে ফার্সি বেচে তেল।' আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য। কয়জন মৌলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তারা একা পান কোরেই 'খোদার খাসি' হয়েছেন।

কিন্তু এ খোদার খাসি দিয়ে কতদিন চলবে? তাই আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি —এবং আপনাদের মারফতে বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে —যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে ধর্ম ধর্ম বলে ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না।

আমাদের Next door neighbour এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামিরও অবসান হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পর competition হবে। সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition -sprots-man like competition.

www.pathagar.com

তরুণের সাধনা

কাজী নজরুল ইসলাম

[১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি-রূপে কবি নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ!

আপনারা কি ভাবিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন, জানি না। দেশের জাতির ঘনঘোর-ঘেরা দুর্দিনে দেশের জাতির শক্তিমজ্জা-প্রাণস্বরূপ তরুণদের যাত্রা-পথের দিশারী হইবার স্পর্ধা বা যোগ্যতা আমার কোনদিন ছিল না, আজও নাই। আমি দেশকর্মী –দেশনেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ কোন স্বদেশপ্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগ স্বীকারের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে হয়ত আমি তাঁহাদের কাছে খর্ব pigmy বলিয়া অনুমিত হইব। তবু দেশের জন্য অন্তত এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না পারিলেও অমঙ্গল-চিন্তা কোদিন করি নাই, যাহারা দেশের কাজ করেন তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই। রাজ-লাঞ্ছনার চন্দন-তিলক কোনদিন আমারও ললাটে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাহা লইয়া গৌরব করিবার অধিকার আমার নাই।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাহাদেরই দলে যাহারা কর্মী নন –ধ্যানী। যাহারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া তাহারা মহৎ; কিন্তু সেই মহৎ হইবার প্রেরণা যাহারা জোগান, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির-ধারার মত গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মত অলক্ষ্যে। আমি কবি। বনের পাখির মত স্বভাব আমার গান করায়। কাহারাও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙ্গে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আর গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে

www.pathagar.com

গান করে আপনার মনের আনন্দে, যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা মোহ-নিন্দ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়ত তাহার শক্তির সম্বন্ধে আজও না-ওয়াকিফ।—

আমি বক্তাও নহি। আমি কম-বক্তার দলে । বক্তৃতায় যাহারা দিগ্বিজয়ী–বখতিয়ার খিলজি, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুত বেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষণসেন অপেক্ষাও আমরা বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মত অবিরল ধারায়। আমাদের –কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মত। ছন্দের দু'কূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীতগুঞ্জন করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা-ভাগীরথীর মত খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের –তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা, প্রাণের টান তারুণ্যকে –যৌবনকে - আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি। জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ–প্রভাতে তেমনি সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তব–গান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতই যে তারুণ্য তিমিরবিদারী সে যে আলোর দেবতা। রঙ্গের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত দু:খের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেই ত লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া তাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের এই মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়। আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই; আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া সর্বপ্রধান অভাব অনুভব করিতেছি আমাদের মহানুভব নেতা –বাংলার তরুণ মুসলিমের সর্বপ্রথম অগ্রদূত তারুণ্যের নিশান -বর্দার মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবের। সিরাজগঞ্জের শিরাজীর সাথে বাংলার শিরাজ বাংলার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। যাঁহার অনল-প্রবাহ-সম বাণীর গৈরিক নি:স্রাব জ্বালাময়ী ধারা মেঘ-নীরন্ধ্র গগনে অপরিমাণ জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিল, নিদ্রাতুরা বঙ্গদেশ উন্মাদ আবেগ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, 'অনল প্রবাহের' সেই অমর কবির

www.pathagar.com

কণ্ঠস্বর বাণীকুঞ্জে আর শুনিতে পাইব না। বেহেশতের বুলবুলি বেহেশতে উড়িয়া গিয়াছে। জাতির কওমের দেশের যে মহা ক্ষতি হইয়াছে, আমি শুধু তাহার কথাই বলিতেছি না, আমি বলিতেছি আমার একার বেদনার ক্ষতির কাহিনী। আমি তখন প্রথম কাব্য-কাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি –ফিঙে বায়স বাজপাখির বয়ে ভীরু পাখির মত কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিবারও দু:সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই, নখচঞ্চুর আঘাতও যে না খাইয়াছি এমন নয়—এমনি ভীতির দুর্দিনে মনি-অর্ডারে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখা : 'তোমার লেখা পড়িয়া খুশি হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না ব্যথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।' চোখের জলে স্নেহসুধা সিক্ত ঐ কয় পংক্তি লেখা বারে বারে পড়িলাম; টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনো আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কাঙ্গাল ভক্তের মত দূর হইতেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। সেইদিন প্রথম মানসনেত্রে কবির স্নেহ-উজ্জ্বল মূর্তি মনে মনে রচনা করিলাম, গলায় পায়ে ফুলের মালা পরাইলাম। তাহার পর ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার জ্যোতি বিমণ্ডিত মূর্তি দেখিলাম। দুই হাতে তাঁহার পায়ের তলার ধূলি কুড়াইয়া মাথায় মুখে মাখিলাম। তিনি আমায় একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, নিজে হাতে করিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। যেন বহুকাল পরে পিতা তাহার হারানো পুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছে। আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া বাঙ্গলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মনস্বী দেশ-প্রেমিকের কথাই বারে বারে মনে হইতেছে। এ যেন হজ্জ্ব করিতে আসিয়া কাবা-শরিফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহার রুহু মোবারক হয়ত আজ এই সভায় আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় হয়ত আজ আমরা তরুণেরা এই যৌবনের আরাফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। আজ তাহার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধা তসলিম নিবেদন করিতেছি, তাহার দোওয়া ভিক্ষা করিতেছি।

আপনারা যে অপূর্ব অভিনন্দন আমায় দিয়েছেন, তাহার ভারে আমার শির নত হইয়া গিয়াছে, আমার অন্তরের ঘট আপনাদের প্রীতির সলিলে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। সেই পূর্ণঘটে আর শ্রদ্ধা প্রতি-নিবেদনের ভাষা ফুটিতেছে না। আমার পরিপূর্ণ অন্তরে বাকহীন শ্রদ্ধা-প্রীতি সালাম আপনারা গ্রহণ করুণ। আমি উপদেশের শিলাবৃষ্টি করিতে আসি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে যাহা না বলিলে নয়, শুধু সেইটুকু বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

আমি সর্বপ্রথমে বলিতে চাই, আমাদের এই তরুণ মুসলিম সম্মেলনের কোনো সার্থকতা নাই যদি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, জরার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিতে না পারি। বার্ধক্য তাহাই —যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই —যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব-মানবের অভিনব জয়-যাত্রার পথে শুধু বোঝা নয় –বিঘ্ন: শতাব্দীর নব-যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দে মিলাইয়া

www.pathagar.com

যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানর না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই —যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি —যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি —যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহার —যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতি-বেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড-প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়রে অসিতে, কামাল-করিম-জগলুল-সানইয়াৎ-লেনিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে —যাহারা বৈমানিক-রূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারক-রূপে নব পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, পবন গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়ন-মণি নিভিয়া যায় —যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি —শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশান-ঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া, ভিখারি সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশার বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের —তাহারাই তরুণ। আমাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের সীমার উর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা —মুসলিম তরুণেরা যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি : ধর্ম আমাদের ইসলাম কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের, সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম; ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে।

www.pathagar.com

যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দু:সাহস আছে একা তরুণেরই। দোর দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মুনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়েছেন বেহেশত ও বেহেশ্‌তি চীজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারির মত হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব, ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

আমাদের বাঙ্গালি মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন বেনো-জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমির আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পরি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ইহারা প্রায়ই প্রত্যেকেই 'মনে মনে শাহ ফরীদ, বগল-মে ইট।' ইহাদের নীতি 'মুর্দা দোজখ-মে যায় য়্যা বেহেশ্‌ত-মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি-সে কাম।'

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।' নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আরো লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া। বিবি তালাক ও কুফরির ফতোয়া তো ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়া-ধারী ফতোয়া-বাজদের হাত হইতে গরীবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে তো সে তরুণ। ইহাদের হাতের 'আষা' বা যষ্টি মাঝে মাঝে আজদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্য, কিন্তু এই 'আষা' দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরো-যুদ্ধ— ভাই-এর সহিত আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই— সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয়ই হোক, তাহার যক্ষা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহারা বলেন, 'দিন ত চলিয়া যাইতেছে, পথ তো চলিতেছি,' তাহাদের বলি ট্রেন-মোটর-এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়িতে শুইয়া দুই ঘন্টায় এক মাইল হিসাবে গদাই-লস্করি চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য আমাদের একটু

www.pathagar.com

অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয় এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐ টুকুতেই কি আমার ঈমান বরবাদ হইয়া গেল? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ঈমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যাক আর শক্র বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। তবে ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্তত বাপের বাড়িও চলিয়া যায় নাই। এবং কুফরি ফতোয়া সত্ত্বেও কেহ 'শুদ্ধি' হইয়া যান নাই।

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাংলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাস-রোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজু-বুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষা-পোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদের পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষায় ভুগিয়া মরিতেছে। আলো-বায়ুর অভাবে। এই সব যক্ষা রোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামী সেই অনুশাসনগুলির প্রতিই জোর দিয়া থাকি, যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।

কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির-বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়ো দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দ:ঃখ কিসের যে অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না —সর্ব প্রথম মুসলমান নর নহে –নারী।

বৃদ্ধদের আয়ূর পুঁজি তো ফুরাইয়া আসিল, এখন আমাদের –তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির-বন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখি দুধ-ছোলা খাইয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সেও উড়িতে পারে। বাহিরে তাহারই স্বজাতি পাখিকে উড়িতে দেখিয়া অন্য কোন জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীনবীর্য সন্তানের

www.pathagar.com

জন্ম। শুধু কি ইহাই? আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে একা তরুণের। আমাদের পর্বত-প্রমাণ বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষেধের দুস্তর পাথার; এইসব লঙ্ঘন করিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবার দু:সাহসিকতা যাহাদের —তাহারা তরুণ। ইহাদের জন্য চাই আমাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠ সাধনা, চাই সঙ্ঘ। আজ আমরা বাংলার মুসলিম তরুণেরা যূথভ্রষ্ট। আমাদের সঙ্ঘ নাই, সাধনা নাই, তাই সিদ্ধিও নাই। আমাদেরই চারিপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিতেছি —কি অপূর্ব তাহাদের ঐক্য, ত্যাগ, সাধনা। তাহারা সকলে যেন এক দেহ, এক প্রাণ। সকল বৈষম্য বিরোধের উর্ধ্বে তাহারা তাহাদের যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। জগতের যে কোন যুব-আন্দোলনের সঙ্গে তাহারা আজ চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কত বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। ইহারা পিতা-মাতার স্নেহ ভাই-ভগ্নি প্রীতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা, প্রিয়ার বাহু-বন্ধন, গৃহের সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্যের বিলাস, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ, সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে জাতির জন্য, দেশের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য। এই তরুণ বীর সন্ন্যাসীর দল আছে বলিয়াই আজও আমরা দিনের আলোকে মুখ দেখিতে পাইতেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ইহারা নচিকেতার মত প্রশ্ন করে, মৃত্যুর বজ্রমুষ্টি হইতে জীবনের সঞ্চয় ছিনাইয়া আনে। এই বনচারী বীরাচারীর দলই দেশের যৌবনে ঘুণ ধরিতে দেয় নাই। ... আমাদের মত ইহাদের স্কন্ধে চাকুরীর দৈন্য সিন্দবাদের মত চাপিয়া বসে নাই। ইহারাই সত্যকার আজাদ, বাঁধনহারা। সকল বন্ধন সকল মায়াকে অস্বীকার করিয়া তবে আজ ইহারা এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইউনিভার্সিটির কত উজ্জ্বলতম রত্ন –যাহারা আজ অনায়াসে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার প্রফেসর হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করিত, তাহারা রাস্তায় প্রাণ ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই তো মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালী জাতি আজও টিকিয়া আছে। দীপ-শলাকার মত ইহারা নিজেদের আয়ু ক্ষয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রাণ-প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতেছে। ... আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয় চাকুরি অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টের' মত আমরা ঐ চাকুরির দিকে তীর্থের কাকের মত হা করিয়া চাহিয়া আছি। বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া কিছু যদি না হই অন্তত সাবরেজিষ্টার বা দারেগাা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি —তাহাদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহীদদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরির মোহ, পদবির নেশা, টাইটেলের বা টাই ও টেলের মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি,

www.pathagar.com

তবে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর-পরাহত। কোথায় আছে সেই শহীদদের দল? বাহির হইয়া আইস আজ এই মুক্ত আলোকে, উদার আকাশে নীল চন্দ্রাতপতলে। তোমাদের অস্থি-মজ্জা, প্রাণ-দেহ, তোমাদের সঞ্চিত জ্ঞান, অর্জিত ধন-রত্নের উপর প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের সঙ্ঘের –তরুণ সঙ্ঘের। সকল লাভ-লোভ-যশ-খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে —এ সাধনা তাহারই, এ শহীদি দরজা শুধু তাহারই।

আমাদের লক্ষ্য হইবে এক, কিন্তু পথ হইবে বহুমুখী। যে দুর্ধর্ষ, সে কালবৈশাখীর কেতন উড়াইয়া অসম্ভবের অভিযানে যাত্রা করুক; যে বীর তাহার জন্য রহিয়াছে সংগ্রামক্ষেত্র; যে কর্মী তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে কর্মের বিপুল উপত্যকা; কিন্তু যে ধ্যানী যে সুন্দরের পূজারী, সে কল্প-পাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্নলোকে, উদার নি:সীম নীল নভে। সেই স্বপ্ন-পুরী হইতে সে যে স্বপন-কুমারীকে রূপ-কুমারীকে জয় করিয়া আনিবে তাহার লাবণীতে আমাদের কর্মক্লান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। যে গাহিতে জানে, গানের পাখি যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূর-বিথার বনানীর কোলে — আমাদেরই আশেপাশে থাকিয়া আমাদের অবসাদক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে গানে ভরিয়া তুলিবে, প্রাণে নব- প্রেরণার সঞ্চার করিবে। ইহারা আমাদের সুন্দর সাথী। বাড়ির উঠানের ফুলে ফুলে ফুল্ল লতাটির পানে চাহিয়া যেমন রৌদ্র-দগ্ধ চক্ষু জুড়াইয়া লই, তেমনি করিয়া ইহাদের কবিতায় গানে ছবিতে আমরা আমাদের বুভুক্ষু অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইব, অবসাদ ভুলিব।

বিধি-নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখিকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইবে? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টি হেরিয়া কুফরির ফতোয়া দিবে?

এই খোদার উপর খোদকারী আর যারা করুক, আমরা করিব না।

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজো সর্বশ্রেষ্ঠ হল কি কণ্ঠসঙ্গীতে কি যন্ত্রসঙ্গীতে তাহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

অথচ সে দেশের মৌলভী মৌলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলভী সাহেবানদের অপেক্ষাও জবরদস্ত। তাঁহারা ঐসব গুণীদের অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন বলিয়াও জানি। সঙ্গীত শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই সকল বিধিনিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা

www.pathagar.com

লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙ্গালি মুসলমানদের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা য়ত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড় –শ্রেষ্ঠ।

আমার অভিভাষণ হয়ত অতিভাষণ হইতে চলিল। আমার শেষ কথা —আমরা যৌবনের পূজারী, নব-নব সম্ভাবনার অগ্রদূত, নব নবীনের নিশানবর্দার। আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে যে বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্ঝার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মত আমরা বহিয়া যাইবি। যাহা থাকবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙ্গিবার তাহা আমাদের চরণঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। দুর্যোগ রাতের নীরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হউক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্তি! সকল বাধা-নিষেধের শিখর-দেশে স্থাপিত আমাদের উদ্ধত বিজয়-পতাকা। প্রাণের প্রাচুর্যের আমরা যেন সকল সঙ্কীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, ওমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান-হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই খালেদ-মুসা-তারেকের তরবারি, বেলালের প্রেম। এই সব গুণ যদি আমরা অর্জন করিতে পারি, তবে জগতে যাহারা আজ অপরাজেয় তাহাদের সহিত আমাদের নামও সসম্মানে উচ্চারিত হইবে।

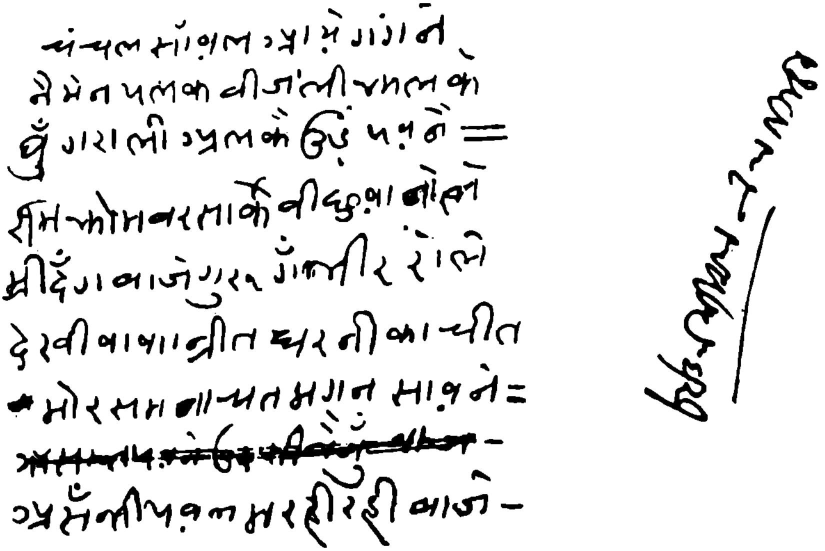

কবির হিন্দী হস্তলিপি

www.pathagar.com

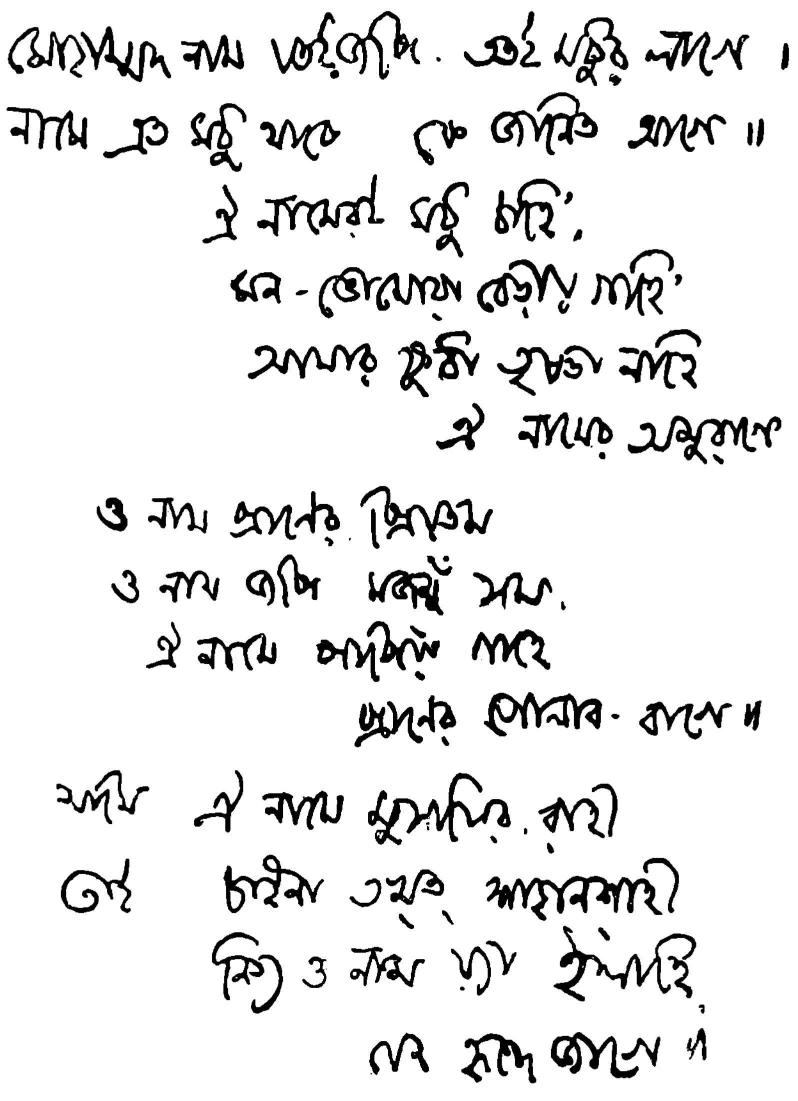

কবির স্বহস্ত লিখিত 'নাতিয়া'।

www.pathagar.com

জনসাহিত্য

কাজী নজরুল ইসলাম

[১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা ৫নং ম্যাঙ্গো লেন দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিস-গৃহে, জন-সাহিত্য-সংসদের শুভ-উদ্বোধনে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলামের প্রদত্ত অভিভাষণ।]

সাহিত্যে সবারই প্রয়োজন আছে দুনিয়ার হাতিও আছে, আরশুলাও আছে। তাদের কে বড় কে ছোট, বলা যায় না, তার কারণ, হাতি খুব বড়, কিন্তু আরশুলা উড়তে পারে। জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এর সমাধানও জনসাহিত্যের একটা দিক। সাময়িক পত্রিকাগুলোর দ্বারা আর তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা কিছুই হবে না। সম্পাদকীয় মত উপর থেকে উপদেশের শিলাবৃষ্টির মত শোনায়। তাতে জনগণের মনের উপর কোনো ছাপ পড়ে না — জনমতও সৃষ্টি হয় না।

যাঁদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তারা সেখান থেকেই তাদের সাহিত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই। বক্তৃতা প্রবন্ধ তাদের প্রাণে দাগ কাটতে পারে না। তাদের মত করে তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন। তারা ত বুঝতে পারে না। কিন্তু সাবধান, আপনাদের মুরুব্বিয়ানা ভাব প্রকাশ না পায় তার মধ্যে, তা হলে তারা পালিয়ে যাবে। চাষীরাও আয়না রাখে ; নিজেদের চেহারা যদি তার মধ্যে দেখতে পায় তবে যত্ন করে রাখবে। আমিও একবার ভাবছিলাম : জারির গান, গাজির গান ওদের ভাষায় লিখে ওদের জন্য চালাব তা হয়ে ওঠে নাই।

এ প্রসঙ্গে আমার নিজের বিষয়ে কিছু বক্তব্য আমার আছে। কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

www.pathagar.com

সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।

আমি আট বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন যৌবন ছিল, আর আমিও তার চঞ্চলতা নিয়ে যুবক। কিছুর ভয় করিনি। খেতাম হোটেলে, শুতাম মসজিদে, ছেলেদের খুব ভালবাসতাম, কিন্তু বহু মেশার পরেও আমি দেখলাম তাদের সাথে যেন আমার মিশ খাচ্ছে না। আমি নিজেকে দোষ দিয়েছি ; আমার নিজের ব্যর্থতায় আমি নিজেকেই দায়ী করেছি। তারপর সে-পথ ছেড়ে যে-পথে আজ চলেছি সে-পথে এসে পড়লাম। আর মনে করলাম, ও-পথের যোগ্য আমি নই। ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার আত্মবিশ্বাস নেই। আমার নিজের উপর যে-সম্বন্ধ নিজেরই বিশ্বাস নেই, সে-সম্বন্ধ নেতৃত্ব করা আমার সাজে না।

আজকাল জনসাধারণের জন্য দরদ জেগেছে সবার মধ্যে কত রকম 'ইজম' মতবাদ এর জন্য সৃষ্টি হয়েছে। যা-ই হোক, তাদের এই দরদ যদি সত্যিকারের প্রাণের দরদ হয়, তবেই মঙ্গলের। বাহির থেকে তাদের দরদ দেখালে তারা বিশ্বাস করে না। তাদেরই একজন হতে হবে। তাদের কাছে টর্চলাইট হাতে নিয়ে গেলে তারা সরে দাঁড়াবে, কেরোসিনের ডিবে হাতে করে গেলে তার থেকে যত ধোঁয়াই বের হোক না কেন তাদেরকে আকর্ষণ করবেই। কারণ, টর্চলাইটে তারা অনভ্যস্ত। ওতে তাদের চোখ ঝলসায়। কেসেরাসিনের ডিবে ওদের নিজেদের জিনিস। অবশ্য যাদের টর্চ-লাইটই সম্বল, তাদের পথ শহরের দিকে। গ্রামের দিকে, জনসাধারণের দিকে গেলে তাদের ঠিক হবে না। যাঁরা ইনটেলেকচুয়াল (intellectual), তাদের আমি জন-সাহিত্য গড়ার জন্য আসতে বলি না। কিন্তু এমনো তো সাহিত্যেক আছেন, যাঁদের সম্বল কেরোসিনের ডিবে। এ পথ কিন্তু সোজা নয়। কঠিন। ত্যাগ চাই এর পিছনে। পরে দু:খ করলে কোন লাভ হবে না। জনসাধারণের যা সমস্যা, তা সাহিত্যিকরাই সমাধান করতে পারবেন।

জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। তারা আত্মীয়ের গালি সহ্য করতে পারে, কিন্তু অনাত্মীয়ের মধুর বুলিতে গ্রাহ্য করে না।

ওদের জন্য যে সাহিত্য, তা ওরা এখনো যেমনভাবে পুঁথি পড়ে, আমির হামজা, সোনাভান, আলেফ লায়লা, কাছাচল আম্বিয়া পড়ে, তখনো সেইভাবে পড়বে। ওদের সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যা বলবার বলতে হবে। কিন্তু যেন মাস্টারি-ভাব ধরা না পড়ে। সেই জন্য তথাকথিত ভদ্র-পোশাক-পরিহিত ভদ্রলোকদের নেমে আসতে হবে কাদার মধ্যে– ওদেরকে টেনে তোলার জন্য। নেমে এসে যদি ওদের ওঠানোর চেষ্টা করা যায়, তবে সে-চেষ্টা সফল হবে, নইলে না।

আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজ-নীতি সবই টবের গাছ। মাটির সাথে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জন-সাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কি করে চলে?

www.pathagar.com

একমাত্র সন্তান মরে গেছে, পুরুষ বিদ্রোহ করে খোদার বিরুদ্ধে, কিন্তু স্ত্রী তাকে বলে খোদার মহান উদ্দেশ্যের উপর বিশ্বাস রাখতে। এদের খবর, এদের প্রাণের খবর কে রাখে? এদের কাছে যেতে জানতে হবে এদের।

নিজেদের কওমের যদি মঙ্গল করতে চাই, তবে তার জন্য অপর কাউকে গাল দেয়ার দরকার করে না। যারা অপরকে গালি দিয়ে 'কওম' করে চিৎকার করে, তারা ঐ এক-পয়সায় মক্কা-মদিনা-দেখানেওয়ালাদেরই মতো। তারা কওমের জন্য চিৎকার করতে করতে হয়ে যান মন্ত্রী, আর ত্যাগ করতে করতে বনে যান জমিদার। কওমের খেদমত করতে করতে কওম যাচ্ছে গরিব হয়ে, আর গড়ে উঠেছে নেতাদের দালান-ইমারত। হযরত ওমর, হযরত আলী এরা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন ; কিন্তু নিজেরা কুঁড়ে-ঘরে থেকেছেন, ছেঁড়া কাপড় পরেছেন, সেলাই করে, কেতাব লিখে, সেই রোজগারের দিনপাত করেছেন। ক্ষিধেয় পাথর বেঁধে থেকেছেন ; তবু রাজকোষের টাকায় বিলাসিতা করেননি। এমন ত্যাগীদের লোকে বিশ্বাস করবে না কেন?

কওমের সত্যিকার কল্যাণ করতে হলে ত্যাগ করতে হবে হযরত ইব্রাহিমের মতো। দুদিন বাদে কোরবানি ঈদ আসছে। ঈদের নামাজ আমাদের শিখিয়েছে, সত্যিকার কোরবানি করলেই মিলবে নিত্যানন্দ। আমরা গরু-ছাল কোরবানি করে খোদাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি। তাতে করে আমরা নিজেদেরকেই ফাঁকি দিচ্ছি। আমাদের মনের ভিতর যে-সব পাপ, অন্যায়, স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের গরু-ছাগল – যা আমাদের সৎবৃত্তির ঘাস খেয়ে আমাদের মনকে মরুভূমি করে ফেলছে আসলে কোরবানি করতে হবে সেই সব গোরু-ছাগলের। হযরত ইব্রাহিম নিজের প্রাণতুল্য পুত্রকে কোরবানি করেছিলেন বলেই তিনি নিত্যানন্দের অধিকারী হয়েছিলেন। আমরা তা করিনি বলে আমরা কোরবানি শেষ করেই চিড়িয়াখানায় যাই তামাসা দেখতে। আমি বলি ঈদ করে যারা চিড়িয়াখানায় যায় তারা চিড়িয়াখানায় থেকে যায় না কেন?

এমনি ত্যাগের ভিতর দিয়ে জনগণকে যারা আপনার করে নিতে পারবে তারা-ই হবে জনগণের নায়ক।

নয়া জামানা
১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৪৫

www.pathagar.com

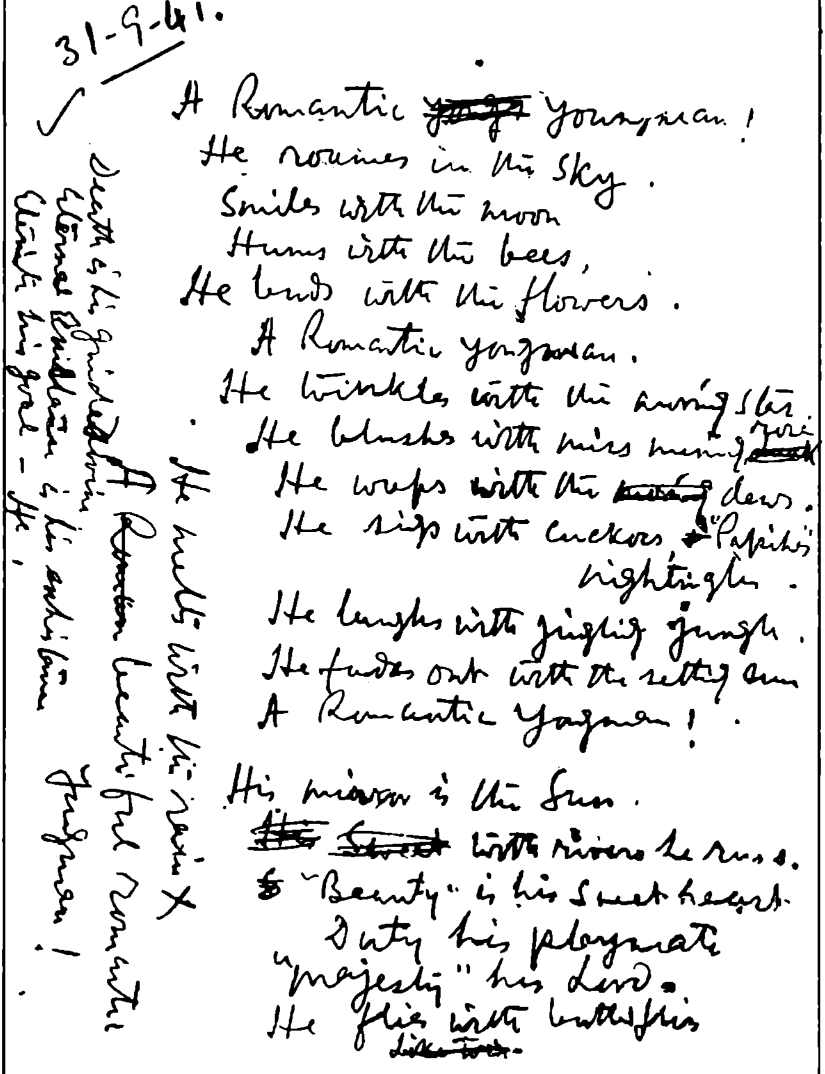

31-9-41.

A Romantic Youngman!
He roams in the Sky.
Smiles with the moon
Hums with the bees,
He buds with the flowers.
A Romantic youngman.
He twinkles with the evening star.
He blushes with miss morning
He weeps with the dew.
He sings with cuckoos & "Papiha"
nightingale.
He laughs with jingling jungle.
He fades out with the setting sun
A Romantic Youngman!

His mirror is the Sun.
with rivers he runs.
& "Beauty" is his sweet heart.
Duty his playmate
"majesty" his Lord.
He flies with butterflies

He melts with his rain X
A Romantic Youngman
Death is his guide
Eternal Emancipation is his ambition
Climb his goal – He, Youngman!

কবির স্বহস্ত লিখিত ইংরেজী লেখা। কবিতাটি ১৯৪১ সালে লিখিত
'রেডিও বাংলাদেশ' অক্টোবর ১৯৭৬ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পথে আত্মসমর্পণ

কাজী নজরুল ইসলাম

আস্‌সালামু আলায়কুম্‌!

আমার সোদর-প্রতিম তরুণ-দল ও ছাত্রবৃন্দ। আপনাদের অনেকে বহুদিন থেকে এই দীন ফকিরের কাছে আসা-যাওয়া করছেন — যারা আসেন না তাঁরাও নাকি আশা করে বসে আছেন শির্নির আশায়! যে ফকিরের ঝুলি রইল আজও শূন্য, আল্লাহর পরম রহমতের আশায় যে ভিক্ষু আজও উর্ধ্বের পানে হাত পেতে বসে আছে, তারই কাছে যখন আপনারা হাত পাতেন, তখন আমার আঁখি অশ্রুতে ভরে ওঠে। পরম করুণাময়ের পরম রহমত পাওয়ার শুভক্ষণ যখন এল ঘনিয়ে — যে ভাণ্ডার হতে তাঁর অনন্ত শক্তি অসীম করুণা নিয়ত বিতরিত হচ্ছে সেই অতি গোপন ভাণ্ডারের দ্বারে পৌঁছে যদি আমি আপনাদের আহ্বানে পিছু ফিরে চাই, তাহলে বঞ্চিত শুধু আমিই হব না, হবেন আপনারা — যাদের জন্য আমার এই তপস্যা, এই হজ্জ্ব-যাত্রা। আরাফাতের ময়দানের তক্‌বির যখন শুনতে পাচ্ছি — পবিত্র কাবাঘরের ছায়া যখন আকাশের নীল শিসায় ফুটে উঠেছে — তখন আমার আত্মীয় যারা তারাই যদি পিছু ডেকে ফিরাতে চায়, তাহলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত দুই হবে বরবাদ। আমার এই ঘোর দুর্দিনের, দুর্যোগের মরুভূমি দিয়ে তীর্থযাত্রা হবে নিস্ফল। 'সলুক' (journey) ও তরিকতেই (path) হবে আমার মৃত্যু।

বন্ধুগণ ! আল্লাহ্‌ জানেন, আমার অমৃতের সাধনা — আমার মুক্তির, আজাদির সাধনা আমার একার জন্য নয়। অমৃত যদি পাই, মুক্তি যদি পাই — সে অমৃতে শক্তিতে আপনাদের সকলের হিস্‌সা আছে। শুধু পরম গোপনকে জানাই আমার সাধনা নয় — তাঁকে জেনে তাঁকে পেয়ে প্রকাশ-জগতে আনার জন্যই আমার এ তপস্যা। আজ যখন আমার বন্ধুদের ভাইদের কাছ থেকে যশ-খ্যাতি-অভিনন্দনের ডালি আসে তা গ্রহণ করতে ভয়ে আমার হাত আড়ষ্ট হয়ে আসে। আমি জানি, এ অভিনন্দন গ্রহণ করার আমার কোনো অধিকার নেই।

www.pathagar.com

যে-দেশে লোক ভাড়া করে যশ-খ্যাতি-অভিনন্দনের থালা ও মালার প্রোপাগাণ্ডা চলে, সে দেশে আমি কেন যে বহু বৎসর ধরে আপনাদের আমন্ত্রণ ও অভিনন্দনকে অস্বীকার করে আসছি — তার একমাত্র কারণ, আমার একদা এক শুভ প্রভাতে কেন যেন মনে হয়েছিল, বাইরের মালায় যার হাত পড়ল বাঁধা, অর্ন্তলোকের — উর্ধ্বের পরম দান থেকে সে হাত হল চির-বঞ্চিত। বাইরের ক্ষুদ্র প্রশংসায় যার পাত্র উঠলো পুরে— অমৃত পরিবেশনের শুভক্ষণে সে হল অপাত্র।

কে করবে দেশকে স্বাধীন, কে আনবে মুক্তি? কোথায় সেই স্বাধীন মুক্ত আত্মা? যে নিজে নিত্য কামনা বাসনা লোভ অহঙ্কার ঈর্ষার কাছে নিত্য-পরাজিত — সেই বদ্ধজীবে কে আনবে জয়ের শুভ্র নির্মাল্য? যার অন্তর বাহির সমস্তটা রইল আত্মতৃপ্তির ক্ষুধায় পূর্ণ — সেই ক্ষুধিত মূর্তি আজ বাইরে ত্যাগের গেরুয়া ও খেলকা পরে কৌমের দেশের জনগণকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর পথে, জাহান্নামের পথে। 'ডেমন' ও 'ডার্ক ফোর্সের' শক্তি বিপুল — কিন্তু এ শক্তি কল্যাণের পথে নিয়ে যায় না — এদের পথ 'সেরাতুল মুস্তাকিম' নয় — এ পথ 'গজবের', অভিশাপের পথ। এ পথে আল্লাহর রহমতের ছায়া নাই — এ পথের পথিকের অন্তরে আল্লাহর ভয় নাই। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহর রসূলের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকে যে মুসলমানের — কোরআন মজিদের এক হরফও যারা হৃদয়ঙ্গম করে তারা জাত-ভাইকে জাতিকে এমন মিথ্যার পথ দিয়ে নিয়ে যায় না। এদের খেলকার ভিতরে, এদের চোগা-চাপকানের অন্দরে — যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি যায়, তাঁরা দেখবেন — এরা সুদখোর কাবুলির চেয়েও ভীষণ-দৈত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কাবুলি সুদ পেলে রেহাই দেয়, এরা সুদে-মূলে সাবাড় করতে চায়। অন্তরে আল্লাহর করুণার এক কণাও যে পেয়েছে, তার কখনো এই বীভৎস লোভী মূর্তি দেখা যায় না। সে কখনো বাইরের যশ-খ্যাতি-ঐশ্বর্যের মোহে জোঁকের মত কওমকে জাতিকে রক্ত শুষে মেরে ফেলে না। অন্তরে যে আল-ফাজালিল আজিম — পরম প্রসাদ-দাতা আল্লাহর প্রসাদ পেল না — সেই বাইরের এই দস্যুবৃত্তি করে বেড়ায়। তথাকথিত স্বাধীন দেশেও এই শক্তি-মাতাল দানবের উৎপাদন চলেছে — ভারতেও চলেছে এই শক্তি-লোভীর সাম্যহীন ভেদলীলা। যে দৃষ্টির দর্শন — শক্তি এই দেওয়ালের ওপারে পৌঁছায় না, সেই খর্বদৃষ্টি অন্ধের ইঙ্গিতে চলেছে অগণন জনগণ। এই নেতাদের শক্তি নাই, কিন্তু অতি কূটবুদ্ধি আছে; যৌবন নাই, কিন্তু যৌবনের কাঁধে ভর করে জয়যাত্রার মিছিল বের করার প্রখর বুদ্ধি আছে। এই জয়যাত্রার মিছিলকে আমি দেখেছি — জানাজার মিছিলের মত। জরাগ্রস্ত জইফ্ যারা তাঁদের উপর আমার ব্যক্তিগত কোন অশ্রদ্ধা নেই — আমার বর্তমান ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা, তারা জানেন আমার চেয়ে তাঁদের কেউ বেশি শ্রদ্ধা করেন না। আল্লাহ জানেন তাঁদের বুজর্গ বলে পদধুলি নিতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। কিন্তু তাঁরা যখন জাতীয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হয়ে অগ্রে চলতে চান — তখনই আমার পায় হাসি। আমি এই জায়গায় তাঁদের সালাম না নমস্কার করতে পারিনি। জরার প্রধান ধর্ম হলো — অতি সাবধানে পা টিপে টিপে বিচার করতে করতে

www.pathagar.com

চলা। এই অতি সাবধানীরা (ভিরু নাই বললাম) অগ্রগমনের পথ পরিষ্কার না করে পশ্চাতে 'রিট্রিট' করার পথ উন্মুক্ত রাখতে চান। আগে-চলো-মারো-জোয়ান-হেঁইয়ো' বলে এগুতে এগুতে যেই এসে পড়লো চৌরিচোরার দুটো খুনোখুনি, অমনি সেনাপতির কণ্ঠে ক্রন্দন ধ্বনিত হল — 'পিছু হটো, পিছু হটো।' গণ-ঐরাবতের পায়ে কাপাস-তুলো চরকাকাটা সুতোর পুঁটুলি বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও তার বিপুল আয়তনের জন্য দুটো চারটে লোক মারা গেল এইটাই সেনাপতির চোখে পড়ল — আর (ভারতের কথা ছেড়ে দিলাম) এই বাংলাদেশে যে কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়ায় বছরে বছরে এগার লক্ষ করে লোক cold blooded murdered হচ্ছে সেদিকে একচক্ষু সেনাপতির দৃষ্টি পড়ল না। কানা হরিণের মত তাঁর মৃত্যুবাণও এল তাই ঐ ভয়ের পথ দিয়েই মৃত্যুর ভয় যার হয়ত নিজের গেছে –– কিন্তু অন্যের মৃত্যু দেখলে যার মৃত্যু-যন্ত্রণা হয় ভয়ে কূর্ম-অবতার হয়ে যান — তিনি আর যাই করুন অমৃতসাগরের তীরে নিয়ে যাওয়ার সাধনা তাঁর নিস্ফল হয়েছে। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মধ্যে যিনি পরম নিত্যম্, নিত্য পূর্ণম — তাঁকে যিনি উপলব্ধি করলেন না, তাঁর সংহার রূপকে যিনি অস্বীকার কররেন, ভয়ের পশ্চাতে অভয়কে দেখলেন না তিনি আর যাই পান — পূর্ণকে পাননি। তবু কাঠ পুড়ছে বলে, যে শুধু কাঠের ধ্বংসই দেখল, আগুনের সৃষ্টি দেখল না, তার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন নয়। এর এক চোখে দৃষ্টি আছে আর বাকি যারা তারা একেবারে দৃষ্টিহীন অন্ধ। এরা হাতে বড় বড় মশাল জ্বেলে চলেছেন — কিন্তু অন্ধের হাতে মশাল যত না আলো দেয় তার চেয়ে ঘর পোড়ায় বেশি।

এই জরাগ্রস্ত সেনাপতিদের বাহন আজ যুবক–শক্তি। এই যুবকদের কাঁধে চড়ে এঁরা যশ: খ্যাতি ঐশ্বর্যের ফল পেড়ে খাচ্ছেন। বাহক যুবক-বৃন্দ তার অংশ চাইলে বলেন— আমরা ফল খেয়ে আঁটি ফেললে সেই আঁটিতে যে গাছ গজাবে তারই ফল তোমরা খেয়ো। এই আঁটির আটির আশায় যুবকদের কণ্ঠে জরার জয়গান করে চেঁচাতে চেঁচাতে আজ বাঁশের চাঁচাড়িতে পরিণত হয়েছে, চাকরির দরখাস্তের পাতা পেলে দলে দলে যুবক, দেখতে তীর্থের কাকের মত হাঁ করে বসে আছে — ভোট ভিক্ষা করে তাদের ঠোঁট গেছে ছিঁড়ে, মোট বয়ে কোট হয়েছে নিমৃস্তিন, পথে ঘুরে ঘুরে পায়জামা পরিণত হয়েছে জাঙ্গিয়ায় — কিন্তু দরখাস্তের পাতায় পোলাও আর পড়ল না। দু'চার জনের পাতায় যা পড়ল — তার চেহারা দেখে বাবুর্চির 'বাবুর' 'চি' শব্দ — দুয়ের উপর আসে ধিক্কার। যুবকেরা নিজেরাই জানেন, 'ইয়ে দুঙ্গা উয়ো দুঙ্গা' বলে যারা চোগা-চাপকানের পকেট দেখান — তাঁদের চাকরি বা অন্য যে কোন কল্যাণ–দানের শক্তি অতি সামান্য। তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও দেওয়ার শক্তি নেই। তবু শিক্ষিত তরুণেরা স-তল্পি তাঁদের বয়ে বেড়াচ্ছেন — এই আশায় যে, কোন বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে কে জানে? যারা অন্যের ক্ষুধা দূর করার জন্য নিজের ক্ষুধা আগে মেটান — তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরতের বা তাঁর আসহাবদের শিক্ষা কখনো গ্রহণ করেননি। নিজেরা সাততলা দালানের আশ্রয় থেকে নিরাশ্রয় জনগণের জন্য কাঁদলে — তা কখনো

www.pathagar.com

তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে না। অন্ধকূপে যে গেছে পড়ে — সাত মহলার উপর থেকে 'আরে কম-জোর ওঠ — আরে কম–বখত ওঠ' বলে চেঁচালে সে কুয়া থেকে উঠতে পারবে না। উপরওয়ালার নেতার হুকুমে কুয়া থেকে উঠতে গিয়ে তার বুক যাবে ছিঁড়ে — পা যাবে ভেঙে। যিনি সত্যিকার তাকে অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করতে চান — তিনি তাঁর সভ্য পোশাক, কালচারের কালচে–পড়া মুখোশ খুলে কুয়ায় নেমে কাঁধ দিয়ে উর্ধ্বে তোলেন। এই কোটি কোটি নিরন্ন নিরাশ্রয়ের বেদনায় যার ক্ষুধার অন্ন মুখে উঠবে না ঐ ভিক্ষুকদের সাথে পথে পথে করবেন ভিক্ষা — ঐ নিরাশ্রয়দের সাথে গাছ-তলা হবে যার আশ্রয় — ইট-পাথর হবে যার উপাধান— ছিন্ন কন্থা হবে যার একমাত্র আবরণ সেই পরম বৈরাগীই এই বাংলার-ভারতের-মহাভারত বিশ্বের অনাগত সেনাপতি-নেতা-লিডার-ইমাম। যিনি অন্তরে আল্লাহর আনন্দরূপকে প্রাপ্ত হননি- পরম শান্তের শান্তির প্রাসাদ যিনি পাননি তিনি এই পথের দু:খকে অগনিত জনগণের জন্য এই দারিদ্র্য-অনাহার-উৎপীড়ন-আঘাতকে সহ্য করতেই পারবেন না। অন্তরে পরম ঐশ্বর্য পেয়েও যিনি পরম ভিক্ষু — অনন্ত আসক্তির ভোগের মাঝে যিনি নিরাসক্ত নির্লোভ নিরভিমান নিরহঙ্কার সেই পরম অভেদজ্ঞানী পরম সাম্য সুন্দরের প্রতীক্ষায় আমি দিন গুনছি। তাঁর আনন্দ-সুন্দর জ্যোতি মাঝে মাঝে ঝলকে ওঠে হে আমার প্রিয়তম তরুণবৃন্দ — তোমাদের চোখে মুখে। তাঁর অজর অমর অক্ষয় তনুর বজ্র শক্তির ঝিলিক দেখি তোমাদের শক্তিতে তাঁর অভয়-সুন্দর দক্ষিণ হাতের আভাষ পাই তোমাদের বাহুতে। তোমরা ডাকো, ডাকো, তাঁকে তোমাদেরই মাঝে, জরাজীর্ণ দেহে নয়, লোভ অহঙ্কার ঈর্ষার অপবিত্র দেহে নয় — তোমাদেরই শুদ্ধদেহে সেই সর্বভয়মুক্ত সর্বভেদ-জ্ঞান-মুক্ত শক্তি-সাধনায় পূর্ণসিদ্ধ মহাপুরুষকে ডাকো তোমাদেরই মাঝে।

আমি আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে এই আশার বাণী শোনাচ্ছি — তিনি প্রকাশিত হবেন তোমাদেরই মাঝে। জরাজীর্ণ দেহে নয়। তোমাদের আকাঙ্ক্ষা, তোমাদের প্রার্থনা আমার মত মহামূর্খকে লিখালেন কবিতা, গাওয়ালেন গান — তাঁর শক্তি এই নাম–গোত্রহীনের হাতে দিলেন আশার বাঁশি, আহ্বানের তূর্য, রুদ্রের ডমরু বিষাণ। তোমরা চাও — আরো চাও — দেখবে তোমাদেরই মাঝে চির-চাওয়া রুদ্র-সুন্দর আসবেন নেমে।

আল্লাহ্ তাঁর এই দাসের — বান্দার জীবনকে ভেঙে চুরে মিসমার করে নতুন করে গড়েছেন। আমার আজও ভয় হয় যশঃখ্যাতির প্রলোভনকে ; 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'।

সেদিন আল্লাহ তাঁর এই বান্দার অন্তরে-বাহিরের সর্বসত্তাকে তাঁর বলে গ্রহণ করবেন — আমার বলে কিছুই থাকবে না — যেদিন আমার পরম স্বামী পরম প্রভুর দরবার থেকে পাক ফরমান — সেই দিন আমি তাঁরই ইঙ্গিতে কর্মে নামব ; তার আগে নয়। আল্লাহ আমায় সর্ব-প্রলোভন হতে রক্ষা করুন। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধপ্রেমের মিলনে তখন সে কর্ম হবে তাঁর কর্ম। এ বান্দার নয় — শুদ্ধ কর্ম। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই আল্লাহর

www.pathagar.com

রহমত আমায় নাজাত দিয়েছেন — কিন্তু অন্যকে মুক্ত করার শক্তি তিনি দেননি। তার জন্য আমার কোনো ব্যস্ত নেই। শান্ত হয়ে অটল ধৈর্য নিয়ে সেই শুভক্ষণের জন্য বসে আছি। যখন তার শক্তি নেমে আসবে আমাদেরই কারুর মাঝে — তুষার গলে স্রোতস্বিনী মত অনন্ত প্রবাহে, আপনাদের যারই মাঝে সেই শক্তি আসবে — সেই সেনানীর আদেশ এই বান্দা হাসিমুখে পালন করে ধন্য হবে। আল্লাহর সেই শক্তিকে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে এই পৃথিবীর ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। অটল শান্ত ধ্যানী হতে হয়। উর্দ্ধে সঞ্চরণশীল মেঘদলকে সমতলভূমি গ্রহণ করতে পারে না — তাকে গ্রহণ করে সমতলের (plain-এর) ঊর্ধ্বে যে অটল গিরিচূড়া উঠেছে, সে। সেই ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় সঞ্চিত হয় সেই মেঘদল তুষাররূপে। সেই তুষার বিগলিত হয়ে প্রবাহিত হলে অনুর্বর উপত্যকার অধিবাসীরা তার প্রসাদ পায়, তার দুই কূলে বাসা বাঁধে, তাদের অনুর্বর ক্ষেত্র উর্বর হয়, ফলে-ফুলে ভরে ওঠে। আল্লাহর ঊর্ধ্বের জালাল-শক্তিকে স্পর্শ করতে হবে তাঁদের, যারা দেশকে জনগণকে পরিচালিত করতে চান। বদ্ধ পুকুরের পানি দিয়ে দেশকে শস্য-শ্যামল করা যায় না। আপনাদের তরুণেরা প্রত্যেকেই অনাগত লিডার — তাই আপনাদের এই ঊর্ধ্বের কথা বললাম। যদিও আমি সেই নিরক্ষরদের একজন।

আপনারা জেনে রাখুন — আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর কামনা আমার নেই— 'লিডার' হওয়ার লোভ ও দুর্মতি থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। আজ মোল্লা-মৌলভী সাহেবদের মুসলমানির ফখরের কাছে টেকা দায়। কিন্তু তাঁদের আজ যদি বলি যে ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ — আল্লাতায়ালায় সেই পরম আত্মসমর্পণ কার হয়েছে? আল্লাহে পূর্ণ আত্মসমর্পণ যার হয়েছে তিনি এই দুনিয়াকে এই মুহূর্তে ফেরদৌসে পরিণত করতে পারেন। আমরা কথায় কথায় অন্য ধর্মাবলম্বী ও নিজ ধর্মের জ্ঞানবাদীদের কাফের বলে থাকি। এই কাফেরের অর্থ আবরণ, বা যা আবৃত করে রাখে। কাফের ও ইংরাজি 'কভার' এক ধাতু থেকে উৎপন্ন কিনা ভাষা-তত্ত্ববিদরা বলবেন। আল্লাহ ও আমার মাঝে যতক্ষণ আবরণ রইল, ততক্ষণ আমি কাফের, অর্থাৎ আমার পরম তত্ত্ব, আমার শক্তি ও সত্য ততক্ষণ আবৃত। এমন একজন মুসলমানেরও যদি বাঙলায় কেন, সারা দুনিয়ায় সন্ধান পান — আমি তাঁর কাছে মুরিদ হতে রাজি আছি। আমার মধ্যে যতক্ষণ আবরণ অর্থাৎ ভেদাভেদ-জ্ঞান, সংস্কার, কোন প্রকার বাধা-বন্ধন আছে ততক্ষণ আমার মাঝে 'কুফর'ও আছে। আমি সর্ববন্ধন-মুক্ত, সর্বসংস্কার-মুক্ত সর্বভেদাভেদ জ্ঞানমুক্ত না হলে — সেই পরম নিবারণ পরম মুক্ত আল্লাহকে পাব না আমার শক্তিকে। শক্তিমান পুরুষই কওমের জাতির, দেশের, বিশ্বের ইমাম হন — অধিনায়ক হন। অন্য দিকে যাঁকে ধরতে পারেনি, সেই পরম দিগম্বরের করুণা পাবে এই সব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য লোভীর দল? যে জাতির পবিত্র কোরানের প্রথম শিক্ষা — 'আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন' — সমস্ত প্রশংসা মহিমা যশ:খ্যাতি আল্লাহর প্রাপ্য, আমার নয় — সেই আয়েত দিনে শতবার উচ্চারণ করেও যারা ভোগের পাকে পড়ে রইলেন কর্দম-

৫—

www.pathagar.com

বিলাসী মহিষের মত তাঁরা আর যাই হন আল্লাহর ও তাঁর রসূলের কৃপা পাননি। আল্লাহর প্রাপ্য, আমার নয় — সেই আয়েত দিনে শতবার উচ্চারণ করেও যারা ভোগের পাকে পড়ে রইলেন কর্দম-বিলাসী মহিষের মত তাঁরা আর যাই হন আল্লাহর ও তাঁর রসূলের কৃপা পাননি। আল্লাহর কৃপাপ্রাপ্ত একজন মুসলমানই যথেষ্ট, sixty percent তিনি গণনা করেন না। নিত্য-আজাদ মুসলমানকে তিনি গোলামখানায় নিয়ে যান না। যারা অনাগত 'বদর' 'ওহোদের' যুদ্ধে বীর শহীদান হতে পারত — জাতির দেশের সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিমান সন্তানদের তিনি কশাই-খানায় পাঠান না। যে দৃষ্টি আপাত-মধুর লভ্যের লোভে তলোয়ারকে করে ঝিঙে চাঁচার বঁটি, মাটি খোঁড়ার খোন্তা — সে দূরদর্শী দ্রষ্টা নয়। অন্যের মাল পয়মাল করে নিজে ধনী হওয়ার গুপ্ত লোভ তার অন্তরে জটিল সাপের মত ফণা গুটিয়ে আছে। তার মাথায় মণি থাকলেও সে বিষধর ফণী। তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। যে তরুণের বাজুতে শোভা পেত এসম আজমের তাবিজ, সেই হাতে বাঁদা আজ ভোট ভিক্ষার ঝুলি। যে কণ্ঠের তকবির-ধ্বনি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে তুলতে পারে, সেই কণ্ঠ আজ নেতার জয়ধ্বনিতে হল কলঙ্কিত। হে তরুণ! তোমরা কি যাবে ঐ লোভের পথে ঐ গোলামির কশাইখানায়? আজ চাকুরি-লোভী বাঙালি হিন্দু-জাতির দুর্দশা দেখ। চাকুরি যদি এরা গ্রহণ না করত, তা হলে এই বাঙালি অসাধ্য সাধন করতে পারত। যে লোকগুলো এক-পেট-পিলে আর এক-পিঠ অপমান নিয়ে মরল — (মরতে তাদের হলই কিংবা যারা বাঁচল তারা হয়ে রইল মরারও বাড়া) তারা না হয় দুদিন আগেই মরত। মরে স্বাধীনতা আনলে তাদের বাপ-মা ছেলে-মেয়ে-আরও ঐশ্বর্য পেত, যশ পেত, সম্মান পেত। তাদের ভালো খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা স্বাধীন ভারত করত। যে কয়টা মৃত্যু-বিলাসী — হ্যাঁ, মৃত্যু ওদের আনন্দ-বিলাস ছিল বৈ কি বাঙালি ছেলের মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জা কষল সেই নাম-না-জানা শহীদদের প্রসাদে দেশে যতটুকু এল স্বায়ত্বশাসন — তারই ছিবড়ে নিয়ে আজ আমরা কামড়া-কামড়ি করছি! আজ মুসলমান ছেলেরা সেই আত্মত্যাগীদের আত্মার কাছে শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে? জেহাদের পথে গাঁথা! তাদেরই জন্য আজও আমি লুকিয়ে কাঁদি। আল্লাহর রহমত পেয়েইও তাদের কথা — তাদের ত্যাগ মনে পড়লে আমি শিশুর মত চিৎকার করে কাঁদি! যে নিত্য-শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছি, সেই শান্তির অটল আসন আমার টলতে থাকে।

আমি জানি, তোমাদের মাঝে বহু তরুণ আছে যাদের রুহ, আত্মা জাগ্রত। যারা বাইরের সম্মান, লোভ, খ্যাতি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে রাহে-লিল্লাহ আপনাকে সদকা দিতে রাজি আছেন— আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি— তাঁরা কি গ্রহণ করবেন দুনিয়ার এই ক্ষণিক ভোগের পথ? তাঁরা কি গ্রহণ করবেন না এই মহামন্ত্র — "ইন্না সালাতি ও নুসুকি ওয়া মাহয়্যায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন" — "আমার সব প্রার্থনা, নামাজ রোজা তপস্যা জীবন-মরণ সবকিছু বিশ্বের একমাত্র পরম প্রভু আল্লাহর পবিত্র নামে নিবেদিত!" যে সংসারের সুখের জন্য তুমি আজ এত লালায়িত, তুমি কি বলতে পার,

www.pathagar.com

এই সভা হতে বাড়ি যাওয়ার আগেই তোমার সে লালসা চিরকালের জন্য ফুরিয়ে যাবে না? তোমার বাপ-মা ছেলে-মেয়ে ভাই-বোনের জন্য তুমি চিন্তা করে তাদের কি দু:খ-দারিদ্র্যমুক্ত করতে পেরেছ বা পার? তুমি কি জান, তোমার জন্মেও যেমন তোমার হাত নেই— তোমার বা তোমার আত্মীয়ের মৃত্যুতেও তেমনি তোমার কোন হাত নেই? যে কোন মুহূর্তে তোমার পিতামাতার সাধ-আশাকে মৃত্যু তার সস্থূল হাত দিয়ে মুছে ফেলতে পারে। তুমি কি জান, তোমার বা তোমার পিতামাতার ভার তোমার হাতে নেই— এই ভার একমাত্র যাঁর হাতে সেই আল্লাহর শক্তিতে নির্ভর কর তাঁর পরমাশ্রয়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ করে রাহে-লিল্লাহে আত্মনিবেদন কর। আমি আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে বলছি — এই আত্মনিবেদনেই তুমি তোমার আত্মীয়দের অভাবগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারবে। বিশ্বাস কর— আল্লাহ্ আল-গনি, তাঁর কোন অভাব নেই— নিত্য পূর্ণ। যে তাঁকে ডাকে তিনি তার সমস্ত অভাব দূর করেন, তাকে পরম কল্যাণের পথে হাত ধরে নিয়ে যান। বিশ্বাস কর— তাঁতে আত্মনিবেদন করলে তুমি বাদশাহর বাদশাহ যিনি তাঁর পরম করুণা প্রাপ্ত হবে। যে অদৃশ্য শক্তি হাতের পুতুল আমরা — সেই অনন্ত অপরিমাণ শক্তি যে উৎস হতে নিয়ত উৎসারিত হচ্ছে — সেইখানে খোঁজ পরম ঐশ্বর্যের সন্ধান। গোলামখানায় — কতলগাহে সে ঐশ্বর্যের এক কণাও নাই।

লিডারের কাছে শক্তি ভিক্ষা করো না — আল্লাহ এতে নারাজ হন — শক্তি ভিক্ষা করো একমাত্র আল্লাহর কাছে। জয়ধ্বনি মহিমা কীর্তন করো একমাত্র আল্লাহর।

বন্ধু! আমি জানি, তোমাদের অনেকে আমারই পানে চেয়ে আছে সেই অগ্রপথিকের নিশান তুলে জয়যাত্রার পথে চলতে। আল্লাহ্ জানেন, আমি আত্মপ্রতারণা করি নাই, আমি তাঁর বিষাণ বাজানোর আদেশ পেয়েছি, নিশান ধরার হুকুম পাইনি। তবে পঙ্গু যাঁর কৃপায় গিরি লঙ্ঘন করে — যাঁর করুণায় জন্মঅন্ধের চক্ষে সাত আসমানের দ্বার খুলে যায় — তাঁর কৃপা যদি পাই, তাঁর আদেশ যদি আসে — আমি আপনাদের বিনা আহ্বানে এসে ডাকব......

ভেঙেছে দুয়ার জেগেছে জোয়ার রেঙেছে পূর্বাচল,
খুলে গেছে দেখ দুর্গতি–ভরা দুর্গের অর্গল।
মৃত্যুর মাঝে অমৃত যিনি— এনেছে তাঁহার বাণী,
পেয়েছি তাঁহার পরমাশ্রয়, আর ভয় নাহি মানি।
সকল ভয়ের মাঝে রাজে যাঁর পরম অভয় কোল,
সেই কোলে যেতে আয় রে, কে দিবি মরণ-দোলাতে দোল!

দৈনিক 'কৃষাণ'
৮ই পোষ, ১৩৪৭

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে নজরুল

www.pathagar.com

যদি আর বাঁশি না বাজে
কাজী নজরুল ইসলাম

[১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি-রূপে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের এই শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আপনারা এই ভিখারীকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' জুবিলি উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলেন, যিনি বিশ্বভুবনের পরম পতি, পরমগতি, পরম প্রভু, তিনিই জানেন। আপনাদের কাছে আজ অজানা নেই যে ঘরে-বাইরে, সভায় বা সমাধির গোপন গুহায় কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই। যিনি সকল কর্মের, ধর্মের, জাতির, দেশের, সকল জগতের একমাত্র পরম স্বামী — পতিত্ব বা নেতৃত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁর। এ অধিকার মানুষেও পায় মানি। কিন্তু সে পাওয়া যদি তাঁর কাছ থেকে না হয়, তারে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারকে আমি অসুন্দরের দূত বলে মনে করি। এ অহঙ্কার Divine নয় Demon। অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ্ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর, আনন্দ-ঘন সুন্দর। আপনাদের আহ্বানে যখন কর্ম-জগতের ভিড়ে নেমে আসি, তখন আমার পরম সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, আমার অন্তরে বাহিরে দুলে ওঠে অসীম রোদন। আমি তাঁর বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারি না। আমার সর্ব অস্তিত্ব জীবন-মরণ-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তাঁরই নামে শপথ করে তাঁকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমা-সুন্দর প্রিয়তম আমার আমিত্বকে গ্রহণ করেছেন।

আমার বহু আত্মীয়াধিক প্রিয় সাহিত্যিক ও কবিবন্ধু আমায় অভিযোগ করেন, আমার না-কি দান করার অপরিমেয় শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্যে-রস-পিপাসু মনকে — শুধু কার্পণ্য করে বা স্বার্থপরের মত আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণা-দানের দক্ষিণ হস্তকে উর্ধ্বে, না-জানা শূন্যের পানে তুলে ধরেছি। তাঁরা আমায় আত্মীয়ের চেয়েও ভালবাসেন ; তাঁরা যখন এ-কথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। যে

www.pathagar.com

অভিমান তাঁরা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্বিকার উদাসীন একাকিত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে। যে মহাসাগর থেকে ঝড়ের রাতে শ্যাম-ঘন মেঘ-রূপে আমি সহসা এসেছিলাম ঘন ঘন বিদ্যু-ছটায়, বজ্রের রোলে, ঘোর তিমির-ঘন -ঘটায়, মুক্তজটায় দিগ দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছিলাম, অজস্র বারিবর্ষণে তৃষিত মাঠ-ঘাট প্রান্তরের তৃষা মিটিয়েছিলাম ; আমার রুদ্র-সুন্দর মৃত্যু দেখে যারা দেখতে পাননি যে, এই অশান্ত মেঘ-গন রূপ শুধু রুদ্রের ডমরু বিষাণ নিয়েই আসেনি, এরই করুণ নয়নের অশ্রুধারায় পৃথিবীতে ফুটেছে প্রেমের ফুল, শতদল, বৃন্ত, বনলতা হয়ে উঠেছে আনন্দে কণ্টকিত ; এই মেঘই এনেছে আনন্দ-বন্যা, ছন্দের নূরপুর-ধ্বনি, সুরের সুরধুনী গানের প্রবাহ, — সেই মেঘ একদিন দেখতে পেলো সে তুষারীভূত হয়ে শ্বেত শুভ্ররূপে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে পড়ে আছে। তার শক্তি — তার প্রিয়াও যেন মহাশ্বেতা রূপে তার বামে সমাধিস্থা। সেই সমাধির মাঝে আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেই সমুদ্রকে স্মরণ করতাম। সহসা মনে হত, এই মহাসমুদ্র এল কোথা থেকে। খুঁজতে গিয়ে মন বুদ্ধি অহঙ্কার — সবকিছু হারিয়ে যেত আকাশের পর আকাশ পেরিয়ে কোন এক পরম শূন্যে। তাই বন্ধুদের বলছি, এ আমার স্বধর্ম, এ আমার স্বভাব। তাঁরা তুষারীভূত আমাকে ভেঙে যেটুকু বরফ পেয়েছেন, তাতে তাঁদের তৃষ্ণা দূরীভূত হয় না। বলছেন আমি তাঁদের আমার অসহায় অবস্থার কথা বললে বিশ্বাস করেননি। ঘুড়ি উড়তে উড়তে গেছে ডালে আটকে, টানাটানি করলে সুতো ঘুড়ি সব যাবে ছিঁড়ে— অবুজ হাত তবু টানাহেঁচড়া করতে ছাড়ে না।

আপনাদের এই সাহিত্যসভায় রসের জলসায় আপনারা আমার অসহায় জীবনী শুনতে আসেননি। আমি আমারএ অসহায় অবস্থার কথা আগেই জানিয়েছিলাম। যার গলায় হয়েছে টনসিল বা বেধেছে কুলের আঁটি, সে সঙ্গীতশিল্পীকে জোর করে গান গাওয়ালে সে যত না গাইবে গান তার চেয়ে অনেক বেশি করে প্রকাশ করবে তার কণ্ঠের অসহায় অবস্থা; সুরের চেয়ে আঁটি আর টনসিলের ব্যথাই বড় হয়ে উঠবে। আপনারা ইচ্ছা করে শাস্তি গ্রহণ করছেন, আমি নিরপরাধ। যে সিংহ আছে খাঁচায় আটকে — তার ন্যাজ ধরে টেনে ন্যাজ ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, হুঙ্কারও শুনতে পারেন, কিন্তু তাকে টেনে বের করতে পারবেন না। যিনি বন্ধ করেছেন, তিনি দয়া করে দুয়ার না খুললে আমার বাইরে আসার কোনো উপায় নেই।

আনন্দ-রস-ঘন স্বর্ণবর্ণের এক না-জানা আকাশ থেকে যে শক্তি আমায় রস সরবরাহ করতেন — আগেই বলেছি, তিনি মহাশ্বেতা-রূপে মাঝে মাঝে হয়ে যান সমাধিস্থা। তখন আমিও হয়ে যাই নীরব, আমার বাঁশি আর বাজে না, রসস্রোত হয়ে যায় তুষার ভূত, আমার আনন্দময় তনু হয়ে যায় পাষান-বিগ্রহ। এ মৃত্যু নয়, কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও নিরানন্দময়। আজ আপনাদের কাছে বলে যাব — আবার নিদ্রিতা সমাধিস্থা শক্তি জেগেছেন, তবে তন্দ্রার ঘোর-সমাধির বিহ্বলতা কাটেনি। আমার সেই আনন্দময়ী শক্তি যদি আবার সমাধিস্থা না হন, আমায় পরম শূন্যে নিয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য লয় না

www.pathagar.com

করেন, তাহলে এই পৃথিবীতে যে প্রেমের যে সাম্যের যে আনন্দের গান গেয়ে যাব — সে গান পৃথিবী বহুকাল শোনেনি। আমার চির-জনমের প্রিয়া এই প্রেমাময়ীর প্রেম যদি না পাই — তাহলে বুঝব আমার এ বারের মত খেলা ফুরালো। আমার বাঁশি বিরহ-যমুনার তীরে ফেলে চলে যাব। শুষ্ক যমুনার বালুচর থেকে সেই বেণু কুড়িয়ে যদি যদি অন্য কেউ বাজাতে পারেন, আমার ফেলে-যাওয়া বাঁশি ধন্য হবে।

যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য-মথুর রূপ দর্শন করেছি তিনি যদি আমার সর্ব-অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে আবার যদি অশ্রুর বন্যা বয়, তাঁর সঙ্গে যদি আবার অমৃত-রস ধারা প্রবাহিত হয় আবার যদি তাঁর চরনে রাস-নৃত্যের ছন্দ জাগে — তাহলে আমি এই বিদ্বেষ-জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা-ভেদজ্ঞান-কলুষিত অসুন্দর অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব; এই তৃষিত পৃথিবীর বহুকাল যে প্রেম, অমৃত, যে আনন্দ-রসধারা থেকে বঞ্চিত — সেই সাম্য, অভেদ শান্তি, আনন্দ প্রেম সে আবার পাবে। আমি হব উপলক্ষ মাত্র, আধার মা ; সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ, সেই প্রেম আসবে আমার নিত্য পরম সুন্দর পরম-প্রেমময়ের কাছ থেকে। নিরস তরুকে নিঙড়ে আপনারা রস পাবেন না। তাকে রসায়িত হবার অবকাশ দিন। আপনাদের আনন্দের, মুক্তির রসের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে জানি — তবু অপেক্ষা করতে হবে। আমি এই আনন্দের এই প্রেমের ভিক্ষা-পাত্র নিয়েই তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি ; যদি আমি না পাই আপনাদের কেউ পান — সেই পরম সুন্দরের নামে শপথ করে বলছি — তাহলে আমি নিজে পেলে যে আনন্দ পেতাম তেমনি সমান আনন্দ পাব — সর্বাগ্রে আমি গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করব — সেবক হয়ে, দাস হয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করব। যদি আপনাদের তৃষিত নয়ন আমাকেই কেন্দ্র করে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করে আছে বলেন, তাহলে আশীর্বাদ করুন যে, আমার অর্ধ–জাগ্রতা আনন্দময়ী শক্তি যেন আবার সমাধিমগ্না না হন, আবার যেন তাঁর সুন্দর নয়নের প্রসাদ পাই, তাঁর প্রেমের প্রবাহকুলে আবার যেন জ্ঞানে, শক্তিতে আনন্দে নিত্য-পূর্ণ হয়ে নৃত্য করতে পারি।

যদি আর বাঁশি না বাজে — আমি কবি বলে বলছিনে — আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি — আমায় ক্ষমা করবেন — আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি — আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম — সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরব পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

হিন্দু–মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ–বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মত জমা হয়ে আছে — এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ–সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম — অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে

www.pathagar.com

এসেছিলাম — আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না — তবু — আপনারা আদর করে যখন নেতৃত্বে আসনে বসান, তখন অশ্রু সম্বরণ করতে পারি না। তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্র-সুন্দররূপ আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকিত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয় — তাহলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেক দিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমানের বলে দেখবেন না — আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির উর্ধ্বে যিনি এক মেবাদ্বিতীয়ম তাঁরই দাস হয়ে। আপনাদের আনন্দের জুবিলি উৎসব আজ যে পরম বিরহীর ছায়াপাত বর্ষাসজল রাতের মত অন্ধকার হয়ে এল, আমার সেই বিরহ-সুন্দর প্রিয়তমকে ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন — মনে করবেন — পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত-আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে, আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোন বাধা-বন্ধন স্বীকার করিনি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায়ন, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সাথে আমার যোগাযোগ বহুদিনের। কয়েকজন বন্ধুর আহ্বানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নিই, এখানে আমি বন্ধুরূপ পাই মি: মুজাফফ্‌র আহমদ, মি: আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুগণকে। আমাদের তখনকার আড্ডা ছিল সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের আড্ডা। আমরা এই তথাকথিত অ্যারিস্টোক্রাট বা 'আড়ষ্ট-কাক' ছিলাম না। বোমরু বারীন-দা এসে একদিন আমাদের আড্ডা দেখে বলেছিলেন — হ্যাঁ, আড্ডা বটে? আজকালের তরুণেরা যে নীড় সৃষ্টি করে বসে আছে, আমরা তা করিনি; আমরা করেছিলাম জীবনকে উপভোগ।

যাক, সেদিন যদি সাহিত্য-সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত তবে হয়তো কোথায় ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না! এই ভালোবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম ; এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কিনা, আমার জানা নেই।

সাহিত্য-সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, একে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে — বিশেষভাবে অর্থ-সাহায্য পুষ্ট করে তুলতে সকলকে আবেদন জানাচ্ছি। সাহিত্য-সমিতি বিত্তশালী হলে বহু তরুণ প্রতিভাকে আশ্রয় দিতে পারবে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করতে পারবে।

www.pathagar.com

[কবি নজরুলকে উদ্দেশ্য করে ইবরাহীন খাঁ লিখিত একখানি পত্র ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর উত্তরে কবি নজরুল যে চিঠিখানা লিখেছিলেন ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'সওগাতে' তা মুদ্রিত হয়। এই উভর চিঠির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নজরুলের চিঠির সাথে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর চিঠিখানা আমরা মুদ্রিত করলাম।]

নজরুলের প্রতি প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর পত্র

ভাই নজরুল ইসলাম,

তোমাকে কখনো দেখি নাই। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগও ঘটে নাই- দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি। বলেছি- "প্রভু, এ কাঙ্গাল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছ, একে রক্ষা করো- সমাজকে দিয়ে ওর কদর করিয়ে নাও।" তোমায় এত আপন ভাবি, এত কদর করি বলেই আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি। তোমার গুণমুগ্ধ, তোমার প্রীতি আকাংখী, তোমার ভক্ত ভাইয়ের এ আবদার তুমি রক্ষা করবে, তাও জানি।

আজ তোমায় কয়টি কথা বলব, গুরুরূপে নয়- ভাইরূপে, ভক্তরূপে। এ কথাগুলি বলব বলে অনেকবার তোমার সাক্ষাৎ খুঁজেছি। পাই নাই। কিন্তু কথাগুলিও বুকের তলে অনুদিন তোলপাড় করছে। তাই পত্র মারফতই বলতে চেষ্টা করছি। আমি আগেই বলেছি, বাঙলার মুসলমান সমাজ কাঙ্গাল ঃ শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাঙলার অ-মুসলমানরা তোমায় যে কদর করছেন, মুসলিমরা তা করেন নাই, করতে শেখেন নাই। এ কথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নত করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি, বন্ধু মহলে রোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সে শুধু নিন্দায় ফায়দা কি? শুধু আস্ফালনে ফলল কি? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র; তাই সেই ভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, পথে আনতে হবে। আর তাদের কাছে ত আমার সে আবদারের অধিকার নাই, যে আবদার তোমার কাছে আমি করতে পারি।

www.pathagar.com

তাই এবার সমাজ ছেড়ে তোমার দিকে ফিরেছি। সমাজ মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী সুধা। কে সে সুধার পাত্র হাতে নিয়ে এই মরণোম্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে? কোন্ সুসন্তান আপন তপোবনে গঙ্গা আনয়ন করে এ অগণ্য সগরগোষ্ঠীকে পুনঃ জীবনদান করবে, কাঙ্গাল সমাজ উৎকণ্ঠিতচিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কেন জানি না; কিন্তু মনে হয় তোমায় বুঝি খোদা সে সুধা ভাণ্ডের কিঞ্চিত দান করেছেন, অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কি?

সুদূর অতীত ইতিহাসের প্রান্তসীমানার ওপার হতে যে অস্পষ্ট, অর্ধশ্রুত মায়াধ্বনি ভেসে আসে সে কবির কণ্ঠস্বর। কবি যে যুগে যুগে সত্যের গীতি, কল্যাণের গীতি, বিরাট অনন্ত মহাজীবনের নিগূঢ় ভিত্তিকর্মের উদ্বোধন গীতি গেয়ে এসেছে। স্নেহবাৎসল্য ভরপুর মাতৃক্রোড়ে আধ নিমিলিত আঁখি শিশুর শয্যাপার্শ্বে, নবীন-নবীনার মিলন তীর্থ-বিবাহবাসরে, ধর্ম যাজকের উন্নত বেদীতে, কর্মবীরের উলঙ্গ অসি-বর্শার রঙ্গ ভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে, সমরশেষে বিজয়ের উল্লাস নিনাদে, শহীদের শোকে নিহতের কল্যাণ-কামনায়, মহাযাত্রীর সমাধি ধারে কবির লীলায়িত বাণী-ধ্বনি যুগে যুগে ঝঙ্কৃত হয়েছে; মহামানবের মনোজ্ঞ করে যখনই যিনি যে বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন, তিনি যত বড় মহাসত্যই প্রচার করুন না, তিনি কবির বচন লালিত্যে মধুর করে তা বলতে চেয়েছেন, বলেছেন। কারণ বিশিষ্ট শক্তি স্ফূরিত স্বল্পসংখ্যক-বিশেষজ্ঞ রসশূন্য নির্মম বাণীর মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু বিশ্ব-মানবের চিত্ত স্পর্শ করতে হলে সেইভাবে উদ্বেলতরঙ্গায়িত বচন-প্রবাহেই তো করতে হবে, যাকে ধরবার জন্য খোদাতা'লার স্থাপিত রাজধানীর দুই পার্শ্বের বেতার স্টেশন দুইটি অনুদিন এত উদগ্রীব এবং যার মৃদু আঘাতে প্রাণের বীণায় নীরব তারে সহসা আকুল রাগিণী ঝংকার জেগে উঠে মানব দেহের স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উন্মাদনার তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়ে দেয়। তুমি সেই কবিদের একজন; তোমার কণ্ঠে সেই সঞ্জীবনী সুধার উন্মাদনা আছে।

কিন্তু ভাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, কোন্ ব্রতে তোমার সে কণ্ঠস্বর তুমি নিয়োজিত করেছ? তোমার প্রতিভা অদ্ভুত, কিন্তু তারো চেয়ে গুরুতর তোমার দায়িত্ব। কড়ির মালিক যে, তার নিকাশ না দিলেও বড় আসে যায় না, কিন্তু মানিকের মালিকের নিকাশ দিতেই হবে; তোমার প্রতিভাকে ত তোমায় সার্থক করতে হবে।

কোন্ পথে সে সার্থকতার অন্বেষণ করবে? বিদ্রোহে?— উত্তম। কিন্তু বিদ্রোহকেও সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যযুক্ত করতে হবে, শুধু তোমার 'যখন চাহে এ মন যা' উন্মাদ ঝঞ্ঝার মত চললে তোমার জীবনের সার্থকতার নৈকট্য কোথায়? তৈমুরের বিরাট দুর্বার অভিযানের দিকে আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, তারপর ক্লান্ত চোখ ফিরিয়ে নেই, এবং তাঁর কথা ভুলে যাই; কিন্তু বাবরের ক্ষুদ্রতর অভিযানের কথা ভুলতে পারি না। তাঁর অভিযান আমাদেরকে দিয়েছে দিল্লী, আগ্রা, ময়ূরাসন; সর্বোপরি দিয়েছে তাজমহল। তোমার কাছে আমরা চাই বাবরের অভিযান, সে অভিযানের দক্ষিণে-বামে অগ্রে-পশ্চাতে নব নব সৃষ্টির সৌধ গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

বাঙলার মুসলিমরা তোমার কদর করে নাই; কিন্তু তাই কি তাদেরে তুমি ছেড়ে যাবে? তোমার ক্ষেত্র মুসলিম-সাহিত্য। বাঙ্গালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণবাণীর পুনঃ প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাঙলার আর দশজন কবির মত যদি তুমি কবিতা লেখ, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে আসন আসন মাত্র, সিংহাসন নয়। আজ বাঙলার মুসলমান-সাহিত্য রাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়। মধুসূদন যদি শুধু ইংরাজী কাব্যই লিখতেন, তবে হয়ত একজন বায়রন হতে পারতেন, কিন্তু মধুচক্র রচয়িতা হতে পারতেন না। কিন্তু আমি শুধু যশের, শুধু প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এ প্রশ্নের বিচার করছি না।

আমার বক্তব্য এই ঃ যেখানে দশটা অভাব আছে, সেখানে যদি সব অভাবগুলি একসঙ্গে দূর করা না যায়, তবে যেটি সবচেয়ে বড় অভাব, সেইটি আগে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে।

এখন বিচার করতে হয়; তুমি বাঙ্গালী কবি, তুমি মুসলমান। বাঙলার কোন্ কল্যাণ সাধনে তোমার আগে অগ্রসর হওয়া দরকার?

বাঙ্গালীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, সবচেয়ে কলঙ্কিত, সবচেয়ে নিন্দিত, কুলিখিত বিষয় ইসলাম। যিনি বাঙলার সাহিত্যে ইসলামের সত্য সনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি "এইসব ভগ্ন শুস্ক শ্রান্ত বুকে আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্যস্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে বল দিবেন, অমুসলিমের বুক হতে ইসলামের অশ্রদ্ধা দূর করতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনি হবেন বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত।" তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার; তুমি সেই মহাগৌরবের আসন দখল করতে পার; তুমি এইরূপে তোমার কবি প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতমরূপে সার্থক করতে পার।

আরো এক কথা। এই বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূতরূপে যে তুমি আসবে, সে কোন্ পথে? বিদ্রোহের পথে? আমার মনে হয়, না, তা নয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'Line of liast resistance.' বা লঘুতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। সত্যিকার ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কিছু নাই; ইসলাম আধুনিকতম উন্নততম ধর্ম, তবে যা বাঙলার মুসলিমরা অনেক কুসংস্কারে পড়েছে, সে ইসলামের দোষ নয়, এই হতভাগারা ইসলামের সাথে ঐ কুসংস্কারগুলি পোষণ করছে। এখন এই কুসংস্কারগুলি দূর করতেই হবে, কিন্তু সেগুলি যে ইসলামের অনুশাসন নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধ মত, এই বলে সেগুলির নিন্দা করতে হবে, ইসলামকে ইসলামের কোন অনুষ্ঠানের নিন্দা করে নয়। কারণ, যারা কুসংস্কারে ডুবে ইসলামের পবিত্র নামে হয়ত অজ্ঞাতে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করছে, তারাও ইসলামের নিন্দা সইতে পারে না, সুতরাং ইসলামের নিন্দার নামে খুব ভাল কথা বললেও তারা শুনবে না। যাদের শুনবার জন্য বলা, তারাই যদি না শোনে তবে সে বলায় লাভ কি? কিন্তু মুসলিমদের একটা গুণ আছে, তারা ধর্মের নামে পাগল নয়;

www.pathagar.com

তাই সে হাফিজ-রুমীকে সত্য সাধক বলে বরণ করে নিয়েছে, তাই সে শেখ সাদীকে দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজে আদর্শ মেনে নিয়েছে। 'তোমার বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তাঁদের একজন তোমার 'ছুবহে উম্মিদ' পড়ে আনন্দে গর্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন, আর নাচতে নাচতে এসে আমায় বলেছিলেন, 'নজরুল যদি এমনি ধারায় লিখত তবে বাঙলার আলিমরা যে তাকে মাথায় করে রাখত' [যিনি বলেছিলেন, তিনি একজন আলীম]। একথা কয়টা তোমায় ভেবে দেখতে বলি। বাঙলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাঙলার মুসলিমকে বাঙলার সাহিত্যকে ধন্য কর।

তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি, ভাই কাঙ্গাল মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি, তুমি এই পতিত মুসলিম সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও; তাদের ব্যথিত চিত্তের করুণ রাগিণী তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তোমার আকুল আহ্বানের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হোক, ইসলামের মহান উদার আদর্শ তোমার কবিতায় মূর্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য সাধনা ইসলামের মহান নীতিতে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক। আমিন।

অনেক কথা বলে ফেল্লাম ভাই– মাফ করো। ভাইয়ের কাছে ভাই যদি এমন প্রাণ খুলে কথা না বলবে, তবে বলবে কোথায়?

গুণমুগ্ধ– ইবরাহীম খাঁ

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের পত্র

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খান সাহেব!

আমাদের আশি বছরে নাকি স্রষ্টা ব্রহ্মার একদিন। আমি অত বড় স্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা তো বটে, তা আমার সে-সৃষ্টির পরিসর যত ক্ষুদ্র পরিধিরই হোক। কাজেই আমারও একটা দিন অন্তত তিনটে বছরের কম যে নয়, তা অন্য কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আপনি নিশ্চয়ই করবেন।

আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে, তখন। এমনও হতে পারে, ১৯২৭-এর সাথে সাথে হয়ত বা আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে— তাই আমি আমারও অজ্ঞাতে কোন্ অনির্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে। কেননা, আমি এই তিন বছরের মধ্যে কারুর চিঠির উত্তর দিয়েছি, এত বড় বদ্‌নাম আমার শত্রুতেও দিতে পারবে না– বন্ধুরা তো নয়ই। অবশ্য আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে— এ সুসংবাদটা উপভোগ করবার মত

www.pathagar.com

সৎসাহস আমার নেই, বিশ্বাসও হয়তো করিনে; কিন্তু আমারই স্বজাতি অর্থাৎ কবি জাতীয় অনেকেই এ বিশ্বাস করেন এবং আমিও যাতে বিশ্বাস করি তার জন্যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণেই করছেন। কিন্তু আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা যে নিঃশ্বাস মোচন করেন, তা হ্রস্ব নয় এবং সে নিঃশ্বাস বিশ্বাসীরও নয়! হতভাগা আমি, তাঁদের এই আমার প্রতি অতি মনোযোগ নাকি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে– মন্দ লোকে এমন অভিযোগও করেছে তাঁদের দরবারে।

লোকে বললেও আমি মনে করতে ব্যথা পাই যে, তাঁরা আমার শত্রু। কারণ একদিন তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আজ যদি তাঁরা সত্যি সত্যিই আমার মৃত্যু কামনা করেন, তবে ত আমার মঙ্গলের জন্যই, এ আমি আমার সকল হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি– তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যত বেশিই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায় কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়ে কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে ওঠে- তা-ও আমি ভাল করেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি–ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষেই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চির-রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধূলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি তোমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পাই!

কিন্তু এ ত আপনার চিঠির উত্তর হচ্ছে না। দেখুন, চিঠি না লিখতে লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে। তাতে করে কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক। যদিও চোখ-কান বুঁজে উত্তর দিয়ে ফেলি কারুর চিঠির, সে উত্তর পড়ে তাঁর প্রত্যুত্তর দেবার মতো উৎসাহ বা প্রবৃত্তির ইতি ঐখানেই হয়ে যায়। কেননা, সেটা তাঁর চিঠির উত্তর ছাড়া আর সব কিছুই হয়। এ-বিষয়ে ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য নিতে পারেন, সুতরাং এটাও যদি আপনার চিঠির উত্তর না হয়ে আর কিছুই হয়, তবে সেটা আপনার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার হাতের অখ্যাতি।

আপনাদের দেখার না হলেও শোনার ক্রটি কোনো পক্ষ থেকেই ঘটেনি দেখছি। আপনাকে চিনি, আপনি আমায় যতটুকু চেনেন তার চেয়েও বেশি করে; কিন্তু জানতে যে আজও পারলাম না, তার জন্য অভিযোগ আমার অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাকে করব বলুন। এতদিন ধরে বাঙলার এত জায়গা ঘুরেও যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল না, তখন আর যে হবে সে আশা রাখিনে। বিশেষ করে— আজ যখন ক্রমেই নিজেকে জানাশোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ভালই হয়েছে— অন্তত আপনার দিক থেকে। আমার দিকের ক্ষতিটাকে আমি সইতে পারব এই আনন্দে যে, আপনার এত শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয়েছে বলে দুঃখ করবার সুযোগ আপনাকে দিলাম না। এ আমার বিনয় নয়; আমি নিজে অনুভব

www.pathagar.com

করেছি যে, আমায় শুনে যাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, দেখে তাঁরা তাঁদের সে শ্রদ্ধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করছি, কাছে থেকে যাঁদের কেবলই ব্যথাই দিলাম, দূরে গিয়ে অন্তত তাঁদের সে দুঃখ ভুলবার অবসর যদি না দিই, তবে মানুষের প্রতি আমার ভালবাসা সত্য নয়।

তাছাড়া নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূরের থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে কেউ খুশি হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে- সূর্যালোক ঘরে আসে তা আলো দেয় কিন্তু চোখে দেখার সূর্য দগ্ধ করে। চন্দ্র-সূর্যকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু তাঁদের পৃথিবী-দর্শনের কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভালোই হয়েছে ভাই, কাছে গেলে হয়ত আমার কলঙ্কটাই বড় হয়ে দেখা দিত।

তারপর শ্রদ্ধার কথা। ওদিক দিয়ে আপনার জিতে যাবার কোন আশা নেই বন্ধু। শ্রদ্ধা যদি ওজন করা যেত, তাহলে আমাদের দেশের একজন প্রবীণ সম্পাদক- যিনি মানুষের দোষগুণ বানিয়ার মত করে কড়া-গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাছে গিয়েই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত! গ্রহের ফেরে তার কাঁচি-পাকি ওজনের ফের আমার পক্ষে কোনদিই অনুকূল নয়; তা সত্ত্বেও আপনিই হারতেন, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

হঠাৎ মুদির প্রসঙ্গটা এসে পড়বার কারণ আছে, বন্ধু! জানেন ত, আমরা কানাকড়ির খরিদ্‌দার। কাজেই ওজন এতটুকু কম হতে দেখলে প্রাণটা ছ্যাঁক করে ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ছাড়া কেউ বুঝবে না; মুদিওয়ালা ত নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে তূল-দাঁড়ি ধরতে দেখলে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তার বাধবে; কিন্তু তা পাঁচসিকে মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়ি-পাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোন আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদ্‌দার। থাক্‌ত বড় বড় মিঞাদের মত সহায়-সম্বল, তাহলে এ অভিযোগ করতাম না।

পায়া-ভারী লোকের ভারী সুবিধে। তা সে পায়া ভারী পায়ে ফাইলেরিয়াগোদ হয়েই হোক্ বা ভারগুণেই হোক। এঁদের তুলতে হয় কাঁধে করে। আর কাছে যেতে হয় মাথাটা ভুঁইসমান নিচু করে। ব্যবসা যারা বোঝে, তারা অন্য দোকানির বড় খদ্দেরকে হিংসা ও তজ্জনিত ঘৃণা যতই করুক, তাঁকে নিজের দোকানে ভিড়াতে তার দোকানের সবটুকু তেল তাঁর ভারী পায় খরচ করতে তার এতটুকু বাধে না। দরকার হলে তার পুত্র ছোটে তেলের টিন ঘাড়ে করে, সাঁতরে পার হয় রূপনারায়ণ নদ, তাঁর ভারী পায়ে ঢালে তেল,— তা সে পা যতই কেন ঘানি-গাছের মত অবিচলিত থাকে। সাথে সে ভাঁড় ও স্তুতিগাইয়ে নিয়ে যেতেও ভোলে না।

যাক এখন এসব বাজে কথা। অনেক কথার উত্তর দিতে হবে।

আমি আপনার মত অসঙ্কোচে 'তুমি' বলতে পারলাম না বলে ক্ষুন্ন হবেন না যেন। আমি

www.pathagar.com

এক পাড়াগেঁয়ের স্কুল-পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরী নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না (পেটে বোমা মারা উপমাটা দিলাম না স্পেশাল ট্রিবিউনালের ভয়ে) যদি বা 'খাজা' বা ইবরাহীম খানকে 'তুমি' বলতে পারতাম, কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। আরে বাপঃ স্কুলের হেড মাস্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজও জলতেষ্টা পেয়ে যায়, আর কলেজের প্রিন্সিপাল, সে না জানি আরও কত ভীষণ! আমার স্কুল জীবনে আমি কখনও ক্লাসে বসে পড়েছি, এত বড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়ে যে "লাষ্ট বয়" হয়ে যেত–সেও দিতে পারবে না। হাই বেঞ্চের উচ্চাসন হতে আমার চরণ কোনদিনই টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছিল। তাই হয়ত আজও বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয়, মাস্টারমশাই হাইবেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি, তাকে আপনি সাধ্যসাধনা করেও 'তুমি' বলাতে পারবেন না, এ স্থির নিশ্চিত।

এইবার পালা শুরু।

বাঙলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনদিন অভিযোগ করেছি বলে তা মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় ত আমি হইনি। অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম!

হিন্দু-লেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহে যে নিবিড় প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তাহলে আমার শরীর মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েজন গোঁড়া হিন্দু-সভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদের আঙ্গুল দিয়ে গোনা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তাছাড়া আজকের সাম্প্রদায়িক মাত্‌লামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ,— আমি যত বেশি অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল– এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুসলমানরা যে আমায় কদর করেননি, এটাও ঠিক নয়। যাঁরা দেশের সত্যিকার প্রাণ, সেই তরুণ মুসলিম বন্ধুরা আমায় যে ভালোবাসা, যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দন করেছেন, তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নীচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবীণদের আশীর্বাদ– মাথার মণি হয়ত পাইনি, কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা, বুকের মালা আমি পেয়েছি। আমার ক্ষতির ক্ষেতে ফুলের ফসল ফলেছে।

www.pathagar.com

এই তরুণদেরই নেতা ইব্‌রাহীম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর, ওয়াজেদ আলি, আবুল হুসেন। আর এই বন্ধুরাই ত আমায় বড় করেছেন, এই তরুণদের বুকে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছেন– প্রীতির আসন! ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুরে যারা তাদের গলার মালা দিয়ে আমায় বরণ করল, তারা এই তরুণদেরই দল। অবশ্য এই তরুণের জাত ছিল না। এরা ছিল সকল জাতি।

সকলকে জাগাবার কাজে আমায় আহ্বান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি– সে শুধু লিখে তা নয়,– আমার জীবনী ও কর্মশক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি– লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোনদিন হয়েছি, এ-বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়। আমার এই দেশ সেবার সমাজ-সেবার 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার দৃষ্টি অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বাজেয়াফ্‌ত হয়ে। এই সে দিনও পুলিশ আবার জানিয়ে দিয়েছে, আমার উপর নব-প্রকাশিত 'রুদ্র-মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি :

> "Behold, I do not give a little Charity.
> When I give, I give myself."
> তাহলে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভুল করবেন না।...

আপনি সমাজকে "পতিত, দয়ার পাত্র" বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত (demoralized) মনে করি– কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়ত হাসছেন, কিন্তু আমি ত জানি, আমার শির লক্ষ্য করে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভাল করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে পচে ওঠে তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়ে ঐ গলিত ঘা সরিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশি হয়ে উঠবার কথা। কিন্তু বেচারি 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র চিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালায় সে-ঘায়ে; রোগী চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার

www.pathagar.com

কর্তব্য করে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা করে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা ছুড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ সেবা হয়ত চলবে না। এই জন্যই আমি বারেবারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এ সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারি নয়। দারিদ্র্য সইবার মত পেট, আর মার সইবার মত পিঠ যদি কারুর থাকে, ত এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা বতাজা'র গান।

আপনি হয়ত আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হতে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মত আমিও ভাবি, আজও ভাবি যে, কে সে ভাগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজো আসেনি। আমি অনেকবার বলেছি– সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী- তাঁরই আগমনী-গান। আমি তাঁরই অগ্রপথিক তূর্যবাদক। আমার মনে হয়, সেই ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে চলেছি– জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর, তবু আমি তাঁর দেয়া তূর্য বাজিয়ে চলেছি। এ-বিশ্বাস কোথা হতে কি করে যে আমার মাঝে এল, তা আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয় কার যেন আদেশ–কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এতদিন তাঁকে খুঁজেছি আমার উর্ধ্বে। তাকে আমারই মাঝে খুঁজতেও হয়ত চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ কথা বলতেও আমার আজ দ্বিধা নেই যে, আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনও মনে হয়েছে কতদিন, যেন আর একটু হাত বাড়ালেই তাঁকে ধরতে পারি।

আপনার "হাত বাড়াবে কি"? কথাটা আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ-হতাশ্বাসে সেই নিশ্চিত শান্তি– যার ধ্যান-লোকে বসে আমি তপস্য-প্রোজ্জ্বল নেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ শান্তি আমার এ জীবনে পাব কি না জানি না; যদি পাই– আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সেদিন।

আপনার কয়েকটি মৃদু অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব এইবার।

আপনি আমার যে দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন, সে-দায়িত্ব আমার সত্যিকার কাব্য সৃষ্টির, না সমাজ সংস্কারের? আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।

"এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুণ্ন থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুটো হয়ে পড়ে"—

www.pathagar.com

এমনিতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বলগা কষে কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হল— এ কথা মানতে আর্টিস্টের হয়ত কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। জানি, ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে হাড়ে চটে, তাঁদের কলম হয়ে উঠবে বাঁশ। এরই মধ্যে হয়ে উঠেছে তাই। তবু আজ এ কথা জোর গলায় বলতে হবে নবীন পন্থীদেরে। এই সমালোচকদের নিষেধের বেড়া যাঁরাই ডিঙিয়েছেন, তাঁদেরই এঁদের গোদা পায়ে লাথি খেতে হয়েছে, প্রথম শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে যেতে হয়েছে।

বেদনা-সুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে বলে নিন্দা করেছে। আর, এরাই দলে ভারী। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুর-তাল-লয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে ও কান্না হাততালি দেবার মত কান্না হল না বাপু, একটু আর্টিস্টিকভাবে নেচে নেচে কাঁদ! সকল সমালোচনার উপরে যে-বেদনা, তাকে নিয়ে আর্টশালারক্ষী— এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চিৎকার হুইটম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।

আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা। 'সর্বহারা' লিখলে বলে– কাব্য হল না; 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট' লিখলে বলে– ও হল ন্যাকামি! ও নিরর্থক শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কি? ও না লিখলে কার কি ক্ষতি হত?

'লিরিক' নাকি 'লভ' এবং 'ওয়ার' নিয়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধ নাই (হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ ছাড়া); কাজেই মানুষের নির্যাতন দেখে তার সেই মর্মব্যথার গান গাইলে এখানে হয় তা 'বীভৎস বিদ্রোহ-রস'। ওটা দিয়ে নাকি মানুষের প্রশংসা সহজ-লভ্য হয় বলেই আজকালকার লেখকরা রসের চর্চা করে।

"আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই"— এ বদনাম সহ্য করতে হয়ত কোনো কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পূজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল— সে সত্যযুগই হবে হয়ত— যখন মানুষের দুঃখ আজকের মতো এত বিপুল হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিপীড়িত হতে লাগল, অমনি সৃষ্টি হল বেদনার মহাকাব্য– রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে সমাজের আজকালকার বেঁড়ে-উস্তাদ সমালোচকদের তথাকথিত "বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র রসের" প্রাধান্য থাকলেও— তা কাব্য হয়নি, এমন কথা কেউ বলবে না।

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপ-স্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়, পুশ্‌কিন, দস্তায়ভ্‌সকি, হুইটম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে; এই ত আমাদের সাধনা।

www.pathagar.com

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি– সে গানে হয়ত রূপ-রঙ ফুটে ওঠেনি আমি ভাল রংরেজ নই বলে;' কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মত নীচতা মানুষের কেমন করে আসে। অথচ এই সব গালাগালির বিপক্ষে কোন প্রতিবাদও ত হতে দেখিনি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে, শত্রু নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার দিনের সূর্য ওদের শরনিক্ষেপে মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বে না– আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্তত আমি ত জানি, আমার এই ত চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই ত সবেমাত্র সেদিন শুরু। আজই আমি আমার পথের দাবি ছাড়ব কেন? ওদের রাজপথে ওরা চলতে যদি না-ই দেয়, কাঁটার পথেই চল্‌ব সমস্ত মারকে সহ্য করে। অন্তত পথের মাঝ পর্যন্ত ত যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে মালা দিয়ে আমায় সাজাল, সে মালার অবমাননা-ই বা করব কেমন করে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই করব– পথে চলার তপস্যা।

'বিদ্রোহী'র জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক বলে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের নিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি— বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে,— যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন- পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রুপার খাপের ঝক্‌মকানিটাকেই দেখাইনি— এই ত আমার অপরাধ। এরই জন্য ত আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল মনে করেই।

যাক্। আগেই বলেছি, এ কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রগতিশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হলে এর চেতনা আসবে না। কুম্ভকর্ণের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বা চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙাবার যে-সব পলিসির উল্লেখ আছে, তা একেবারে মোলায়েম নয়। সেই পলিসিই একবার একটু পরখ করে দেখুকই না ছেলেরা! এতে কি আর এমন হবে! আপনি বলবেন, কুম্ভকর্ণ না হয় জাগ্‌লে ভায়া, কিন্তু জেগে সে যে রকম 'হা'টা করবে, সে 'হা'ত সঙ্কীর্ণ নয়, তখন! আমি বলি কি, তখন কুম্ভকর্ণ তাদেরই ধরে 'জলপানি' করবে, যারা তার ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল।

এতই ত মরেছে, না হয় আরো দু'শটা মরবে! আপনি বলবেন, ভয়ত ঐখানেই, বন্ধু, বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে এগোয় কে? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আসহাব কাহাফে'র মত রোজ কিয়ামত তক্ ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন।

www.pathagar.com

কারুর পান থেকে এতটুকু চুন খসবে না, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না; তেল–কুচকুচে নাদুস-নুদুস ভূঁড়িও বাড়বে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে– এ আশা আলেম সমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।

আমার কথাগুলো 'মরিয়া হইয়া'র মত শুনাবে, কিন্তু বড় দু:খে দেখে-শুনে তেতো–বিরক্ত হয়ে এ-সব বলতে হচ্ছে। তাই ত বলি যে, 'বাবা! তোকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। মরতে হয় ত এদেরই একজনের হাতে মর বেশ একটু হাতাহাতি করে; তাতে সুনাম আছে। কিন্তু ঐ হনুমানের হাতে মরিস কেন? হনুমানের হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভাল।' কথাগুলো যখন বলি, তখন লোকে হাততালি দেয়, 'আল্লাহু আক্‌বর' বন্দেমাতরম' ধ্বনিও করে; কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাইনে।

আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নূতন করে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি–শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন করে গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র পারি ভাঙি-আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর, নাদির সংস্কার-প্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নতুন-পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লী আগ্রা-ময়ূরাসন তাজমহল গড়ে তোলার জন্য। আমার বিদ্রোহও 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন মুক্তের-পূর্ণতম স্রষ্টার।

আপনার 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য না মুসলিম-ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য- রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি: গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি ত স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর। উঠতে পারেও না। তাহলে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। তা আপনি কি চান, তা আমি বুঝতে পারি– কিন্তু সমাজ কি চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ।

তার কাছে এখনও—

www.pathagar.com

"আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবী কর সার।
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার ॥"

রীতিমত কাব্য। বুঝবার কোন কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হলো, মাজাও দুল্‌ল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল! যাক, বাঁচা গেল–কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারি ভবনদীর এ পারেই রইল পড়ে'। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে– মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ রেখে দুলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি– আর এরাই শতকরা নিরানব্বই জন– তারা বলে কমলবন, টমলবন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সেও-ভি আচ্ছা– কিন্তু একেবারে ভবনদীর পারঘাটায় লাগাও নৌকা। এ অবস্থায় কি করব বলতে পারেন? আমি 'হুজ্জতুল ইসলাম' লিখব, না সত্যিকার কাব্য লিখব?

এরা যে শুধু হুজ্জতুল ইসলামই পড়ে, এ আমি বলব না; রসজ্ঞানও এদের অপরিমিত। আমি দেখেছি, এরা দল বেঁধে পড়ছে—

"ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।"

অথবা—

"লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার।
শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার ॥"

আর এই কাব্যের চরণ পড়ে কেদে ভাসিয়ে দিয়েছে। উম্মর উম্মিয়ার প্রশংসায় রচিত—

"কাগজের ঢাল মিঞার তালপাতার খাঁড়া
তার লগির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল হামারা ঘোড়া।"
পড়তে পড়তে আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠেছে।

বিদ্রুপ আমি করছিনে, বন্ধু, এ আমার চোখের জল-মেশানো হাসির শিলাবৃষ্টি। সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তাহলে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি। কিন্তু আমার এ ভালবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কি না কশাঘাত করেছেন সমাজকে;- তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নাই। সংস্কার ত দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দুজাতি যে এক নবতম বীর্যমান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।

www.pathagar.com

আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্ম-জাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ!

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। কিন্তু ইসলামের 'সভ্যতা-শাস্ত্র-ইতিহাস' এ-সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি?

আমার মনে হয়, আমাদের নূতন সাহিত্যব্রতীদল এর এক-একটা দিক নিয়ে রিসার্চ ও আলোচনার দায়িত্ব নিলে ভাল হয়। আগেই বলেছি, নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রার পূর্ণ শান্তি কোনোদিন পাইনি। যদি পাই, সেদিন আপনার এই উপদেশ বা অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা যেন করতে পারি– তাই প্রার্থনা করছি আজ।

আবার বলি যাঁরা মনে করেন– আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ-ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে– তাকে ইসলাম বলে না-মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ-ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে– এ ছাড়া আমার কি বল্‌বার থাকতে পারে?

আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে, হাফেজ-রুমীকে শ্রদ্ধা করেন-এ-ও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদেরে। এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তাহলে মুসলমান কবি দিয়ে বাঙলা-সাহিত্য সৃষ্টি কোনো কালেই সম্ভব হবে না– জৈগুণ বিবির পুঁথি ছাড়া।

বাঙলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরেজি-সাহিত্য হতে গ্রিক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাংলা-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য এতে হিন্দু দেব দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায় হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমান মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু-দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করছি।

কিন্তু বন্ধু, এ কর্তব্য কি একা আমারই? আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার যেমন বিশ্বাস, আপনার উপরও আমার সেই একই বিশ্বাস-একই শ্রদ্ধা। আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না কেন? আমার মনে

www.pathagar.com

হয়, ওদিকে আপনার জুড়ি নেই অন্তত আমাদের মধ্যে কেউ। 'কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার- আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক-লিখিয়ের অভাবও আপনাকে দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথা-সাহিত্যিকের। এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে অথচ কথা-সাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদকের দিক দিয়েও আমরা সবচেয়ে পিছনে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা না-ই-বললাম।

এত অভাবের কোন্ অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু! অবশ্য একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজে– তাতে করে হয়ত কোনোটাই ভাল করে হচ্ছে না।

জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।

আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী করেই না উত্তর দিলাম। ব্যথা যদি দিয়ে থাকি, আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুণ, তাহলে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন– এ বিশ্বাস আমার আছে।

আপনার বিরাট আশা, ক্ষুদ্র আমার মাঝে পূর্ণ যদি না-ই হয়, তবে তা আমাদের কারুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক, আমি কায়মনে এই প্রার্থনা করি।

— কাজী নজরুল ইসলাম

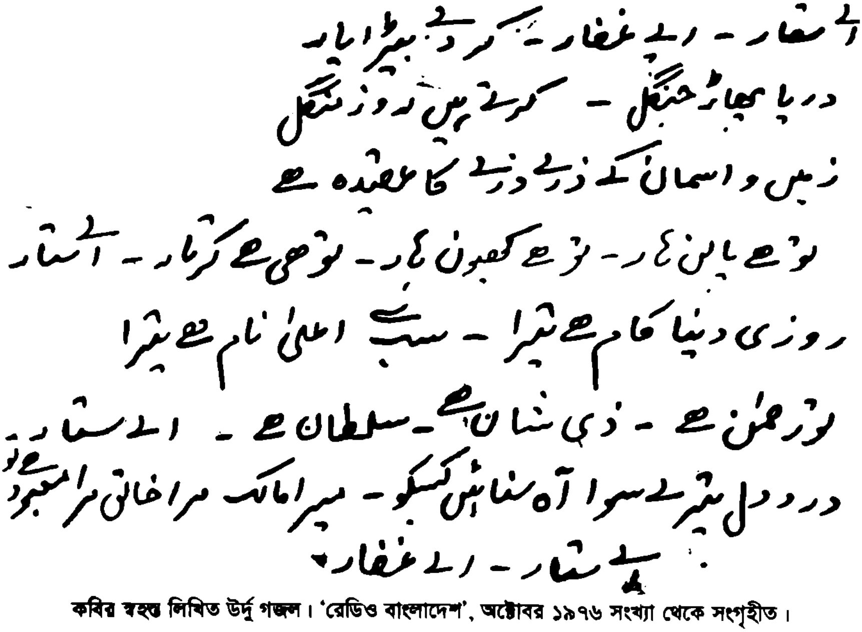
اے ستار - اے غفار - کردے بیڑا پار
دریا پہاڑ جنگل - کرتے ہیں روز شغل
زمیں و آسماں کے ذرے ذرے کا عقیدہ ہے
تو ہے پالن ہار - تو ہے کھیون ہار - تو ہی ہے کرتار - اے ستار
روزی دنیا کام ہے تیرا - سب سے اعلیٰ نام ہے تیرا
تو رحمٰن ہے - ذی شان ہے - سلطان ہے - اے ستار
درد دل تیرے سوا آہ سنائیں کسکو - میرا مالک میرا خالق میرا معبود ہے تو
اے ستار - اے غفار

কবির স্বহস্ত লিখিত উর্দু গজল। 'রেডিও বাংলাদেশ', অক্টোবর ১৯৭৬ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

কৃষ্ণনগরের বাসস্থান 'গ্রেস কটেজে' নজরুল পরিবার। নজরুলের কোলে শিশুপুত্র বুলবুল, বামে শ্বাশুড়ি গিরিবালা দেবী, ডানে কবিপত্নী প্রমীলা বামে বুলবুলের সেবিকা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুল সাহিত্য ও ব্যক্তিত্ব

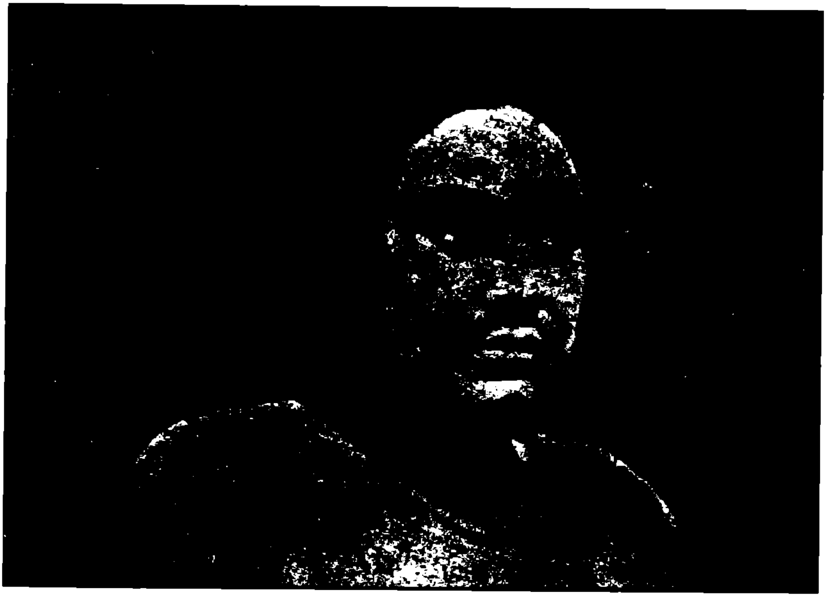

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইস্‌লামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর্ তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল॥
—কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

১৯২৮ সালে সিলেটে গুণমুগ্ধদের সাথে নজরুল

www.pathagar.com

নজরুল-সাহিত্যে বিশ্ব-মানস

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

বিশ্ব-সাহিত্য বলতে বিদগ্ধ মহল এ বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্যকেই মনে করেন। হোমার, বাল্মিকী, ব্যাস, তোবাহ বা ওলড টেস্টামেন্ট, রাজা আর্থারের রাউণ্ড টেবিলের গল্প [King Aurthur and his round table], আরব্য উপন্যাস, শেকসপীয়র, গ্যেটে, তলস্তয় ও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকে বিশ্ব-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ অবদান বলে গণ্য করেন। এ তালিকাকে নিখুঁত বলে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। যেহেতু মানব-জীবনের কোনো শেষ সীমা আজও নির্ধারিত হয়নি এবং ভবিষ্যতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও উন্নততর অবদানের সম্ভাবনা রয়েছে— এজন্য গোঁড়া ভক্তের মতো পণ্ডিতজনের এ সংখ্যাকে সর্বশেষ বলে গ্রহণ করা যায় না। তবে এ নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে তাঁদের বিচারের মানদণ্ড আবিষ্কার করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

কেন এগুলোকে বিশ্বের সেরা সাহিত্য বলে তাঁরা গ্রহণ করেছেন এবং কালের অমোঘ প্রবাহ অতিক্রম করে কেন এগুলো এখনও মানব-জীবনে টিকে রয়েছে— তার অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তাতে মানব-জীবনেরই চিরন্তন রূপ প্রতিফলিত হয়েছে— এবং তাতে সে জীবনের সমালোচনা রয়েছে— এ জন্যে তারা আজও টিকে রয়েছে। হোমার বা বাল্মিকী অংকিত চরিত্রের প্রত্যেকটিই এক একটা প্রতীক [type] এবং তারা মানব-জীবনের এক একটা বিশিষ্ট দিকের প্রতিনিধি। হোমারের অংকিত ট্রয়ের রাজকুমার প্রায়াম দস্যু প্রকৃতির অদম্য দু:সাহসী যুবক। তার বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হেলেনকে জোর-জবরদস্তি করে অপহরণ করেছে। এ অপহরণ করার যে প্রবৃত্তি মানব-মানসে রয়েছে— সেই প্রবৃত্তি তাকে এ অপকর্ম করার প্রেরণা যুগিয়েছে। এজন্য তাকে মানব-মানসে ক্রিয়াশীল দুষ্প্রবৃত্তির প্রতিনিধি বলা যায়। রামায়ণে চিত্রিত রাজা রামচন্দ্রকে তেমনি মানব-জীবনের অপর এক বৃত্তির প্রতিনিধি বলা যায়। তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য চতুর্দশ বৎসর বনবাস ক্লেশ সহ্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন, এবং প্রায়মের মতো পাপাচারী রাজা রাবণের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাকে বধ করেছেন। তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের

www.pathagar.com

ব্যাপারে তিনি ম্যাকিয়াভ্যালীর সেই নিন্দিত নীতি— The end justities the means—লক্ষ্যের যথার্থ দ্বারাই মাধ্যম গ্রহণের সার্থকতা স্বীকৃতি লাভ করে'— গ্রহণ করেছেন। এ নীতির আলোকে রাম ভ্রাতৃ-যুদ্ধে লিপ্ত বালিকে বধ করেছেন। ভ্রাতৃ-বিরোধ বিচ্ছিন্ন বিভীষণের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তেমনি গণ-মানসের সন্তোষের জন্য পতিব্রতা সীতাকেও ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। এজন্য তাকে মানব-জীবনের একটা টাইপ বা প্রতীক বলা যায়। শেকসপীয়রের অংকিত চরিত্রগুলোতে সেরূপ প্রতীকী চরিত্র রয়েছে। হ্যামলেট নাটকের নায়ক রাজকুমার হ্যামলেট আপনার চাচা কর্তৃক নিহত পিতার সংস্রবে আসার কোনো সুবিধা পাননি। পিতৃহন্তা ও বিপিতা চাচার আশ্রয়ে প্রতিপালিত এ কুমার একাধারে প্রেমিক ও দার্শনিক। ছেলে-বেলা থেকেই সন্দেহের বীজ তার মানসে ক্রিয়াশীল। তাই মানব-জীবনের সবগুলো উত্থান পতনকে তিনি যেমন আপাতদৃষ্ট রূপে গ্রহণ করতে পারেননি, তেমনি এ বিশ্বচরাচরের রূপকে তার প্রকৃত রূপ বলে গ্রহণ করতেও তিনি সম্মত হননি। শেকস্‌পীয়রের অপরাপর নাটকগুলোতে তেমনি মানব চরিত্রের এক একটা বিশিষ্ট প্রতীক বিশেষভাবেই ফুটে উঠেছে। অদম্য সাহসের অধিকারী অথচ উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা সকল সময়ই পরিচালিত ম্যাকবেথ তেমনি মানব-মানসের এক অতি উজ্জ্বল প্রতীক। আরব্য উপন্যাসের নায়ক নায়িকারাও তেমনি মানব-জীবনের এক একটা বৃত্তি বা প্রবৃত্তির প্রতীক। অত্যাচারী তথাকথিত খলিফা হারুন-আল্‌-রশীদের শাসনকালে রচিত এ গ্রন্থখানাতে যে সব চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে, তারা সকলেই-প্রতীকী জীবনের পুরুষ ও নারী। সিন্দাবাদ নাবিকের জীবনে যেমন ধন-লিপ্সার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে, এবং তা লাভ করার জন্য তিনি সাত সাগরে পাড়ি জমাচ্ছেন, তেমনি সে ধনকে অতি সহজে লাভ করার প্রতীক হিশাবে দেখা দিয়েছে— আলীবাবা। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্রই সে ধর্ম পালন করছে।

আধুনিককালে যারা বিশ্বের ক্লাসিক হিসাবে গণ্য হয়েছেন, তাদের মধ্যেও এক প্রতীক চিত্রণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মহাকবি গ্যেটে তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য ফাউস্টের মধ্যে একদিকে ফাউস্ট অপরদিকে মেফিস্টোফেলিসের চিত্র অংকিত করে মানব-জীবনের সে আদর্শিক দ্বন্দ্বের সত্যই প্রচার করেছেন। ফাউস্টের জীবনে অবিরাম সে মেফিস্টোফেলিসের সঙ্গে সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছে।

লেভ তলস্তয়ের উপন্যাসগুলোতে তেমনি কতকগুলো প্রতীকী চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর "আনা কারেনিনা" এক হতভাগ্য মহিলার জীবনের করুণ কাহিনী। তিনি তাঁর এক প্রেমিকের দ্বারা প্রলুব্ধা হয়ে গর্ভবতী হয়েছেন—অথচ সে অবস্থায়ও তাঁর উদার হৃদয় স্বামীকে তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত। তবে সামাজিক জীবনে তাঁর স্থান অবশ্যিই অত্যন্ত নীচ পর্যায়ে, 'অধঃগ্রামী' হবে বলে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। "রেজারেকশন" নামক উপন্যাসে মহামতি তলস্তয় তাঁর নায়িকার ক্যটুলা ম্যাসলভাকে অতিশয় পতিত জীবনের মধ্যেও মানবতার এক প্রতীক হিশাবে চিত্রিত করেছেন। মানবতার এ অভূতপূর্ব প্রতীক ম্যাসলভা তাঁর এক অনন্য সৃষ্টি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যেই সে প্রতীকী ধর্মের

www.pathagar.com

রয়েছে অভিব্যক্তি। সেখানে ব্যক্তি-জীবনের যেমন প্রতিক্রিয়ার ফল রয়েছে তেমনি সমষ্টি জীবনেরও প্রতিক্রিয়ার ফল সন্নিবেশিত হয়েছে। জীবনে বিশ্ব-চরাচরের নানাবিধ বিষয়ের ক্রিয়াকলাপের যে প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে তার অভিব্যক্তি রয়েছে— তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এ রচনার প্রেক্ষাপটে যে-সৃষ্টিশীল প্রতিজ্ঞা কার্যকরী তিনি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ। "গীতাঞ্জলী", "গীতিমাল্য" প্রভৃতি পর্যায়ে তিনি বিশ্ব-মানব-জীবনকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন পরম মঙ্গলময় এবং পরম সুন্দর এক অতীন্দ্রিয় সত্তার নিকট। এ সত্তার নিকট নতি স্বীকার এবং তার সত্তায় ব্যক্তি-জীবনের অহংকার ও স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ মানব জীবনে এক আকাঙ্খিত বিষয়। সেরূপ মানব-জীবনের আশা-ভরসা নানা আদর্শিক বিষয়ের কামনা তাঁর বিরাট রচনার মধ্যে বর্তমান। তাঁ রচিত নাটকগুলো যে প্রতীকধর্মী সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। "রক্ত-করবী"র প্রধান চরিত্র নন্দিনী মানব-মানসেরই একটা সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার রূপ নিয়ে অপ্রাকৃত জীবনের ধনমদমত্তের বাসনায় অন্ধ সোনার পুরীতে অবস্থিত জাল ছিঁড়ে তাদের প্রকৃতিস্থ করতে চায়। এতে যে বলিষ্ঠ প্রতীক সৃষ্টির বাসনা প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্ব-সাহিত্য অনন্য।

এ প্রতীক যেমন সর্বসাধারণের জীবনের নানাবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষার হতে পারে— তেমনি মানব-সমাজের মধ্যে উদ্ভুত নানা শ্রেণী, নানান জাতি, নানা কর্মে লিপ্ত মানুষের হতে পারে। যাঁরা মানব-জীবনকে তাঁদের রচনায় এভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁদের রচনার মধ্যে আবার মূল্যবোধও প্রকাশ পেয়েছে। যদিও ধর্মগুরুদের আদেশ-নির্দেশের মতো তা প্রকাশ পায়নি তবুও মানব-চেতনার নানাবিধ বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রতীকগুলোর মধ্যে কোনটার পক্ষে তাদের সহানুভূতি রয়েছে তা অতিশয় কুশলী তুলির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। গভীর রাত্রিতে সমুদ্রের পারে আবির্ভূত রাজা ডানকানের প্রতি, না উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ ম্যাকবেথের প্রতি শেকসপিয়রের সহানুভূতি রয়েছে তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। ম্যাকবেথের স্বগত উক্তিতে তার জীবনের গভীর তলদেশ থেকে উত্থিত নৈতিক চেতনা তাকে যখন ভীষণভাবে আক্রমণ করে পীড়িত করতে থাকে, তখন তার উক্তিতে শেকসপীয়রের মূল্যবোধেরও পরিচয় স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এজন্য বিশ্বসাহিত্যে প্রতীকধর্মী রূপের প্রেক্ষাপটে সৃষ্টিকুশলী সাহিত্যিকেরা কবির যে মূল্যবোধ রয়েছে— তাকে অনস্বীকার্য বলা যায়। মূল্যেরও আবার তারতম্য রয়েছে। এ দুনিয়ার সমাজে মানবতাবাদ ক্রমশই বিকশিত হচ্ছে। কাজেই এককালে যা মানব-জীবনের অবশ্যম্ভাবী রূপে গ্রহণীয় ও সহনীয় ছিলো— বর্তমান কালে তা নেই। অনাগত ভবিষ্যতে আরও উচ্চ-পর্যায়ের মূল্যমান এ দুনিয়ায় অভ্যুত্থিত হ'লে—মানব-জীবনের কার্যকরী নানাবিধ মূল্যমান ম্লান হয়ে যেতে পারে। অনাগত যুগের সাহিত্যে তাই ভালো-মন্দের বিচার আজকের দিনের মতোই হবে–তা বলা যায় না। তবে একথা নি:সন্দেহে বলা যায় মানবতাবাদের বিস্তৃতির ফলে যে পরিবেশে বর্তমান মানব-সমাজ রয়েছে, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে সে সমাজের অধ:পতন হবে না,— হবে আরোহণ। এজন্য অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে এমন

www.pathagar.com

কোনো মূল্যমানের অভ্যুদয় হবে না তার পূর্ববর্তী মূল্যমানকে বিচ্যুত করে মানব-সভ্যতার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে। মানব-জীবনে এমন সব চিরন্তন বৃত্তি ও প্রবৃত্তি রয়েছে যে-গুলোর সন্তোষ বিধানের জন্য মানুষ চিরকালই চেষ্টা করবে এবং তাদের মধ্যে মানব-জীবনের পক্ষে অনুকূল দলের সঙ্গে প্রতিকূল দলের সংঘর্ষ অনিবার্যভাবে দেখা যাবে।

বিশ্ব-সাহিত্যের অপর লক্ষণের মধ্যে পাওয়া যায় স্থান-কাল-জাত-পরিবেশের প্রভাব। হোমারের মহাকাব্যে গ্রীস ও ট্রয়ের যুদ্ধে দেবদেবীগণও যোগদান করেছেন। তেমনি রামায়ণ ও মহাভারতে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে—তাতে মানব-বংশ বহির্ভূত বীরগণ অংশগ্রহণ করেছেন। ধর্মের অংশে যুধিষ্ঠিরের এবং পবনের অংশে ভীমের জন্ম হলেও ইন্দের অংশে অর্জুনের জন্ম। তেমনি অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের অংশে নকুল ও মহাদেবের জন্ম। এরা সম্পূর্ণভাবে দেব বংশ সম্ভূত না হলেও দেব ও মানবের মধ্যবর্তী অতি-মানবিক বংশ সম্ভূত ছিলেন। রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার কল্পে যে-সেনাবাহিনীকে গঠন করেছিলেন— তাতে বানর বংশীয় সৈন্যও যোগদান করেছিলেন। সে-যুগে দেব-দানব ও মানুষে অথবা মানুষ ও পশুতে তেমন পার্থক্য দেখা দেয়নি বলে এরূপ চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যাস অথবা বাল্মিকী কোনো দ্বিধাবোধ করেননি।

তাহলে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে আমরা কতকগুলো লক্ষণ পাচ্ছি। তাতে মানব-মানসের কতকগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তির প্রতীককে কাব্যের বা নাটকের নায়ক-নায়িকারূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। তাতে নানা ব্যবসায় বা কর্মজীবনের পার্থক্য রয়েছে। তাতে যেমন রাজা-মহারাজা রয়েছেন, তেমনি অতিশয় দীন দু:খী মানুষও রয়েছে। তাতে ব্যক্তি-জীবনের এক বৃত্তির সঙ্গে অপর বৃত্তির যেমন সংগ্রাম রয়েছে, তেমনি এক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অপর শ্রেণীর লোকেরও সংগ্রাম রয়েছে। তাতে পরিবেশের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে এবং তার মধ্যে মূল্যবোধের প্রকাশও রয়েছে।

এ মানদণ্ডের আলোকে নজরুল ইসলামের রচনাকে বিচার করলে— তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যিকদের আসনে স্থান দান করা যায় কি না-তা-ই বিশেষভাবে বিচার্য। তবে তার পূর্বে নজরুলের জীবনে যে পরিবেশ কার্যকরী ছিল তাও ভেবে দেখতে হয়। কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি— পরিবেশের ছাপ সকল বিশ্ব-কাব্যেই বর্তমান। নজরুলের জন্ম হয়েছে অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু অভিজাত পরিবারে—পরিবারের মধ্যে তাঁর ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি-চর্চা থাকলেও, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে তাঁকে লেটো দলে বা রুটির দোকানের চাকুরি গ্রহণ করতে হয়েছে। যে-সমাজে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন সে-সমাজের মুসলিমের অবস্থাও তখন অত্যন্ত শোচনীয়। বঙ্গদেশবাসী মুসলিম সমাজ তখন ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে অত্যন্ত দুরবস্থায় অধ:পতিত হয়ে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাবে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী, মুনশী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ নেতাদের দ্বারা পুনর্বার আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তবে জীবনের অধিক সংখ্যক ক্ষেত্রেই তারা অপর সমাজের লোকদের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। কেবল বঙ্গদেশে নয়, ভারতের সর্বত্রই মুসলিম সমাজের

www.pathagar.com

এই একই দশা। গুটিকতক করদ মিত্র রাজ্যের নওয়াব এবং বঙ্গদেশে গুটিকতক জমিদারের সৃষ্টি করে ইংরেজ সরকার বিজিত মুসলিম সমাজকে পদানত করে রেখেছে। কেবল এ উপ-মহাদেশে নয়— সারা বিশ্বেই মুসলিমদের অত্যন্ত হীন অবস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট ভূখণ্ডের মালিক এবং মক্কা মদীনা তথা জাজিরাত-উল আরবের সংরক্ষণকারী তুর্কির সুলতান বলকান যুদ্ধের পরে হৃতসর্বস্ব। পরবর্তীকালে প্রথম মহাসমরের পরে একেবারে নি:স্ব।

দেশের সর্বত্রই রয়েছে অনাচার অত্যাচারের প্রবাহ। ধনী কর্তৃক নির্ধনকে শোষণ সামাজিক জীবনে নির্বিবাদে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আশরাফ আতরাফের ভেদ ধর্মের বিধান বলে গৃহীত হয়েছে। হিন্দু অথবা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সতত বিবাদ বিসংবাদ দেখা দিচ্ছে। কথাকথিত পুরোহিত বা মোল্লা সমাজের লোকেরা এই বিবাদকে ধর্মীয় প্রেরণাজাত বলে প্রচার করছেন। সত্যিকার দেশপ্রেমিক লোকেরা সমাজে কোন স্থান পাচ্ছে না। বাংলা অগ্নিযুগের বিপ্লববাদীদের কঠোর হস্তে দমন করা হচ্ছে। মানবতাবাদের আলোকে তৎকালীন ভারতীয় শিক্ষালয়গুলোতে কোনো শিক্ষাদান করা হচ্ছে না। এরূপ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে মানুষ মানবিক জীবন যাপন করতে পারে না। তার বিরুদ্ধে একমাত্র বিদ্রোহ ব্যতীত অপর কোনো পন্থা নেই। তাই নজরুল তাঁর কাব্য-জীবনের সূচনায়ই এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের গর্জন করেছেন। সে গর্জনের পূর্ণ অভিব্যক্তি 'বিদ্রোহী'তে দেখা দিয়েছে বটে, তবে তার অভ্যুদয় হয়েছে 'শাতিল-আরব', 'মুহররম' প্রভৃতি কবিতায়। এ বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে যে আদর্শ রয়েছে বিদ্রোহের গর্জনের মধ্যেও তার আভাস ও ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তীকালে তা "নতুন চাঁদ" প্রভৃতি কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'বিদ্রোহী'ই নজরুল মানস-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি। তাতে যে বিভিন্ন চিন্তার স্রোত রয়েছে সে স্রোতগুলো তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে নিজের স্বকীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এ পরিদৃশ্যমান বিশ্বভুবনে এবং মানব-জীবনে যত সব বিষয়আশয় রয়েছে এবং তার মধ্যে দ্বন্দ্ব-কোলাহল রয়েছে তাকে জয় করে তা থেকে উত্তরণ ছিলো 'বিদ্রোহী'র লক্ষ্য। এজন্য তাঁর এ রচনার মধ্যে অসংগতি রয়েছে বলে কোনো কোনো সমালোচক মন্তব্য করেছেন। যিনি 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া' বিশ্ব বিধাতৃর বিস্ময় রূপে দেখা দিয়েছেন— তিনিই আবার 'ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম উদ্দাম' রূপে কিভাবে দেখা দিতে পারেন? অথবা তিনি বিষ্ণু বক্ষ হতে যুগল কন্যা কেন ছিনিয়ে আনবেন? তিনি 'জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'ই বা ধরবেন কেন? বা 'অর্ফিয়াসের বাঁশের বাঁশরী'ই হবেন কেন? এ সকল চরিত্রের মধ্যে অধিকাংশ প্রতীক। মানব-মানসে ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ উদ্দাম প্রেমের যে স্থান রয়েছে, তেমনি লক্ষ্মী সরস্বতী নামক যুগল কন্যার অধিকারী বিষ্ণুর প্রতিও হিংসা রয়েছে। তেমনি বিরাট ও বিপুল অগ্নিপাখার অধিকারী জিব্রাইলের প্রতিও রয়েছে। এজন্য তাঁর এসব উক্তিতে অসংগতি দেখা দেয়। এ প্রতিভাসিত জগতের মধ্যে যাতে কোনো অসংগতি বা ভেদাভেদ থাকে না তার জন্যই বিদ্রোহীর এ হুংকার। তবে 'বিদ্রোহী'তেই নজরুল

www.pathagar.com

ইসলামের কাব্য জীবনের নানাবিধ সংকেত থাকলেও এখানেই তাঁর কাব্য-জীবনের ইতি হয়নি। 'বিদ্রোহী'তে প্রকাশিত এক একটা প্রতীক পরবর্তীকালে তাঁর স্বকীয় পরিধির মধ্যে চমৎকার রূপ লাভ করেছে। 'বিদ্রোহী'তে প্রকৃতি-প্রীতি Paganism- এর যে সুর উঠেছে এবং এ বিশ্বের স্থিতি ও ধ্বংসের মধ্যেও তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অবকাশ পেয়েছে তার পরিচয় আমরা পাই :

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা

তার একক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে :

আজ কাশ বনে কে শ্বাস ফেলে যায়
মরা নদীর কূলে
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায়
অড়হরের ফুলে।

মানব-মানসে স্বাশ্রয়ী হওয়ার যে-আদিম প্রবৃত্তি রয়েছে এবং যার প্রকাশ 'বিদ্রোহী'তে জাজ্জ্বল্যমান তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে :

তোমার দণ্ড হস্তেরে বাঁধে কার নিপীড়ন চেড়ী
আমার স্বাধীন বিচরণ কার আইনের বেড়ী
ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে আছে মোর প্রাণ
আমিও মানুষ আমিও মহান
আমার অধীন এ মোর রসনা এই খাড়া গর্দান
মনের শিকল ছিঁড়েছি পড়েছে হাতের শিকলে টান
এতদিনে ভগবান—

[ফরিয়াদ]

আত্ম-সংরক্ষণের উপবৃত্তি হচ্ছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সে আত্ম-প্রতিষ্ঠারই এক রূপ যৌন-বাসনা। এ যৌন-বাসনার প্রকাশ কবির ভাষায় অনুপম রূপ লাভ করেছে :

সখি পাতিসনে শিলাতলে পদ্ম-পাতা
সখি দিসনে গোলাপ ছিটে খাস লো মাথা
যার অন্তরে ক্রন্দন
করে হৃদি মন্থন
তারে হরি চন্দন
কমলী মালা
সখি দিস নে লো, দিস নে লো বড় সে জ্বালা!

www.pathagar.com

আত্ম-প্রতিষ্ঠার উপ-প্রবৃত্তির মধ্যে যুথচারী প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রকটমান। এ প্রবৃত্তিই মানুষকে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভে উদ্বুদ্ধ করে। নজরুলের ভাষায় এ প্রবৃত্তিরই দান সাম্যবাদের প্রকাশ অনন্য :

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রীষ্টান।

[সাম্যবাদী]

ঐতিহ্য-চেতনা থেকেই স্বদেশপ্রেমের সৃষ্টি, সে স্বদেশপ্রেমের মূলমন্ত্র হচ্ছে আপনার দেশ থেকে অপর জাতির শাসন ও শোষণের অবসান। নজরুল স্বদেশপ্রেমের প্রতিনিধি হয়ে বলেছেন :

কাণ্ডারী তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।

যে ঐতিহ্যচেতনার মধ্যে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধও রয়েছে :

জুলফিকার, হায়দরী হাঁক আজও হজরত আলীর
শাতিল আরব, শাতিল আরব জিন্দা রেখেছে তোমার তীর

[শাত-ইল-আরব]

তাঁকে প্রায়ই অপবাদ দেওয়া হয়, তাঁর কাব্যে বা জীবনে কোনো দার্শনিক মতবাদ নেই; সে অপবাদের জ্বলন্ত প্রতিবাদ হিসাবে বলা যায় :

আমার আপনার চেয়ে আপন যেজন
খুঁজি তারে আমি আপনায়
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়—
. . . .
আমারই রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া
যে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারই গলে দুলে হায়।

[আপনি-পিয়াসী, ছায়ানট]

আমার সঙ্গে পরমাত্মার একটা মধুর সম্পর্ক সম্বন্ধে তার বর্ণনা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন :

আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল—

৭—

www.pathagar.com

আমারই আপন দেহ
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির সেহ।

[বন-গীতি]

এ দেহেরই মধ্যে যে প্রাণের ঠাকুর নিত্য তার লীলায় মত্ত রয়েছেন—সে সম্বন্ধে কবি নি:সন্দেহে :

এ দেহেরই রঙ মহলায়
খেলিছে লীলা-বিহারী
মিথ্যা মায়া, এ কায়া
কায়ায় হেরি ছায়া তারি।

[গুল-বাগিচা]

এতে স্পষ্টই বোঝা যায় মানব-মানসের এমন কোনো বৃত্তি বা প্রবৃত্তি নেই যার সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে ত্রুটি করেননি।

এজন্যেই তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যের কবি-সভায় স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে দাবী করা যায়। তবে এখানে একটা বিঘ্ন রয়েছে। যাঁরা ক্লাসিক হিসাবে বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন তাঁদের রচনা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়েছে— রামায়ণ, মহা-ভারত বা ইলিয়ড ওডিসি সমৃদ্ধভাবে গ্রন্থাকারে দেখা দিয়ে আজও রসগ্রাহী মহলে রস পরিবেশন করছে। তেমনি শেকসপীয়রের নাটকগুলোও এখনও মঞ্চে পরিবেশিত হয়ে মানব-চিত্তে নানা সমস্যার সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে নাটকগুলো এখনও অভিনীত হচ্ছে। নজরুল ইসলামের রচনাবলীতে বেশির ভাগ রয়েছে কবিতা ও গান। এগুলো পাঠ ব্যতীত অন্যভাবে পরিবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প। এজন্য তার প্রচার অত্যন্ত সীমিত। তাঁর রচনাকে নাট্যাকারে প্রকাশ করে তার ভাবধারা বিশ্ববাসীর নিকট পেশ করা যায় কিনা— আজকের দিনে এ পরীক্ষা হবে আমাদের কর্তব্য।

আমরা দেখতে পেয়েছি জীবনের এমন কোনো স্তর নেই যার সম্বন্ধে তিনি বিশ্বজনের প্রতিনিধি হয়ে সে সম্বন্ধে আলোকপাত করেননি। তাঁর প্রতিটি কবিতায় মানব-জীবনের কোনো- না কোনো বৃত্তির প্রতীকী রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যে-অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী হয়ে নজরুল এ দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং যে প্রতিভার অপূর্ব ছটায় একদা বাংলা তথা ভারতের কাব্য-গগন আলোকিত হয়েছিলো— তার সম্যক বিকাশ হয়নি। নিদারুণ দারিদ্র্য স্বীয় সমাজের হেনস্থা ও অবহেলা তাতে মহাপ্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিয়েছে। চল্লিশ বৎসর পার হতে না হতে তিনি মানসিক স্তব্ধতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। যদি তিনি দীর্ঘায়ূ হতেন, তা'হলে তাঁর কাছ থেকে এ বিশ্ব আরও অনেক কিছু আশা করতে পারতো। তবুও যা কিছু তিনি দান করেছেন— তাকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে অল্প আয়াসেই উত্তোলন করা যায়।*

* অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়কৃত গ্যোটের তরজমা পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম : একটি নতুন বিবেচনা

সৈয়দ আলী আহসান

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা কবিতার ধারাক্রম পরীক্ষা করলে কয়েকটি বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সকল যুগের কবিদের মধ্যেই অল্প বিস্তর পরিবর্তনসহ এবং অভিব্যক্তিগত পার্থক্যের মৌলিক বিশিষ্টতা একই রকম ছিল। এই বিশিষ্টতাগুলোকে আমরা নিম্নরূপে চিহ্নিত করতে পারি :

ক. ধর্মীয় আদর্শ এবং বিশ্বাস— এক্ষেত্রে উপকরণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে এবং প্রকাশময়তাগত পার্থক্য আছে, কিন্তু মূল তত্ত্বগত কোন পার্থক্য নেই।

খ. আবেগগত বিশেষণ সকল যুগের কবিতার মধ্যেই আছে— কোথাও হয়তো বেশী, কোথাও হয়তো কম।

গ. নাগরিক বৃত্তি এবং গ্রামীণ বোধ সকল যুগের কবিতার মধ্যেই আছে— কোনও ক্ষেত্রে নাগরিক বোধটাই প্রবল, আবার কোন ক্ষেত্রে গ্রামীণবোধ।

ঘ. জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার ব্যবহার সকল যুগের কবিতার মধ্যেই আছে। অবশ্য ব্যবহারগত কৌশলের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। 'চর্যাগীতিকা'য় যেভাবে প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করা হয়েছে, নজরুল ইসলাম সেভাবে ব্যবহার করেননি।

আমরা প্রথমে ধর্মীয় আদর্শের কথাই তুলব। 'চর্যাগীতিকা'য় ধর্মীয় আদর্শ একটি বিশেষ অভিব্যক্তিতে রূপ পেয়েছে। যে কয় শত বছরের মধ্যে 'চর্যাগীতিকা'গুলো রচিত হয়েছিল সে সময় বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণ স্থাপিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোন সংকট সৃষ্টি করেনি। যদিও বৌদ্ধ এবং জৈনগণ সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে মানতেন না, তৎসত্ত্বেও আমরা দেখি যে সে সময়কার বৌদ্ধ এবং জৈনগণ অনেক দেবদেবীকে স্বীকার করে বসেছেন এবং ব্রাহ্মণদের জ্যোতিষ, সামুদ্রিক সমস্ত কিছু মেনে নিয়েছেন। এর অনেক আগে যখন গ্রীক, শক, আভীর, গুর্জর ইত্যাদি জাতি বাইরে থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, সে সময় বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি ছিল। বৌদ্ধদের দ্বারা বহিরাগত জাতিগুলো

www.pathagar.com

স্বাগত হয় এবং সে সময় তারা সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়। যদিও ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে বহিরাগতগণ ম্লেচ্ছ ও যবন বলে চিহ্নিত হত তবুও দেখা যাচ্ছে যে এই সময় বহিরাগতদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন, এঁদের মধ্যে ব্যক্ট্রীয়ান রাজা মিয়ান্দার কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্ট্রিয় তিন-চার শতক শেষ হবার পর দেখা গেল যে ভারতে বৌদ্ধরা ক্রমশ অধঃপতিত হচ্ছে। এর কারণ স্বরূপ রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন বলেছেন যে বৌদ্ধগণ ভারতের কোনও সামাজিক সংস্থার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত রাখতেন না, তাঁরা গৌতম বুদ্ধের সময়কার ধর্মীয় উপাদান নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকতেন। ক্রমশঃ সামন্তদের প্রশ্রয়ে ব্রাহ্মণদের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে এবং আত্মরক্ষার জন্য বৌদ্ধগণ বজ্রমান এবং সহজমানে নিজেদের পরিণত করে নিম্নশ্রেণীর লোকের সমর্থনে বেঁচে থাকবার প্রয়াস পান। যোগ-সমাধি, তন্ত্র-মন্ত্র এবং ডাকিনী-যোগিনীর অলৌকিক রহস্য এবং চমৎকারিত্বের দ্বারা জনসাধারণকে নিজেদের দিকে টেনে আনবার চেষ্টা করেন। কখনও কখনও সিদ্ধাদের বিচিত্র জীবনকথা লোকভাষায় বর্ণনা করে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন। এগুলোকে বলা যেতে পারে দুর্বল ব্যক্তির আত্মরক্ষার অসহায় প্রচেষ্টা। জনতার সামনে জীবন-যাপনের বহুবিধ সমস্যা ছিল, সে সমস্যার চর্চায় অগ্রসর না হয়ে তারা গুহ্য সাধনায় জনসাধারণকে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেন। অবশ্য একটি কথা মনে রাখতে হবে যে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হবার জন্য তাঁরা জনসাধারণের ভাষাকে সম্মান দিয়েছেন। যেখানে ব্রাহ্মণদের ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সুমার্জিত এবং সম্ভ্রান্ত সেখানে বৌদ্ধগণ প্রাকৃতজনের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

বাংলা কাব্যে মধ্যযুগে আমরা রূপকচ্ছলে ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং বিবেচনার পরিচয় পাই। সঙ্গে সঙ্গে আবার মানবিক আবেগের প্রকাশ দেখি। এ সবের সঙ্গে আবার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের আভাসও লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের কবিরা চেষ্টা করেছেন যে, যেভাবেই হোক তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় চৈতন্যকে আনন্দের অর্ঘ্য হিসেবে উপস্থিত করবেন। মধ্যযুগের শেষের দিকে যখন রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য আরম্ভ হল তখন তার মধ্যে আমরা সূফী সাধনার আত্মত্যাগের দর্শন দেখতে পেলাম। আবার সঙ্গে সঙ্গে রূপ-মোহের কথাও ক্রীড়াচ্ছলে বর্ণিত হতে দেখলাম। এক কথায় বলা যায় সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগের কাব্য যেমন ধর্মীয় সাধনার উপকরণকে ধারণ করেছে, তেমনি আবার মানবিক আকাঙ্ক্ষার পরিচিতিকে তুলে ধরেছে।

অনেকটা সময় বাদ দিয়ে আবার এখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসি তখন একই সঙ্গে আমরা আবেগের অধিকার এবং জ্ঞানের অধিকারকে প্রকাশ পেতে দেখি। এসময় কারও কারও মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি বর্ণীকরণ ঘটেছে। এসময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রজ্ঞার মাধ্যমে উদ্ভূত চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তার প্রধান গ্রন্থ 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'। আধুনিক কালের বিবিধ জিজ্ঞাসা তাঁর কাব্যে রূপ পেয়েছিল। কিন্তু মূলের ধর্মীয় বিবেচনাটি কখনও হারিয়ে ফেলেননি— যদিও তার প্রকাশ ছিল শান্ত ও নিমগ্ন।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে আমরা যখন রবীন্দ্রনাথে এলাম তখন তাঁর মধ্যে বিশ্বাসের বিনম্রতাকে পেলাম। 'গীতাঞ্জলি', 'খেয়া', 'গীতিমালা' ইত্যাদি কাব্যের মাধ্যমে তিনি নিবেদনের যে অসাধারণ চিত্র আঁকলেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু প্রশমিত হয়েছিল আবেগের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ের যে বলয় নির্মাণ করেছিলেন তার পরিধি ছিল অশেষ। নানাবিধ উপকরণ নিয়ে বিচিত্র কাব্য কৌশলে তিনি তাঁর বিশ্বাসকে এবং ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছিলেন। অতীতের ধারাক্রমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ছিলেন, কিন্তু কবিতার একটি অনুপম রূপসজ্জায় কবি তাকে প্রকাশ করেছিলেন। মানব জীবনের বিশ্বাস, প্রজ্ঞা এবং আবেগ তাঁর কবিতাকে উজ্জ্বল করেছে।

রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত। ভারতীয় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য তাঁর নখদর্পণে ছিল। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সূত্র ধরে এগুলোর উপর রবীন্দ্রনাথের অধিগম্যতা·গড়ে ওঠে। পিতার সূত্র ধরেই সূফী আদর্শের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গড়ে ওঠে। আবার পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর কৌতূহল এবং আকর্ষণও ছিল প্রচণ্ড। ভিক্টোরিয় যুগের ইংরেজী কাব্যধারা তিনি নিয়মিত পাঠ করেছেন এবং সে সময়কার কবিদের অনেকে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক্ষেত্রে সুইনবার্ন, টেনিসন এবং রসেটির নাম উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় উপমা-রূপকের। যে কারুকর্ম তৈরী করেছেন সেগুলোর মধ্যে এগুলোর প্রভাব ধরা পড়ে। আমরা এক্ষেত্রে শুধু একটি কথাই বলব যে রবীন্দ্রনাথ কাব্য জগতে বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কবিতার উপকরণ, আবেগ, অনুসন্ধান এবং সত্য নির্ণয়ের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী প্রমাণ করে যে কবিতা শুধু আবেগের সৃষ্টি নয়, কবিতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের অহমিকাও প্রকাশ করা যায়। আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি যে আদিকাল থেকে বাংলা কবিতা জ্ঞানের উপঢৌকন নিয়ে নিয়মিত উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এর চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটলো।

রবীন্দ্রনাথের পরে অনন্যসাধারণ প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল ইসলাম প্রথাগত বিদ্যার অধিকার তাঁর ছিল না বললেই হয়। স্কুলের পাঠ তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তাই বিস্মিত হই যখন আমরা দেখি যে তাঁর জানার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথমে যে কবিতাটির দ্বারা নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যক্ষেত্রে পরিচিত হলেন তার নাম 'বিদ্রোহী'। এই একটি মাত্র কবিতাতেই তিনি তাঁর জানার পরিধি যে বিস্ময়করভাবে বিস্তৃত তার প্রমাণ করেছেন। হিন্দু পুরান এবং মহাভারতের কাহিনীকে তিনি এমনভাবে আত্মীকরণ করেছিলেন যে আমাদের মনে হয় এগুলো যেন তাঁর নিজস্ব সত্তার উপলব্ধি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। জন্মসূত্রে তিনি মুসলমান, কিন্তু তিনি হিন্দুদের পৌরাণিক বিশ্বাসের বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণে দেব-দেবী এবং ক্ষমতাবান ঋষি এবং মনীষীদের নামমাত্র উচ্চারণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তাঁদের চারিত্রিক সত্তাকেও উন্মোচন করেছেন। পুরাণের এই ব্যবহার রবীন্দ্রনাথেও আছে, কিন্তু তা গৌণ। কিন্তু নজরুল ইসলামের মধ্যে এগুলো প্রবল এবং প্রত্যক্ষ। ছন্দের বন্ধনের মধ্যে

www.pathagar.com

এবং অনুপ্রাসের উদ্বেলতার মধ্যে পৌরাণিক নামবাচক শব্দকে যেভাবে বৈভবে আচ্ছন্ন করেছেন তার তুলনা বাংলা কাব্যক্ষেত্রে আর নেই। এদিক থেকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র অনুপ্রাসের সাহায্যে এবং ছন্দের স্পন্দনের সাহায্যে পৌরাণিক বিশ্বাস এবং রসাবেশকে বর্তমান সময়ের উপযোগী করে তুলেছিলেন, নজরুল ইসলামও তাই করেছেন। নিম্নে একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রানী– সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য!
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতূর্য
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির উন্নত মম শির!

আবার অন্য দিকে মুসলমানদের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় কাহিনী থেকে বহু উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছেন, যেগুলো শুধু উপকরণ হিসেবে আসেনি, কিন্তু তাৎপর্য বিশ্বস্ততায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন "আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুংকার" অথবা "ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি" অথবা "আমি রুষে উঠে যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া, ভয়ে সপ্ত-নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!" আমাদের বিস্মিত হতে হয় একথা ভেবে, যে বালক শৈশবে গৃহহারা হয়ে বাউণ্ডেলে হিসেবে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং কোথাও স্থির হয়ে বসে জ্ঞান-চর্চার সুযোগ পায়নি এবং যৌবনের উন্মেষে মেসপটেমিয়ার যুদ্ধে যাবে বলে করাচী পর্যন্ত পৌচেছিল, সেই অশিক্ষিত অপরিচিত বালক বাংলা কাব্যক্ষেত্রকে প্রচণ্ড উন্মাদনায় আলোড়িত করল। শুধুমাত্র তাই নয় জ্ঞানের গভীরতায় সে ব্যক্তি তাঁর জানার পরিধিকে অসম্ভব বিস্তৃত করেছিল। আমরা এটুকু মাত্র জানি যে করাচী অবস্থানকালে তিনি উর্দু ও ফারসি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এক মৌলভীর কাছে আরবী পাঠ নিয়েছিলেন। এটাও কিন্তু অল্প সময়ের জন্য। আমরা বুঝতে পারছি যে নজরুল ইসলামের স্মৃতিবোধটি ছিল প্রচণ্ড। তিনি যা পাঠ করেছেন এবং যা শুনেছেন সবকিছুকে স্বীকরণ বা আত্মীয়করণ করেছিলেন বিস্ময়কর ক্ষমতার সাহায্যে। হিন্দু পুরাণ এবং রামায়ন-মহাভারতের পাঠ তিনি নিয়েছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদারের কাছ থেকে। সেগুলোতে কোনরূপ অনুশীলন ছিল না। কিন্তু তিনি যা শুনেছিলেন তাই-ই স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন এবং বলিষ্ঠ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে সেগুলো ব্যবহারও করেছিলেন অবলীলাক্রমে। পাশ্চাত্য সাহিত্যও যে তিনি পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া যায় 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে। সেখানে দেখতে পাই যে তিনি শেলীর কাব্য পাঠ করেছেন এবং বিখ্যাত আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাব্যচেতনাকে গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অনেক কবিতায় ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'অগ্রপথিক' কবিতাটি ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি কবিতার অনন্য-সাধারণ অনুবাদ। 'অগ্রপথিক'কে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছেন যে এটাকে নতুন সৃষ্টি বলে মনে হয় এবং কোনক্রমেই অনুবাদ বলে সাব্যস্ত করা যায় না। নজরুল ইসলামের গ্রহণ করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তাঁর মধ্যে অনুকরণের আভাস নেই, কিন্তু আত্মীকরণের দীপ্তি আছে।

কবি ইয়েট্‌স এক সময় অসাধারণ রোমান্টিক কবিতা লিখেছিলেন। ১৮৯০ এর দিকে এ কবিতাগুলো সৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের কিছু গানে ইয়েট্‌সের কাব্যব্যঞ্জনার কিছু প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গান আছে যেখানে কল্পনার অতিরেক সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ভাব-বিহ্বলতা তৈরী করেছিলেন। গানটির প্রথম দু'চরণ আমার মনে আছে : "ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধু মঞ্জুরি'। এই গানটিতে পুষ্পবিলাস রয়েছে। বধূকে নানাভাবে নানা রকমের ফুল দিয়ে সাজানোর কথা আছে। ঠিক একই বিভূষণের গান আছে নজরুল ইসলামের। নজরুলের গানটি কল্পনার লীলাবিলাসে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। এক অতুলনীয় কল্পনা-বিলাসে কবি তার প্রিয়তমাকে সাজিয়েছেন। গানটি নিম্নে আমি পুরো উদ্ধৃত করছি :

মোর প্রিয়া হবে, এস রানী, দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল॥

কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস সারির দোলানো মালিকা
বিজলি-জরীন ফিতায় বাঁধিব মেঘ-রং এলোচুল॥

জ্যোস্নার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়,
রামধনু হতে লাল রং ছানি' আল্‌তা পরাব পায়।
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব প্রিয়া,
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুলবুল ॥

কবি ইয়েট্‌সের যে কবিতাটির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের গান দুটি রূপ পেয়েছে তার উদ্ধৃতি আমি দিতে পারছি না, কিন্তু বাংলাতে তার ভাবটি আমি তুলে ধরছি। কবি তাঁর প্রিয়তমার জন্য আকাশের উদার বিস্তৃতি কামনা করেছেন, তারকাখচিত নভোমণ্ডলের চাদর খুঁজে আনতে চেয়েছেন যেন তার প্রিয়তমা লঘু সঞ্চারে তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। সোনালী স্বর্ণ এবং রৌপ্যখচিত মহার্ঘ আস্তরণ তিনি তার

www.pathagar.com

পদতলে বিছিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এগুলো কিছুই তিনি দিতে পারছেন না কেননা তিনি একজন দরিদ্র কবি। তাঁর শুধু স্বপ্ন আছে, তিনি সেই স্বপ্ন বিছিয়ে দিয়ে প্রিয়তমাকে বলছেন : "তুমি লঘুপায়ে হেঁটে যাও, কেননা তুমি স্বপ্নের উপর দিয়ে হাঁটছো।" ইয়েট্সের এ কবিতাটি অতুলনীয়। এর কাছাকাছি পৌঁছানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, কিন্তু মনে হয় নজরুল ইসলাম এর কাছাকাছি পৌঁছেছেন। তারকাখচিত যে বৈভবের কথা ইয়েট্স বলেছেন সে বৈভব দিয়ে নজরুল ইসলাম তাঁর প্রিয়তমাকে সাজিয়েছেন। কবির কল্পনাবিলাস যে কত মধুর হতে পারে তা আমরা এই গানের মধ্যে দেখতে পাই।

নজরুল ইসলামের 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থটিতে তাঁর সূফী তত্ত্বজ্ঞানের গভীর পরিচয় আমরা খুঁজে পাই। 'নতুন চাঁদ'-এর 'অভেদম্' কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। এখানে সূফী তত্ত্বের পরম পুরুষকে অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। কবিতাটির প্রথম স্তবক আমি এখানে উদ্ধৃত করছি :

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ!
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যেজন কেবলি রচিছে মায়া!
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল সন্ধ্যা বেলা।
আমরা সকলে খেলি তাঁরই সাথে, তাঁরই সাথে হাসি কাঁদি
তাঁরই ইঙ্গিতে পরম 'আমি'রে শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে 'আমি' ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি-আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।

সূফী দর্শনের এবং বৈষ্ণব রূপাভিব্যক্তির গভীরে প্রবেশ না করলে কারও পক্ষেই অভেদ তত্ত্ব বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। প্রেমের লীলার মধ্য দিয়ে যেখানে পরম পিতা এবং মানুষ একীভূত হয়ে গেছে প্রেমের ব্যঞ্জনায় তারই একটি পরিচয় পাই নজরুলের কবিতায়। সূফী রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব রূপতত্ত্বের গভীরে নজরুল ইসলাম প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই 'অভেদম্' কবিতাটি লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলামের প্রজ্ঞা এবং গভীর কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশব থেকেই নজরুল ইসলাম উদাসী মানুষদের সান্নিধ্য পেয়েছেন এবং তাদের গভীর ইচ্ছাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে আমরা গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ দেখি না, বরঞ্চ এখানে

www.pathagar.com

আমরা সাধনার গভীরে বিলুপ্তির পরিচয় পাই। 'নতুন চাঁদ'-এর আরেকটি কবিতায় সূফীতত্ত্বের গভীর প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটির নাম 'আর কতদিন?'। এর দ্বিতীয় স্তবকটি উদ্ধৃত করছি :

আমি ছিনু পথ-ভিখারিনী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্‌বির,
'তসবি'তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর!
'তশবিহি' রূপ এই যদি তাঁর 'তন্‌জিহি' কিবা হয়,
নামে যাঁর এত মধু ঝরে, তার রূপ কত মধুময়।
কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে
মনে হয় তার স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে ওঠে কুতূহলে।
ঘুম-নাহি-আসা নিঝ্‌ঝুম নিশি-পবনের নিঃশ্বাসে
ফিরদৌস-আলা হতে যেন লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলী জুঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে।

যতদূর মনে হয় নজরুলের দিওয়ান এবং গজল পাঠ করতে গিয়ে সূফীতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। উপরের উদ্ধৃতির মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফিজের মধ্যে যেভাবে তন্ময় হয়েছিলেন, নজরুল ইসলামও সেভাবেই তন্ময় হয়েছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ছিলেন মহাপণ্ডিত, অন্যদিকে প্রথাগত পাণ্ডিত্য নজরুলের ছিল না। নজরুল ইসলামের মধ্যে আমরা উপলব্ধির গভীরতা লক্ষ্য করি। তিনি তাঁর আপন চৈতন্যে সূফী সাধনার মূল রসাবেশটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সূফী তত্ত্ব খুব সহজবোধ্য জিনিস নয়, গভীর উপলব্ধি না থাকলে কোন ব্যক্তিই সূফীদের ধ্যানলোক বা সমাধিকে আবিষ্কার করতে পারে না। সূফীরা বলে থাকেন যে আপনাকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তারা মহাশক্তিকে স্পর্শ করেন। নজরুল ইসলাম বলছেন এই পরম শক্তিই পৃথিবীতে প্রথম ঈদের চাঁদরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। কথাটি রূপক। কবি বলতে চাচ্ছেন প্রকৃতির যে লীলা বৈচিত্র্য এবং আকাশের নক্ষত্র এবং সূর্য যেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, সেগুলোর মধ্য দিয়ে বিধাতা আত্মপ্রকাশ করেন। জীবন যাপনের দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠে কর্মময় জীবন দেখি। নজরুল 'নতুন চাঁদ'-এর একটি কবিতায় 'কেন জাগাইলি তোরা' –এর মধ্যে তাঁর জাগরণের বক্তব্য তুলে ধরেছেন :

www.pathagar.com

মহা সমাধির দিকহারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু
আমারে খুঁজিতে সহসা সে কোন শক্তিরে পরশিনু—
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ—
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাঁদ—
তারি মাঝে কেন ঢাকঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে
ভাঙাইলি ঘুম? চাঁদ যে এখনো ওঠেনি নীল আকাশে।

নজরুল ইসলামের 'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থটি রাসূলে খোদার আংশিক জীবন-কথা। যতটুকু তিনি লিখেছেন সেখানেই তিনি সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে এ হতে পারে যে নজরুল ইসলাম বিবি খাদিজার সঙ্গে বিবাহ পর্যন্তই লিখতে চেয়েছিলেন। এই জীবনী-কাব্যটি সুনিপুণভাবে রচিত একটি আবেগবহুল কাব্য। তিনি ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করে ইতিহাসের ধারাভিত্তিক কাব্য রচনা করেননি, তিনি আবেগের উচ্ছলতা এবং বিনয়ের সম্ভাষণে রাসূলের জীবনকে অবলোকন করেছিলেন। নিবেদনের গভীরতা এবং আবেগের অন্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থটি রূপ লাভ করেছে। প্রথম সর্গের অবতরণিকা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে —

রবি-শশী-গ্রহ-তারা-ঝলমল গগনাঙ্গন তলে
সাগর উর্মি-মঞ্জীর পায়ে ধরা নেচে নেচে চলে।
তটিনী-মেখলা নটিনী ধরার নাচের ঘূর্ণি রাগে
গগনে গগনে পাবকে পবনে শস্যে কুসুম-বাগে।
সে আজান শুনি থমকি দাঁড়ায় বিশ্ব-নাচের সভা,
নিখিল-মর্ম ছাপিয়া উঠিল অরুণ জ্যোতির জবা।
দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া উঠিল জাগর পাখির গানে,
ভুলোকে দ্যুলোকে প্লাবিয়া গেল রে আকুল আলোর বানে
আরব ছাপিয়া উঠিল আবার ব্যোমপথে 'দীন্' 'দীন্'।
কাবার মিনারে আবার আসিল নবীন মুয়াজ্জিন।

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার ধারাক্রমকে লক্ষ্য করে আবেগের সম্ভাষণ যেমন এনেছেন, তেমনি প্রজ্ঞার বিভূষণ দ্বারা কাব্যকে সুশোভিত করেছেন। আবার ধর্মীয় চৈতন্যের বিনম্র সমর্থন কবিতায় স্পষ্ট করেছেন। এভাবেই নজরুল ইসলামকে আমরা পাই বাংলা কাব্য ধারায়। বাংলা কাব্য ধারার স্রোতে যেমন একজন ভাসমান পুরুষ তেমনি আবেগে এবং উচ্ছলতায় একজন অসাধারণ দীপ্ত পুরুষ। নজরুল ইসলাম একজন স্বাভাবিক চৈতন্যের অধিকারী একজন কবি নন, তিনি বলিষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে একজন অসাধারণ চেতনলোকের কবিকণ্ঠ।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম

ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

নজরুল ইসলামের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজ যে সহজাত শ্রদ্ধা পোষণ করে তার একমাত্র বা প্রধান কারণ এই নয় যে, তিনি একজন বড় কবি। তাঁর কবিতা আমরা অবশ্যই কবিতা হিসাবে উপভোগ করি, কিন্তু এই অনুভূতির সঙ্গে এসে মিশ্রিত হয় আর একটা অনুভূতি, যা' সহজে প্রকাশ করা শক্ত। আমাদের অস্থি-মনে যে আত্মসচেতনা রয়েছে, যে আত্মসচেতনতা আমাদের জাতীয়তাবোধের মূলে, তার অনেকটাই নজরুল ইসলামের দান। তাঁর কবিতা, গান, গজলের মধ্যে আমাদের জীবনের গভীরতম এবং সূক্ষ্মতম অনেক অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এর আগে এ কথাগুলো এমন করে কেউ বলেননি বা বলতে পারেননি। অতীত সম্পর্কে একটা গৌরববোধ এবং বর্তমান সম্পর্কে একটা আত্মবিশ্বাস না থাকলে সাধারণত জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারে না। নজরুল ইসলামের যখন আবির্ভাব হলো প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে, তখন বাংলাভাষী মুসলমান সমাজে সংহতির অভাব তো ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে ছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা গভীর হতাশার ভাব। তখন নজরুল ইসলামের মুখে সমাজ শুনতে পেলো এক নূতন বাণী। সে বাণীতে তিনি সমাজের ক্রটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে নির্মমভাবে সমালোচনা করলেন, কিন্তু বজ্র-নির্ঘোষে একথাও বললেন যে, আমাদের বাঁচতে হবে এবং জীবন সম্বন্ধে হতাশ হলে চলবে না।

আমার মনে আছে নজরুল ইসলামের নাম যখন প্রথম শুনি তখন বয়স নয় কি দশ। একজন অশিক্ষিত লোক আমার হাতে নজরুল ইসলামের একখানা বই এনে দিল, বললো, কবিতাগুলো তাকে পড়িয়ে শুনাতে হবে। সে কলকাতায় চাকুরী করত এবং সেখানে নজরুল ইসলামের নাম শুনেছিল। নিজে নিরক্ষর কিন্তু তার পরোয়া না করে বইখানা সে কিনে ফেলেছিলো উৎসাহের আতিশয্যে। সেই বইতেই প্রথম 'কামাল পাশা' আমি পড়ি। সবটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু এই ঘটনাটা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে। শিক্ষিত -অশিক্ষিত আবার বৃদ্ধ-বণিতার মধ্যে নজরুল ইসলাম যে অভূতপূর্ব উৎসাহ এবং অনুভূতির সঞ্চার করেছিলেন সে কথা পরে বড় হয়ে বুঝতে পারলাম —তারই

www.pathagar.com

একটা নমুনার মতো ছেলেবেলার এই ঘটনাটি আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি।

তাই আমি প্রথমে বলেছি যে নজরুল ইসলামের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি শুধু কবি হিসেবেই, একথা বললে সবটা বলা হয় না। কবিতা না লিখলে এ প্রসিদ্ধি তিনি লাভ করতে পারতেন না সত্য, কিন্তু এটা যেন সাহিত্যের অতিরিক্ত একটা কিছু। এবং এই কারণেই সমাজ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও তাঁকে শুধু শ্রদ্ধা করেনি, প্রায় যুগস্রষ্টা হিসাবে হিসাবে সমাদর করেছে। তাঁর অজস্র গান ও গজল পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে লোকের মুখে মুখে। রচয়িতা কে সে জ্ঞানও হয়তো অনেকের নেই। কিন্তু এর সুর এবং শব্দ যোজনার মধ্যে এমন একটা যাদুকরী শক্তি নিহিত যে, প্রথম মহাযুদ্ধের আজ পঞ্চাশ বছর পরও নজরুল ইসলামের খ্যাতি ম্লান হয়নি। এতটা জনপ্রিয়তা আর কোন কবি অর্জন করতে পেরেছেন কিনা বলা কঠিন। তাঁর জনপ্রিয়তা অন্য কবিদের মতো শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এ অনেকটা রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার মতো, সাহিত্যের গন্ডী থেকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত, আমি মনে করি যে, একদিন আমাদের নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার মধ্যে তফাৎ কোথায়, তা স্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে হবে। কিন্তু তাতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁর স্থান অটুট থাকবে বলে আমি মনে করি। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের সাধনার ইতিহাস দীর্ঘ। আলাওলের আমল থেকে আজ পর্যন্ত বহু মুসলমান কবি-সাহিত্যিক বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন। পুঁথি-সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা সর্বজনবিদিত। তবে নজরুল ইসলামই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা বদলে দিতে পেরেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর মানসে ঐতিহ্য-সচেতনার সংগে আধুনিকতার সংমিশ্রণের ফলে। একদিকে তিনি বিদ্রোহী অন্যদিকে ইতিহাসকে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী। শুধু বিদ্রোহ যদি তাঁর প্রধান বক্তব্য হতো, সমাজকে তিনি এতটা নাচিয়ে তুলতে পারতেন না। বিদ্রোহ, সাম্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁর পরে আরো অনেকে কবিতা লিখেছেন কিন্তু তাঁরা কেউ তাঁর মতো জনপ্রিয়তা লাভ করেননি।

এদিক থেকে বিচার করতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, নজরুল ইসলাম একজন মৌলিক কবি। তাঁর এ মৌলিকত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী, তারই অভিব্যক্তি। এর কোনটিকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যের মূল্য ভবিষ্যতে আরো অনেক অগ্রসর হবে এবং মুসলমান সমাজ অনেক পরিবর্তিত হবে। কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের ফলে আমাদের জাতীয় চেতনায় এবং সাহিত্যের ইতিহাসে যুগপৎ যে আলোনের সৃষ্টি হয়েছিলো সেটা একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই অর্থে নজরুল ইসলাম আমাদের যথার্থ পথিকৃত। যতদিন বেঁচে থাকব তাঁর এই দান আমরা ভুলতে পারব না।

www.pathagar.com

নজরুল-কাব্যের পটভূমি

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

কাজী নজরুল ইসলাম যুগ-প্রবর্তক কবি-প্রতিভা। যুগ-প্রবর্তক কবি-প্রতিভার আকস্মিক সবল প্রকাশের স্বরূপ বুঝতে হলে পাঠক-মনের পূর্ববর্তী যুগ-প্রবর্তক প্রতিভার মোহমুক্তি দরকার ; কিন্তু তা কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ। এ কারণে দেখতে পাওয়া গেছে, নজরুল-পূর্ব যুগ-প্রবর্তক কবি-প্রতিভা রবীবন্দ্রনাথের মোহমুগ্ধ পাঠক-সমাজ নজরুলকে বুঝতে না পেরে তাঁর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। এতে অবিশ্যি বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই।

দুনিয়ায় যত যুগ-প্রবর্তক প্রতিভার উদয় হয়েছে, তাঁদের প্রায় সকলের ভাগ্যেই অল্পবিস্তর নিন্দা-গ্লানি লাভ হয়েছে। শেক্সপিয়ার, মিল্টন, কীট্‌স, শেলী, হাফেজ, ওমর খাইয়াম এঁদের প্রায় সকলকে গ্লানি-অনাদার সইতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মাইকেলের আবির্ভাবে প্রাচীনপন্থী কবি-মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনে পাণ্ডিত্যগর্বিত বাঙালী-মহলে যথেষ্ট উষ্মার সঞ্চার হয়েছিল ; আবার রবীন্দ্রনাথের উদয়ে মাইকেল-মোহমুগ্ধ কবি-সমাজের দ্বিতীয় রিপুর উত্তেজনাও কম আত্মপ্রকাশ করে নাই। এ-কারণে নজরুলের অভ্যুদয়ে রবীন্দ্র-মোহমুগ্ধ সাহিত্যিক সমাজে যে একটা অযৌক্তিক চাঞ্চল্যের সাড়া পড়েছিল, তাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু ছিল না।

॥ ২ ॥

নজরুল ইসলাম যখন যৌবনের জয়গান গেয়ে বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন, তাঁর বাণীর অভিনবত্বের বিরুদ্ধে তখন একটা অস্বাভাবিক কোলাহল উত্থিত হল। একদল তাঁর লেখায় অনৈসলামিকতা আবিষ্কার করে শিউরে উঠলেন এবং তাঁকে কাফেরের ফতোয়া দিয়ে তাঁর পরকালের ভাবনায় অস্থির হলেন। অন্যদল নজরুলের লেখায় রবীন্দ্রনাথের অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ-অনুসরণ থাকে বলে নিন্দামুখর হয়ে উঠলেন।

www.pathagar.com

কারণ তখন রবীন্দ্রনাথের বাইরে কোনো সার্থক কাব্য রচিত হতে পারে এ-ধারণা অনেকের ছিল না। সুতরাং নজরুলের আবির্ভাব যতটা অভিনন্দিত হয়েছিল, তার চাইতে বেশী হল নিন্দিত।

কিন্তু কবি হলেন সত্য-শিব-সুন্দরের সাধক। কবির সৃষ্টি সুন্দর হল কিনা, তাতে বিশ্বমানবের কোনো মঙ্গল নিহিত কিনা, এবং কোনো সত্যের দিকে তা অঙ্গুলী-নির্দেশ করছে কিনা, তা-ই হল কাব্য যাঁচাই করার একমাত্র মাপকাঠি। এ-কারণে কাব্যে অনৈসলামিকতার দোষারোপ ধোপে টেকে না। কাব্যে ইসলামের অনুশাসনের ও গরিমার ব্যাখ্যা আছে কি না, ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রমাণিত হয়েছে কিনা, এসবের যাঁরা অনুসন্ধিৎসু, আমাদের মতে, তাঁরা কাব্য পাঠ না করে ইতিহাস পাঠ করলে খুশী হতে পারবেন। বস্তুতঃ ব্যবহারিক জগতে কবি মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান হতে পারেন, কিন্তু কাব্য-লেখক হিসাবে কবি প্রেমধর্মী। কবি বেদ-বেদান্ত, কোরান-হাদিস, বাইবেল-ত্রিপিটকের ভেতর দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান করেন না, সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে সেই চির সুন্দরের অন্বেষণ করেন।

তাই কাব্য-জগতে অহিন্দু, অনৈসলামিক, খৃষ্টান এ-সব কথা আসে না; কাব্য অসুন্দর, অমঙ্গলের কারণ, কিংবা অসত্য কিনা তা-ই নিয়ে মাত্র বিচার চলতে পারে। কাব্য-জগতে ধর্মের বন্ধন যদি থাকত, তবে এক সম্প্রদায়ের কাব্য অপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক পড়তোনা। কাব্য-জগতে এ বিধি-নিষেধের স্থান নাই। কাব্য বিশ্বজনীন সৃষ্টি। তাই মুসলমান কবি শেখ সাদী, খৃষ্টান কবি সেক্সপিয়ার বা হিন্দুকবি কালিদাসের কাব্য সকলে সমভাবেই উপভোগ করতে পারে।

এ-কারণে নজরুল ইসরামের কাব্যসৃষ্টি নিয়ে যে অনৈসলামিকতার ধুয়া উঠেছিল তাকে প্রবুদ্ধ কাব্যোপভোগের ফল বলে সত্যকার কাব্যসমজদারগণ মনে করেন নাই। তবে এ কথা সত্য-শিব-সুন্দরের ধারণা জাগতিক বিধি-বন্ধনের অতীত জিনিস হলেও জগতের নানা গণ্ডিভুক্ত মানুষ নিজ নিজ গণ্ডিগত বিশিষ্ট ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করে থাকে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ পৃথিবীতে যতদিন জাতিভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ থাকবে, ততদিন এই গণ্ডিগত বিশিষ্টতার হাত এড়াবার উপায় নাই। কিন্তু তাই বলে কবিরা তাদের সৃষ্টিতে গণ্ডিকেই সত্য করে তোলেন না ; গণ্ডির ছাপ দিয়ে তাঁরা সে সত্য-শিব-সুন্দরেরই অনুসন্ধান করেন। সুতরাং কবির কাব্যে গণ্ডির অস্তিত্ব খুঁজতে যাওয়া কাব্য-সমালোচনা নয়। গণ্ডির ভেতর দিয়ে গণ্ডির অতীত যে সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনা, কাব্যের সেই চরম লক্ষ্যকেই বিচার করা হয়ে থাকে। তবে মানুষ যেহেতু গণ্ডিগত জীব, এ কারণে গণ্ডিগত বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির ভিতর দিয়েই কাব্যের প্রকাশ অধিকতর সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক হতে পারে।

এই গণ্ডিগত বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির ভেতর দিয়ে কাব্যের মূল লক্ষ্য সত্য-শিব-সুন্দরের অন্বেষণের নিদর্শন নজরুলের রচনায় প্রচুর। কিন্তু ইসলামী প্রকাশভঙ্গির সাথে সাথে

www.pathagar.com

হিন্দুয়ানী প্রকাশভঙ্গির নজীরের প্রাচুর্য এক শ্রেণীর পাঠককে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল যে তাঁরা কবিকে কাফেরের ফতোয়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অবশ্য প্রবুদ্ধ কাব্যসমজদারগণ এদেরকে কৃপার পাত্রই মনে করেছিলেন। কারণ নজরুল ইসলাম কোন্ ভাবের ভাবুক এ কথা তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা এদের ছিল না।

॥ ৩ ॥

নজরুল ইসলাম প্রধানত ঃ বেদনা-সুন্দরের কবি। জগতের নিপীড়িত মানবতার ভেতরে বেদনার যে সার্বজনীন রূপ আছে, তার সুরেই নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যবীণা বেঁধেছিলেন। তাই আর্ত, নির্যাতিত নিখিল-মানবের বেদনার সুর তাঁর কাব্যের ভেতর দিয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। তিনি নিজের পিতৃভূমি বাংলা দেশকে কেন্দ্র করেই এই নিপীড়িত মানবতার গান গেয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ তো শুধু মুসলমানের নয়, হিন্দুরও দেশ। কাজেই বাঙালী-জীবনের বেদনার গান গাইতে গিয়ে যদি তাঁর রচনার প্রকাশভঙ্গির কোনো কোনো স্থলে হিন্দুয়ানীর ছাপ পড়ে থাকে, তা তো কিছুতেই অস্বাভাবিক বিবেচিত হতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'সর্বহারা' কাব্যে 'মানুষ' শীর্ষক কবিতায় চাষার প্রতি একশ্রেণীর ঘৃণা দেখে কবি বলেছেন—

"চাষা বলে কর ঘৃণা!
দেখ চাষা রূপে লুকায়ে জনক-বলরাম এলো কিনা।
যত নবী ছিল মেষের রাখাল তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী—যা আছে রবে চিরকাল।"

এখানে নিপীড়িত চাষীদের বেদনাই কবির লক্ষ্য ; জনক-বলরাম বা নবীদের গুণকীর্ত্তন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বাংলার চাষীশ্রেণীতে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে। বাঙালী হিন্দুদের জন্য জনক-বলরামের কথা এবং বাঙালী মুসলমানদের জন্যে নবীদের উদাহরণ কবি এখানে এনেছেন। এর ফলে চাষীর বেদনা বাঙালীর মনে যে সত্য সহানুভূতির সঞ্চার করেছে কবির প্রকাশভঙ্গি একদেশদর্শী হলে তা নিশ্চয় করতে পারত না। কাজেই যারা জনক-বলরামের উল্লেখ দেখেই কবির অনৈসলামিক প্রকাশভঙ্গিতে বিমুখ হয়ে উঠেন কাব্য-উপভোগের ক্ষেত্রে তাঁরা নিতান্তই হাস্যাস্পদ।

বাংলা কাব্যরচনায় সুষ্ঠু ইসলামী রূপ দেয়ার ব্যাপারে নজরুল ইসলামের কৃতিত্ব অতুলনীয়। তাঁর 'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'শাতিল আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'রণভেরী', 'মহররম', 'সুবেহ উম্মিদ', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম' প্রভৃতি কবিতা যারা পড়েছেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে এমন ইসলামী প্রকাশভঙ্গিযুক্ত চমৎকার কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর নাই—

www.pathagar.com

"আনোয়ার ! আনোয়ার !
সব যদি সুমসাম তুমি কেনো কাঁদো আর?
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার!

আনোয়ার! আর না!—
দিল কাঁপে কার না?
তলোয়ারে তেজ নাই তুচ্ছ স্মার্ণা!
ঐ কাঁপে থর থর মদিনার দ্বার না?
আনোয়ার! আর না!"

এমন ইসলামী রূপায়ণ বাংলাকাব্যে বেশী আছে কি? আনোয়ারকে স্মরণ করে এমন বেদনার বাণী কোন্ কবি এমন অননুকরণীয় ইসলামী প্রকাশভঙ্গিতে বাংলা সাহিত্যে দিতে পেরেছেন? আবার—

"ওরে আয়
ঐ ঝন-নন-নন-রন ঝন-ঝন ঝঞ্ঝনা শোনা যায়!
শুনি ওই ঝঞ্ঝনা-ব্যঞ্জনা নেবে গঞ্জনা কে রে হায়!
ওরে আয়
তোর ভাই ম্লান চোখে চায়,
মরি লজ্জায়
ওরে সব যায়
তবু কবজায় তোর শমশের নাহি কাঁপে আফসোসে হায়?
রণ দুন্দুভি
শুনি খুন খুবি
নাহি নাচে কিরে তোর মরদের ওরে দিলিরের গোর্দায়?
ওরে আয়,
মোরা দিলাবার খাঁড়া তলোয়ার হাতে আমাদেরই শোভা পায়,
তারা খিঞ্জির, যারা জিঞ্জির-গলে ভূমি চুমি মুরছায়।
আরে দূর দূর!
যত কুক্কুর
আসি শের-বব্বরে লাথি মারে, ছি ছি ছাতি চড়ে! হাতি
ঘাল হবে ফেরু-ঘায়!
ঐ ঝন-নন-নন রন-ঝন-ঝন ঝঞ্ঝনা শোনা যায়।"

এমন ইসলামী জোশ, এমন মুসলিম শৌর্যবীর্যের রূপায়ন বাংলার আর কোন কাব্যে আছে? ভীরু বাঙালীর কলমেরও যে এত তেজ, নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগে তা কে কল্পনা করতে পেরেছিল?

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, নজরুল বেদনা-সুন্দরের কবি। মানব-মনের চিরন্তন ব্যথা-বেদনার কথাই নজরুল-কাব্যের উপজীব্য। যেখানেই নিপীড়িত মানবাত্মা বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছে, সেখানেই তিনি তাঁর সবল সহানভূতি নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। কাব্য-রচনার প্রাথমিক যুগে তাঁর প্রতিভাকে চঞ্চল দেখতে পাই। তখনো তাঁর প্রতিভা আত্মস্থ হয় নাই; গভীরভাবে বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে নাই। তাই সে যুগে তাঁর রচনায় বেদনার যে তীব্রতার পরিচয় মেলে গভীর উপলব্ধির পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। তাই তাঁকে কখনো বা আনোয়ার পাশার দু:খে রোদন করতে দেখি, আবার কখনো বা কামালপাশার হাতে অত্যাচারী গ্রীকদের পরাজয়ে উৎকট আনন্দ প্রকাশ করতে দেখি। এর কারণ, তখনো তিনি তাঁর বেদনার কেন্দ্রস্থল খুঁজে পান নাই। কিন্তু পরাধীন স্বদেশের মর্মবেদনাকে যেদিন থেকে তিনি হৃদয়ে বরণ করে নিলেন, সেদিন থেকেই তিনি নিজ প্রতিভাকে আত্মস্থ করবার কেন্দ্র খুঁজে পেলেন। সেদিন থেকে তাঁর বেদনার প্রকাশভঙ্গি তীব্রতা কিছুটা হারালেও গভীরতর হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায়ই আমরা তাঁর এই আত্মোপলব্ধির প্রথম পরিচয় লাভ করি। 'বিদ্রোহী কবিতায়ই নজরুলের কাব্যজীবনের মর্মবাণীর প্রথম প্রকাশ ঘটে। কেন তিনি আনন্দ-সুন্দরের কবি না হয়ে বেদনা-সুন্দরের কবি, 'বিদ্রোহীতে' তার আভাস সুস্পষ্ট।

॥ ৪ ॥

আনন্দের মতো বেদনাও বিশ্বজনীন অনুভূতি। কারণ বেদনা ব্যক্তিগত মনের অভিব্যক্তি হলেও এর অনুভূতি বিশ্ববাসীর মনে সমভাবে বিরাজিত। একজনের ব্যথা দেখে যে অপর একজন হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করে, বেদনার বিশ্বজনীনতাই তার কারণ। এ-কারণে মনের যে অনুভূতি সমগ্র বিশ্বমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা যে বিশ্বজনীন কাব্যরচনার উপযোগী সামগ্রী তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। কাব্যকার যখন ব্যক্তিগত বেদনার অভিব্যক্তিতে বিশ্ববাসীর মনে সহানুভূতির তরঙ্গ তুলতে পারেন, তাঁর রচনার ইন্দ্রজালে যখন মানুষ নিজের ব্যক্তিগত বেদনার কথা ভুলে সমগ্র বিশ্বমনের বেদনার সাথে নিজ মনের যোগ-সাধন করতে পারে তখনি কাব্যকারের রচনা সার্থক হয়— তাঁর রচনা বিশ্বসাহিত্যে স্থানলাভের যোগ্য হয়।

ইংরেজ কবি টেনিসন বন্ধু বিয়োগে in memorium কাব্য লিখে গেছেন। এ তাঁর নিতান্তই ব্যক্তিগত কথা হলেও এতে ফুটে উঠেছে বিশ্বের আত্মীয়-বিয়োগ-বিধুর মানব-মনের চিরন্তন বেদনার কথা। বিশ্বের মানব-মাত্রেরই মন তার কোনো না কোনো আত্মীয়-পরিজনের বিয়োগ-ব্যথায় চঞ্চল। টেনিসন যেই তাঁর বন্ধু-বিয়োগে হৃদয়ের বেদনার কথা কাব্যের সুরে গেয়ে উঠলেন, অমনি তা বিশ্ববাসীর বেদনার তন্ত্রীতে আঘাত করে তার সেই নিজের ব্যথার স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। এইখানেই কাব্যের সার্থকতা। ব্যক্তিগত মনের কথা যখন বিশ্ববাসীর মনের কথা হয়ে দাঁড়ায়, তখনি তা

www.pathagar.com

বিশ্ববাণী বলে গণ্য হয় এবং তার কাব্যের প্রকাশ বিশ্বসাহিত্য বলে বরণীয় হয়। নজরুলের কাব্যে বেদনার এই বিশ্বরূপ আছে বলেই তাঁর কাব্যকে আমরা বিশ্বসাহিত্য বলে অভিনন্দন জানাতে বাধ্য হই। বিশ্বমানবের বেদনার অনুভূতির সাথে অন্তরের বেদনানুভূতির যোগসাধন হওয়ার ফলেই তাঁর রচনার ভেতর বিশ্বসৃষ্টির প্রতি একটা অপূর্ব সাম্যের ভাব ফুটে উঠেছে। তাঁর কাব্যে আমরা উৎপীড়িত আর্তজীবের প্রতি যে একটা সহৃদয় সহানুভূতি দেখতে পাই—যাতে পাপী-তাপী, কুলী-মজুর এমনকি, চোর-ডাকাত, মিথ্যাবাদী, বারঙ্গনা পর্যন্ত সকলের হৃদয়ের দু:খবেদনার ইতিহাস ফুটে উঠেছে—তার কারণই হচ্ছে কবির মনের এই সর্বজীবে সাম্যভাব। সর্বজীবে সাম্যভাব যাঁর কাব্যের মূলকথা, তাঁর রচনাকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায় থেকে নামিয়ে দেওয়ার সাধ্য কারুর নাই বলেই আমাদের ধারণা।

“ওকে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব।
ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।”

কবি চণ্ডাল ও সম্রাটের ভেতরে কোনো পার্থক্য দেখেন নাই, বিধাতার সৃষ্টি–মানুষ হিসাবে সকলেই সমান। ‘কুলী-মজুর’ শীর্ষক কবিতায় আছে—

“দেখিনু সেদিন রেলে
কুলী বলে এক বাবু সা’ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এলো জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধিচীদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা’ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।

জগৎ যাকে অভিশপ্ত বলে ঘৃণা করে এসেছে, সেই বারানাা জাতিও কবির সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় নাই। পাপ ঘৃণাযোগ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু তাই বলে পাপী ঘৃণ্য হবে কেন? সে যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মানুষ! তাই কবি বলেছেন—

“শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পরে মানব জাতির থাকে না কো কোনো গ্লানি!
পাপ করিয়াছ বলিয়া কি নাই পুণ্যের অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ন দেবত্ব দেবতার।”

আর্ত উৎপীড়িত মানব-মনের বেদনা-বোধ থেকেই কবির প্রাণে সহানুভূতির এই মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হয়েছে—যা পান করে বিশ্বমানব ধন্য হতে পারে। মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার দেখে মানবপ্রেমিক কবি বলেছেন—

www.pathagar.com

"সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশি!
একজনে দিলে ব্যথা—
সমান হইয়া বাজে সে-বেদনা সকলের বুকে হেথা!
একের অসম্মান
নিখিল-মানব জাতির লজ্জা—সকলের অপমান।"

মানুষের এই অপমান সম্পর্কে মানব জাতিকে সাবধান করার জন্যে কবি এরপর বলছেন—

"মহা-মানবের মহা-বেদনায় আজি মহা-উত্থান।
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।"

'একের অসম্মানে' যে নিখিল-মানব জাতির লজ্জা, এই পরম সত্যই নজরুল কাব্যসাধনার সর্বত্র ফুটে উঠেছে। তাই তিনি যত অত্যাচারী, স্বার্থপর ভণ্ডদের বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করেছেন! তাই তিনি 'বিদ্রোহী' সেজে সবল কণ্ঠে বলছেন—

"আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

॥ ৫ ॥

নজরুল ইসলাম যে তাঁর পূর্ববর্তী যুগ-প্রতিভাধর-মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের পথ মাড়ান নাই, সেইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব। মাইকেল রামায়ণের কাহিনী নিয়ে তাঁর অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' লিখেছেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সে-যুগের শক্তিশালী কবি হয়েও মাইকেল-কাব্যপন্থা থেকে সরে যেতে সাহস পান নাই। তাই তাঁরা 'বৃত্তসংহার' ও 'কুরুক্ষেত্র' লিখে প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হলেও যুগপ্রবর্তক মৌলিক কবি-প্রতিভার সম্মান লাভ করতে পারলেন না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মোটেই সে বাঁধা পথ মাড়ালেন না। মহাকবি হওয়ার লোভ সংবরণ করে তিনি ধরলেন গীতিকাব্য রচনার নতুন পথ। সীমার মাঝে অসীমের সুর-ঝঙ্কার তুলে তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করলেন। বাংলার কাব্যরসিকরা এই নতুন সুরসুধা পান করে একেবারে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। ভাবের দিক দিয়া

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ এমন উঁচুগ্রামে তাঁর কাব্যবীণার সুর বাঁধলেন যে, মনে হল, তাঁকে অতিক্রম করা একেবারে অসম্ভব—এমনকি তাঁর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে কিছু নতুন সৃষ্টিও সম্ভব নয়।
কিন্তু নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে বাংলা কাব্যে এক নতুন পথ সৃষ্টি করলেন। তিনি মহাকাব্য রচনার পথ যেমন মাড়ালেন না, তেমনি সীমার মাঝে অসীমের সুর বাজাবার ব্যর্থ প্রয়াসও করলেন না। তিনি উৎপীড়িত আর্ত-জীবের মহাবেদনার বাণী রূপ দেওয়ার সাধনায় প্রমত্ত হয়ে কাব্য-জীবনের পত্তন করলেন। বাঙলা সাহিত্যে এ ছিল একেবারে অভিনব। বিশ্বসাহিত্যে এক হুইটম্যান ছাড়া এ পথে তখন আর কাকেও বড় দেখা যায় নাই।
নজরুল ইসলাম অন্তরের প্রেরণাতেই কাব্যসাধনায় এ পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। শৈশব থেকে তাঁর পারিবারিক জীবনে নানা অত্যাচার-অবিচার-জনিত যে বেদনারাশি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল—তা থেকে তাঁর কবিপ্রাণ কাব্যের রসদ যোগাড় করেছিল। এ জন্যেই তাঁর কাব্যসাধনা কবিযশ:প্রার্থী হওয়ার সখের প্রয়াস মাত্র ছিল না—জীবনের নিতান্ত বাস্তব অনুভূতি থেকেই তা শুরু হয়েছিল। আমরা তাঁর রচনায় যে বেদনার আগুন দেখতে পাই তা তাঁর অন্তরের আগুনেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কাব্য সত্যের প্রকাশ, এ কথার প্রকৃত অর্থ যদি হয় কবির আত্মপ্রকাশ, তা হলে নজরুল-কাব্যে কবির আত্ম-প্রকাশের যে সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায়, এমনটি বাংলার আর কোন কবির কাব্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এই কারণেই আমরা নজরুল ইসলামকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক ও বস্তুতান্ত্রিক কবি বলে অভিনন্দিত করি। তিনি সর্বত্রই নিজের অন্তরের বাণীর অনুসরণ করে কাব্য-জগতে তাঁর অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

www.pathagar.com

নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ

সৈয়দ আলী আশরাফ

আমার উদ্দেশ্য নজরুলেব কাব্য বিচার নয়; আমার উদ্দেশ্য নজরুল তাঁর কাব্যে যে-সমস্ত আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন তার প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা এবং সেই ব্যবহারের ফলে তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, না ব্যাহত হয়েছে, তা বিবেচনা করা। আধুনিক বাংলা কাব্যে নজরুলের পূর্বে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। তবে নজরুল ইসলামই প্রচুর পরিমাণে এসব শব্দ ব্যবহার শুরু করেন। মোহিতলাল আর সত্যেন্দ্রনাথ এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন বিশিষ্ট মুসলমানী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। নজরুল মুসলমানী পরিবেশ ছাড়াও সাধারণভাবে প্রায় কবিতায়ই দু'চারটে অপ্রচলিত ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত বলছি বিশেষ ক'রে এই কারণে যে, বাংলার মুসলিমরা চিরকালই তাদের কথ্যভাষায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুরাও যে তা করতেন, তার প্রমাণ পাই 'আলালের ঘরের দুলাল' -এর ভাষায়। বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার শুরুতে হিন্দু পণ্ডিতদের ও মার্শম্যান এবং কেরীর প্রচেষ্টায় এসব শব্দকে সাহিত্য-গণ্ডীর বহির্ভূত করা হয়। বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম অভিধান রচয়িতা ডাব্লিউ কেরী তাঁর 'Dictionary of the 'Bengali Language' এর ভূমিকায় বলেছেন যে, বাংলা ভাষার শতকরা নব্বই ভাগ শব্দই সংস্কৃত-জাত। তাঁর অভিধানে আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বাংলা গদ্যে ও পদ্যে আরবী-ফারসী শব্দ বর্জন করার ফলে আমরা দেখতে পাই, যে বাংলা ভাষা শিশুকাল থেকে আমরা শিখি তা আরবী-ফারসী শব্দ বর্জিত। ফলে কায়কোবাদের মতো কবিও বলেছেন যে, তিনি 'শুদ্ধ বাংলা' লিখতেন বলে হিন্দুদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

বাংলা কাব্যে সত্যেন দত্ত ও মোহিতলাল এসব শব্দ ব্যবহার করলেও নজরুলই প্রথম ব্যাপকভাবে তাঁর কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার শুরু করেন। কিন্তু প্রচুরভাবে আরবী-ফারসী শব্দ তিনি আমদানী করেন নি। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দাহাম' কামাল

www.pathagar.com

পাশা' ও 'মহরম' ছাড়া প্রচুর প্রয়োগ তাঁর অন্য কোনা কবিতায় নেই। 'সঞ্চিতা'র সবগুলো কবিতা পড়ে গেলে দেখতে পাই যে, নজরুলের ভাষা ও ভাবধারায় হিন্দু প্রভাবই প্রবল। সাধারণভাবে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করলেও, নিজস্ব মনোভাবও অনুভূতিপ্রকাশের জন্য তিনি আশ্রয় খুঁজছেন হিন্দু উপকথা থেকে সংগৃহীত উপমা ও চিত্রে, তিনি সাহায্য নিয়েছেন সাধারণ হিন্দু সমাজের এবং এই শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজের ভাষার অর্থাৎ কায়কোবাদের সেই 'শুদ্ধ' ভাষার। তাঁর প্রথম যুগের কাব্যে তা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। সম্পূর্ণ 'পূজারিনী' কবিতায় দু'টি মাত্র আরবী-ফারসী শব্দ পেয়েছি এবং তার একটি শব্দ বাংলা ভাষায় এত প্রচলিত যে, এর উৎসস্থল অন্য ভাষায় আছে বলেই আমাদের মনে হয় না। শব্দটি হচ্ছে 'আরাম'। অপরটি হচ্ছে 'বে-দরদী'। আরবী-ফারসী ব্যবহার না করাতে কাব্যের কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু এই অব্যবহারের ফলে নজরুল-মানসিকতার একদিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে- সে হচ্ছে তার হিন্দু উপকথার পরিবেশে স্বচ্ছন্দ বিহার। লায়লী-মজনু শিরী-ফরহাদের কথা তাঁর মনে এলো না, এলো বিরহিনী রাই, ললিতা আর তাপসিনী উমার কথা।

'বিদ্রোহী' কবিতাটিই ধরা যাক। মুসলিম জীবন ও ঐতিহ্যবোধক মাত্র নয়টি শব্দ রয়েছে –'আরশ' 'বেদুঈন' 'চেঙ্গিশ' 'ইস্রাফিল,' 'জিব্রাইল' 'অফিয়াস' 'হাবিয়া দোজখ' এবং জাহান্নাম'। অথচ হিন্দু উপকথা থেকে রয়েছে তিরিশটি উপমা। প্রায় প্রত্যেক কবিতা থেকেই এ তথ্য সংগ্রহ করা চলে। অনেক কবিতা রয়েছে যাতে মুসলিম ঐতিহ্যের চিহ্নও নেই, অথচ হিন্দু ঐতিহ্যবাহী উপমা ও চিত্র প্রচুর রয়েছে। 'পূজারিনী' ছাড়াও 'অভিশাপ,' 'অ-বেলার ডাক', বিজয়িনী' এবং নজরুলের দু'টি প্রধান কবিতায় –'সিন্ধু' ও দারিদ্র্যে' –মুসলিম ঐতিহ্যবোধক শব্দের সম্পূর্ণ অভাব।

তজ্জন্য মনে হয়, নজরুলের প্রথম জীবনের কাব্যে হিন্দু-উপকথার-রাজ্য উপমা ও চিত্রচয়নের পক্ষে সহজলভ্য ছিল। এ ছিল তার পক্ষে সহজ, স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত। মুসলিম ঐতিহ্যের রাজ্যে তাঁর সহজ ভ্রমণ দেখি তাঁর শেষে-জীবনের কাব্যে।

এই ঐতিহ্য নজরুল-কাব্যে স্থান পেয়েছে দু'ভাবে —দু'জায়গায়। প্রথমত: মুসলিম জীবনের ঘটনা-বর্ণনে অথবা মুসলিম ইতিবৃত্ত থেকে রূপাঙ্কনে পরিবেশ সৃজনের জন্য যথেষ্ট আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত: মুসলিমদের ঘরে ঘরে যেসব শব্দ প্রচলিত অথচ হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত —এমন অনেক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন স্বাভাবিক যে কোনো অনুভূতি প্রকাশের জন্য, যেমন 'পানি', 'তুফান' 'দরদী' 'যবেহ' 'আতসী' 'সেরেফ্'।

প্রথম রকমের শব্দ-ব্যবহার রীতি দেখি 'ঈদ-মোবারক, 'আয় বেহেশতে কে যাবে আয়', 'নওরোজ', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'ফাতেহা-ই-দোহাজ-দাহম,' 'মহরম'- ইত্যাদি কবিতায়। পরিবেশ সৃজন, কবির কল্পলোক-রূপায়ণ ও অবস্থানুযায়ী অনুভূতি সঞ্চারের জন্য এসব শব্দ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—

www.pathagar.com

যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্ঢা পীর,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুর-পরীর
শরাব-সাকীর গুলিস্তায়।
আয় বেহেশতে কে যাবে আয়।

'বুঢ্ঢা পীর' কথাটিতে শুধু বৃদ্ধত্বেরই নয়, পীরালিরও ইংগিত রয়েছে। এ শব্দ দু'টি মুসলিম-মানসে যে ভাবের ঢেউ খেলিয়ে তোলে তা 'বুড়ো পুরোহিত' কথাটি কিছুতেই জাগায় না। সাধারণ মুসলিমের ধারণা, পীরের হাতে হাত রেখে বয়েৎ হলেই বেহেশতের পথ তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। নজরুল সে ধারণাকে সরাসরি মিথ্যা না বললেও একথা স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তার বেহেশতে প্রবেশের জন্য পীরের প্রয়োজন নেই, পীরই সে বেহেশতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত। 'শরাব-শাকির গুলিস্তায়' —এই বাক্যাংশ যে চিত্রাঙ্কন করে তা যুগ যুগ ধরে ইরানী কবিদের মারফৎ মুসলিম মানসের অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তি হয়ে রয়েছে। শরাবের সংগে রয়েছে ইরানী আঙ্গুরের যোগাযোগ ও ওমর খৈয়ামের সম্পর্ক। সাকীর সৌন্দর্য, মনোমুগ্ধকারিতা এবং সুমিষ্ট হাসি হেসে শরাব বন্টন, তার হাতের সোরাহিতে শরাব, তার চারপাশে মৌ-লোভী সরাইখানার শারাবী দল আর সেই সঙ্গে গুলিস্তার বিচিত্র অপার্থিব সৌন্দর্য। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে-মুসলিম বেহেশতে শরাবান্-তহুরা পান করতে দেওয়া হবে জান্নাতবাসীদের। ফলে এই বাক্যাংশ এক বিশেষ কল্পলোক সৃজন করে, সে কল্পলোক অবাস্তব হলেও তা এই কবিতার জন্য সত্য এবং কবির কল্পিত বেহেশ্‌ত হিসেবে আমাদের জন্যও সত্য। 'গুলিস্তা' না বলে 'গুলবাগ' বললে এই কল্পলোকের দূরত্ব ও স্বপ্নময়তা ততদূর বজায় থাকত না, কারণ 'গুলিস্তাঁ' শব্দটি বাঙালী পাঠকের নিকট সাদীর 'গুলিস্তা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় —সুতরাং সহজেই আমরা সাদীর 'গুলিস্তা'র জগতের সঙ্গে নজরুলের 'গুলিস্তাঁ'র তুলনা করে এর বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই।

তাই দেখতে পাই, শুধু পরিবেশ-সৃজনের জন্যই কবি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেননি —কবির কল্পলোককে আমাদের কাছে সত্যভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং সেই কল্পলোক যে অনুভূতি প্রেরণায় জেগে উঠেছে সে অনুভূতি সঞ্চারের জন্য কবি এইসব অধুনা অপরিচিত আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং সেই একই কারণে নজরুল বাংলা কাব্যে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে অপ্রচলিত ফারসী বা উর্দু থেকে কতকগুলো শব্দ নতুন আমদানীও করেছেন। এসব নতুন আমদানীও উপরোক্ত কারণে অন্যায় হয়নি। ধরুন এ লাইনটি—

মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ্দম হ্যায় হর্দ্দম ভরপুর মদ

www.pathagar.com

'হ্যায়' শব্দটি পুরাপুরি উর্দু –বাংলাতেও চলেও নি, চলবেও না, কারণ এ শব্দটি হচ্ছে ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়াপদের দ্বারাই প্রধানত: এক ভাষা অন্যভাষা থেকে পৃথক। এখানে কবি অন্য ভাষা ব্যবহার করেছেন বলা যেতে পারে। এবং সে ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতা খুঁজে পাই তাঁর অনুভূতির বৈশিষ্ট্যে। এ যেন মস্‌ত্‌ হয়ে জোর গলায় উর্দু বলে ওঠা —যেমন অনেকে রাগ হয়ে হঠাৎ উর্দুভাষী বনে যান। সে হিসাবে এ ব্যবহার স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়। 'হ্যায়'-এর বদলে এখানে যদি 'আছে' ব্যবহার করতেন তবে 'হর্দ্দম আছে হর্দ্দম ভরপুর মদ' কথায় মত্ত হয়ে ওঠার ভাবটি পরিস্ফুট হ'ত না। ঠিক একই প্রতিভার লক্ষণ দেখি 'মোহরম' কবিতার প্রারম্ভে—

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া,
'আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।'

দ্বিতীয় পংক্তিকে কেউ বাংলা বলবে না— এ খাঁটি উর্দু! কিন্তু এর ব্যবহার কারবালার সুদূরত্ব আমাদের মনে জাগ্রত হয়। কোন্ অতীত জামানার কোন্ দূর দেশে কান্নার রোল উঠেছে —তাই-ই হাওয়ায় এসে আমাদের কানে লাগছে। তারই জন্য উর্দু হলেও একে স্বাভাবিক বলে মেনে নিঁ।

এই পরিবেশ-সৃজনের খাতিরে অনেক সময়ই একই কবিতায় নজরুল আরবী-ফারসী শব্দহীন নিখুঁত সংস্কৃতজাত বাংলা থেকে আকস্মিকভাবে আরবী-ফারসী বহুল বাংলাতে গতি পরিবর্তন করেছেন। 'মানুষ' কবিতায় পূজারীর সংগে ভিক্ষুকের সাক্ষাৎকার বর্ণনায় লিখছেন—

জীর্ণ বস্ত্র, শীর্ণ গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ—
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোল বাবা, খাইনি ক সাতদিন'!

আবার মৌলভীর সংগে মুসাফিরের সাক্ষাৎ বর্ণনায় বলছেন—

এমন সময় এল মুসাফির, গায়ে আজারির চিন্।
বলে, 'বাবা আমি ভুখাফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন।

প্রথম উদ্ধৃতিতে একটিও আরবী-ফারসী শব্দ নেই, দ্বিতীয়টিতে তিনটি শব্দ বাংলা ভাষায় স্বল্প ব্যবহৃত; কিন্তু মুসলিম সমাজে অতি পরিচিত।

পরিবেশ-সৃজন ছাড়াও নজরুল সার্বজনীন অনুভূতি প্রকাশের জন্য অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণত: হিন্দু সমাজে প্রচলিত নয়। 'পাপ' কবিতার প্রথম কয়েকটি পংক্তি নিলেই তা স্পষ্ট হবে—

সাম্যের গান গাই—
যত পাপী-তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।

www.pathagar.com

এ পাপ-মুলুকে পাপ করেনিক কে আছে পুরুষ-নারী?
আমরা ত ছার; —পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী।
তেত্রিশ-কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল।
দেবতার পাপ পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর-দল।
আদম হইতে শুরু ক'রে এই নজরুল তক্ সবে
কম বেশী করে পাপের ছুরীতে পুণ্য করেছে জবেহ্।

'পাপ-মুলুকে' না ব'লে 'পাপ-জগতে' হয়ত বলা যেত, কিন্তু যে ঘৃণার ভার 'মুলুকে' শব্দটি দিয়ে প্রকাশ পায় তা সম্ভব হত না। 'পাপ-মুলুকে' বলার সংগে সংগেই 'মগের মুলুকে'র কথা মনে জেগে ওঠে এবং মগের মুলুকের বিশৃঙ্খলার সংগে এ পাপ-মুলুকের বিশৃঙ্খলার সামঞ্জস্য খুঁজে পাই। 'জবেহ্' কথাটির পেছনে এ যুক্তি নেই, তবে নজরুল বোধ হয় বিশেষ করে মিলের খাতিরেই এটা ব্যবহার করেছেন।
এই শেষোক্ত ধরনের ব্যবহার আমরা নজরুলের অন্যান্য কবিতায়ও পাই। হয়ত সংস্কৃতজাত বা পরিচিত বাংলা শব্দ দিলেও চলে, কবি সেখানে ব্যবহার করেছেন স্বল্প-পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ। যেমন 'চাঁদনী রাতে' কবিতায়—

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া।
তৃতীয়া চাঁদের বাকী 'তের কলা' আবছা কালোতে আঁকা
নীলিম-প্রিয়ার নীলা 'গুল্‌রুখ' অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী
সেহেলী "লায়লি" দিয়ে গেছে চুপে কুহেলী মশারি টানি।

কিন্তু 'চাঁদনি রাতে' কবিতায় এই শব্দ ব্যবহার-রীতি বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না, কারণ কবির কল্পনা ও অনুভূতি এ কবিতায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি। অন্যান্য অনেক কবিতা রয়েছে যেখানে আরবী-ফারসী শব্দ যে চিত্র ও মেটাফর সৃষ্টি করছে তা কবি-কল্পনার অবিসম্বাদিত ক্ষমতার পরিচায়ক যেমন 'মানুষ' কবিতায়—

খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা!
সব দ্বার এর খোলা র'বে, চালা হাতুড়ী শাবল চালা!
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।

www.pathagar.com

এখানে 'খোদার' ও 'মিনারে' শব্দ দু'টি আমাদের কাছে অযৌক্তিক মনে হয় না, বরঞ্চ একান্ত প্রয়োজন মনে হয়। 'খোদার' শব্দের বদলে 'পূজার' বল্লে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু 'খোদার' বলাতে আপত্তির কোনো কারণ নেই। বরঞ্চ 'খোদার ঘর' বলা হয় মসজিদকে। সুতরাং 'খোদার ঘর' বলার পরে 'মিনারে চড়ার' উপমা অত্যন্ত সংগত হয়েছে। মিনারে চড়ে এখন স্বার্থপূজার জন্য আহ্বান জানান হয়।

দু'একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম। নজরুল আরবী-ফারসী শব্দের এই অকারণ ব্যবহার আরো বহুবার করেছেন। কিন্তু এ কথা সত্য বাঙালী হিন্দু-সমাজে এসব শব্দ অপ্রচলিত হ'লেও বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে এরা একেবারে অজ্ঞাত নয়, যদিও অনেক শব্দ রয়েছে যা আন্‌কোরা আমদানী —যেমন 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দাহাম' কবিতায়—

নাই তাজ!
তাই লাজ?
ওরে মুসলিম খর্জ্জুর-শির্ষে তোরা সাজ
করে তসলিম হর কুর্নিশে শোর আওয়াজ

অথবা,

মরুসাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ!

আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য দেখিয়েছি! এর আরও একটি দিক আছে। সে হচ্ছে নজরুলের আরবী-ফারসী শব্দ ও মুসলিম ঐতিহ্যবাহী শব্দদ্বারা বিচিত্র সংগীত সৃষ্টি করা। সংস্কৃতজাত শব্দ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক সম্পদ, তজ্জন্য আরবী-ফারসী শব্দের নতুন আমদানী খাপছাড়া এবং অস্বাভাবিক ঠেক্‌তে পারে। নজরুলের কৃতিত্ব হচ্ছে সংস্কৃতজাত শব্দের সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের সহজ প্রচলনের ব্যবস্থা করার! দু'এক জায়গা ছাড়া নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। এর প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমত:, কবি সংস্কৃতজাত শব্দের সংগীতের সংগে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত:, ছন্দ ও অনুভূতির তীব্রতায় ভাষার বৈষম্য আমাদের নজরে পড়ে না।

প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ স্বরূপ 'চিরঞ্জীব জগলুল'—এর প্রথম কয় পংক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রাচীর দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির-রাতে
মেসেরের শের, শির, সমশের —সব গেল এক সাথে।
সিন্ধুর গলা জড়ায়ে কাঁদিছে —দু'তীরে ললাট হানি'
ছুটিয়া চলিছে মরু-বকৌলি 'নীল' দরিয়ার পানি!
আঁচলের তার ঝিনুক মাণিক কাদায় ছিটায়ে পড়ে,
সোঁতের শ্যাওলা এলোকুন্তল লুটাইছে বালুচরে।

www.pathagar.com

মরু 'সাইমুম' —তাঞ্জামে চড়ি' কোন পরীবানু আসে ?
'লু'হাওয়া ধরেছে বালুর পর্দা সম্ভ্রমে দুই পাশে।

অথবা 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় :

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।

আবার 'চল্ চল্ চল্' কবিতায় :

ঊর্দ্ধে আদেশ হানিছে বাজ
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচকাওয়াজ
খোলরে নিদ্-মহল!
কবে সে খেয়ালি বাদশাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল।

'চল্ চল্ চল্' কবিতায় আমরা দ্বিতীয় কারণটিরও সন্ধান পাই। ছন্দের বিশেষ দোলায় যে ভাব-তরংগ জাগ্রত হয়, তার প্রভাবে আমরা আরবী-ফারসী শব্দ সহজেই গ্রহণ করি। ছন্দের বেগবান গতিসঞ্চার নজরুলের ভাষার অনেক ত্রুটিবিচ্যুতিও এই একইভাবে ঢেকে ফেলে। ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিলেও দেখতে পাই, নজরুল যে ছন্দ ও ভাষাঝংকার সৃষ্টি করেছেন আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার দ্বারা সেই ঝংকার বিশিষ্টভাবে নজরুলের। এবং আরবী-ফারসী শব্দের ঝংকার তাঁকে আরো বিশিষ্টতা দান করেছে। বোধ হয়, এই বেগ ও আবেগ সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই নজরুল পয়ার ছন্দে লিখিত কবিতায় বিশেষ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেননি। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে করেছেন।
সর্বশেষে নজরুলের আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের আর একটি দিক উল্লেখ করেই আলোচনা শেষ করব। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহু শব্দ রয়েছে যা নজরুলের পূর্বে কেউ ব্যবহার করেননি, নজরুলের পরেও আজ পর্যন্ত তার স্বার্থক ব্যবহার হয়নি। 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়' কবিতায় কবি যে জগৎ কল্পনা করেছেন তার সত্য হচ্ছে কাল্পনিক, বাস্তবিক নয়। কিন্তু 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় কবি মুসলিম সমাজের সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনায় যে-সব আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন তা আমরা ঘরে ঘরে দৈনিক ব্যবহার করি।

www.pathagar.com

'ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হ'ল মাৎ।
'গিন্নি-পাগল' চালের ফিরণী
তশ্‌তরী ভ'রে নবীনা গিন্নী
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশীতে কাঁপিছে হাত
শিরনি রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেস্‌মাত।

নজরুল—পূর্ব বাংলার মুসলিম কবিদের জন্য যথেষ্ট ইংগিত রেখে গেছেন। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা সেই ইংগিতই দেখতে পাই। মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভাষার সাহায্যে মুসলিম মানসের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা নজরুল করেছেন। এখনও দেখতে পাই আমাদের মধ্যে অনেকেই এ ভাষাকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেননি। এখনও অনেকের ধারণা রয়েছে যে, যেহেতু হিন্দু ঐতিহ্যবাহী উপমা ও চিত্র বাংলা ভাষার অংগীভূত হয়েছে, সুতরাং তা ব্যবহার ক'রে মুসলিম মানসের পরিচয় দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু নজরুলের ভাষা ব্যবহারের বিচারেই দেখতে পারি যে, নজরুল উভয় সমাজের ঐতিহ্যবাহী শব্দ একত্র ব্যবহার করতে সর্বত্র সক্ষম হন্‌নি। দুই সমাজের ভাবধারা ও ঐতিহ্য মূলত: কখনও মিলিত হয়নি গঙ্গা-যমুনার ধারার মতো। ফলে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলন লক্ষ্য করি, উপমা ও ঐতিহ্যবাহী শব্দে সে মিলন সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করে থাকি যা হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত —যেমন, 'পানি', 'তশ্‌তরি', 'শিরনি', 'ফিরনি', 'খাঞ্চা', 'বিবি', 'বাঁদি', 'গোলাম', 'তশরিফ'। এগুলো মুসলিম পরিবেশ রচনা করতে পারে, কিন্তু হিন্দু পরিবেশ রচনা করবে না। যেখানে সেই পরিবেশ রচনায় প্রয়োজন নেই সেখানে এসব শব্দ ব্যবহারও অহেতুক। কিন্তু পরিবেশের খাতিরে ও মুসলিম-মানসের সংগে সংযোগের জন্য আরবী-ফারসী বহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করা সংগত। নজরুল-কাব্য থেকে আমরা সেই কথারই সাক্ষ্য পেয়ে থাকি।

www.pathagar.com

নজরুল প্রতিভা

ড: আশরাফ সিদ্দিকী

কার্লাইল লেখক শিল্পীদের কথা বলতে গিয়ে একবার লিখেছিলেন কোন সার্থক লেখক বা শিল্পীই তার আবেষ্টনীকে অস্বীকার করতে পারেন না। আর যদি অস্বীকার করেন তবে তার সাহিত্য-শিল্প বাস্তব-বিমুখ হতে বাধ্য।

নজরুল সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়েও এই আবেষ্টনী বা পারিপার্শ্বিকতাকে জানা প্রয়োজন। এই পারিপার্শ্বিকতা হল :

১. ১৮৯৯ অব্দে নজরুলের জন্মের পর থেকেই নানা রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশ অগ্রসর হচ্ছিল।

২. তার জন্মভূমি চুরুলিয়া গৈরিক মাটির দেশ। একদিকে যেমন ছিল যুগ যুগ ব্যাপী ঝুমুর, লেটো, টুসু ভাদু, বৈষ্ণব আর শক্তি-সঙ্গীতের প্রাণ মাতানো কারুন্য অন্য দিকে আবার শালমহুয়ার দিগন্তব্যাপী সবুজ সান্ত্বনা এবং শাওতালের মহুয়া মাতাল উজ্জ্বলতা।

৩. তাঁর পূর্বপুরুষ কাজীদের ছিল কিছুটা আরবী-ফারসীর ঐতিহ্য যা বংশানুক্রমে পরবর্তী পুরুষগণও ঐতিহ্য সূত্রে পেয়ে থাকবেন।

৪. বাড়ীর পূর্ব পাশে বহুদিনে রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস বিজড়িত যেমন ছিল রাজ নরোত্তম-সিংহের গড়, তেমনি ছিল আবার কামেল পুরুষ হাজী পাহলোয়ানের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের স্মৃতি বিজড়িত মাজার এবং তাঁর খনিত পীরপুকুর।

৫. নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন এই মাজারের খিদমতগার এবং মাজার সংলগ্ন মসজিদের ইমাম। তিনি রাত দিন আল্লাহর সাধনায় মগ্ন থাকতেন।

৬. শোনা যায় বাল্যে নজরুলও সুললিত ভাষায় কোরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন এবং এসময় তিনি নিয়মিত নামাজও পড়তেন।

৭. কবির চাচা বজলে করিম ফারসী ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন— কবিতা লিখতেন ফারসীতে এবং তার লেটোর দলে— বাংলা-ফারসী উর্দু মিশানো এক

www.pathagar.com

অদ্ভুত ভাষায় গানও পরিবেশন করতেন। নজরুল বাল্যে চাচার এই লেটো গানের ভক্ত হয়ে পড়েন এবং নিজেও পরবর্তী সময়ে লেটো-দলের গান করে এবং লিখে গ্রামবাসীদের প্রশংসা অর্জন করেন।

৮. নজরুল যখন স্কুলের ছাত্র তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের যে কার্যকলাপ চলছিল কিশোর নজরুলের মনকে তা হয়তো নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ তার আসে নাই। তার পূর্বেই ৪৯ নং বাংগালী পল্টনে ভর্তি হয়ে তাকে বিদেশে পাড়ি জমাতে হল।

৯. করাচী গিয়ে সৈনিক জীবনে নজরুলের যে মস্ত একটি সুযোগ এলো তা হলো বাঙ্গালী পল্টনের জনৈক পাঞ্জাবী মৌলানার কাছে রুমী, জামী ও হাফিজের অপূর্ব কাব্য সম্পদের সঙ্গে পরিচয় এবং অন্যান্য সৈনিকদের সঙ্গে হরহামেশা থেকে ফারসী, আরবী ভাষার শব্দরাজির সঙ্গে ঘরোয়া পরিচয়।

১০. সৈনিক হিসাবে তিনি বহু বিদেশী সৈন্যদের মার্চের তালে তালে গান গাইতে শুনতেন। সৈনিক জীবনের এই প্রেরণা নজরুল জীবনের অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে থাকবে।

১১. করাচী থেকে কলকাতা ফিরে নজরুল যার সঙ্গে পরিচিত হন তিনি বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মুজাফফর আহমদ। সাম্যবাদীর বিভিন্ন দর্শন তিনি তার কাছ থেকে পেয়ে থাকবেন কিন্তু বিশেষ কোন ইজমে সম্ভবত: তিনি প্রভাবিত হন নাই।

১২. ১৯১৯ অব্দে যখন প্রথম মুহাযুদ্ধ শেষ হল—যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য ভারতের মুক্তি পাবার কথা। কিন্তু তার বদলে তারা পেলো দমননীতির নতুন দলিল— যার নাম "রাউল্যাট অ্যাক্ট"। সংঘটিত হ'ল জালিওয়ালাবাগের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড, গুজরান-ওয়ালাতে উড়োজাহাজ থেকে বোমাবর্ষণ—

উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ জেলে বন্দী, 'অভিরামের' হয় দীপান্তর আর 'খুদিরামের ফাঁসী'। অর্থাৎ সংক্ষেপে— তরঙ্গায়িত উচ্ছল বিদ্রোহী বাংলা তথা ভারতবর্ষ। অন্যদিকে আবার খেলাফৎ আন্দোলনের ঝড়ঝঞ্ঝা, কাজেই একদিকে অভিযান অন্যদিকে অভিসার— দুটি সুরের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়। দেশের এই বিদ্রোহ বিপ্লবের পটভূমিতে স্বভাবতই তরুণ সমাজ এমন একজন কবির অপেক্ষায় ছিল যিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে অগ্নি-বীণার গান শোনাবেন। সদ্য যুদ্ধফেরৎ নজরুল যেন ডবল মার্চ করে ঠিক সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করলেন আর তার শ্লোগান হল :

> 'বল বীর বল চির উন্নত মমশির'।
> 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?'
> কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।'
> 'প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
> যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ'।

www.pathagar.com

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর—
ঐ নতুনের কেতন উড়ে কালবোশেখীর ঝড়।'
'জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হত।'
'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্তজমাট শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী।'
'দিকে দিকে ঐ বেজেছে ডঙ্কা, নাহিক' আর—
মরিয়ার মুখে মারনের বাণীর উঠিতেছে মার মার।'...

বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত সমাজ-বিদ্রোহী তরুণবাংলা— স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত বাংলা সন্ত্রাসবাদী বাংলা—যেমন পেল অগ্নি-বীণা অন্যদিকে অবহেলিত মুসলমান সমাজ নজরুলের ইসলামী সংগীত ও শব্দ ভাণ্ডারে সমাজ পেল নিজেদের নতুন করে আবিষ্কারের পথ। নজরুলের বিভিন্ন কবিতা দিকে দিকে জাগিয়ে দিল পুরস্কারের অগ্নিবহ্নি।

ডক্টর সুকুমার সেনের ভাষায় : "দমকা হাওয়ার কবি শুধু অগ্নি-বীণা বাজাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি ধুমকেতুও ছাড়ছিলেন : কবিতার ঝঙ্কার যাহাদের কানে কোনদিন পৌঁছিবে তাহারাও ধূমকেতুর ঝাপটা হইতে রেহাই পাইল না", (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ২৮১) "নজরুলের কবিতা স্বীয় আবেগ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে মাত করিয়া দিল এবং বাংলা কবিতার যে বাজারদর হইতে পারে তাহা জানাইয়া দিল" (প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮১)।

কাব্যের বহিরঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন— "ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে। কোনখানে অধিকারের সীমা লংঘন করে নাই— এই প্রকৃত কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে"-(নজরুল পরিচিতি ১৫৭)। এইসব কারণেই অগ্নিযুগের বাগ্মীনেতা বিপিনচন্দ্র পালকেও বলতে শোনা গেল রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলছেন "দেশের সৎ ছেলে"। (আর নজরুল বাংলার কবি, তরুণ বাংলার বিদ্রোহী কবি"—। অন্যদিকে (শনিবারের চিঠি) (কালিকলম, কল্লোল প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্র সাহিত্যের সূর্যমণ্ডলের বাইরে একটি নতুন পথ ভাবে-ছন্দে- ভাষায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছিল। এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন মোহিতলাল-বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। ড: সুকুমার সেন যার নাম দিয়েছেন "কল্লোল কোলাহলে জাগে একধ্বনি"। অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় :

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাটের কোটায় যদিও 'বলাকা' যুগে তারুণ্যের বাণী উচ্চারিত হয়েছে তার কণ্ঠে কিন্তু হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষের জন্য 'মাটির' এতো 'কাছাকাছি' যাওয়া

www.pathagar.com

তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সেই জন্যই ধূমকেতুদের তিনি সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন—

জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন
এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর—
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিয়ে যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো—
যুগ-সূর্যম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর ॥

শুধু তাই নয় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিদ্রোহী তরুণদের হয়ে বললেন, "এখন বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনের নোঙ্গর ছেড়া নবীন-অতি আধুনিক যুগ। এ যুগের নেতা গল্পে উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতায় নজরুল ইসলাম" (ড: সুকুমার সেন, বা, সা, ই, চতুর্থ খণ্ড, পৃ, ২৫২)। বলা নিষ্প্রয়োজন : এইসব বাক বিতণ্ডায় নজরুল অংশ নেন নাই। নজরুলের জনপ্রিয়তার আরও একটি কারণ সম্বন্ধে মুনীর চৌধুরীর যথার্থ বক্তব্য : "নজরুল অতীতকে স্মরণ করেছেন বর্তমানকে পুন নির্মাণের হাতিয়াররূপে। নতুন হোক পুরাতন হোক দেশী হোক বিদেশী হোক শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারে তিনি ছিলেন কুশলী কারিগর। অতীতকে তিনি নকল করেননি, ঐতিহ্যকে আউড়ে যাননি, তাকে নবরূপ দান করেছেন। বর্তমানের সঙ্গে তার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন— (নজরুল পরিচিতি, পৃ: ১০৬)

কল্লোল যুগের অন্যতম মধ্যমণি ও প্রাণোজ্জল নজরুলের আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ যাদের মুগ্ধ করেছিল তাদের অন্যতম মোহিতলাল মজুমদার ও নাদির শাহের 'জাগরণ' 'বেদুইন' 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি বিভিন্ন কবিতায় নজরুলকে অনুসরণ করেছেন সার্থকভাবে। মোহিতলালের "নারীস্তোত্র" আর নজরুলের 'নারী' ও 'বারাঙ্গনা' পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লে পরস্পরের ঋণের দিকটা বুঝা যাবে।

নজরুল প্রয়োগিত শব্দ ভাণ্ডারের প্রতি অকৃপণ শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন আরও একজন সমসাময়িক লেখক কবি নরেন্দ্র দেব। অনুরূপভাবে অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্তের 'বাংলা মেয়ে' কবিতায় নজরুলের ছায়ানট কাব্যের নারী, ও 'বাদল প্রিয়া'র, সুরটি বিদ্যমান।

এ দৃষ্টান্ত ড: সুকুমার সেনও দিয়েছেন (বা-সা-ই-২৯৫)। ড: সেনের মতে বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', নজরুলের 'বন্দীর বন্দনা' থেকে গৃহীত। নজরুলের সে যুগের পরিচিতদের অন্য কবি গোলাম মোস্তফার 'রক্তরাগ' (১৯২৪) ও 'খোস্ রোজ' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থেও নজরুল সুরের দূরাগত ধ্বনি শ্রুত হতে পারে। অন্যত্র আমরা যখন– কবি আশরাফ আলী খানের রাজপথ, "ঠকঠক করি চলেছে বৃদ্ধ ভূমি পড়ো পড়ো"। তখন নজরুলের 'মানুষ', কবিতার প্রতিধ্বনি পাই। অন্যত্র খান মুহাম্মদ মইনুদ্দিন, শাহাদৎ হোসেন, কবি বেনজীর আহম্মদ মুসলিম শব্দ ভাণ্ডারই শুধু ব্যবহার করেন নাই— প্রভাবিতও হয়েছেন কমবেশী। 'আমার সাগরে জেগেছে উর্মি' অথবা 'দুর্বার' কবিতায়—

www.pathagar.com

"আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে"র আমেজ বিদ্যমান। পরবর্তী কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ প্রভৃতি আরও অনেকের মধ্যেই শব্দে ও ভাবে এই প্রয়োগ প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। প্রকারান্তরে স্বাভাবিক কারণেই নজরুলও পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত এবং অতুলপ্রসাদের ভাবে ভাবিত হয়েছেন।

গানের রাজা নজরুল— যিনি একাই তিন হাজারেরও অধিক গান রচনা করেছেন— ওস্তাদ জমির উদ্দিন খানের সংস্পর্শে এসে এমন কোন সুর বা রাগ রাগিনী নেই সিন্দু, কাফি, ভৈরো, ভামপলশী, ভূপালী, ভৈরবী, পিলু, কালংরা, বেহাগ, বাগেশ্রী, কাফী স্বাহানা-জয়ন্ত, মেঘবসন্ত প্রভৃতির এক বা একাধিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গানের জগতে এনেছেন বৈচিত্র্য। এছাড়া প্রচলিত মারফতি, মূর্শিদী, ভাটিয়ালী, ঝুমুর এমনকি ভাওয়াইয়া পর্যন্ত তার মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাঁর সংগীত সম্ভার, কলেবর ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর— এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। নজরুলের বিভিন্ন গানের শব্দ ও সুর বৈচিত্রের মোহনার প্রভাব থেকে শৈলেন রায়, প্রণবরায়, সলিল চৌধুরী, ফররুখ আহমদ, সিকান্দর আবু জাফর প্রভৃতি অনেকেই পাঠ নিয়েছেন।

কোন কবিই তার পূর্ববর্তীদের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না— এইটি একদিকে নজরুলের ব্যাপারেও যেমন সত্য— অন্যদিকে তার উত্তরসূরীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

ছাব্বিশ বছর বয়সে নজরুল

www.pathagar.com

শিল্প : জীবন : নজরুল ইসলাম

তালিম হোসেন

নজরুল ইসলামকে যতটুকু বুঝেছি, তাঁর উপরের পরিচয় 'লাগাম-ছেঁড়া বিদ্রোহী', 'বাঁধনহারা বাউণ্ডেলে' হলেও, জীবন থেকে, সমাজ থেকে সত্যিকারভাবে তিনি কখনো পালিয়ে যেতে পারেননি। জন-জীবনের বলয়ে সমাজ-সংসারের চৌহদ্দীতেই তিনি বাস করেছেন। কাছ থেকে সবাইকে দেখেছেন, পেয়েছেন, ভালোবেসেছেন। ঘৃণা ও বিদ্রোহের শিখা তাঁর প্রাণে জ্বলেছে, বিক্ষুব্ধ। মনের অগ্নিগিরিতে বারবার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে-তার কারণ, জীবনের বলয়ে বন্দীদশা আর সমাজ-সংসারের নিগড়ে নিষ্পেষণ আর-দশজনের সঙ্গে তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করেছেন, তাই।

পরের দু:খ-দুর্দশার সংবেদনা চিত্তে সঞ্চারিত হতে পারে, আর তাতে করে কথা সুর আর ছবির মধ্যে শিল্পীর অকৃত্রিম অনুভূতি মুখরও হতে পারে। কিন্তু, নিজের দেহে-মনে প্রত্যক্ষসংবেদনের যে অভিজ্ঞতা, তার আর্তি অন্যতরো, তার শিল্পরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের দ্যোতনা জাগায়। শিল্পের আড়ালে শিল্পী সেখানে পুরাপুরি নেপথ্যচারী হতে পারেন না, আনন্দের কুঞ্জে বা বেদনার কুণ্ডে তিনি নিজেই শিহরিত হন, আপনি বিমথিত হন। পরের আনন্দ বেদনাকে তিনি আত্মস্থ্ করেন আর তার সঙ্গে মিলে নিজের আনন্দ-বেদনাকে তিনি শিরে সাজিতে সাজিয়ে দেন সকলের রস-ভুজ্ঞনের জন্য। সমাজ তাতে নিজের অস্তিত্বেরই আস্বাদ পায়।

একথা সব শিল্পীর জন্যই সত্যি হলেও নজরুল ইসলামের বেলায় একেবারে দেহধারী সত্য হয়ে উঠেছে। সেজন্য আমাদের দেশের আমাদের জনসমাজের সংস্কৃতির অবয়ব তাঁর লেখায় আর তাঁর গানেই ফুটেছে এত প্রত্যক্ষ হয়ে। শিল্পের ,আড়াল শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সামনে যে পরোক্ষতার-সুতরাং অস্পষ্টতার-পর্দা টেনে দেয়, তাতে শিল্পীর মহত্ত্বের চেয়ে শিল্পের মহত্ত্ব হয়তো বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। কিন্তু, সে শিল্পের চরিত্র এত নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে যে, তা সংস্কৃতির চিরকালের সম্পদ হলেও হতে পারে, কিন্তু শিল্পীর নিজের দেশ-কাল মানুষের জন্য তার অবদান হয় গৌণ।

www.pathagar.com

সত্যি কথা এই যে, এই গৌণতাই হয় কোন কোন শিল্পীর সাধনা। কিন্তু নজরুল চিরকালের নিক্তিতে কখনো নিজের অবদান মাপতে গিয়েছেন এমন মনে হয় না। 'পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে'—তাঁর এই বিখ্যাত উক্তি তাঁর ক্ষেত্রে শুধুই কথার কথা নয়। তিনিও শিল্পী, অসাধারণ শক্তিধর শিল্পী। উপজীব্য নয়, শিল্প তাঁর অন্য উপজীব্যের মাধ্যম। তিনি মানুষকে ভালোবাসেন, কারণ তারা তাঁর আপন; দুঃখ-বেদনা, কামনা-বাসনা, ভালো-মন্দ নিয়ে তারা তাঁর আত্মীয় এবং তিনি তাদেরি একজন — সেই সুখ-দু:খ, ভালোমন্দেরই অংশভাগী একজন। তাই, শিল্প তাঁর হাসি-কান্না আর ঘৃণা ভালোবাসা প্রকাশের প্রত্যক্ষ মাধ্যম। তাই, তাঁর কথা, কবিতা ও গানের আবেদনও প্রত্যক্ষ। নিজের সামনে শিল্পের আড়াল টানার সচেতন প্রয়াস তাঁর মধ্যে নেই, বরং নিজেকে অবলীলায় ব্যক্ত করা, আপন মানসবিদ্ধ এবং সমাজ সচেতন অনুভূতি আর বক্তব্যকে জনগোচরে উপস্থিত করে আপন সত্তার স্বরূপে তাদের শিহরিত, বিমথিত এবং উদ্বোধিত করাই হচ্ছে তাঁর শিল্প-সাধনার ইতিবৃত্ত।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতেই বোঝা সহজ হবে যে কেন নজরুল ইসলাম সাংস্কৃতিক জীবনায়নে কোন ধর্মীয় সংস্কার, বাঁধাধরা মতবাদ বা যান্ত্রিক ইজমের কাছে বাঁধা পড়েননি। তাঁর সময়ের সব মতবাদ, ইজম এমনকি সব দল-গোষ্ঠীরই তিনি কাছাকাছি হয়েছেন; এ সবের প্রবক্তা ও কর্মীরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে অথবা আপন করে কাছে টেনে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি সকলের মাঝে থেকেও 'একক নজরুল' হয়েই থেকেছেন। তিনি সকল পাড়ায় একই সূর্যের মতই আলো আর উত্তাপ ছড়িয়েছেন। সে আলো যে সত্যকে উদ্ভাসিত করার, করেছে; যে মিথ্যাকে উলঙ্গ করার, তা-ও করেছে। এবং উত্তাপ, যে হৃদয়কে সরস করার, করেছে; যাকে জ্বালিয়ে দগ্ধ করার, তাও করেছে। জন-জীবনের ঐতিহ্যকে তিনি অস্পৃশ্য জ্ঞানে বা উন্নাসিকতায় বর্জন করেননি। বরং চেষ্টা করেছেন তার তুচ্ছতাকে মহনীয় করে তুলতে, তার মহত্ত্বকে শৈল্পিক সম্প্রচারে সার্বজনীন, সর্বদেশীয় করে তুলতে। রবীন্দ্রনাথের কথায়-'মাটির কাছাকাছি' অর্থাৎ জীবনের কাছাকাছি আরো সত্য করে বলতে গেলে, জনজীবনের কাছাকাছি থেকেছেন বলেই নজরুল ইসলাম তাঁর দেশের জীবনের তাঁর জনগণের সংস্কৃতির এমন ঘনিষ্ঠ ও তন্নিষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

ইকবালের 'ইনসানে কামিল' ও নজরুল ইসলামের 'পুরুষোত্তম'

শাহেদ আলী

উপমহাদেশের তিন শ্রেষ্ঠ কবির অভ্যুদয় ঊনিশ শতকের শেষার্ধে। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার কবি, আর ইকবাল তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেছেন উর্দূ ও ফার্সী ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ এবং ইকবাল প্রায় সয়বয়সী– রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে, ইকবালের জন্মের কয়েক বছর পূর্বে। ইকবালের জন্মসন ১৮৭৩। বয়সের দিক দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম দু'জনেরই কনিষ্ঠ; নজরুল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ সনে। ইকবাল এবং রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন সুদীর্ঘ বলা যায়। নজরুল ইসলামের যখন আমাদের সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটলো তখন রবীন্দ্রনাথ তার কবিজীবনের মধ্য-আকাশ অতিক্রম করেছেন। ইকবালের কবিকীর্তিও তখন তাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্য এ সফলতার শীর্ষে উপনীত। অথচ এই তিন কবির মধ্যে রয়েঝা একটা মিল– তিনজনই মানবতার কবি, তিনজনই বিশ্বাসের কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস তাকে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের প্রবর্তনা দেয় না, তাকে দিয়েছে ঋষির ভূমিকা। পার্সুয়েশানের [Persuation] মাধ্যমে তিনি সমন্বয় সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ভেঙে পড়ার ভূমিকাতে তাঁকে আমরা দেখি না। তিনি অনেকটা 'স্ট্যাটাসকো'র কবি; যা আছে তাকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি অন্তর্বিরোধ দূর করতে চেয়েছেন। সাম্য তাঁর কাম্য নয়; পরস্পরের মধ্য মিলন এবং সম্প্রীতিই তাঁর অন্বিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের একাডেমিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর না হলেও রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ ও আবহাওয়া ছিলো তাঁর গীতিধর্মী কবিপ্রতিভা বিকাশের অনুকূল। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে এবং ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘটেছিল তাঁর নিবিড় পরিচয়। এ ছাড়া ভারতীয়, বিশেষ করে.সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরেও প্রবেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পারিবারিক ঐশ্বর্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিল তাঁর এই গীতি-ধর্মী প্রতিভা। বাংলাদেশে পৌত্তলিক ধর্ম-বিশ্বাসকে পাশ কাটিয়ে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম মতবাদ জন্মলাভ করে, রাজা রামমোহন রায়ের আনুকূল্যে ও নেতৃত্বে, কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তারই নেতৃপুরুষ। এই উপনিষদীয় আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডলে বিকশিত হয় রবীন্দ্রনাথের মন, মানস ও প্রতিভা। ব্রাহ্ম মতবাদ সনাতন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ বলা যায়- কিন্তু এ ধর্ম ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করেই বিকশিত হয়।

ইতিপূর্বে, এদেশে, পৌত্তলিক ও বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে, শাসক ইংরেজ ও খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রভাবে আরো একটি বিদ্রোহ ঘটে। একশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু সেদিন স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ শুরু করে। যুগন্ধর প্রতিভা মহাকবি মধুসূদন দত্ত পিতৃধর্ম ত্যাগ করে খৃীস্টান হয়ে পড়েন, মদ ধরেন এবং মেম বিয়ে করেন। কবি বাংলা সাহিত্যে যে বিপ্লবের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন, তা আকাশে হঠাৎ আবির্ভূত ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গেই তুলনীয়। কল্পনায় স্বর্গমর্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে বিদায় নিলেন মধুসূদন; এরপর বাংলা কাব্যে শুরু হলো গীতিকবিতার কোমল রাগিণী। মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথ নামেই 'রবি' বাস্তবে দেখা গেল। আকাশ জুড়ে তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছেন, পূর্ণিমার চাঁদের মতোই তিনি স্নিগ্ধ-সূর্যের দহন বা তেজ তার মধ্যে অনুপস্থিত। বুদ্ধি, মেধা এবং মননের কবি রবীন্দ্র 'বিদ্রোহ' বা বিপ্লবে কুণ্ঠিত' বিদ্রোহ তাঁর কবি-প্রকৃতির বিরোধী। তাঁর প্রথম দিকের কিছু কবিতায়, যেমন— 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতিতে সহজ সরল ভাবোচ্ছ্বাসের প্লাবনে আমরা ভেসে যাই; কিন্তু ধীরে ধীরে আবেগের উপর মননের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক পর্যায়ে মননই হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যের প্রধান লক্ষণ। এ জন্য, রবীন্দ্রকাব্য বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েও শান্ত ও স্নিগ্ধ; প্রলয়ের তোলপাড় সৃষ্টি করা সামুদ্রিক তরংগাভিঘাত এ কাব্যে পাওয়া যায় না।

কবি হিসাবে কে বড়ো, কে মহৎ এ প্রশ্ন অবান্তর। মোদ্দা কথা এই যে, ইকবাল ও নজরুল-কাব্যের সুর এবং মেজাজ আলাদা। রবীন্দ্র-কাব্য এঁদের কাব্য থেকে স্বতন্ত্র। ইকবাল এবং নজরুল ইসলাম দু'জনই বিদ্রোহী; তাঁরা প্রচলিত সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছেন। নজরুলের ক্ষেত্রে কেবল Pious wish নয়, তিনি হাতুড়ি শাবল নিয়ে ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, তার স্থানে নতুন সমাজ সৃষ্টির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সবাইকে ডাক দিয়েছেন। দু'কবিরই জন্ম মুসলিম পরিবারে, মুসলিম ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে। ইসলাম অসত্যের সঙ্গে, শোষণ, জুলুমের সঙ্গে আপোস করে না, দাসত্বকে মনুষ্যত্বঘাতী বলে গণ্য করে। তাই 'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সব নিবে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' এ ধরনের কোনো আহ্বান নজরুল ইসলাম বা ইকবালের কাব্যে আমরা দেখি না। 'এসো ব্রাহ্মণ শুচি করো মন, ধর হাত সবাকার' এমন আর্তি নজরুল ইসলামে অকল্পনীয়, কারণ নজরুল ব্রাহ্মণ্যবাদ, বর্ণবাদ ও জাতি-পাতির অচলায়তন ভেঙে

www.pathagar.com

চুরমার করে দিতে চান। তিনি বলেন, 'গাহি সাম্যের গান—মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!' কবি গুরু যখন বলেন, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান/অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান', তখন আমরা দেখি এক হুঁশিয়ারী, তিনি সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন, তাই অনিবার্য অপমান থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবির এই সময়োচিত সতর্কবাণী।

নজরুল ইসলাম এবং ইকবাল যে বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে জন্ম নেন, তাতে মানুষ সৃষ্টি জগতে তার স্রষ্টার প্রতিনিধি : সমগ্র সৃষ্টিই মানুষের অধীনে স্থাপিত। সে বিশ্বস্রষ্টার প্রতিনিধি বলেই তো, আসমান-জমিনে যা কিছু আছে– চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা সমস্ত কিছু-এমনকি, দিন-রাত্রি তথা সময়ের উপর পর্যন্ত মানুষকে দেয়া হয়েছে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক দাসত্বের প্রভাবে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। সে তার স্বরূপকে চেনে না। গাছপালা বা ইতর জীব-জন্তুর মতো জন্ম-মৃত্যুর অধীনতাকেই সে নিজের নিয়তি বলে মনে করে। কিন্তু মানুষ যখন নিজের স্রষ্টাকে চেনে তখনি তার স্বরূপ নিজের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে– তখন তার এই উপলব্ধি ঘটে যে, তার ও তার স্রষ্টার মাঝে এমন কোনো শক্তি, ব্যক্তি বা সত্তা নেই, যার কাছে সে সিজদায় অবনমিত হতে পারে, স্রষ্টার সামনে সিজদায় নুয়ে পড়ার পর, গোটা সৃষ্টিই তার প্রতি সিজদায় নত হয়ে পড়ে!

এই অবস্থায় মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটে। সে তখন দেখে, তার সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। তখন 'কারার লৌহকপাট' লাথি মেরে গুঁড়া করে সে বিশ্বের মুক্ত আঙিনায় বেরিয়ে আসে— তখনি সে বলে ওঠে 'আমি চিনেছি আমারে, সহসা আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' এই বন্ধনমুক্ত মানুষই নিজেকে দেখতে পায় তার আদি সত্তায়; এই মানুষই সৃষ্টির আনন্দে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে এই ভাষায়— 'মোর চোখ হাসে, মোর মুখ হাসে, মোর টগবগিয়ে খুনহাসে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।' মুহূর্তেই আমরা বুঝতে পারি, এই কবির সৃজন-বেদন কতো জেনুইন, কতো অব্যর্থভাবে এর অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর কাব্যে!

ইকবাল এবং নজরুল বিশ্বাসের যে পরিমণ্ডলে লালিত ছিলেন, তার একেবারে মূলেই রয়েছে সৃষ্টির গোড়াতে এই স্বীকৃতি যে, মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে রাজাধিরাজ হয়ে, পৃথিবীকে, সৃষ্টিকে সে নিয়ন্ত্রণ করবে, সে কারো দাসত্ব করবে না। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা তার এই স্বরূপ উপলব্ধির, তার এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের বজ্র-নির্ঘোষ। এই মুক্ত মানুষই ইকবালের 'ইনসানে কামিল', নজরুলের 'পুরুষোত্তম সত্য'। মনগড়া বিধি-বিধান, কল্পিত দেব-দেবীর প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দাসত্ব, সমাজ ও সংস্কারের গোলামি, রীতি-নীতির অন্ধনিগড় এসবই সৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে আচ্ছন্ন করে রাখে— মানুষকে তার মুক্ত চেতনার আঙিনায় নিজেকে চিনতে দেয় না— অথচ, সৃষ্টিমূলে মানুষই হচ্ছে বিশ্বের নিয়ন্তা। এই মুক্ত মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠ উদাত্ত ঘোষণা আমরা দেখি নজরুল ও ইকবালের কাব্যে। সংস্কার, রীতিনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

নিগড়ে বন্দী, ঔপনিবেশিক জগদ্দল পাথরের নীচে পিষ্ট মানবতার মুক্তির জন্য কবি পুরাতন পৃথিবীকে ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করতে চান। ইকবাল বলেন, এ আকাশ পুরোনো, জীর্ণ হয়ে পড়েছে, তিনি একটা নতুন আকাশ চান। নজরুলের বিদ্রোহ শান্ত হবে না, যদি না পৃথিবী থেকে সর্বপ্রকার শোষণ জুলুম নিশ্চিহ্ন হয়েছে, অত্যাচারীরা নির্মূল হয়েছে— অর্থাৎ শোষণমুক্ত, স্বাধীন মানুষের পৃথিবী যতোদিন না সৃষ্টি হয়েছে। কবির সংগ্রাম চলতেই থাকবে। কবি চিরন্তন সংগ্রামের সৈনিক। 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি', বলে নজরুল করুণা উদ্রেক করতে চান না, তিনি অত্যাচারী রাজা ও শোষকের হাত গুঁড়িয়ে দিয়ে রক্ষা করবেন শোষিত ও দরিদ্রকে।

মানুষের খেয়ালী আইন, তথা বিধি-বিধান, যা ভেদবৈষম্য, শোষণ-জুলুমকে চির-স্থায়িত্ব দানের জন্য উদ্ভাবিত, তাই মানুষকে জিন্দানখানায় বন্দী করে রাখে চিরকালের জন্য। মানুষ যখন তার স্বরূপের মুখোমুখি হয়, যখন তার ব্যক্তিসত্ত্বা বা জ্ঞান বিকাশের পর পরমোৎকর্ষ অর্জন করে, তখন তার হাতই আল্লাহর হাত হয়ে ওঠে। তখন স্রষ্টাই তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত বা কর্মের শুরুতে বান্দাকে জিজ্ঞেস করেন, কী করলে বান্দা খুশী হবে। অর্থাৎ মানুষের যখন এই বিকাশ ঘটে তখন আল্লাহর ইচ্ছা আর মানুষের ইচ্ছায় কোনো বেদ থাকে না। খুদীর চরম উৎকর্ষের বদৌলতে মানুষ হয়ে ওঠে স্রষ্টার সহকর্মী। ঠিক তেমনি মানুষ যখন তার স্বরূপকে চিনতে পায়, তখন সংস্কারের সমস্ত বন্ধন, জাগতিক মানসিক দাসত্বের সকল শৃঙ্খল টুটে যায়। তখনি সে সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠে— 'জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য।' জগদীশ্বর মানে জগতের অধিপতি, নিয়ন্ত্রক, শাসক। মোগল বাদশাহদের যখন বলা হতো 'দিল্লীশ্বরই জগতের ঈশ্বর', তখন দিল্লীর রাজা বা অধিপতিই জগতের অধিপতি বা সম্রাট বুঝাতো। নজরুল ইসলামের জগদীশ্বরও এই অর্থেই 'ঈশ্বর', সে জগতে কারো গোলাম নয়, সে সৃষ্টিতে কারো অধীন নয়, সে সৃষ্টির অধীশ্বর, তাইতো কবি বলেন, 'বলো বীর চির উন্নত মম শির'। তার ললাটে, 'রাজ রাজটীকা', সৃষ্টিতে মানুষের এই নেতৃত্ব ও প্রভুত্বই কি প্রমাণ নয় যে, সে দাসত্ব করতে আসেনি, সে রাজাধিরাজ? নজরুল ইসলাম ও ইকবালের কাব্য সৃষ্টির অভিজাত, জগতের রাজাধিরাজ, এই মুক্ত স্বাধীন মানুষেরই বন্দনা। এই মুক্ত মানুষই সকল প্রকার দাসত্বের নিগড় থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য চিরন্তন জেহাদে লিপ্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলাম : এক মহান কবিপুরুষ

আল মাহমুদ

১. এক অবিশ্বাস্য কবি প্রাণশক্তি

অনেকটা আকস্মিক ঘটনার মতো। হ্যাঁ, আকস্মিক, কারণ, কাজী নজরুলের জন্মবার্ষিকীতে এবার কিছু লিখবার আমন্ত্রণ পেয়ে যখন ভাবছিলাম, এই বিস্ময়কর কাব্য-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার এমন দৈব সুযোগ হয়তো আর না আসতে পারে। কারণ, আমি নিজের উদ্যোগে কোনো গবেষকের মনোবৃত্তি নিয়ে হয়তো কোনোদিনই এই মহান কবিপুরুষের বিপুল রচনাবলীর ওপর কিছু লেখার সাহসীই হবো না। হবো না এজন্য নয় যে তার কবিতা বা গানের ওপর আমার কোনো বক্তব্য নেই। বরং তার পাঠক হিসেবে আমি এমন বিস্মিত ও অনুরক্ত, তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা এমন সরল ও সীমাহীন যে আমার সামান্য ধীশক্তির সাধ্য নেই আবেগ পরিহার করে তা যুক্তির সূতোয়, একজন খাঁটি গবেষকের মতো গ্রথিত করে তুলি।

আকস্মিক আরও একটি কারণে। নজরুলের কবিতার ওপর বিশেষ করে উপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে রচিত তাঁর কবিতায় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের কথা লিখবো বলে প্রায় মনস্থির করে ফেলার পর অত্যন্ত আকস্মিকভাবে নজরুল-গীতির এক তরুণী গায়িকা ইফফাত আরা নার্গিস অনেকটা স্বেচ্ছায় শিল্পকলা একাডেমীতে নজরুলের কয়েকটি রাগমাধুরীতে গান শুনিয়ে আমাকে অভিভূত করে গেলেন। শিল্পী 'কি হবে জানিয়া কে তুমি বধু/কি তব পরিচয়/ আমি জানি তুমি মোর প্রিয়তম সুন্দর তনুমন..' অথবা 'বনহরিণীরে তব বাঁকা আঁখির মেরো না তীর/ ওগো শিকারী মেরো না তীর...' গান দু'টি এমন দরদ দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইলেন যে উভরবী ও পুরিয়া ধানেশ্রীর রাগ-সংযোগ আমার মতো আরও দু'একজন শ্রোতাকে অভিভূত ও স্তম্ভিত করে দিল।

আমার সামান্য অধ্যয়নের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামকে যতটা ধ্যানস্থ হয়ে ভাবা যায়, ভেবেও আমি কূল করতে পারিনি, নজরুলের বিদ্রোহী-সত্তা কিভাবে যুগপৎ তার

www.pathagar.com

কোমলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলো. তিনি কেন বিদ্রোহী ছিলেন তার একটা কারণ বুঝি। এর কারণ তিনি যে সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সম্প্রদায়ের তৎকালীন রাজনৈতিক ও বৈষয়িক পরাজয়ের ক্ষোভ, সামাজিক অধঃপতনের ক্ষোভ তিনি ধারণ করেছিলেন তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থলে। মুঘল রাজশক্তির পতনের পর সিপাহী বিদ্রোহও যখন নিরাশার মধ্যে অবসিত হলো তখন থেকেই এই যুক্তিহীন ক্ষুব্ধ বিবেক কাজ করছিল পরাজিত মুসলিম যুবকদের মধ্যে। পরবর্তীকালে যে সৈয়দ নিসার আলী (তিতুমীর) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিক ক্ষমতার অপরাজেয় শক্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বাঁশের কেল্লা নিয়ে নিরুপায়ভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, আসলে তা সেই ক্ষুব্ধ বিবেকেরই সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টামাত্র। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও, নিজের বিনাশ জেনেও, শুধু এই কথাটি জানিয়ে দেয়া যে, আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী শাসন মানি না। এ হলো বিদ্রোহের একটা দিক। এ দিকটি হলো রাজনৈতিক। এর একটি ধর্মীয় দিকও আছে। সেদিকে এগিয়েছিলেন হাজী শরিয়তুল্লাহ্। তিনি এমন আত্মিক শক্তিতে কাঙাল-মুসলিম নরনারীকে ডাক দিয়েছিলেন, ভাবতে অবাক লাগে তাঁর বাহাসের কাছে, তাঁর ওয়াজের মর্মস্পর্শিতায় তৎকালীন বাংলার নিম্নবিত্ত মুসলিম চাষী পরিবারগুলোর মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অদৃশ্য পরিকল্পনাটি স্তম্ভিত ও মুহ্যমান হয়ে পড়ে; রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিরোধের পর বেশ একটু পরবর্তীকালে, একটু বিলম্বে হলেও সাহিত্যিক দিকে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কাজী নজরুল ইসলাম। যাকে বলে কার্যকর প্রতিরোধ। রাজনীতি, ধর্ম কিংবা সাহিত্য অথবা সামাজিক আচরণে তৎকালীন বাঙালী-মুসলমানের যুবশক্তি, তারা আরবী-ফারসী কিংবা ইংরেজী— যে শিক্ষায় শিক্ষিতই হোক না কেন, উপরোক্ত বিদ্রোহী মনোভাব বহন করে চলেছিলেন। নজরুল যেহেতু ছিলেন কবি, সে-কারণে তাঁর বিস্তার ঘটেছিলো প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। এ জন্য নজরুলের আবির্ভাবকে কেউ কেউ ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ আবার বিবেচনা করেছেন প্রতিভাবান বালক রূপে। কিন্তু 'তার বিদ্রোহ দ্রুতদাহ্যমান কোনো শিখা ছিলো না। এ ছিলো উপমহাদেশের জন্য পরাজিত মুসলিম সম্প্রদায়ের হৃদয়স্থিত স্থির আগুন।

নজরুল যে প্রতিভাবান বালক ছিলেন না অথবা ছিলেন না খ্যাতিলোভী জনপ্রিয়তার ডুগডুগি তা কবির অজস্র গীতরচনাতেই প্রমাণিত সত্য হিসেবে ধরা দেয়। যাঁরা 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলন করতে গিয়ে নজরুলের গানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখে বলেছেন, তিনি ছিলেন প্রতিভাবান বালক; তাঁদের বক্তব্যে ও কাজে কাজী নজরুল ইসলাম এক ধরনের প্রতিভাবান বালক; তাঁদের বক্তব্যে ও কাজে কাজী নজরুল ইসলাম দুর্ভাগ্যবশত এক ধরনের দ্বৈতাচারের শিকার হয়েছেন মাত্র।

জাঁ আর্তুর র‍্যাবোকে ফরাশিরা বলেন, দিগভ্রষ্ট দেবদূত। যদিও বয়সের দিক দিয়ে যে কয়দিন তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন— ছিলেন বালকই। তবু ফরাশিরা কেন, পৃথিবীর কবিতা-পাঠকদের কেউই তাঁকে বালক বলে আখ্যায়িত করেননি। র‍্যাবোর কথা ভাবলেই

www.pathagar.com

আমার কেন জানি কাজী নজরুলের কথাই মনে হয়। র‍্যাঁবো যেমন গল জাতির কাব্যবিচার ও সৌন্দর্যতত্ত্বের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি নজরুলও বাংলা ভাষাভাষী দ্রাবিড়-ভেডিডড রক্তমিশ্রিত একটি বিরাট মানবগোষ্ঠীর প্রচলিত উপমা পদ্ধতির শৃংখলাকে তোলপাড় করে দিয়েছিলেন।

তবুও কেবল উপনিবেশিক শাসনশৃংখল কম্পনকারী কবি হিসেবে তাকে বিচার করতে আমারও প্রবৃত্তি হয় না। যদিও জানি, তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেখানে যেখানে সূর্য অস্ত যেত না, এশিয়া আফ্রিকার কোথাও, সাম্রাজ্যবাদের ওপর এমন তীব্র ঘৃণা নিয়ে আর কোনো কবির আবির্ভাব হয়নি। অবশ্য এই মহাদেশগুলোতে বড়ো কবি, মহাকবিও দু'চারজন ছিলেন।

যুগের হুজুগ আজ কেটে গেছে। নজরুলের কবিতা তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে এখন থিতিয়ে দানাবাঁধার পর্যায়কে অতিক্রম করছে। এখন আমাদের নজরুল কেমন লাগে?

আমার কাছে নজরুলকে এক অবিশ্বাস্য কবি-প্রাণশক্তি বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর শব্দের ধারণা অবিশ্বাস্য, তাঁর উপমার বয়ন অন্তস্থলস্পর্শী। যদি তাঁর মধ্যে চপল ও বালকোচিত কোনো-কিছু থেকে থাকে তবে তা যে তাঁর নিজের উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী ধারণার মধ্যেই নিহিত আছে, তাতে অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই। তিনি হিন্দু-মুসলমান, ইসলামী সংগীত ও শ্যামাসংগীত, নাত ও গজলকে এক সঙ্গে মেলানোর যে রোমাঞ্চকর চেষ্টা করেছিলেন, এর মধ্যেই বালসুলভ গায়ের জোরের ভ্রান্তিটি লুকিয়ে আছে। এখানেই তিনি বালকের মতো সরল ও চারণকবির মতো উদার ছিলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য, পরবর্তীকালে কেউ তাঁর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁকে বিচার করেননি। না তাঁর স্ত্রীর সম্প্রদায়, না তাঁর নিজের সম্প্রদায়।

তাঁর গানই বলে দেয়, তিনি ছিলেন তাঁর কালের অন্যতম প্রেমের কবি : মানবপ্রেমের যতগুলো দিক আছে, তিনি সেসবের সমস্ত বৈচিত্র্য সংগীতে ধরতে চেয়েছিলেন। উত্তর ভারত ও মার্গসংগীতের দ্বারা আপ্লুত সেকালের বাংলা গানে নজরুল আমদানি করলেন আরবী ও ফারসী ধারা। মধ্যপ্রাচ্যকে এমন সরাসরি বাংলা কাব্যসংগীতের ক্ষীণ স্রোতোধারার মধ্যে সঞ্চারিত করার শক্তি সম্ভবত নজরুল ছাড়া আর কারোরই সাধ্যের মধ্যে ছিল না। তাঁর গানের বাণীকেও তিনি তাঁর কাজের উপযোগী করে তুললেন। কথা যেন রাগের সচল মেঘের ওপর বিদ্যুতের ঘন ঘন চমকানির মতো বসে যেতে লাগলো। ভারতীয় সংগীতযন্ত্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁর সুরের যোজনা ও গীতের চাঞ্চল্য ছিলো আশাতীত এক আধুনিক ঘটনা। যতই দিন যাবে ততই তা উপলব্ধ হবে বলে মনে হয়।

২. নজরুলের ভাষাবিদ্রোহ

আধুনিক বাংলাভাষার স্থপতি রবীন্দ্রনাথ। এই ভাষার প্রবল বহমানতা এবং প্রতিষ্ঠালগ্নের সহজতা নিয়ে কারো কোনো অভিযোগ বা অস্বস্তি ছিল বলে মনে পড়ে না। আর থাকলেও তা ভাষাসাহিত্যের সৃজনশীলতার সাথে সম্পর্কিত ছিল না বলে সমসাময়িক কবি-

www.pathagar.com

সাহিত্যকগণ বহমান আধুনিকতায় কমবেশী বিমুগ্ধই ছিলেন। সকলেই বাংলাভাষার একটি সম্ভাব্য রূপ বা চারিত্র্য সম্বন্ধে মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা আধুনিক বাংলাভাষার সমসাময়িক কবিরা আধুনিক কবিতার এক ধরনের আঙ্গিক-ধারণার মধ্যে বিচিত্র কবিতা লিখে একটি পরিচিত বলয় তৈরী করে নিতে পেরেছিলেন। তা প্রমথ চৌধুরীর বীরবলীয় গদ্যের ভাষাচাতুর্য। যা আয়ত্ত করতে কমপক্ষে ইংরেজীর সাথে ফরাসীটাও বাঙালি লেখকদের জানা একান্ত উচিত বলে শিক্ষিত কবিগণ মনে করতেন। তবে একথা কেউ ভেবে দেখেছিলেন কিনা জানি না, আধুনিক বাংলাভাষার যে কবিপরিতুষ্টি স্থিত হয়েছিল তা তৎকালীন বাঙালি চিন্তার নানা উৎক্ষেপ ধারণে সক্ষম হলেও সর্বতোভাবে পরীক্ষিত ছিল না। কারণ বৃটিশ ভারত তখন ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে এমনভাবে জর্জরিত, ঐ যাতনার একটা উপযোগী ভাষারূপ যে একান্তই অপরিহার্য তা আধুনিক বাংলাভাষার চর্চাকারী এবং অনুরাগীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়নি।

উপমহাদেশের মুক্তির জন্য উপযোগী স্বাধীনতার ভাষা উচ্চারণকারী কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম। আধুনিক বাংলাভাষার তিনিই প্রথম সাম্যাজ্যবাদবিরোধী কবি। যাঁর কবিতায় উপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। আর মুসলমান কবিদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যাপকভাবে হিন্দু দেবদেবী ও পুরাণকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি তাঁর সময়কার বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে গানে কবিতায় ভাষা দিতে গিয়েও। 'পিনাকপাণির ডম্বরু ত্রিশূল ধর্মরাজ্যের দণ্ড'—এরকম একটি পংক্তি রচনার সাধ্য তাঁর সমসাময়িক কোনো কবির পক্ষে কল্পনারও অতীত ছিল।

কাজী সাহেব মুসলমানী শব্দ ও বাক্যবন্ধ রচনায় একটু বেশি পারঙ্গম হবেন এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ে জন্মে সংস্কৃত তৎসম শব্দ সম্ভারকে প্রতিবাদের ভাষায় রূপান্তরের সাধ্য তখন অন্তত নব্য মুসলিম লেখকদের ছিল বলে মনে হয় না। শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের লেখকদের কথাই বা বলি কেন, অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানদেরও কি ছিল? প্রতিবাদ করলে মানুষের স্বভাব ও ভাষা বদলে যায়। সৈনিক জীবন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জীবন। তাদের ভাষায় ও ইঙ্গিতে সহজ ভাবেই সামরিক তেজ ও দীপ্তি থাকারই কথা। হয়ত কাজী সাহেবেরও ছিল। তবে সে ভাষা যে শেষপর্যন্ত একজন কবিকে খুব বেশি সাহায্য করবে এটা ভাবা যায় না। কিন্তু নজরুলের জন্য এই অভিজ্ঞতা রহস্যময়ভাবে সুফলদায়কই হয়েছে। তিনি বাংলা কবিতায় সামরিক ইঙ্গিতসমূহকে অর্থবহ করেছেন। এমন কি তার উদ্দীপনামূলক গানেও।

নজরুল বৌদ্ধ পুরাণ বা উপকথাগুলো ব্যবহার করেন নি। কারণ সে কাহিনীকে নজরুল। তার ইচ্ছাপূরণের জন্য সহায়ক ভাবেন নি। অথচ রবীন্দ্র-কাব্যের একটা বড় সম্পদ হল বৌদ্ধ ধর্মীয় কাহিনী এবং উপকথাসমূহ। নজরুলের বিষয়-বিদ্রোহের একটা বড় দিক হল শক্তি ও ধ্বংসের আকর হিন্দু দেবদেবী। নজরুলের আকস্মিক আবির্ভাবের যে দীপ্তি সমসাময়িকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল— তা তার আরবী-ফারসী শব্দের সুষম ব্যবহারে

www.pathagar.com

যতটা নয়, তার চেয়েও চমকপ্রদ ঘটনা হল বাংলাকাব্যে হিন্দু পুরাণের সার্থক পুনরুজ্জীবনে। নজরুল মুসলমানদের ঘরে জন্মেছিলেন বলে ঐসব পুরাণ নিংড়াতে তিনি সামান্যতম দ্বিধান্বিত ছিলেন না। অতীতের অস্ত্রে বর্তমানকে ঘায়েল করার যে সাহিত্য-ক্ষমতা নজরুল জন্মগতভাবেই আয়ত্তের মধ্যে রেখেছিলেন তা বাংলা ভাষায় এক নতুন বাকচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এখানেই প্রকৃতপক্ষে নজরুলের বাকবিদ্রোহী কবি চরিত্রটি লুকিয়ে আছে বলে আমি মনে করি। বল বীর, বল উন্নত মম শির—নিশ্চয়ই চমকপ্রদ উত্থাপন। তবে এতেই আর বাংলাভাষার গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়নি। বরং নজরুল বাংলাকাব্যের গতিকে, যদি আদৌ ভাষার স্থিতিতুষ্টিকে গতি বলে উল্লেখ করার কোনো সুযোগ থাকে—সেটা করেছিলেন সমসাময়িক সর্বপ্রকার সাহিত্যিক বড়ত্ব ও জড়ত্বকে উপেক্ষার মধ্য দিয়ে। আবার এটা ঠিক উপেক্ষাও নয়, এটাকে শ্রদ্ধামিশ্রিত পাশ কাটানোর একটা সতর্ক কৌশলও বলা যায়। এই বিনয়ী কৌশলটি তিনি যে কেবল তার অগ্রবর্তী ও সমসাময়িকদের বেলায়ই অবলম্বন করেছিলেন এমন নয়। করেছিলেন তার অব্যবহিত পরবর্তীদের বেলায়ও। নজরুলের ভাষায় তারা হলেন, 'রয়েছে সোনার শত ছেলে'।

আরবী-ফারসী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার নজরুলের কবিতার জন্য ছিল একটা অতিশয় স্বভাবিক ব্যাপার। কারণ সে সময়কার সমস্ত মুসলমান লেখকেরই কমবেশী এই স্বাভাবিকতার গুণটি ছিল। যে গুণ সমসায়িক মুসলিম কবি-সাহিত্যকগণের ছিল না, তাহলো মুসলমান সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ক্ষুধার নিরসন করার উপযুক্ত সাহিত্যিক খাদ্য। তাদের পালা পার্বণে, ঈদে রমজানে উল্লাসমুখর কোনো সাহিত্য-রচনার সাধ্য। নজরুল সে ক্ষুধা নিবৃত্তির একটা উপায় সৃষ্টির কাব্যভাষা নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। আর সে ভাষার বাক্যচাঞ্চল্যে তার ওপর নারাজ মুল্লারাও পরিতৃপ্তিতে তাঁদের অশ্রুভেজা দাড়ির ওপর হাত বোলাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমি আগেই বলতে চেষ্টা করেছি নজরুলের ভাষাবিদ্রোহের নিবিড় রহস্য হল একই সাথে তৎসম ও লৌকিক ভাষার শব্দরাজিকে সমকালীন অর্থবহতারও অতিরিক্ত অর্থ দান—তিনি এক রাজ্যহারা পুরাণের দেবদেবী চরিত্রগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার মধ্যে যেন তিনি এক রাজ্যহারা মুগ্ধ মুসলমান রাজা—যিনি শিবের গাজন গেয়ে ঔপনিবেশিক দাসত্বে আবদ্ধ তার বিপুল প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহে উস্কানী দিচ্ছেন। আমার মনে হয় নজরুল-কাব্যের ভাষাবিদ্রোহের বীজ এই ঘটনার মধ্যেই খুঁজলে পাওয়া যাবে।

নজরুলের ভাষাবিদ্রোহের আরেকটি ইঙ্গিতময় বিষয় হল তার প্রেম-ধারণা। এ ধারণার পুরোটাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন ফারসী ও আরবী কবিতা থেকে। এর সাথে যোগ হয়েছিল কবির অল্প কালের ভ্রমণ ও স্বল্পকালীন প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা। নজরুলের প্রেমের বিষয় তাঁর গানেই উত্থাপিত হয়েছে বেশী। এধরনের গান ও গজলের সাথে সম্ভবত বাঙালি শ্রোতাদের ইতিপূর্বে তেমন করে পরিচয়ই ঘটেনি। বহু বিচিত্র রাগরাগিনীর মধ্যে তিনি তাঁর বাণীকে সার্থকভাবে অর্থবহ করে তুলতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলামের নাটক

আরিফুল হক

কাজী নজরুল ইসলামের নাটক নিয়ে তেমন কোন আলোচনাই হয়নি। বিদগ্ধজনেরা এমন এক মৌনভাব অবলম্বন করে থাকেন যাতে মনে হতে পারে কাজী নজরুল ইসলাম কোনদিন নাটক রচনায় হাতই দেন নি।

বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে দু'টি বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার মধ্যে একটি শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্যের দুই খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল বই 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', এবং অপরটি শ্রীঅজিতকুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'।

উক্ত গ্রন্থ দু'টিতে গেরাসিম লেবেদেফ থেকে ১৯৭০ সালের নাট্যকার নবকুমার গড়াই-এর নাটক পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। কেবল উহ্য থেকে গেছে নজরুলের নাম। নজরুল ইসলামের নাটক নিয়ে একটি লাইনও লেখা হয়নি এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থ দু'টিতে। বাংলা নাট্য সাহিত্যের আকরগ্রন্থ দু'টির গ্রন্থকারদ্বয় নজরুল ইসলামের নাটক সম্বন্ধে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থেকেছেন। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর দু'হাজার পৃষ্ঠার বিপুলায়তন বইটিতে নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে একটি লাইন-ই লিখেছেন। সে লাইনটি হল, মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত, শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' নাটকটির আলোচনা পর্বে শ্রীভট্টাচার্য্য লিখেছেন : "পাঁচ দৃশ্যের এই নাটকের জন্য কবি নজরুল ইসলাম সাতখানি গান লিখিয়া দেন"। একই ভাবে শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ; মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকটির আলোচনা-পর্বে লিখেছেন, "নাটকের গানগুলি নজরুল ইসলাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনা করিয়া দিয়াছেন"। কাজী নজরুল ইসলামের নাট্যচর্চা সম্পর্কে এই দুই গবেষকের এতটুকুই মূল্যায়ন।

তাদের মন্তব্য পড়লে মনে হয় নজরুল কেবল দুইখানি নাটকের জন্যই যেন গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু আসল সত্য হল, কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর গানের চাহিদা ছিল আকাশচুম্বী। তাঁর গান ছাড়া তৎকালীন

www.pathagar.com

গ্রামোফোন কোম্পানীগুলো অচল হয়ে পড়তো, কমার্শিয়াল থিয়েটারগুলোতে দর্শক সমাগম হত না। ফলে অনেক নাট্যকারের অনুরোধেই নজরুলকে মঞ্চ নাটকের জন্য গান লিখতে এবং সুর সংযোজনা করতে হয়েছে। আলোচকদ্বয়ের মন্তব্য অনুযায়ী উক্ত দু'টি নাটকের গীত রচনাতেই নজরুল সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটক ছাড়াও 'মহুয়া', 'সাবিত্রী', এবং 'সতী' নাটকের জন্য গান রচনা করে দিয়েছিলেন। শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' নাটক ছাড়াও 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সব ক'টি গান রচনা করেছিলেন। শুধু ঐ দু'জন নাট্যকারই নয়, তিনি প্রবোধ সান্যালের 'শ্যামলীর স্বপ্ন', মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর', সুধীন্দ্র রাহার 'সর্বহারা', দেবেন্দ্র রাহার 'অর্জুন বিজয়' প্রভৃতি নাটকের জন্যও গান রচনা এবং সুর সংযোজনা করেছিলেন। সে দিক থেকে উল্লিখিত গবেষকদ্বয় গীতিকার নজরুল ইসলামেরও পূর্ণ মূল্যায়ন করেন নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, একি তাদের অজ্ঞতা না উদাসীনতা?

কাজী নজরুল ইসলাম যে কত বড় মাপের স্রষ্টা ছিলেন তার পরিমাপ সেকালেও যেমন হয়নি, আজও তেমন হচ্ছে না। অথচ তাঁর সৃষ্টি-সম্ভারের দিকে একটু মনোনিবেশ করলেই আমরা বুঝতে পারবো, নজরুল নামটি এক নক্ষত্র বিজয়ীর,— আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে যাঁর অধিষ্ঠান। সৃষ্টির মহত্ত্বে, মৌলিকত্বে, পরিব্যাপ্তিতে একাধারে দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করা, অপর দিকে হৃদয়ের মাঝখানটিতে স্থান করে নেয়ার এমন চুম্বকপ্রতিম প্রতিভা আর কার ছিল? তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার, নাট্যকার, অভিনেতা এবং সংগীতশিল্পী। বহুমাত্রিক বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ তাঁর নাম। ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি, রাজনীতি এবং সমাজ-সচেতন এমন দক্ষ কবি, এমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ মানুষ বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে আর জন্মান নি। শত খণ্ড বই লিখেও যার মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, দুঃখের বিষয় তাঁকে নিয়ে আমাদের গবেষণা কাজ শুরু করাই হয়নি। তিনি আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেছেন।

নজরুল ইসলামের গান নিয়ে, কবিতা নিয়ে, ছোটগল্প, এমনকি, তাঁর উপন্যাস নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হলেও, কোন এক অজ্ঞাত কারণে নজরুলের নাট্যচর্চা বিষয়টি একেবারে অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। নজরুল ইসলাম যে একজন সফল নাট্যকারও ছিলেন সে বিষয়ে আলোচকগণ, ইতিহাস রচয়িতাগণ এমন মৌনভাব অবলম্বন করেছেন যাতে মনে হতে পারে, নাট্যকার হিসেবে নজরুল খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারেননি।

অথচ, নজরুল ইসলাম কবি হলেও নাটক দিয়েই তাঁর জীবন শুরু। সেই কৈশোর কালে, লেটোর দলে পালাগান রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের হাতে খড়ি। অল্প বয়সেই তাঁর কলমের সোনার কাঠির পরশে স্থূল গ্রাম্য রসের লেটোগান হয়ে উঠেছিল মার্জিত, গতিশীল এবং সর্বজনপ্রিয়। আপন প্রতিভা বলেই ১২-১৩ বছর বয়সেই তিনি লেটোর দলের উস্তাদের পদ পেয়ে যান, এবং সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ পালাকারের সম্মানে ভূষিত হন। দুর্ভাগ্যবশত লেটোদলের জন্য লেখা সবগুলো পালাগান উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যে ক'টা

www.pathagar.com

পাওয়া গেছে, তার মধ্যে আছে— আকবর বাদশা, রাজপুত্র, কবি কালিদাস, চাষার সং, ঠপুরের সং, মেঘনাদ বধ, শকুন বধ, দাতাকর্ণ প্রভৃতি। পালাগানগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যে, লেখার চমৎকারিত্বে সেকালেই বাংলা সাহিত্যে একজন সফল নাট্যকারের আগমন সূচিত করেছিল।

নাটককে বলা হয় 'আর্ট অভ্ ক্রাইসিস'। সে দিক থেকে নজরুল ইসলামের পুরো জীবনটাই ছিল নাটক। জীবনের ক্রাইসিস মোকাবেলা করতে করতেই এক দিন তিনি ক্লাইমেক্সে চলে গেলেন। লেটোদলের পাঠ চুকিয়ে তিনি এলেন কবি গানের দলে, সেখানেও তাঁর কাজ হল পালাগান রচনা করা। ১৯২৩ সালের শেষ দিকে বহরমপুর জেলে বসে, কয়েদীদের অনুরোধে, দুর্গাপূজা উপলক্ষে অভিনয় করার জন্য তিনি একটি নাটক লেখেন। সম্ভবত সেটাই ছিল কবি নজরুলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা। নাটকের পাণ্ডুলিপিটি তিনি জেলের বাইরে পাঠাতেও সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আর সেটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

১৯২৮ সালের দিকে কবি যখন গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগ দিলেন, তখন তাঁর নাট্যরচনার আর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। এ সময় তিনি গ্রামোফোন রেকর্ড উপযোগী বহু একাঙ্কিকা, যাকে রেকর্ড নাটক বলা যেতে পারে, সেই ধরনের নাটক রচনা করেছিলেন। যেগুলির অন্যতম ছিল শিশুদের জন্য লেখা নাটক। সম্ভবত কাজী নজরুল ইসলামই ছিলেন এই ধরনের রেকর্ড নাটক রচনার সার্থক পথিকৃত। দু:খের বিষয় তাঁর সবকটি রেকর্ড নাটকের তালিকাও পাওয়া যায়নি, এবং সেগুলি উদ্ধার করাও সম্ভবপর হয়নি। যে ক'টি মাত্র উদ্ধার করা গেছে সেগুলির মধ্যে আছে, ঈদুল ফিতর, খুকী ও কাঠবিড়ালী, আল্লার রহম, কবির লড়াই, কলির কেষ্ট, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, বনের বেদে, শ্রীমন্ত, কালোয়াতী কসরত, পুতুলের বিয়ে, পুরোনো বলদ, নতুন বৌ, বাঙালীর ঘরে হিন্দি গান, বিলাতি ঘোড়ার বাচ্চা, ছিনি মিনি খেলা, জুজুবুড়ির ভয়, পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার প্রভৃতি। নজরুল ইসলামের রেকর্ড নাটক তৎকালীন গ্রামোফোন রেকর্ডের চাহিদাকে বিস্তৃত করেছিল। নাটকগুলির বিষয়বস্তু, সংলাপ মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত।

১৯৩১ সালের আগেই রঙ্গমঞ্চের সাথে কবির যোগাযোগ ঘটে। ১৯৩১ সালের দিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় হাত দেন। 'আলেয়া' এবং 'মধুমালা', এই পূর্ণাঙ্গ নাটক দু'টি এই সময়েরই রচনা। 'আলেয়া' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় কলকাতার 'নাট্যনিকেতন' রঙ্গমঞ্চে, ১৯৩১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বিকাল ৫টায়। এবং 'মধুমালা' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় নাট্যভারতীর উদ্যোগে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে (যা পরবর্তীকালে 'গ্রেস' সিনেমা নামে পরিচিত) ১৯৪৫ সালে। 'মধুমালা' কাজী নজরুল ইসলামের সর্বাধিক মঞ্চসফল নাটক। একাদিক্রমে চল্লিশ রজনী অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অভিনীত হওয়াই নাটকটির মঞ্চ-সফলতা প্রমাণ করে। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন সে যুগের তারকাশিল্পীরা। যেমন জহরগাঙ্গুলী (রাজকুমার), সাবিত্রী (মধুমালা), রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ

www.pathagar.com

প্রমুখ। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং সংগীত পরিচালনা করেছিলেন কবি স্বয়ং। সংগীতবহুল এই নাটকের মূল গানগুলি গাইতেন সে যুগের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতি রাধারাণী ও শ্রীমতি হরিমতি দেবী।

নজরুল ইসলামের নাটকের সংখ্যা যে কত, তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। কারণ, তাঁর সবগুলো নাটক সংরক্ষিত হয়নি। অনেকের মতে তিনি ছোট বড় মিলিয়ে একশোটিরও বেশী নাটক রচনা করেছিলেন; যার মধ্যে চল্লিশটি মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 'আলেয়া' ও 'মধুমালা' ছাড়াও কবির অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'সেতুবন্ধ' (১৩৩৭), 'ঝিলিমিলি' (১৩৩৭), 'শিল্পী' (১৩৩৭), 'ভূতের ভয়' (দেশাত্মবোধক নাটক), 'বিদ্যাপতি' (১৩৭৭), 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'শ্রীমন্ত', 'সাপুড়ে' প্রভৃতি নাটক।

১৯৩৮ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেবার পর কবি অসংখ্য গীতি নাট্য ও গীতি-আলেখ্য রচনা করেন। সুরেশ চক্রবর্তীর ভাষায়— "সেগুলো একশোর বেশী হবে"। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে '৪৭-এর পর সেগুলোর বেশীর ভাগই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। যে ক'টি মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে— 'অতনুর দেশ, 'ছন্দসী', 'কাবেরী তীরে', 'গুলবাগিচা', 'কাফেলা', 'বনের বেদে', 'নীলাম্বরী', 'আকাশবাণী', 'অন্নপূর্ণা', 'দেবীস্তুতি', 'হরপ্রিয়া', 'দশমহাবিদ্যা', 'বিজয়া', প্রভৃতি।

বাংলা সংখ্যাগুরু মানুষের জাতীয় উৎসব 'ঈদুল ফিতর'। এই মহোৎসব বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে নাট্য সাহিত্যে একেবারেই অনুল্লেখ ছিল। মহান ঈদ উৎসব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে দু'টি মাত্র নাটিকা রচিত হয়েছে, তার রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।

শিশুদের নিয়েও কবি অনেক উন্নতমানের নাটক রচনা করেছেন।

কবির সব নাটকই যে খুব উন্নতমানের, এমন দাবি আমরা করছি না। একজন স্রষ্টার সব সৃষ্টিই উন্নতমানের হবে, এমন আশা করাটাও সমীচীন নয়। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, কাজী নজরুল ইসলামের অধিকাংশ নাটকই বাংলা নাট্যধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল গতিবেগ সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল।

নজরুল যখন নাট্যজগতে আবির্ভূত হলেন, তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চে চলছিল পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের যুগ। নজরুলই প্রথম পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে ভিন্নতর বিষয়ের অবতারণা করলেন। নজরুল ইসলাম এলেন, নাটকের বিষয়বস্তুতে, সংলাপে, দৃশ্যপটে পরিবর্তন এলো। যুগ পরিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ্য করা গেল। সেদিক থেকে বিচার করলে নজরুল ইসলামই ছিলেন বাংলা নব নাট্য-চর্চার পথিকৃৎ বা পুরোধা পুরুষ।

কাজী নজরুল ইসলামের নাট্যচর্চা নিয়ে ইতিহাসবিদ, সমালোচক জীবনীকারদের মৌনী ভাব অবলম্বন সত্যই বড় বিস্ময়কর। অথচ প্রকৃত ইতিহাস বলছে যে, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মীর মোশার্‌রফ হোসেনের আদর্শ। উত্তর তিরিশের সকল মুসলিম নাট্যকারের পথ-প্রদর্শক, অনুপ্রেরণাস্থল ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এছাড়াও তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকার। নাট্যকলার এতগুলো পথে বিচরণ করার পরও তাঁর

www.pathagar.com

নামটি ইতিহাসবিদগণের কাছে কেন যে অজানা রয়ে গেল, সে বিষয়টিও গবেষণার বস্তু হতে পারে। নজরুল-পরবর্তী সময়ে বাংলা নাট্য-চর্চায় যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁদের মধ্যেও নজরুল লিখিত নাটকের খোঁজ খবর নেয়ার আগ্রহও তেমন একটি দেখা যায় না। আমাদের মঞ্চে, টেলিভিশনে নজরুলের গল্প উপন্যাসের কিছু কিছু বিকৃত নাট্যরূপ প্রচারিত হলেও তাঁর মূল নাটক থেকে গেছে অবহেলিত। এই অবহেলার কারণ নজরুল-নাটক সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতাসূচক অবহেলা। এদেশে ফরাসী, জার্মানী, ইতালীয়, মার্কিনী নাটক নিয়ে আলোচনা হয়। মোটা মোটা বই লেখাও হয়। সেই সব বই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপাও হয়, কেবল বাদ পড়ে যান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের নাটক নিয়ে সামান্য ছিটে-ফোঁটা আলোচনাও এদেশের কোথাও হয় না। যার ফলে নাট্যকর্মীরা জানতেও পারে না কি বিপুল নাট্য-সম্ভার কবি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। স্বাধীনতার পর এদেশের মঞ্চে, টেলিভিশনে হাজার হাজার নাটক অভিনীত হচ্ছে, কিন্তু নজরুল ইসলামের মৌলিক কোন নাটক কোথাও অভিনীত হয়েছে বলে শোনা যায়নি। এদেশে ইস্কাইলাস, এরিস্টোফেন, ইউরিপিদিস থেকে টেনেসি উইলিয়াম পর্যন্ত শত শত নাট্যকারের নাটক নিয়ে আলোচনা হয়, কেবল নজরুল থাকেন উহ্য। জর্মন নাট্যকার বার্টল্ট ব্রেখট, রাশিয়ান নাট্যকার আন্তন শেখভ, নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন, রুমানিয়ার নাট্যকার ইউজিন আয়োনেস্কো, ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার, জাঁ-পল সাঁত্রে, ইতালীয়ান নাট্যকার লুইগী পিরানদেল্লো, ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপীয়ার, ক্রীস্টোফার মার্লো, শেরিডন, সুইডিশ নাট্যকার স্ট্রিণ্ডবার্গ, আইরিশ নাট্যকার বার্নাড শ, শিনজে, আমেরিকান নাট্যকার আর্থার মিলার, ইউজিন ওনীলসহ পৃথিবীর প্রায় সবদেশের নাটকই এদেশে অভিনীত হয়েছে এবং হচ্ছে, কেবল নজরুল ইসলামের মৌলিক নাটকগুলোই পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। এর কারণ কি তবে নজরুল ভাল নাটক লিখতে ব্যর্থ হয়েছেন, নাকি নজরুল নাটক সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ?

কাজী নজরুল ইসলামের বেশীর ভাগ নাটকই রূপক-সাংকেতিক শ্রেণীর নাটক। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই শিল্পরীতির নাটক বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লেখেন নি। রূপক নাটক সেইটাই যেটা স্বাভাবিক বা বাস্তবিক রচনা নয়। অর্থাৎ রূপক নাটকের কাহিনী বা ঘটনার ভিতর দিয়ে অন্য কোন ঘটনা, নীতি বা তত্ত্বকে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। আর সাংকেতিক নাটকে থাকে পদার্থের ধ্বনি সংকেত বা চিহ্ন। অর্থাৎ সাধারণভাবে লেখক যা ব্যক্ত করতে চান, তার চাইতেও অতিরিক্ত, এবং তদতীত বিষয়ের ব্যঞ্জনাসহ এক অতীন্দ্রিয় রহস্যময় আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতীক নাটকে ফুটে ওঠে। পাশ্চাত্য এক ধরনের নাটক দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হয়ে দর্শকদের রসপিপাসা তৃপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, জার্মান নাট্যকার হাউপট্‌ম্যান, রুশ নাট্যকার আন্দ্রিভ, এমন কি, ইবসেন ইউজিন ওনীলের নাটকেও বাস্তবতার পাশাপাশি রূপক ও সংকেত-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাংলার নাট্য সাহিত্য সব চেয়ে অনুন্নত থাকায় এবং বাংলা নাট্যদর্শকের অধিকাংশের রুচি যথেষ্ট মার্জিত এবং রসবোধ সূক্ষ্ম ও উন্নত না হওয়ায়, রূপক-সাংকেতিক নাটকের গূঢ়

www.pathagar.com

সৌন্দর্যবোধ তাদের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারে না। যার ফলে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিও তার যুগে জনপ্রিয় হয় নি। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, ডাকঘর, তাসের দেশ প্রভৃতি নাটকগুলিও তার যুগে জনপ্রিয় করার পেছনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী এবং কিছু রবীন্দ্রপ্রেমী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিরলস প্রচেষ্টা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রভূত অবদান রেখেছে। দু:খের বিষয়, কাজী নজরুল ইসলামের আলেয়া, মধুমালা, সেতুবন্ধ, ঝিলিমিলি প্রভৃতি নাটকগুলি তেমন কোন পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। এ নাটকগুলি যদি কোন ভাল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান, সৃষ্টিশীল নাট্য পরিচালক, দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর আগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেত তা হলে এ গুলিও বহুল পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হত। কারণ, নজরুলের কবিতা এবং গানের মত তাঁর নাট্যসৃষ্টিও অভিনব শিল্পরীতি এবং ভাব ও রসবোধের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির গুণে বাংলা নাট্য ইতিহাসে চিরন্তন আসন লাভের যোগ্য এক অপরূপ সৃষ্টি। এখন তাঁর কয়েকটি নাটক নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে দেখা যাক।

নজরুল ইসলামকে মূলত বিদ্রোহী কবি বলা হলেও নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। সেখানে বিদ্রোহ নেই, সংগ্রাম নেই। অরূপ সত্তার দীপাবরণ সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিক ধ্যান-মৌনী এক স্রষ্টা যেন চারিদিকে রহস্যজাল বিছিয়ে বসে আছেন। নজরুল ইসলামের বেশীর ভাগ নাটকই কাব্যধর্মী এবং প্রতীকধর্মী। শিল্পীর কাজ ভাবকে প্রকাশ করা। কিন্তু এমন কতকগুলো সূক্ষ্ম এবং শুধু অনুভবগম্য ভাব আছে যা প্রকাশ করার মত ভাষা পাওয়া যায় না, সেই ভাব প্রকাশের জন্য শিল্পীকে প্রতীক বা সংকেতের আশ্রয় নিতে হয়। শিল্পীর প্রতীক বা সংকেত যখন দর্শক-কল্পনায় এক নতুন রাজ্যের দুয়ার উন্মোচন করে দেয়, তখনই সাংকেতিক বা রূপক সৃষ্টি সফলতা লাভ করে। জার্মান নাট্যকার হাউপট্ম্যান, নরওয়ের নাট্যকার ইবসেন– তাঁদের নাটকে এই প্রতীকধর্মিতার যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। যেমন, সুপরিচিত A Doll's House নাটকটিতে নাট্যকার ইবসেন নোরার অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব এবং তার পরিণাম বুঝাবার জন্য Tarantella নামক ঘূর্ণি নাচের অপূর্ব প্রতীক ব্যবহার করেছেন।

কবি নজরুল ইসলামের 'আলেয়া' নাটকটিও একটি সার্থক প্রতীকধর্মী নাটক। নাটকটি মানব-মানবীর প্রেম-ভালবাসার কাহিনী নিয়ে লেখা হলেও, এর প্রতিটি চরিত্রই এক বিশেষ ভাব বা ধারণার প্রতীক। যেমন, 'আলেয়া' নামটিও প্রতীকধর্মী। নর-নারীর প্রেম-ভালাবাসাকে আলেয়ার আলোর সাথে তুলনা করে কবি বলতে চেয়েছেন, আলেয়ার আলো যেমন মানুষকে ঠকায়, দিক ভ্রান্ত করে, নর-নারীর প্রেমও তদ্রূপ। আলেয়া নাটকে গান্ধার রাজ মীনকেতু রূপ সুন্দর যৌবনের প্রতীক। তার রূপ যৌবনে মুগ্ধ হয়ে গান্ধার আক্রমণ করলেন যৈশল মীরের রুক্ষ তেজী বহ্নিশিখার মত রূপসী জয়ন্তী। জয়ন্তীর সেনাপতি, শক্তিমাতাল, লোভী, ক্ষুধা এবং শক্তির প্রতীক উগ্রাদিত্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করলেন গান্ধার রাজ মীনকেতুর সেনাপতি, ত্যাগ ও মহিমা সুন্দরের প্রতীক চন্দ্রকেতুকে।

www.pathagar.com

উগ্রাদিত্য শক্তিধর। কিন্তু এই শক্তির গোপন উৎস রাণী জয়ন্তীর প্রতি তার গোপন ভালবাসা। সেনাপতির পরাজয়ের পর মূল দ্বন্দ্ব শুরু হল রাজা মীনকেতু এবং জয়ন্তীর সেনাপতি উগ্রাদিত্যের মধ্যে। এমন সময় মঞ্চে আবির্ভূতা হন রাণী জয়ন্তী। নাটকের এই জায়গাটি সত্যই অপূর্ব।

[মীনকেতু তরবারি মোচন করিয়া জয়ন্তীর দিকে এবং জয়ন্তীও মীনকেতুর দিকে অভিভূতের মত বুভূক্ষু দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল]

উগ্রাদিত্য : রাণী, আমি কি এদের বন্দী করতে পারি?

জয়ন্তী : উগ্রাদিত্য, পরাজিত হলেও ইনি সম্রাট। ওঁর সম্মান রেখে কথা বল।

উগ্রাদিত্য : মার্জনা কর রাণী, যে পরাজিত হয়, তার বন্দী ছাড়া আর কোন সংজ্ঞা নেই! সম্রাট হলেও সে বন্দী।

জয়ন্তী : বন্দী করতে হয়— আমি নিজ হাতে বন্দী করব।

মীনকেতু : (সম্বিত ফিরে পেয়ে) তুমি কোন্ পথ দিয়ে এলে, রাণী?

জয়ন্তী : তোমার পরাজয়ের পথ দিয়ে সম্রাট। এখন তুমি স্বেচ্ছায় বন্দী হবে না যুদ্ধ করবে?

মীনকেতু : যুদ্ধ? কার সাথে যুদ্ধ, রাণী— যেদিন তুমি আমার রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করেছ, সেইদিনই ত আমার পরাজয় হয়ে গেছে।

জয়ন্তী : .... আমার কাছে না হয় হার মানলে, কিন্তু ঐ উগ্রাদিত্য, আমার সেনাপতি, ওর কাছেও কি পরাজয় স্বীকার করবে?

মীনকেতু : হ্যাঁ, ওর সাথে যুদ্ধ করা যায়। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব সেনাপতি। কিন্তু কি পণ রেখে যুদ্ধ করবে তুমি?

উগ্রাদিত্য : (জয়ন্তীকে দেখাইয়া) আমার পণ এই অমৃতলক্ষ্মী, যার লোভে আমি পাতাল ফুঁড়ে ঐ অমৃত লোকে উঠে গেছি শক্তির ছদ্মবেশে। তাকে যদি আজ জয় করতে না পারি, তাহলে আমার তোমার হাতে মৃত্যুই তার উপযুক্ত শাস্তি।

জয়ন্তী : (দৃপ্তকণ্ঠে) উগ্রাদিত্য! তুমি তাহলে ছদ্মবেশী লোভী, শক্তিধর নও?

উগ্রাদিত্য মীনকেতুকে জিজ্ঞাসা করল তার পণ কী? মীনকেতুও ঐ একই উত্তর দিল, আমার পণ ঐ অমৃতলক্ষ্মী। এই কথায় জয়ন্তী ক্ষণিকের জন্য যেন কেঁপে উঠলো। তবে কি মীনকেতুর বুকেও পাওয়ার লোভ? জয়ন্তীকে পণ রেখে মীনকেতু এবং উগ্রাদিত্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে উগ্রাদিত্য নিহত হলেন। উগ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর জয়ন্তীর সব কিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেল। তিনি মীনকেতুকে বলছেন :

জয়ন্তী : আমি তোমার বন্ধু হতে এসেছিলাম! হয়তো-বা বন্ধন নিতেও এসেছিলাম! কিন্তু সে বন্ধন আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ছিন্ন হয়ে গেল। উগ্রাদিত্যের মৃত্যুর

www.pathagar.com

সাথে সাথে আমার হৃদয়ের সকল ক্ষুধা, সকল লোভের অবসান হয়ে গেল। আমি আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী।

মীনকেতু : জয়ন্তী! তুমি কি তবে ওকে ভালবাসতে। তাহলে জয় করেও কি আমার পরাজয় হল? উগ্রাদিত্য মরে হল জয়ী। যাকে পণ রেখে জয় করলুম— সে কি আপন হল না!

জয়ন্তী : কায়াহীন ভালবাসা নিয়ে যারা তৃপ্ত হয়, তুমি ত তাদের দলেরও নও মীনকেতু। তুমি চাও জয়ন্তীকে, এই মুহূর্তের রিক্তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না। যে তেজ যে দীপ্তির জোরে তোমায় জয় করলুম— সেই ত ছিল উগ্রাদিত্য! তোমার হাতে তার পতন হয়ে গেছে! বন্ধু! বিদায়!

বিচিত্র রহস্যে ঘেরা এই প্রেম যেন আলেয়া। জয়ন্তী মীনকেতুকে পেয়েও গ্রহণ করল না। আবার যার সাথে দীর্ঘদিন কাটাল সেই সেনাপতি উগ্রাদিত্যকে ভালাবাসার কথাও জয়ন্তীর মনে উদয় কখনও হয়নি। অথচ তারই মৃত্যুতে সে শোকাভিভূতা, রিক্তা। আলেয়া নাটকে প্রেমের যে উপাখ্যান তুলে ধরা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতীন্দ্রিয় প্রেম। এ প্রেম রাধাকৃষ্ণের প্রেম নয়। শিরি-ফরহাদের প্রেম, লায়লী মজনুর প্রেম। পাওয়ায় নয়, ত্যাগেই যার মাহাত্ম্য।

আলেয়া নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য এর সংলাপ। সংলাপের সুরময় গীতিছন্দ, অনুপ্রাস, বিশেষণের প্রয়োগ আমাদের চমৎকৃত করে। যেমন, কৃষ্ণার সংলাপে আছে: "আমি ফুলবনে আসি কবি। তবে তোমাদের মত আড়ম্বর নিতে আসিনে। আমি কৃষ্ণা নিশিথিনী। নীরবে আসি নীরবে যাই।"

কবির সংলাপে আছে "বোতলকে মাতাল হতে কে দেখেছে কবে, সম্রাট! ওদের যে অন্তরে বাহিরে সুধা। ওদের দরকার হয়না।" মীনকেতুর একটি সংলাপে আছে: "রামধনু মিথ্যা বলেই ত এত সুন্দর!"

এসব সংলাপ তো বারবার উচ্চারণ করার মত। ভাষার উপাদান দিয়ে জীবনের যে রসরূপ তিনি সৃষ্টি করেছেন! এক কথায় তা অনবদ্য। কবি ছিলেন সুরের রাজা। এই নাটকে তিনি সংগীতকে ভাব প্রকাশের আর এক বাহনে পরিণত করেছেন।

'মধুমালা' নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামের সবচেয়ে মঞ্চ-সফল নাটক। আগেই বলা হয়েছে এই নাটকটি ১৯৪৫ সালে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে একাধারে চল্লিশতম রজনীর সফলতা অর্জন করেছিল। পূর্ববঙ্গ গীতিকার এক লোক- কাহিনীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 'মুধমালা' নাটক। মধুমালা নাটকের কাঠামোটি রূপকধর্মী হলেও এর কাহিনী কখনও আকাশচারী হয়নি বা আষাঢ়ে গল্পের রূপ নেয়নি। অপার্থিব অলৌকিক পরিবেশে যে সব ঘটনা ঘটেছে, সবই যেন কাঞ্চন নগর—সন্দীপের, অর্থাৎ এই পার্থিব ধুলা মাটির গল্প। নাট্যকার নজরুল ইসলাম এই রূপকধর্মী নাটকে যথেষ্ট মানবিক চেতনা সঞ্চারিত করেছেন, এখানেই নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য। এ নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এর অসাধারণ গতিময়তা।

www.pathagar.com

মধুমালাও একটি ত্রিভুজ প্রেমের নাটক। কিন্তু সে প্রেম ভোগসর্বস্ব প্রেম নয়, সে প্রেম ত্যাগের স্বর্গরাজ্য নির্মাণের প্রেম। সে প্রেম গোপনে সংরক্ষিত রাখার প্রেম। মধুমালা–কাঞ্চনমালা উভয়ের প্রেমই ত্যাগের সৌন্দর্য্যে অবগাহন করে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মধুমালার ভাষা ও সংলাপ যেন বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত। মদনকুমার বলছে: "আসে আসে আমার সুন্দর রুদ্রের রূপে আসে। ঐ বিজলী শিখায় তার সোনার কাঁকনের ঝিলিক। ধূলি গৈরিক গগন কোণে দোলে তার চন্দন রং উত্তরীয়। পুঞ্জিত কালো মেঘে তার কেশভার। ঝঞ্ঝার রাতে অসীম বিরহের আর্তরোদন ধ্বনি আমি শুনেছি, মরণের মাঝে তোমার আহ্বান আমি শুনেছি, মধুমালা।" মধুমালার একটি সংলাপ: "চাঁদ ওঠে কোন দূর আকাশে, তবু পৃথিবীর সাগরের বুকে জাগে আনন্দ-জোয়ার। সে আর তখন কূলের বন্ধন মানেনা, তরঙ্গের পাখা মেলে সে উড়ে যেতে চায় আকাশে। চাঁদ ওঠার খবর সাগর কি করে পায়? কোন আঁধার বনে ফোটে ফুল— ভ্রমর কেমন করে জানতে পারে? আমার চাঁদ উঠেছে দূর দিগন্তে, তাই ঝিলের জলের কুমুদিনীর মত আমার সারা অঙ্গে জেগেছে না-জানা আনন্দের আবেশ।" এ যেন কবিতা না হয়েও কবিতা, Verse না হয়েও Verse। এসব সংলাপ বিশ্বনাটকের যে কোন বড় নাট্যকারের সংলাপের সাথে তুলনা করা চলে।

'সেতুবন্ধ' কবির আর একটি তিন দৃশ্যের রূপক একাঙ্কিকা। প্রকৃতি এবং মানব-শক্তির দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এ নাটকের আখ্যানভাগ। যন্ত্রশক্তির বলে বলীয়ান মানুষ অসীম শক্তির উৎস প্রকৃতিতে বশ মানাতে চায়। কিন্তু নাটকের পরিণতিতে দেখা যাবে সে প্রকৃতির কাছে পরাস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক তাণ্ডবে মানব-নির্মীত সেতু ভেঙে পড়েছে। কেউ হয়তো বলবেন প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাজয়, মানুষের অগ্রগতির পথরুদ্ধ করে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু তারা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই অনুধাবন করবেন যে, সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই মানুষের সাথে প্রকৃতির সংঘাত চলছে। যতই মানুষ পরাজিত হচ্ছে ততই উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন কৌশল, ততই মানুষ বিজ্ঞানমুখী হয়েছে। নাটিকার পরিণতিতে সেতু ভেঙে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের সংগ্রাম যে অব্যাহত থাকবে সে কথা কবি উপেক্ষা করেন নি।

এই নাটকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এই নাটকের চরিত্রগুলি প্রাণহীন জড় পদার্থ; যেমন মেঘ, বৃষ্টি, তরঙ্গ, পদ্মা, ঝড়, বজ্রশিখা, ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি। কবি এই সব প্রাণহীন পদার্থকে এই নাটকে সজীবতা দান করেছেন। পঞ্চইন্দ্রিয়ের মানব চরিত্র নাটকে যা যা করে এই প্রাণহীন চরিত্রগুলিও তাই করেছে। এই ধরণের প্রচেষ্টা বাংলা নাটকে আর দেখা যায় না। নাটিকাটির অপর বৈশিষ্ট্য এর সংলাপ। সংলাপ রচয়িতা হিসেবে নজরুল বিশ্বের যে কোন সেরা নাট্যকারের সাথে তুলনীয়।

'ভূতের ভয়' নাটকটি কবির একটি দেশাত্মবোধক নাটিকা। এই নাটিকাটিকে ঐতিহাসিক রূপক নাটিকা বলা যেতে পারে। এই নাটিকাটিতে তিনি তৎকালীন পরাধীন ভারতের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ভূতেরা স্বর্গরাজ্য দখল করেছে। দেবতাগণ তাদের তাড়ানোর জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত। কিন্তু দেবতারা আজ দ্বিধা বিভক্ত। এই নাটিকাটিতে কবি জাগরণের এক ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তত্ত্বকে এমন সার্থক রসরূপ রূপায়িত করার চেষ্টা আর কোন রূপক সাংকেতিক নাটকে বড় একটা দেখা যায় না। সমসাময়িক ঘটনা, চরিত্রচিত্রণ এবং গতিধর্মিতার দিক থেকে 'ভূতের ভয়' সার্থক নাট্যকর্মের শ্রেণীভুক্ত।

'ঝিলিমিলি' নাটিকাটি মুসলিম লেখক লিখিত প্রথম রূপক-সাংকেতিক নাটক। এখানে রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রূপক নাটকের উদ্দেশ্য কোন নীতিকথা বা তত্ত্বকথাকে চিত্তাকর্ষক ভাব প্রকাশ করার জন্য, নাটকের মূল আখ্যানভাগের পেছনে এক ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করে। আর সাংকেতিক নাটকের কাজ হল, নাট্যকার যখন এক অপার্থিব, অজ্ঞেয় অদৃশ্য জগতের বিশেষ অনুভূতিগুলোকে কোন সংকেতের মাধ্যমে রূপদানের চেষ্টা করেন তখন তা হয়ে ওঠে সাংকেতিক নাটক বা শিল্প। কিন্তু কখনও কখনও তত্ত্ব এবং ভাবকে নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। রূপক নাটকের সীমানায় পড়লেও এ ধরনের নাটককে দ্বৈত রূপের নাটক অর্থাৎ রূপক-সাংকেতিক নাটক বলা যেতে পারে। হাউপটম্যান এবং আন্দ্রিভ এই শ্রেণীর নাট্যকার। এদের নাটকে রূপকের ছদ্মাবরণে অতীন্দ্রিয় জগতের সংকেত পাওয়া যায়।

ঝিলিমিলি নাটকটি রূপক-সাংকেতিক শ্রেণীর নাটক। অনেকে এই নাটকের সাথে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের সাযুজ্য খুঁজে পান। দুটো নাটকই রূপক-সাংকেতিক শ্রেণীরে নাটক। দুটি নাটকেরই মূল চরিত্র তিনটি। ডাকঘরে অমল, সুধা, মাধবদত্ত। আর 'ঝিলিমিলি'তে হাবিব, ফিরোজা আর মির্জা সাহেব। তবু দুটো নাটকে পার্থক্য অনেক। 'ডাকঘরে' আছে অরূপের স্বপ্ন, অপার্থিব প্রেম, সংসারের বন্ধন মুক্তি। আর 'ঝিলিমিলি' বাস্তব, অতীন্দ্রিয় মানব প্রেম এবং সামাজিক। নজরুলের নাটকে বাস্তব কাহিনী নেই বলে যারা অভিযোগ করেন, এই নাটকটি তাদের অভিযোগ খণ্ডন করবে।

'ঝিলিমিলি' নাটকটি কবি ১৯৩০ সালের দিকে রচনা করেন। অর্ধশতাব্দী পূর্বের রচিত এই নাটকটির অত্যাধুনিক উপস্থাপনা আমাদের বিস্মিত করে। আধুনিক নাট্যউপস্থাপনায় 'টোনাটুনি'র গল্পকথার মত: 'এক যে ছিল টোনা, তার ছিল এক টুনী', এই ভাবে গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপস্থাপনা করা হয় না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আহরিত টুকরো ঘটনাসমূহ একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা তত্ত্বকে উপস্থাপন করাই আধুনিক নাটকের রীতি। কবির 'ঝিলিমিলি' নাটকটির উপস্থাপনা রীতি অত্যাধুনিক নাটকের সমতুল্য। সেদিক থেকে কবিকে আধুনিক বাংলা নাটকের দিশারী বলা যেতে পারে।

কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকটি মাত্র নাটক নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল। নাট্যকার নজরুলের পরিচয় দিতে হলে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে রূপক সাংকেতিক নাটক লিখে যে ক'জন যশস্বী হয়েছেন, নজরুল

www.pathagar.com

ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম কাতারের নাট্যকার। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন সার্থক গীতিনাট্য রচয়িতা। রেকর্ড নাটক, বেতার নাটক, গীতিনাট্য রচনার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন পথ-প্রদর্শক এবং অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। উত্তর-তিরিশ মুসলিম নাট্যকারদের তিনিই ছিলেন দিশারী পুরুষ।

বাংলার নাট্য ইতিহাসে যার এতবড় অবদান, তার খবর বিদগ্ধ ইতিহাস রচয়িতাগণ রাখেন না, এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়। যে দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল, এবং যে দেশের নাট্য-চর্চার অগ্রগতি নিয়ে জাতি গর্ব করে, সেই দেশের নাট্যশিল্পীরাও শতাধিক নাটকের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলামের একটি মৌলিক নাটকেরও খোঁজ রাখেন না, এ ট্রাজেডী কার? কবির, না আমাদের? শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীঅজিতকুমার ঘোষদের মত ইতিহাস রচয়িতার কাছে নজরুল উপেক্ষার পাত্র হতে পারেন, তাঁরা সত্য ইতিহাস উপেক্ষা করতে পারেন কারণ নজরুলকে তাঁরা আপন গোত্রের মনে করেন না। কিন্তু আমরা কি পারি না ঐতিহাসিক পটভূমিতে আমাদের জাতীয় কবির নাটকের মূল্যায়ন করে কবির প্রতি সুবিচার করতে। তাঁর নাট্যচর্চাকে বিশ্বময় পরিচিত করে তুলতে? তাঁর মৌলিক নাটকগুলো নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রযোজনায় হাত দিয়ে আমরা কবির নাট্যচর্চার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি। তাঁর সবকটি নাটকের উদ্ধার কার্যে এগিয়ে আসতে পারি, এবং যে ক'টি উদ্ধার করা গেছে সেগুলির উপর সঠিক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে নজরুল নাটককে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। এ কাজটি কবির জন্ম-শতবার্ষিকীর পূর্বে হলেই কবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হয়ে উঠবে।*

---

* ৩১ অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় নজরুল একাডেমীতে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

নজরুল-কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ

মুনীর চৌধুরী

কোন কবির পরিচয়কে বিশেষণের দ্বারা খণ্ডিত করে বিচার করতে বসায় কিছু বিপদ আছে। কিছু সার্থকতাও আছে। বিপদ এই জায়গায় যে কবির শিল্পী-সত্তা একক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, অবিভাজ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন। একটা বিশেষণের দ্বারা তাকে চিহ্নিত করতে গেলেই অন্য একটা বিপরীত বিশেষণ দশদিক থেকে ছুটে এসে অনর্থ বাঁধিয়ে দিতে চায়। তবু আমরা সম্পূর্ণকে বর্জন করে অংশকে বড়ো করে দেখাই। কবির সমগ্র প্রকাশকে নানা খণ্ডে ভাগ করে তার একেক দিক নিয়ে আলোচনা করি। এভাবে অগ্রসর হওয়ার সার্থকতা এই জায়গায় যে, কবিতার নানা স্তরের বিচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়েই আমরা তার সামগ্রিক স্বরূপকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি, বিপ্লবের কবি, শান্তির কবি, সাম্যের কবি। তিনি প্রেম ও অপ্রেমের, হিংসা ও ভালবাসার মিলন ও সংঘাতের কবি। আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, ধার্মিকতা ও অধার্মিকতা, ইসলাম ও অনৈসলাম সবই নজরুল-কাব্যে পাশাপাশি আবিষ্কারযোগ্য। সবকিছু মিলিয়েই নজরুল ইসলাম কবি। আমাদের আজকের আলোচনার বিশিষ্ট লক্ষ্য নজরুল-কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ বর্ণনা করা। তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা, তার মূল্য বিচার করা।

ভাব ও বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সমগ্র নজরুল-কাব্যকে, দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক শ্রেণীতে পড়বে, 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদ', 'সর্বহারা', 'ফণী-মনসা', 'জিঞ্জীর,' 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়-শিখা'। 'দোলন-চাঁপা 'ছয়ানট;' 'পূর্বের হাওয়া, 'সিন্ধু হিন্দোল', 'চক্রবাক' এগুলোর কাব্যধর্ম পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের। নিজেদের দেশ-জাতি ধর্ম সম্পর্কে কবি তাঁর আশা-আকাঙ্খা, ক্ষোভ-হতাশা, রোষ-উল্লাসকে প্রকাশ করেছেন প্রথম পর্যায়ের রচনাবলীতে। এখানে আবেগের প্রখরতার সঙ্গে মত বা বক্তব্য প্রচারের তাগাদা প্রায় সমপরিমাণে মিশ্রিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যগহনে প্রেমাশ্রিত অন্তরংগ ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগই সার্বভৌম। নজরুলের উত্তরকাব্য 'নতুন চাঁদ' ও 'শেষ সওগাতে' উভয় ধর্মের কবিতাই সংকলিত হয়েছে। স্বভাবতই আমাদের আলোচনার প্রধান অবলম্বন হবে প্রথম

www.pathagar.com

ধারার কাব্য গ্রন্থসমূহ। এগুলোর মধ্যে 'অগ্নিবীণাই প্রধান। বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নজরুলের কৃতিত্ব এই গ্রন্থেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কবিতায় সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। 'কামাল পাশা' 'আনোয়ার' 'শাতইল আরব,' 'খেয়া-পারের তরুণী,' 'কোরবানি', 'মোহররম' সবই অগ্নি-বীণার কবিতা। নজরুল-কাব্যে ইসলামী অনুপ্রেরণার স্বরূপ বর্ণনা প্রসংগে আমরা আরো একটি তৃতীয় ধারার সীমানা নির্দেশ করতে পারি যার সবটাই সরাসরি ইসলাম-প্রীতিমূলক। যেমন 'কাব্যে আমপারা' (অনুবাদ), 'মরুভাস্কর' এবং তার অজস্র ইসলামী গান। কবির ধর্মপ্রাণ সামাজিক সত্তা এই রচনাগুলোর মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রেরণায় বিকাশ লাভ করেছে। শিল্পমূল্য বিচারের কঠিন মানদণ্ড আরোপ করলে হয়তো এর সবটা চিরকালের জন্য উত্তীর্ণ হতে পারবে না; কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মুসলিম গণমানুষের ওপর এগুলোর প্রভাবই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং গভীর। বাঙালী মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ এগুলোকে আশ্রয় করেই আত্মসচেতন হয়েছে। যে রাজনৈতিক প্রয়াস পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করেছে নজরুলের ইসলামী গান যেন প্রথম থেকেই হৃদয়ে হৃদয়ে তার আবহ সংগীত রচনায় রত ছিল।

অগ্নি-বীণার কথায় ফিরে আসা যাক। এখানে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ উৎকৃষ্ট কাব্যমূল্যের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রতিভার যে বিশিষ্ট চেতনা ও প্রক্রিয়ার ফলে বাংলা কাব্যে এই নতুন শক্তি সঞ্চারিত হোলো তার মর্মবাণী আজও আমাদের জন্য এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। কাব্যের বহিরংগে নজরুলের কৃতিত্ব আরবী-ফারসী শব্দের অবাধ এবং অকুণ্ঠ সংযোজনায়। এগুলোর ভাবানুষংগ মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত। তার কিছু বাঙালী মুসলমানের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সম্পদ থেকে আহরিত, কিছু তাঁর জ্ঞানার্জিত শব্দ-ভাণ্ডার থেকে চয়ন করা। কবির একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেগুলো প্রয়োগ যেন যথাযথ হয়, ললিত হয়; ইঙ্গিতে ব্যাঞ্জনায় যেন পাঠকের মন কেড়ে নিতে পারে। শব্দের বিস্ময়কর ধ্বনিগত সমারোহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ-নিরপেক্ষ মোহবিস্তারে পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে 'ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে একটি অবলীলা, স্বাধীন, স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে। কোনখানে অধিকারের সীমানা লংঘন করে নাই এই প্রকৃত কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিনাস ও ছন্দ ঝংকারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব। যখন পড়ি—

উরজ্ য়্যামেন নজদ্ হেজাজ তাহামা ইরাক মাম

মেসের ওমান তিহরান স্মরি' কাহার বিরাট নাম

পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম'।

www.pathagar.com

চলে আঞ্জাম্
দোলে তাঞ্জাম
কোলে হুরপরী, মরি ফিরদৌসের হাম্মাম।
টলে কাঁখের কলসে কওসর-ভর
হাতে আব-জম-জম-জাম্।
শোন দামাম্ কামান্ সামান্ নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম'।

তখন প্রতি চরণের অর্থোদ্ধারের জন্য মোটেই চিন্তান্বিত হই না। 'খেয়া পারের তরণী' পড়ে কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার অভিভূত হন। তাঁর নিজের ভাষায় 'আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব।'

'আবুবকর ওসমান ওমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ্।'

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডমরু-ধ্বনিকে, পরাভূত করিয়াছে বিশেষ, এ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য 'লা' শরীক আল্লাহ্' যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

নজরুলের ঐতিহ্য-প্রীতি সামান্য সামাজিকের অতীতের প্রতি অন্ধমোহের সঙ্গে তুলনীয় নয়। নজরুল অতীতকে স্মরণ করছেন বর্তমানকে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ার রূপে। তাঁর কবি দৃষ্টিতে ইতিহাস চিরজীবন্ত। মহর্‌রম কি কোরবানির কাব্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর উদগত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে সমকালীন মানুষের তৃষাতপ্ত জীবনের ওপর। কামালের কীর্তি ও তাঁর অনুসরণকারীদের আত্মদানের মহিমা ঘোষণা করতে গিয়ে স্বদেশের শহীদদের জন্যই তাঁর বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—

মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না , কিসের?
আব্ জম্‌জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কলসি বিষের।
কে মরেছে? কান্না কিসের?
বেশ করেছে!!
দেশ বাঁচাতে আপনারি জান্ শেষ করেছে।
বেশ করেছে!!

www.pathagar.com

শহীদ ওরাই শহীদ।
বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে, খুন ওদেরই লোহিত।
শহীদ ওরাই শহীদ!!

বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নজরুল ইসলামের সার্থকতা লাভের মূলে কাজ করেছে এই দুই কাব্যসূত্র। এক, নতুন হোক পুরাতন হোক, দেশী হোক বিদেশী হোক শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারে তিনি ছিলেন অসাধারণ কুশলি কারিগর; দুই, তাঁর ঐতিহ্যবোধ ছিল জীবন-সম্পৃক্ত। অতীতকে তিনি নকল করেননি, ঐতিহ্যকে আউড়ে যাননি, তাকে নবরূপ দান করেছেন, বর্তমানের সঙ্গে তার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন, অনাগত দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনায় তাকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছেন।

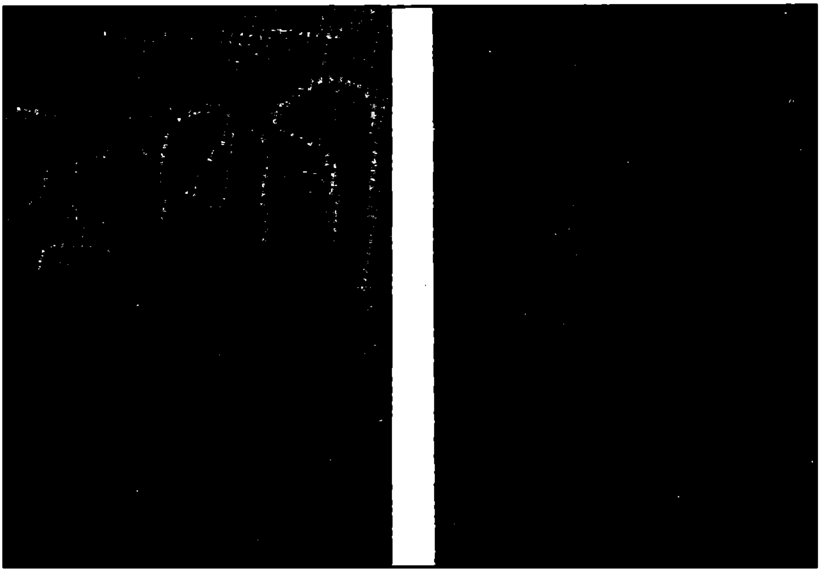

নজরুল রচিত বইয়ের প্রচ্ছদ

www.pathagar.com

১৯২৯ সালে রাজশাহী মুসলিম ক্লাবে গুনমুগ্ধদের সাথে নজরুল

www.pathagar.com

নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ

আহমদ সফা

॥ ১ ॥

একজন সাহিত্যস্রষ্টার সবচাইতে বড়ো হাতিয়ার, তাঁর ভাষা। ভাষার মধ্যেই তাঁর প্রাতিস্বিকতার অনেকখানি নিহিত। একজন লেখক বা কবি যে ভাষারীতিটি প্রকাশমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন তাতেই তাঁর সবটুকু পরিচয় ফুটে ওঠে। সাহিত্যের প্রাণবস্তুর মধ্যে নতুন কোনো উপাদান যুক্ত হলে ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গিতে অবশ্যই তার ছাপ পড়বে। সাহিত্যের প্রাণ এবং প্রকাশরীতি এ দুটো কোনো আলাদা ব্যাপার নয়। পুরনো বোতলে নতুন মদ পরিবেশন করার প্রচলিত প্রবাদটি, সাহিত্যের বেলাতে কোনো অর্থই বহন করে না। নতুন সাহিত্যের নতুন প্রকাশ রীতি চাই, নইলে নতুনকে চেনার উপায় থাকে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী এসকল ছন্দ তাঁর প্রতিভার প্রকাশ মাধ্যম হওয়ার অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। কারণ মাইকেল প্রখর অনুভব শক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি যে নতুন মূল্যমান সম্পন্ন কাব্য-ভাবনার বিকাশ ঘটাতে যাচ্ছেন, বঙ্গদেশে প্রচলিত কাব্যভাষার মাধ্যমে তা আদৌ সম্ভব নয়। এই ভাষা-রীতি মাইকেলের জীবনানুভূতির মর্মবেগ ধারণ করার উপযোগী নয়। সেই কারণে মাইকেলকে নতুন একটি কাব্যভাষার কথা ভাবতে হয়েছিলো। ভেতরের এই আত্যন্তিক সৃষ্টিশীল চাপ তাঁকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিলো। সেই অপূর্ব ছন্দ তুরঙ্গম ধারণ করার উপযোগী আনকোরা নতুন কাব্যভাষা তাঁকে নির্মাণও করতে হয়েছিলো।

মাইকেল বঙ্গ সাহিত্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তুলনারহিত জঙ্গমতার সৃষ্টি করেছিলেন। একেবারে কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে প্রহসন লিখে একটা হুলস্থুল কান্ডও ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তথাপি একথা বলা বোধ করি অসঙ্গত হবে না, মধুসূদনের যাবতীয় সাফল্য পরবর্তী বাংলা কাব্য বিকাশে খুব একটা ফলপ্রসূ প্রভাব রাখেনি। তবে তাঁর গদ্য রচনার কথা স্বতন্ত্র। মাইকেল প্রচলিত ভাষারীতিকে দুমড়ে মুচড়ে ভিন্নরকম

www.pathagar.com

প্রকাশ ক্ষমতাসম্পন্ন ভাষা-শরীর যে নির্মাণ করা যায়, সেরকম একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এ কৃতিত্ব মাইকেলের একার। বাংলা কবিতার পরবর্তী বিকাশে মাইকেলের প্রভাব রক্তসূত্রের মত ক্রিয়াশীল থেকেছে, এ কথা বোধ করি বলা চলে না। অনন্য কাব্যসৌধ নির্মাণেই কাব্যের যে আদর্শ নির্মাণ করলেও মাইকেল—পরবর্তী কবিকুল কেউ সে আদর্শ আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁর ভাষাশৈলী অনুকরণ অনুসরণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার মধ্যে এনেছিলেন দ্যুতি। তাঁর সাধনায় বাংলা কবিতার ভাষা বিমূর্ত ভাব এবং চিন্তা ধারণ করার মতো নির্ভরতা অর্জন করেছিলো। তিনি বাংলা কবিতার জমিনে এতোদূর নিবিড় কর্ষণ করেছিলেন, তার ফলে ভাষার সীমানার বিস্তার এবং সম্প্রসার ঘটছে অনেক দূর। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এলেন, যেখানে মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার, পণ্ডিতজনের ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতজনের ভাষার, চিন্তার ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষার একটা সেতুবন্ধন রচনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে বহুমাত্রিক প্রকাশভঙ্গির বাহন করার যোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেন। ভাষার মধ্যে স্বাধীন চিত্তবৃত্তির সাবলীল স্ফূর্তির যে ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ তৈরী করলেন, সেই বিষয়টা স্মরণে না রাখলে বাংলা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব পূর্বপর সম্পর্করহিত একটা খাপ ছাড়া ঘটনা মনে হবে।

॥ ২ ॥

বাংলা কাব্যগগনে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব নানা কারণেই একটা যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলা কবিতার বিকাশ ধারায় নজরুল একটা চমৎকার ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটনের ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে বিষয়ে সাহিত্য সমালোচকদের অনেকেই একমত। তাঁর সাধনা সিদ্ধির ব্যাপারে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু শক্তি সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার অবকাশ অল্পই আছে।

সে যাহোক, বর্তমান রচনাটি নজরুলের কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিরূপণের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। সমস্ত সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও কবি হিসেবে, মানুষ হিসেবে, যুগনায়ক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই যে একজন অনন্য পুরুষ, এই অনন্যতার একটি পরিচয় তিনি কবিতা, গান, এমনকি গদ্য রচনায়ও যে ভাষারীতিটি ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে নজরুলের ব্যবহৃত ভাষা রীতিটির একটি ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে শুরু করে আধুনিক যে ভাষাটি গিরিগাত্রের সংকীর্ণা স্রোতস্বিনীর মতো বিকশিত হতে হতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবধি এসে ভর যৌবনা প্রমত্তা পদ্মার আকার ধারণ করেছিলো, নজরুল ইসলাম সেই ভাষাতেই গান, কবিতা রচনা

www.pathagar.com

করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শুধুমাত্র এটিকেই কাজী নজরুলের অনুসৃত ভাষারীতি বলে স্বীকার করে নিলে, আজকের দিনে আমরা নজরুল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলতে যে জিনিসটি বুঝি বা বোঝাতে চাই, তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। সচরাচর সাহিত্য-সমালোচকেরা প্রায় সকলেই একটি অভিধা নজরুলের বেলায় প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি এন্তার আরবী-ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এসকল বিভাষী শব্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ব্যাপারে নজরুলের দক্ষতা তাঁর সময়কার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা মোহিতলাল মজুমদার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। তবে এটা নিছকই বাইরের ব্যাপার, তার পরেও কিন্তু অনেক কথা থেকে যায়। নজরুলের আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহারের বেলায় তাঁর একটা গাঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে, কোনো কোনো সময় সেটা এক ধরনের অনমনীয় জেদ বলেও মনে হয়। মোহিতলাল কিংবা সত্যেন দত্তের কাছে আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছিলো এক ধরনের স্বাদ পাল্টানোর মত ব্যাপার। কবিতার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে বৈচিত্র্য এবং ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মোহিতলাল-সত্যেন দত্ত আরবী-ফরাসী শব্দ বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছেন। প্রমথ চৌধুরী মশায় ফিরনির মধ্যে কিসমিসের মত গদ্যের মধ্যে আচমকা দু-একটি আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার করে যে ধরনের চমক সৃষ্টির ওস্তাদি দেখাতেন, অনেকটা সেরকম।

নজরুলের আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারেও চমক সৃষ্টি হতো বটে, কিন্তু সে সকল শব্দ ব্যবহারের আরো গুরুতর কারণ কবির উপলব্ধির গভীরে প্রোথিত ছিল। যে সকল আরবী ফার্সী শব্দ নজরুল ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটি পরিষ্কার ধারণার সৃষ্টি হবে। কতিপয় আরবী-ফার্সী শব্দ তাঁর কবিতা গানে একেবারে সত্তার ভেতর থেকে উঠে এসেছে। আর কতেক শব্দ তিনি ভাষাজ্ঞানের জোরে বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছেন। যে শব্দগুলো একেবারে তাঁর অস্তিত্বের ভেতর থেকে মাতৃভাষার মতো স্বাভাবিকতায় বেরিয়ে এসেছে, সেগুলোর পরিপূরক হিসেবে পড়ে পাওয়া শব্দগুলো এসে পোষ মেনেছে।

তাই মোহিতলাল কিংবা সত্যেন দত্তের আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছিলো একটা নিরীক্ষার ব্যাপার মাত্র। কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল একটা ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধ। নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যভাষা নির্মাণে চলতি ভাষারীতিটির পাশাপাশি গৌণভাবে হলেও মুসলমান লিখিত পুঁথি সাহিত্যের ভাষাশৈলীটির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীলতার স্পর্শে পুঁথি সাহিত্যের ভাষার মধ্যে নতুন একটা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র একজন সাহিত্য-স্রষ্টার বিশেষ স্টাইল হিসেবে চিহ্নিত করলে নজরুলের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হবে বলে মনে করি।

www.pathagar.com

॥ ৩ ॥

আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষার শব্দ বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা, তার সঙ্গে পুঁথি সাহিত্যের একটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করা খুব কঠিন কাজ নয়। অতীতের পুঁথি লেখকেরা বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার বিদেশী শব্দ মিশিয়ে এক সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। সে সাহিত্যের বৃত্ত খুবই সংকুচিত ছিলো। যথেষ্ট মৌলিকতার স্ফুরণও সে সাহিত্যে কদাচিত লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা এককথায় 'বটতলার 'পুঁথি' আখ্যা দিয়ে সেগুলোর বিশেষ একটা শ্রেণী নির্ণয় করেছেন। সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে সারবান পদার্থ অধিক হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এগুলোর মূল্য যে অপরিসীম, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বপ্রথম হুমায়ুন কবীর তাঁর 'বাংলার কাব্য' গ্রন্থে পুঁথি সাহিত্যের এই বিশেষ দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বাঙালী মুসলমান লিখিত পুঁথিসমূহে বাঙালী মুসলমান সমাজের মানস জগতটির যথার্থ পরিচিতি ধরা পড়েছে। বাংলার শ্রমজীবী, কৃষিজীবী আর মুসলমান জনগণের জীবন-জিজ্ঞাসা, মূল্যচিন্তা, বিশ্বাস-আচার রসপিপাসা এসব বিষয় পুঁথিসমূহের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এক সময়ে বাংলার আম মুসলিম জনগণের মধ্যে পুঁথি সাহিত্যের চর্চা ব্যাপক আদরণীয় হয়ে উঠেছিল।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপায়ণের যে প্রক্রিয়াটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শুরু হয়েছিল, সেই বিশেষ সময়টিতেও দেখতে পাই, মুসলমান সমাজে পুরোনো পুঁথি পঠিত হচ্ছে এবং লেখা হচ্ছে নতুন পুঁথি। তারপরে আধুনিক বাংলা ভাষা যখন সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের বাঙালী জনগণের ওপর অপ্রতিহত প্রভূত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, আমরা দেখতে পাই, সেই প্রক্রিয়াটিতে ছেদ পড়ে গেছে।

আবার বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে দেখতে পাই কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ঠিক পুঁথি সাহিত্যের মত অতোটা শিথিল ঢালাওভাবে না হলেও আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করার একটা প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এই বিশেষ ঘটনাটিতে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বেশীর ভাগ সমালোচক এটাকে নজরুল প্রতিভার বিশেষ দিক বলে চিহ্নিত করেছেন। কথাটা মিথ্যেও নয়। তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টির জন্য একটা লাগসই ব্যাখ্যা বটে। কিন্তু তাতে করে নজরুলের ভাষারীতির যে সমাজতত্ত্ব সম্মত একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়, সে দিকটি উপেক্ষিত থেকে যাবে। নজরুলের সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়নের জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি পুঁথি সাহিত্যের প্রেক্ষাপটের বিষয়ে ধারণা থাকাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

॥ ৪ ॥

আমরা বাংলা ভাষার যে লেখ্য রূপটি ব্যবহার করে থাকি, তার সঙ্গে আমাদের জনগণের মুখের ভাষার বিরাট এক ব্যবধান রয়েছে। পৃথিবীর খুব কম ভাষার মধ্যে লেখ্যরূপ এবং মুখের ভাষার মধ্যে এই পরিমাণ দূরত্ব বর্তমান। বাংলা ভাষার আদি

www.pathagar.com

বিকাশ-প্রক্রিয়ায় এই ফারাক ছিলো না। আধুনিক ভাষার যে বিকশিত রূপ আমরা ব্যবহার করে থাকি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে এই ভাষার প্রাথমিক রূপরেখাটি তৈরি করেছিলেন। এই ভাষাটি নানারূপ পরিবর্তন এবং রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যদিও পরবর্তীকালে ভাগীরথী তীরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার একটি সুন্দর সংশ্লেষ ঘটেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী তীরবর্তী জনগণের ভাষার সংযোগ সমন্বয়, মিলন-বিরোধের ইতিহাসই আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাস। প্রতিভাধর এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সাধকদের চেষ্টা প্রযত্ন এবং শ্রমের মধ্য দিয়ে এই ভাষাটি ভাবচিন্তা, অনুভব-বিভব ধারণ করার উপযোগী হয়ে উঠেছিলো, তাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। তথাপি স্বীকার কতেই হবে, তামাম বাঙালী জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পেছনে একটি মুখ্য এবং অগ্রগণ্য কারণ বর্তমান ছিলো; আর সেটি হল শহর কলকাতার ভাষা হওয়ার গৌরব অর্জন। বৃটিশ–শাসিত ভারতের রাজধানী হওয়ার কারণে কলকাতার ভাষাটিই মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার কল্যাণে বাঙালী জনগোষ্ঠীর ওপর চেপে বসতে পেরেছিলো। ভাষার এই বিকশিত রূপটি অগ্রাহ্য করার যেমন কোনো কারণ নেই, তেমনি অভিধান থেকে এই ভাষার যে জন্ম সে বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা না থাকলে বাংলা ভাষার বিকাশ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাবে না। ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহের মধ্যে বাংলাই প্রথম আধুনিক ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল। অধিকন্তু বাঙালী মনীষীবৃন্দের সৃষ্টিশীলতার ছোঁয়ায় এই ভাষায় প্রাণবান, ভাবসমৃদ্ধ এবং অপূর্ব প্রকাশক্ষমতা সম্পন্ন ভাষা হিসেবে বিশ্বমানবের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা ভাষার দূরত্ব কখনো ঘোচেনি। প্রাথমিক নির্মিতির পর্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের যে আত্মা ভাষার শরীরে আশ্রয় নিয়েছিলো তা ঝেড়ে ফেলা কখনো সম্ভব হয়নি।

পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হয়ে যে রূপটি পরিগ্রহ করে আসছিলো, আরবী-ফার্সী ভাষার শব্দ যে ভাবে বাংলা ভাষার মধ্যে স্থান করে নিচ্ছিলো সে প্রক্রিয়াটি হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় সে রূপটির কিছু কিছু নমুনা এখনো একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। ড. আনিসুজ্জামান সাম্প্রতিককালে কিছু প্রমাণ তুলে ধরেছেন। কবি ভারতচন্দ্রের মত সংস্কৃত জানা লোকের পক্ষেও এই ভাষার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তাঁকেও 'যাবনী মিশাল' ভাষায় কাব্য রচনা করতে হয়েছে। বাংলাদেশে মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পরে, ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও আরবী-ফার্সী ইত্যাদি শব্দ এসে মিশে যাচ্ছিলো এবং ভাষায় একটি নতুন চেহারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলো। ভাষাকে নদীর সঙ্গে যদি তুলনা করতে হয়, মেনে নিতে হবে একটা উল্লেখ করার মত বাঁক।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার আরেকটা বাঁক সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা আরবী ফার্সী শব্দাবলী সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত অভিমুখী

www.pathagar.com

একটি ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁদের সে প্রয়াস সবটুকু ফলবতী হয়নি। কিন্তু যে ঝোঁক এবং প্রবণতা ভাষার শরীরের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। যদি পলাশীর বিপর্যয় না ঘটতো, আজকের দিনে বাংলা ভাষার অন্যরকম একটি বিকশিত রূপ হয়তো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। তবে 'যদি' আর 'কিন্তু' নিয়ে তো আর আলোচনা চলে না, যা ঘটেছে তাই-ই সত্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ থেকে বাংলা ভাষা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঙালী জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে পারেনি। এই ভাষার বলয়টি ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং সঙ্কুচিত। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, সংখ্যাল্প সাক্ষরতা ইত্যাদি নানা কারণ নতুন নির্দেশিত ভাষাটিকে একটি বিশেষ সীমারেখার বাইরে অনেকদিন পর্যন্ত বিকশিত হতে দেয়নি। বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী, আধুনিক শিক্ষার দুয়ার যাদের জন্য অনেকদিন পর্যন্ত রুদ্ধ ছিলো, তারা পুঁথি সাহিত্যের মধ্যেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ পারস্পরিক সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে যে ভাষাটি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো, পুঁথি সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে তার একটি নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। একটি ঐতিহাসিক সময়ে আরবী-ফার্সী শব্দ মিশে বাংলাভাষার মধ্যে রূপান্তর প্রক্রিয়া চালু হয়েছিলো, পুঁথি সাহিত্যের ভাষার মধ্যে তার কিছু প্রমাণ মিলে। ভাষার সামাজিক চর্চার ওপর নির্ভর করেই ত' সাহিত্য রচনা করা হয়ে থাকে। একেবারে সামাজিক সম্পর্ক বিরহিত সাহিত্যের ভাষার কথা কল্পনাও করা যায় না।

মুসলিম সমাজ যখন আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন থেকেই তারা কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষাটিকে গ্রহণ করেছে। তার পরেও একটি কথা বলা যায়, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মুসলিম সমাজে আজকের দিনেও পুঁথি সাহিত্য আবেদন হারিয়ে ফেলেনি। সুতরাং জনগোষ্ঠীর ভেতরে ফল্গুস্রোতের মতো আরেকটি সমান্তরাল ভাষারীতি অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করছিলেন, সে সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর সবচাইতে শক্তিমান মুসলমান লেখক 'শহীদে কারবালা' পুঁথিটির একটি আধুনিক গদ্য সংস্করণ রচনা করেছিলেন। লেখক নিজে সে গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন 'বিষাদসিন্ধু'। মুসলমান সমাজে পুঁথির প্রভাব যে কতোটা ছিলো 'বিষাদসিন্ধু'র জনপ্রিয়তা থেকে তা অনুমান করা যায়।

মুসলমান সমাজের যে সকল লেখক বাংলা ভাষায় গদ্য-পদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষাটিকে প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মীর মোশাররফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, মওলানা আকরম খান প্রমুখ কবি সাহিত্যেকদের সকলকেই নগরলালিত ভাষাটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এমনকি ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং মুসলমানদের পুনর্জাগরণ ঘটানোর মানসে যে সকল বই পুস্তক রচনা করা হয়েছে, তার সবগুলোতেও ঐ ভাষারীতিরই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

পাছে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পাঠকরা উপহাস করতে পারেন, এই হীনমন্যতা থেকেই কি মুসলমান লেখকরা আপন সমাজে, পরিবারে, সংসারে সচরাচর ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দসমূহ তাঁদের রচনায় যতটা সম্ভব পরিহার করতেন? বঙ্কিমচন্দ্র মীর মোশাররফ হোসেনের রচনা পাঠ করে যে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই লেখকের রচনায় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় না', এটাই গ্রন্থ রচনার সবচাইতে বড় প্রশংসা বলে মুসলমান লেখকেরা কবুল করে নিয়েছিলেন।

মুসলিম লেখকরা অবশ্য কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষারীতি গ্রহণ করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। দুনিয়ার সব দেশেই ভাষার সর্বাধুনিক বিকশিত রূপটিকেই তাঁদের লেখার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন লেখকরা। মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক নেতা বলে স্বীকৃত লেখক-কবিরাও তাই করেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের বেলায় একটা ভিন্ন রকমের ব্যাপার ঘটে গেলো। তাঁর রচনায় আরবী-ফার্সী এবং উর্দু শব্দাবলী প্রাণপাতালের উত্তাপে যেনো ভাপিয়ে উঠতে থাকলো। এটা কেনো ঘটলো, নজরুল ইসলাম এ সকল শব্দ কেনো ব্যবহার করতে থাকলেন, জানামতে কোনো লিখিত কৈফিয়ৎ তিনি কোথাও দেননি। যদি তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হতো, সম্ভবত আত্মপক্ষ সমর্থনে এ জাতীয় কথা তিনি বলতেন-মুসলমান সমাজে পেঁয়াজ-রসুনের চল আছে। তাই মুসলমানের রচনায় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ থাকবেই। সেটা গোপন করা কোনো ভালো কাজ নয়। কারো নাসারন্ধ্রে সে জন্য যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, করার কি আছে। এমনকি সে নাসারন্ধ্র স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রেরও হতে পারে। তারপরেও তো একটি সমাজকে তার আত্মপরিচয় ফুটিয়ে তুলতে হবে। পুঁথি সাহিত্যের ভাষা নিয়ে কৃতবিদ্যা পণ্ডিতরা যতোই নাসিকা কুঞ্চন করুন না কেনো, এই ভাষাটি কদাপি উর্দু, আরবী এবং ফার্সী ভাষা নয়। এটা বাংলা ভাষারই একটা বিশেষ ফলিত রূপ। একটি সমাজের মধ্যে তার যথেষ্ট আদর রয়েছে এবং সেই বিশেষ সমাজের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাসমূহ এই ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল ইসলাম সাহিত্যে নাসিকা-সমস্যা সমাধানের জন্য একটা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি অধিক হারে ঐ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে থাকলেন। তাঁর দক্ষতা সুফলপ্রসু হয়েছিলো। সর্বশ্রেণীর পাঠক ক্রমে 'যাবনী মিশাল' ভাষাভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। হিন্দু সমাজের অগ্রণী সাহিত্যিকেরা এই অভিনব ক্ষমতা প্রকাশের জন্য নজরুলকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এবং তাঁরাই ছিলেন তাঁর সাহিত্যের প্রাথমিক সমঝদার। আর মুসলমান সমাজের চেনাজানা মানুষদের অনেকে, যাঁরা ঘরে-সংসারে উচ্চারিত শব্দসমূহ প্রকাশ্যে উচ্চারণের দুঃসাহস কখনো প্রদর্শন করেননি, তাঁদেরই একাংশ মহাসমারোহে নজরুলকে 'কাফের' ফতোয়া দিতে এগিয়ে এলেন। সেই মূঢ়তার আলোচনা অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়।

॥ ৫ ॥

নজরুল ইসলামের আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারের মধ্যে অতীতের পুঁথি সাহিত্যের নবজীবন দানের একটি ইশারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নজরুল পুঁথি লেখেননি। আধুনিক

www.pathagar.com

যুগোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। শুধুমাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রয়াসের ফলে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটা ভাষারীতিকে বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে বাংলা ভাষাকে জনগোষ্ঠীর সত্যিকার প্রতিনিধিত্বশীল ভাষা হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এতে তিনি যে সফলতা লাভ করেছিলেন, এক কথায় তাকে অতুলনীয় বললে অধিক বলা হবে না। নজরুল মুসলমানদের ঘরে-সংসারে ব্যবহৃত শব্দসমূহ ব্যবহার করে এমন একটা প্রক্রিয়ার সূচনা করলেন, যার ফলে বাংলা ভাষার অভিধান-সংকলকদের প্রতি নতুন সংস্করণে নতুন নতুন শব্দ সংযোজনের একটা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়ে গেলো। এটা নজরুল ইসলামের একটা বড় কৃতিত্ব।

সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবে এই ভাষারীতি ব্যবহা নজরুলের সাফল্যের পেছনে দুটি কারণ বর্তমান। প্রথম, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সময়ে এসে বাংলা ভাষা যে গতিময়তা অর্জন করেছিল নজরুল ইসলাম এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করেছিলেন। বাংলা ভাষা যে সর্বাধিক শব্দসম্ভার সংস্কৃত থেকে ধার করেছে, সে দিকটিতে নজরুল পুরোপুরি সজাগ এবং ওয়াকেবহাল ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু ইচ্ছা করলে অন্য কোনো বিদেশী ভাষার একটি শব্দও ব্যবহার না করে বিশুদ্ধ সংস্কৃত প্রধান বাংলায় গান, কবিতা, গদ্য সৃষ্টি করতে পারতেন, নজরুলের সাহিত্য সঙ্গীতে তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। নজরুল যদি পুরোপুরি এই ভাষা অবলম্বন করে সাহিত্য-সংগীত সৃষ্টি করতেন, তাহলে আজকে তাঁর সাহিত্যের রস গ্রহণ করার জন্য ভিন্ন ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ এবং মানদণ্ড নিরূপণের প্রয়োজন হতো।

দ্বিতীয়ত, কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সমাজে আত্মগোপন করে থাকা পুঁথি সাহিত্যের ভাষারীতির সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাল্য এবং কৈশোরের একটা উল্লেখযোগ্য সময় তাঁকে এই পুঁথি সাহিত্যের পরিমণ্ডলে কাটাতে হয়েছে। এই সাহিত্যের শৈল্পিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা তাঁর গড়ে উঠেছিল। সমাজের যে অংশের মানুষের মধ্যে এই সাহিত্যের চল ছিল, সেই মানুষদের মানস জগত এবং মনস্তাতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি জানতেন। সর্বোপরি বোধবুদ্ধিতে পরিপক্বতা অর্জনের পূর্বে এই ধরনের সাহিত্যের প্রতি একটা অনপনেয় শ্রদ্ধাবোধই হ'ল আসল কথা। নিজের সমাজের চর্চার জিনিস, কিছুতেই ফেলনা হতে পারে না। বাকরুদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে এই বোধ আমরা লালন করতে দেখি।

নজরুল সাহিত্যে বাংলা কাব্য ভাষার যেমন সৃষ্টিশীল প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি এই পুঁথি সাহিত্যের ভাষাটিও সৃষ্টিশীল নির্বাচনের মাধ্যমে বিশিষ্টতা অর্জনের পর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। নজরুল পুঁথি-সাহিত্যের প্রাণের আগুনটুকু গ্রহণ করেছেন, তার জীর্ণ কঙ্কাল বহন করেন নি। তাই নজরুল সাহিত্যের পুঁথি-সাহিত্যের জীবাশ্ম দৃষ্টিগোচর হলেও, সেই ভাষাকাঠামো খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুঁথি-লেখকেরা বাঙালী মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা উজ্জ্বল করে দেখার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ ভাষারীতি তৈরি করেছিলেন। নজরুল স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী এই মুসলিম সমাজটিকে বাঙালী সমাজেরই একটি অংশ হিসেবে

www.pathagar.com

প্রমাণ করার জন্যই ঐ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন।

নজরুল উর্দু ভাষায় গজল এবং গান লিখেছেন। রাজা নওয়াব আলী রচিত সঙ্গীত বিষয়ক আকর গ্রন্থ 'মারিফুন্নাগমাতের' অংশ বিশেষের স্বচ্ছন্দ বাংলা তর্জমা করেছিলেন। ভাষার ওপর কি রকম দখল থাকলে এরকম একটি দুরূহ গ্রন্থের এমন সাবলীল অনুবাদ করা যায়, তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের গজল 'রুবাই'-এর মূল ফার্সী থেকে তিনি বাংলা কাব্যিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং ফার্সীর ওপর নজরুলের পরিপূর্ণ দখল ছিলো, এটা অনুমান এবং কল্পনার বিষয় নয়। হিন্দী ভাষায় রচিত নজরুলের ভজন নেহায়েত কম নয়। ভাষাটি না জানলে শুধুমাত্র স্মৃতি এবং শ্রুতির ওপর ভরসা করে ভজন রচনা সম্ভব নয় বলেই ধারণা করি। নজরুল আরবী গানের সুরে বাংলা গান লিখেছেন। আরবী ছন্দে বাংলা কবিতা লিখেছেন। ভাষাটি তিনি কতোটা জানতেন, সে সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে ভাষার ওপর বিশদ অধিকার না থাকলেও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নজরুলের ছিল, এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। নজরুল ইসলাম বেশ কয়েকটি ভাষা জানতেন, এটা আমাদের কাছে একটা সংবাদ মাত্র। এই ভাষাজ্ঞান দিয়ে তিনি সাহিত্যের কায়া এবং প্রাণের মধ্যে একটা নতুন সংশ্লেষ ঘটিয়েছিলেন, সেই ব্যাপারটি কদাচিৎ আমরা চিন্তা করে দেখি। সে যা হোক, আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে—আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় নজরুলের সমধিক অধিকার ছিলো, এবং সেই কারণে পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় নতুন মাত্রা এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টি তাঁর পক্ষে কোনো অসম্ভব বা কঠিন কর্ম ছিলো না। আমরা দেখেছি নজরুল কবিতা-গানের ঐ সকল ভাষার জ্ঞানের ক্ষমতার চূড়ান্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন।

সেই সময়টার কথাও মনে রাখতে হবে। ইতোমধ্যে সমাজ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। হিন্দু সমাজের ভেতরে উদারতা এবং মেনে নেয়ার শক্তি বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মুসলমান সমাজের ভেতরে একটা জঙ্গমতা সৃষ্টি হতে চলেছে। এই সময়ে নজরুলের আরবী-ফার্সী ভাষার শব্দ মিশ্রিত কবিতা গান যখন প্রকাশ পেতে শুরু হয়েছে, হিন্দু সমাজের প্রাগ্রসর ব্যক্তিবৃন্দ সাহিত্যে নতুন উপাদান সংযোজন করার জন্য নজরুলকে অভ্যর্থনা জানালেন। আর মুসলমান সমাজের চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা নজরুলের কবিতায় তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে নিত্যব্যবহৃত শব্দসমূহের অকুণ্ঠিত, অসংকোচ প্রয়োগের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁকে আপন ঘরের জন হিসেবে চিনে নিলেন।

নজরুলের কাছে বাঙালী মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান ও প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের 'ভাষাদীন' পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্যসৃষ্টির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন। আর নজরুলের কাছে সমগ্র বাঙালী সমাজের ঋণ এই যে, নজরুল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে, নব বিকাশ ধারায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে অনেক দূর পর্যন্ত গাথুঁনি নির্মাণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

॥ ৬ ॥

বাঙালী মুসলমান সমাজে ধর্মচিন্তা এবং সংস্কৃতি চিন্তার মধ্যে একটা দুস্তর পার্থক্য বর্তমান। ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার হওয়ার পূর্বে এখানকার যে স্থানীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিলো, তার স্রোতোধারার ভেতরে ধর্ম ভাবনা পুরোপুরি অবগাহন করতে পারেনি। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মচিন্তার একটা বিরোধ বরাবর থেকে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান সমাজে এ ধরনের ঘটনা খুবই কম ঘটেছে। যেমন ইরানে ইসলাম প্রসারের পরেও ইরানী জনগণ প্রাক-ইসলামী যুগের উৎসব আচারজাতীয় গর্ববোধ, কোনো কিছুই পরিহার করে নি। ইন্দোনেশিয়াতে হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম চমৎকার মিলেমিশে সহাবস্থান করছে অদ্যাবধি। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় নিশানবাহী বিমান সংস্থাটির নাম গরুড়। প্রতি বছর সে দেশে জাতীয়ভাবে রামায়ণ উৎসব পালন করা হয় এবং জনগণ হিন্দু ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করেন। মুসিলম সন্তানের সংস্কৃত নামকরণ করতে তাঁদের বাধে না। ইরানে দেখা গেছে ইসলাম পাকাপোক্তভাবে চালু হওয়ার পরেও ইরানী মহাকবিরা অগ্নি উপাসক পারসিক নরপতিদের স্মৃতি সযত্নে লালন করে আরব আগ্রাসনের প্রতিবাদ করছেন।

বাংলা মুলুকেও ধর্মসংস্কৃতিতে এক ধরনের সংশ্লেষ যে ঘটে নি সে কথা অসত্য নয়। কিন্তু তার মাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। খুব সম্ভবত মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুদের অনুপাতে কম ছিলো বলে এবং গোটা সমাজে অর্ধাংশেরও বেশী মানুষ অমুসলিম থেকে যাওয়ার কারণে ক্ষেত্রজ সংস্কৃতিটিকে সব সময় সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের অভিভাবকেরা সকল সময়ে স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে শেরক্ এবং মূর্তিপূজার গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন।

বাঙালী মুসলমান সমাজে মিলাদ মাহফিল, ওরশ শরীফ, দুই ঈদের জামাত, নবীর দরূদ পাঠ, কোরআন খতমের আয়োজন করা– এ সকলই ছিলো সংস্কৃতিচর্চার অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্রসম্মত বিষয়। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানসমূহ আরবী ভাষার মাধ্যমে পালন করা হতো যার একবর্ণও আম জনগণ বুঝতে পারতো না। এই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতিতে জীবনের প্রতি অস্তিবাচক কোনো সৃষ্টির প্রত্যাশা করা একরকম অসম্ভব। সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের আরবী-ফার্সীতে কোনো অধিকার ছিলো না। অভিজাত মুসলমানদের সমাজে হয়তো কিছুটা আরবী-ফার্সীর আংশিক অধিকার ছিলো। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের পথ সুগম ছিলো না। তাঁরা বাংলায় কথা বলতেন না। আর সাধারণ মুসলমানদের প্রায় শতকরা একশো ভাগই বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝতে পারতো না।

পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমান অভিজাত শ্রেণী ক্রমে নি:শেষ হয়ে যায়। আপদকালে সামাজিক নেতৃত্ব নির্মাণ করার যে দায়িত্ব অভিজাত নেতৃশ্রেণীর থাকে, ভাষাগত কারণে মুসলমান অভিজাতরা তা করতে পুরোপুরি অসমর্থ ছিলেন। উত্তর ভারতে মুসলমান সমাজ যে রকম একজন স্যার সৈয়দ আহমদের মতো সংস্কারক ব্যক্তিত্বের জন্ম

www.pathagar.com

দিয়েছিলো, কিংবা বাঙালী হিন্দু সমাজ যেমন বিদ্যাসাগর-রামমোহনের আবির্ভাব সম্ভাবিত করেছিলো, বাঙালী মুসলমান সমাজে তেমন একজন ব্যক্তিত্বের উত্থান ছিলো সামাজিক কারণেই একরকম অসম্ভব। পরবর্তীকালে বাঙালী অভিজাত মুসলমান সমাজের পক্ষে একজন সৈয়দ আমির আলীর জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছিলা। সৈয়দ আমির আলী অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকার ছিলো না। তাঁর সমস্ত রচনা তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে। তাঁর মধ্যে যে পরিমাণ যুক্তিবাদিতা এবং মণীষার প্রকাশ দেখা যায়, যদি তিনি বাংলা ভাষায় লিখতেন বৃক্ষ-সমাজের মতো অনঢ় স্থবির মুসলমান সমাজের মোহনিদ্রার অবসান আরো তাড়াতাড়ি ঘটতো। কিন্তু তা ঘটতে পারে নি।

বাঙালী মুসলমান সমাজ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রাগ্রসর ওহাবী, ফরায়েজী আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এগুলো ভাবগত দিক দিয়ে ছিল চূড়ান্ত পশ্চাদমুখী। যেহেতু কখনো রাজা রামমোহন রায় কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সামাজিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক ধর্ম ও সমাজ-সংরক্ষকের জন্ম হয়নি, তার ফলে মুসলমান সমাজের ভেতরের অন্ধকার কাটে নি। মুসলমানদের মধ্যে যে সকল লেখক বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখালেখি করছিলেন, বৃটিশ এবং অন্যদিকে নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ, এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে তাঁরা রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে অতীত মুসলিম গৌরব রোমন্থন করছিলেন।

মোল্লা এবং পীরেরা মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। শরীয়ত পুঙ্খানুরূপে পালন করা হলো কি না, সেটাই ছিল মুসলিম সমাজের ধ্যানজ্ঞান। ইসলাম ধর্মের আধুনিক মানববাদী ব্যাখ্যা অনায়াসে তৈরী করা সম্ভব ছিলো, কিন্তু সেকালে একজনও সেরকম যোগ্যতাসম্পন্ন কাবেল মানুষ ছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইউরোপে রেনেসাঁ থেকে রিফরমেশন পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে ধর্মের মানববাদী ব্যাখ্যা নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজ রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন। তাঁরা ধর্ম এবং সমাজে চিন্তার মধ্যে যে ধরনের সংস্কার আনতে চেষ্টা করেছিলেন সেগুলো যে প্রকৃত প্রস্তাবে বেদ-পুরান বিরোধী নয়, তা প্রমাণ করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাঁদের মুখ্য কর্ম। ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার যদি তাঁরা না করতেন, তাহলে যেটুকু সাফল্য তাঁদের জুটেছিলো, সেটুকুও সম্ভব হতো না। নবযুগ ইসলাম ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দাবী করছিলো। কিন্তু ব্যাখ্যাকার কেউ ছিলেন না। পীরের বাক্য, মোল্লার নসিহত কিংবা পুঁথির উপকথার মধ্যেই মুসলিম সমাজকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো। প্রথম কোরআন এবং হাদীস শরীফের অনুবাদক ছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র।

॥ ৭ ॥

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মুখ্যত কবি এবং সংগীত শিল্পী। তাঁর কাছ থেকে সমাজ-সংস্কারমূলক কোনো সুবলয়িত তত্ত্ব পাওয়া না গেলে আশাভঙ্গের বেদনা ঘটার কারণ

www.pathagar.com

নেই। তবু আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয়, এই মুসলিম সমাজটা নিয়ে তিনি খুবই গভীরভাবে চিন্তা করছেন। গোটা সমাজের মানসিক কর্মবৃত্তি এবং আত্ম-অবিশ্বাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে বারংবার তিনি ফুঁসে উঠেছেন। যদি তিনি স্থির প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হতেন, যদি তাঁর বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণী প্রতিভা থাকতো, তবে সামাজিক দায়িত্ব তিনি অধিকতরো যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে সমর্থ হতেন। নজরুলের যা ছিলো না, অথচ থাকলে ভালো হতো, ও নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। তথাপি সমস্ত কিছু সত্ত্বেও তাঁর একক চেষ্টা মুসলিম সমাজের ভেতরে যে ভাবাবেগ তিনি জাগাতে পেরেছিলেন, যে আত্মবিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্য কোনো মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তির তুলনা হয় না। এই সমাজটিকে ভেতর থেকে বিকশিত করে তোলার জন্য একজন আত্মভোলা খেয়ালী, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামরত কবির পক্ষে যতোটুকু দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত ছিলো, তার চাইতে অনেক গুরু দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন।

নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্দিষ্ট করে কি ছিলো বলা মুশকিল। ১৯২০-এ কলকাতায় ফিরে আসার পর প্রথম দিকে তখন তিনি খেলাফৎ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁর আকর্ষণ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি ধাবিত হয় তাঁদের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে নজরুল তাঁর লালিত আদর্শের প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। জীবনের এই পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ আদর্শের অনুসারী হতে দেখি। আবার, অনতিবিলম্বে গান্ধী রাজনীতির প্রতি তাঁর যাবতীয় শ্রদ্ধাবোধ অবসিত হয়ে আসে। অতঃপর তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ একান্তভাবেই 'সাম্যবাদ'। কমরেড মুজফফর আহমদ প্রমুখের সঙ্গে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে তাঁর মনের অনেকখানি মিল হয়েছিলো। নজরুল সাহিত্যে গণমানবের মুক্তির উদগ্র যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি অনুরাগ না জন্মালে সেটা সম্ভব হতো না। কিন্তু এই মিলের পেছনে যতোটা সামাজিক উপযোগিতা ছিলো, ততোটা সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার সমর্থন ছিলো না। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকা নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখি তিনি নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টির প্রার্থী হয়েছেন। আসলে নজরুলের সুচিন্তিত তেমন কোনো রাজনৈতিক মতামত ছিলো বলে মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই তিনি অন্তরের অপরিমেয় আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন।

তবে বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে নজরুলের দুধরনের স্থির বিশ্বাস ছিলো। তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি এবং ঐক্যে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন। আর মুসলমান সমাজের একেবারে ভেতর থেকে একটা ব্যাপক জাগরণ, একটা প্রাণতরঙ্গ সৃষ্টি করে এই জড় সমাজটির মধ্যে একটা জঙ্গমতা সঞ্চার করার জন্য তিনি সদা তৎপর ছিলেন। নজরুল গবেষক কবি আবদুল কাদির বলেছেন, মোস্তফা কামালের সমাজ সংস্কারের আদর্শ নজরুলের মন কেড়েছিলো। তুর্কী সমাজের জন্য মোস্তফা কামাল যা করেছিলেন,

www.pathagar.com

নজরুল আন্তরিকভাবে বাঙালী মুসলমানের জন্য অনুরূপ কিছু করার বাসনা পোষণ করতেন। তাঁর কবিতা, গদ্য রচনা, অভিভাষণ, চিঠিপত্র—এসবের মধ্যে তার অজস্র প্রমাণ ছড়ানো হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম যে ইসলামী বিষয় নিয়ে অনেক কবিতা এবং অসংখ্য গান লিখেছিলেন, এটা আকস্মিক খাপছাড়া কোনো ব্যাপার নয়। নজরুলের একটা স্থির লক্ষ্য ছিলো। নজরুল ইসলাম ধর্ম এবং বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক ব্যবধানটুকু যথাসম্ভব কমিয়ে আনার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত বিষয় মুসলমানদের প্রিয়, যেগুলো নিয়ে বাংলার মুসলমান সঙ্গত কারণে গর্ব করতে পারে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে উদ্ভাসন না ঘটালে ভেতরে একটা তাড়না সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাঁর রচিত 'মোহররম', 'কোরবানী', 'ফাতেহা-ইদোয়াজদোহম', 'কামাল পাশা', 'উমর ফারুক' এ- সকল কবিতা তিনি সে কারণে লিখেছেন। কোরআনের আংশিক অনুবাদ, এবং মুহম্মদের জীবন নিয়ে কাব্য সেই জন্য তিনি রচনা করেছিলেন। ইসলামী গান রচনাও ঐ একই উদ্দেশ্যে করেছিলেন। হাফিজ, খৈয়াম অনুবাদ করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে যে হীনমন্যতাবোধের শেকড় প্রোথিত ছিলো তার সেই মূলে আঘাত করে মুসলিম তরুণদের সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যের একটা সমন্বয় সাধনের প্রয়াস তিনি করে গেছেন। নজরুলের এ প্রয়াস কতোটা সঙ্গত ছিলো, এবং তা করতে গিয়ে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা কিছু পরিমাণে হলেও অপচিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কেউ কেউ নজরুলকে ধর্মীয় আদর্শের লাশ বহন করেছেন, বলেও অভিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম তাঁর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছিলেন, তার তো' কোনো তুলনা হয় না।

ধর্মের যে উদার এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে উপস্থাপিত করেছিলেন, তার সঙ্গে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রয়াসের অল্পমাত্রায় হলেও তুলনা করে দেখতে চাই। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের একেকটা নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিলো। নজরুলের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ছিলো না, থাকার কথা নয়। নজরুল ছিলেন কবি এবং সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর কাজ একটা বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করা, জীবনের প্রতি একটা স্বচ্ছ অঙ্গীকারাবোধ জাগিয়ে তোলা। সে কর্মটি নজরুল অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পালন করে গেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে। প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যেও কতিপয় বিষয়ে তাঁর স্থির বুদ্ধি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। বাঙালী মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ তার একটি। আমরা জানি, নজরুলের চিন্তা ভাবনার মধ্যে নানা রকম সীমাবদ্ধতা ছিলো। আর তাঁর সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে পার্থক্যও ছিলো বিরাট। নতুন কোনো মৌলিক চিন্তা তিনি সমাজের কাছে হাজিরও করতে পারেন নি। কিন্তু চিত্তের এমন একটি আবেগ, এমন একটি সহজ সরল কাণ্ডজ্ঞান তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজে চাপিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলমান সমাজ সংস্কৃতি-চর্চার একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে। বাঙালী মুসলমান সমাজ শিল্প এবং সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রে নজরুলের মতো আর কারো কাছে অতো বিপুল পরিমাণে ঋণী নয়।

www.pathagar.com

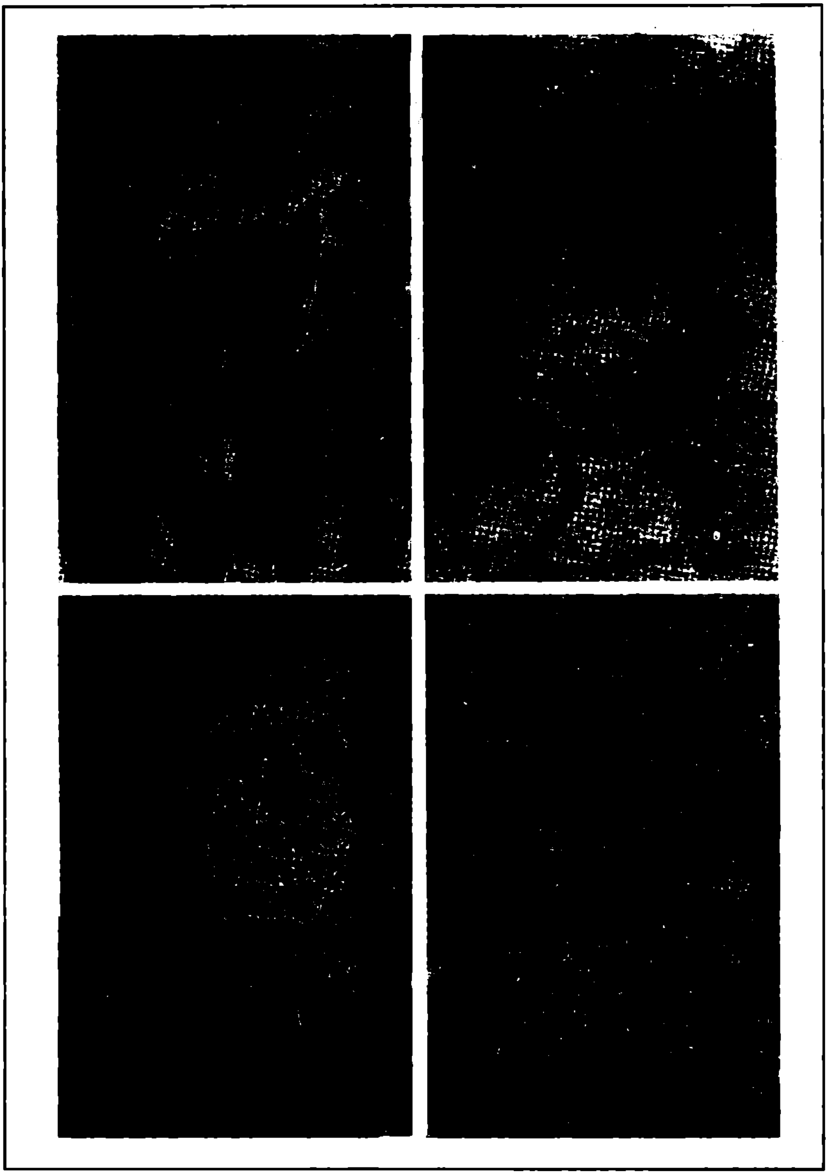

নজরুল রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

www.pathagar.com

প্রভাবিত প্রতিভা ও নজরুল ইসলাম

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

পৃথিবীতে একেবারে স্বয়ম্ভু কোন মৌলিক কবি আছেন কি? গ্রীসের মহাকবি হোমারও সেই মৌলিক কবি ছিলেন না। জানা যায় তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত চারণ কবি। এবং শুধু হোমারের পিতা নন সে যুগে হোমারের পিতার মত আরও অনেক চারণ কবি গ্রীসে ছিলেন।

এই হোমারকে অনুসরণ করে ইলিয়াডের এক প্রধান চরিত্র ঈনিস ও ওডিসিতে বর্ণিত মৃতুপুরীর কাহিনীকে ভিত্তি করেই রোমক কবি ভার্জিল তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ঈনিড কাব্যটি রচনা করেন। (ভূমিকা ঃ 'হোমার রচনা সমগ্র' ঃ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ)। ইংরেজী ঈনিডের ভূমিকাতেও ডব্লিউ. এফ. জ্যাকসন নাইট লিখেছেন —

> Homer was one of his main guides; and in the opening lines of the Aenied he used suggestions from the beginnings of both Hommer's poems, Reminiscences of Homer can be noticed all through the Aeneid;

জ্যাকসনের মতে ভার্জিল শুধু হোমারকেই অনুকরণ করেন নি তাঁর পূর্বের আরও লেখকদের অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলছেন —

> Even Virgil's philosophical ideas are drawn in part from different earlier writers. Lucretius was a very strong influence. Virgil knew his work well and made free use of many hundreds of his phrases in the Aenied.

অনুরূপভাবে ভার্জিলকে আবার দান্তে ব্যবহার করেছিলেন অথবা ভার্জিল দ্বারা দান্তে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ডিভাইন কমেডির দ্বিতীয় পর্ব পারগেটরীর ভূমিকায় ডরোথী সেয়ারস লিখছেন —

www.pathagar.com

The Purgatory, with its freshness, sparkle, and gaity, its tenderness, its journeying in hope, and its reunion of true lovers after estrangement and separation, is the very stuff of fairy-tale and quintesnence of all the romances, handled with all the classical restraint which its author had learned from Virgil.

বলা বাহুল্য শেক্সপীয়ার স্যাকভিলের নাটক Gorbodue-এর কাব্য আঙ্গিকের অনুকরণে নাটক লিখেছিলেন। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে লিখছেন —

Have you ever heard of Sackville Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called 'Gorbodue' first intruduced to Englishman the form of verse in which William Shakespeare wrote.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক মহৎ কবি পূর্বসূরীদের অনুকরণ অনুসরণ করে নিজের কাব্য-প্রতিভার বিকাশ সাধন করেছেন। এটা কোন কবির পক্ষে দারুণ লজ্জার ব্যাপার নয় এবং এতে কোন কবি ছোট হয়ে যান না। কিন্তু বাংলাদেশের কিছু নব্য অল্প শিক্ষিত সমালোচক এটাকে একজন কবির দুর্বলতা এমনকি তার ক্ষুদ্রতা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াসী।

এই সব সমালোচকেরা আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সাহিত্য-বিচারের রুচিকর পদ্ধতির গলায় পা দিয়ে যা সত্য নয় তাকেই সত্য বলে প্রচারে উৎসাহ দেখান। সম্প্রতি একটি সাহিত্য-সভায় এমনি একজন সমালোচক তাঁর বক্তৃতায় হঠাৎ করে বলে ফেললেন নজরুলের উপর রবীন্দ্রনাথের দারুণ প্রভাব আছে। বক্তৃতার বিষয় অন্য কিছু থাকলেও তিনি কয়েকবার এই কথাটি উল্লেখ করলেন। তিনি কোন উদাহরণ দিয়ে দেখালেন না যে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে অনুকরণ করেছেন; সে অনুকরণ আঙ্গিকের না ভাবনার। বলা বাহুল্য পূর্বসূরীর অনুকরণ কোন পাপের কাজ নয় কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকভাবে এই সব কথা বলার পিছনে একটা হীন উদ্দেশ্য আছে। সমাজে নিজের অবস্থানকে পোক্ত করা — সময়ের সুযোগ গ্রহণ করা — বিজয়ী রাজনৈতিক আদর্শের আনুকূল্য লাভ করে সুবিধা আদায় করা। এঁরা চিন্তা করেন না যে এর সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নেই। এতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় সত্য কিন্তু সাহিত্যকে কলুষিত করা হয় — নিজেকেও ছোট ও অপমানিত করা হয়। এসব এখানে ঘটার কারণ এ দেশের প্রায় একশ ভাগ লোক অশিক্ষিত। কারণ বুদ্ধিমানেরা জানে অন্ধের সামনে চুরি করলে তার কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। নজরুল রবীন্দ্রনাথের একেবারেই অনুকরণ অনুসরণ করেননি বা তাঁর দ্বারা

www.pathagar.com

বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি আমি তা বলব না, যেমন বলেছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্রোপাধ্যায় নজরুলের গভীরভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের কথা উল্লেখ করার পর বলেছিলেন —

> "কিন্তু নজরুল প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হলো, যখন সে কবিতা লিখলো, যখন সে নিজে গান রচনা করলো তখন তার কবিতার একটা অক্ষরের মধ্যে, তার গানের একটা আন্দোলনের মধ্যে। তার সুরের একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে, তার প্রকাশের ক্ষীণতম ভঙ্গীর মধ্যে, এমনকি তার ভাষার রীতির মধ্যে কোথাও দেখা গেলো না রবীন্দ্র-প্রতিভার বিন্দুমাত্র প্রভাবের লক্ষণ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সজ্ঞান চেষ্টায় রবীন্দ্র-প্রতিভার আওতার বইরে যে কিছুটা যায়নি, তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটা প্রাজ্ঞ সজ্ঞান চেষ্টা। নজরুলের এই স্বাতন্ত্রের মধ্যে নেই ক্ষীণতম চেষ্টার লক্ষণ। এ যুগের সাহিত্যিকের মধ্যে, সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে, সুর-স্রষ্টাদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে পেরিয়ে গিয়েছে রবীন্দ-প্রভাবের মন্ত্রপূত-গন্ডী। মানুষের মস্তিষ্কের সকল চেষ্টার বাইরে, যে রহস্যময় শক্তি দৈবধনের মত শুধু দু'একটি চিহ্নিত ভাগ্যবানকে দেয় তাঁর নিগূঢ় রহস্য মন্ত্রের দুর্লভ দীক্ষা। নজরুল এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই দুর্লভ শক্তির প্রসাদ, যার কৃপায় সে হয়ে ওঠে অনন্যসাধারণ, স্বতন্ত্র একক। (প্রাণ-সুন্দর বিপ্লবী কবি নজরুল : শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যে একেবারে অহেতুক কথাগুলো বলেছিলেন তা নয়; বিশ্বসাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের একজন আসাধারণ মেধাবী পাঠক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে খুঁটিয়ে পড়েই এ কথা বলেছেন। হয়ত কিছু কিছু বিষয় তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকবে তবু তাঁর বিষয়ের রায় সত্য থেকে খুব দূরে ছিল না।

নজরুলের প্রথম কাব্য "অগ্নি-বীণা'-র কথা ধরা যাক। এখনে মোট বারোটি কবিতা ছাপা হয় ;

> ১. প্রলয়োল্লাস ২. বিদ্রোহী ৩. রক্তাম্বরধারিণী মা ৪. আগমনী ৫. ধূমকেতু ৬. কামাল পাশা ৭. আনোয়ার ৮. রণভেরী ৯. শাত-ইল-আরব ১০. খেয়াপারের তরণী ১১. কোরবানী এবং ১২. মোহররম।

"অগ্নি-বীণা'-র সূচীপত্র উর্ধ্বরূপ হলেও কবিতাগুলোর প্রকাশ কালের সূচীপত্র ভিন্ন। এদের কালনুক্রমমিক সূচীপত্র নিম্নরূপ :

১. শাত-ইল-আরব -(১৯২০ মে), ২. খেয়াপারের তরণী (১৯২০ জুলাই), ৩. কোরবানী (১৯২০ আগস্ট), ৪. মোহররম (১৯২০ সেপ্টেম্বর), ৫. রণভেরী (১৯২১ সেপ্টেম্বর), ৬. আগমনী (১৯২১ সেপ্টেম্বর), ৭. আনোয়ার (১৯২১ অক্টেবর), ৮. কামাল পাশা (১৯২১ অক্টোবর), ৯. বিদ্রোহী (১৯২১ অক্টোবর) —[কমরেড মুজফফর আহমদের মতে

www.pathagar.com

কবিতাটি ছাপা হয়েছিল ১৯২১-এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এবং মুদ্রিত হয়েছিল প্রথমে 'বিজলী' তে-১৯৯২-এর ৬ই জানুয়ারী। "মোসলেম ভারত"-এর তারিখ ১৯২১-এর আক্টোবর থাকলেও পত্রিকা প্রকাশিত হয় অনেক পরে।] ১০. প্রলয়োল্লাস (১৯২২ মে), ১১. ধূমকেতু (১৯২২ আগস্ট) এবং ১২. রক্তাম্বরধারিণী মা (১৯২২ সেপ্টেম্বর)

লক্ষ করার বিষয় — এই বারোটি কবিতায় নজরুল যে ভাষা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দ ও ভাষা নজরুলের মৌলিক সৃষ্টি। এর কোন একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ থাকলেও তা এত সুদূরের যা নির্ণয় করা অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম কবিতা "শাত-ইল-আরব" -এর ছন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'সেবার পাহাড়ম্ব কবিতার ছন্দের মিল ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের, 'মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর'— চার পর্বের ছয় মাত্রার (৬+৬+৬+৫=২৩) মাত্রাবৃত্তে লেখা কবিতা। এই ছন্দের অনুসরণে নজরুল লেখেন—Ëশাতিল আরব। শাতিল আরব!! পূত যুগযুগে তোমার তীর'। কিন্তু সৃষ্টিশীল নজরুল তাঁর আবিষ্কারধর্মী প্রতিভা দিয়ে এই ছন্দে বৈচিত্র্য আনেন। পার্থক্যটা দেখানোর জন্যে আমি দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের কবিতার দুটি স্তবক পাশাপাশি তুলে ধরছি।

মেবার

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় —যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর
বিরাট দৈন্য দুঃখে তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে যেই দাবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্য ক্ষত্রবীর।
(দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ দ্বিজেন্দ্র-কাব্য-সঞ্চয়ন)

শাত-ইল-আরব

শাতিল আরব! শাতিল আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক সেনানী
য়ুনানী মিস্‌রী আরবী কেনানী;
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈনদের চাঙ্গা শির।
নাঙ্গা শির—

শামসের হাতে আঁসু আখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর!
শাতিল আরব! শাতিল আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর!!
(নজরুল : অগ্নি-বীণা)

www.pathagar.com

এখানে প্রথম কবিতাটির প্রথম স্তবকের চারটি পংক্তির সব কটিই ছমাত্রার চার পর্বের কিন্তু নজরুলেরটি প্রথম দু পংক্তির পর তার রূপ পরিবর্তন করেছে। নজরুল হঠাৎ দুটি পংক্তিকে দু'পর্বে ভাগ করেছেন— (৬+৬) তারপরে আবার তিনি ৫ম পংক্তিতে চার পর্বের পংক্তিতে ফিরে গিয়েছেন এবং শেষ পর্বের ৫ মাত্রার পংক্তির অনুকরণে ৬ষ্ঠ পংক্তিটিকে একটি পর্বের ৫ মাত্রার পংক্তি করে আবার প্রথম পংক্তিটির মত ৪ পর্বের ছয় মাত্রার (৬+৬+৬+৫) পংক্তিতে ফিরে গিয়েছেন। এতে একটি অসামান্য কারিগরী কৌশলের সঙ্গে সাঙ্গীতিক আবহের সৃষ্টি হয়েছে এবং পূর্বসূরীর সাফল্যকে ছাড়িয়ে এটি অনেক উপরে উঠেছে।

এখানে নজরুল আর যে কাজটি করেছেন তা হল গতানুগতিক শব্দ ব্যবহারকে দূরে হঠিয়ে মুসলিম বাংলার শব্দ-ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্পিরিটটা এখানে আছে কিন্তু সুদক্ষ রাঁধুনীর হাতে পড়লে সামান্য খাদ্য যেমন অসামান্য হয়ে ওঠে এখানেও তাই হয়েছে। এখানকার পার্থক্যটা একটি সাধারণ সমাধির সঙ্গে তাজমহলের যে পার্থক্য অথবা একটি গ্রাম্য মসজিদের সঙ্গে দিল্লীর জুমা মসজিদের যে পার্থক্য।

"মোসলেম ভারত"-এ 'শাত-ইল-আরব'-এর পর প্রকাশিত হয় "খেয়াপারের তরণী"। ছন্দ সম্পূর্ণ পৃথক। চার মাত্রার মাত্রাবৃত্ত; চার পর্বের পংক্তি (৪+৪+৪+৪) কোন কোন পংক্তি (৪+৪+৪+৩) — এই মাত্রার। অভিনব ধরনের ছন্দ। পংক্তির শেষ পর্বটি কখনও চার ও কখনও তিন মাত্রার হলেও কানে লাগে না। এটা একাটা বিস্ময়কর সৃষ্টি। সঙ্গীতের উপর দখল থাকার জন্যেই নজরুলের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন দত্ত কারও কাব্যে এই ছন্দের নমুনা নেই। মোহিতলাল কর্তৃক এই কবিতার ও তার ছন্দের প্রশংসাই বলে দেয় য়ে নজরুল কারও অনুকরণ করেন নি। নতুন সৃষ্টি করেছেন। মোহিতলালের উক্তি ছিল নিম্নরূপ:

> "বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতম ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি; কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।

এটা প্রমাণ করে তিনি পূর্বসূরী বা সমকালীন কোন জীবিত বা মৃত বাঙালী কবির কাব্যছন্দে প্রভাবিত হন নি। পরবর্তী কবিতা 'কোরবানী'র-ছন্দও নতুন। এই ছন্দ সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন —

> "শুধু ঘন-ঘন যুক্তাক্ষর বিন্যাসই নয়— পর্বন্ত হসন্তবর্ণ যতদূর সম্ভব বর্জন করিতে পারিলে, স্বর-প্রসারণের কোন অবকাশ আর থাকে না বলিয়া এই বাংলা ছন্দেও প্রবল আঘাতমূলক ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি করা যায়। যথা—

www.pathagar.com

'ওরে, হত্যা নয় আজ সত্য-গ্রহ শক্তির উদ্বোধন'।

ইহা পড়িতে হইবে এইরূপে:

ওরে 'হত্যা-'নয়াজ০ সত্যগ্রহ০ 'শক্তি-'রুদ্বো০ 'ধন' — ইহার কোনখানে স্বরপ্রসারণের অবকাশ মাত্র নাই।"

এইভাবে প্রতিটি কবিতাতেই নজরুল নতুন ছন্দের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছেন। শুধু নজরুলেরই সৃষ্টি 'খেয়াপারের তরণী'-র ছন্দের সঙ্গে 'মোহররম'-এর এবং 'বিদ্রোহী'র ছন্দের সঙ্গে 'ধূমকেতু'র ছন্দের মিল আছে। নইলে প্রতিটি কবিতাই স্বতন্ত্র ছন্দে বিরচিত হয়েছে। 'শাত-ইল-আরব'-এর ছন্দের সঙ্গে যেমন মিল নেই 'খেয়াপারের তরণী' বা 'মোহররম'-এর ছন্দের, মোহররমের ছন্দের সঙ্গে তেমনি মিল নেই 'কোরবানী' বা 'বিদ্রোহী' বা 'কামাল পাশা' বা 'প্রলয়োল্লাসে'র ছন্দের। স্বরবৃত্তে রচিত 'কামাল পাশা' ভিন্ন বাকী কবিতাগুলো মাত্রাবৃত্তে রচিত হলেও প্রত্যেকেরই ছন্দ-চারিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন — যা বাঙলা সাহিত্যে অভিনব ও নতুন। বলা বাহুল্য এই ভাষার চরিত্রও ভিন্ন। —কেননা এদের ভাবের চরিত্রও ভিন্ন। "খেয়াপারের তরণী"-র ছন্দ ভাব ও ভাষা সম্পর্কে মোহিতলাল যে উক্তি করেছিলেন— 'কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী।' সেটি 'অগ্নি-বীণা'-র সব কবিতা সম্বন্ধে সত্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নজরুল 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের কবিতায় কোন বাঙালী কবির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। না রবীন্দ্রনাথের দ্বারাও নন। সে-জন্যই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ পড়লেও নজরুলের কবিতার ভাব ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েনি।

বলা বাহুল্য 'অগ্নি-বীণা' ছাড়িয়ে আমরা নজরুলের 'বিষের বাঁশী-তে এসে সেই একই ব্যাপার দেখব। 'বিষের বাঁশী'র শ্রেষ্ঠ কবিতা এর প্রথম কবিতা 'ফাতেহা-ই-দোয়জ দহম'। এব আবির্ভাব ও তিরোভার দুই অংশের কবিতা মাত্রাবৃত্তে রচিত হলেও এর রূপ-বৈচিত্র্য বাংলাকাব্যে অভিনব। এর 'আবির্ভাব' অংশটি ১৯২০-এর নভেম্বরে এবং 'তিরোভাব' অংশটি ১৯২১-এর নভেম্বরে 'মোসলেম ভারত'-এ প্রকাশিত হয়। এই কবিতার আঙ্গিক রূপের কোন পূর্ব-ঐতিহ্য নেই — যা দেখে বলা যায় নজরুল কোন পূর্বসূরী কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। "বিষের বাঁশী" কাব্যগ্রন্থের 'মুক্ত পিঞ্জর' ও 'ঝড়' কবিতাটি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। এদের ছন্দ পরবতীকালের বা সমকালীন সময়ের বেশ কিছু বাঙালী কবি অনুসরণ করেছেন।

এখানে এসেই আমরা এখন একটি প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করব। নজরুলের কবিতায় কি তাহলে কোন কবির অনুকৃতি আদৌ নেই। দেশী-বিদেশী কোন কোন কবির অনুসরণ আছে কিন্তু অন্ধ অনুকরণ হয়ে নেই। নজরুল বেশ কিছু কবির ভাব বিষয় ছন্দ বা ভাষাকে ব্যবহার্য উপাদান হিসেবে নিয়েছেন তারপর তাঁকে প্রতিভার আগুনে গলিয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন অলঙ্কার।

www.pathagar.com

এখানে নজরুলের সুবিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র প্রসঙ্গ আসে। মুক্তক মাত্রাবৃত্তে রচিত এ কবিতার ছন্দ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নতুন যেমন "বলাকা"র মুক্তক অক্ষরবৃত্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যে নতুন। কিন্তু এ কবিতাটি কি মোহিতলালের 'আমি' প্রবন্ধের অনুকরণ?

কম্‌রেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'র ২৪১ পৃষ্ঠায় লিখছেন : 'মোহিতলাল প্রচার করছিলেন যে নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমি' শীর্ষক একটি লেখার ভাব নিয়ে কবিতাটি (বিদ্রোহী) লিখেছে, অথচ কোন ঋণ স্বীকার করেনি।

তিনি এ বিষয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে ১৯২০-এ মোহিতলাল ১৯১৪-এ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর এই লেখাটি নজরুলকে পড়ে শোনান; যেখানে তিনিও ছিলেন; এবং তিনি এবং নজরুল সে লেখাটি যথেষ্ট অস্বস্তি এবং অনীহার সঙ্গে শোনেন। এর এক বছর পরে ১৯২১-এর ডিসেম্বর নজরুল বিদ্রোহী লেখেন। মুজফ্‌ফর আহমদের মতে উভয় লেখার মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকাসত্ত্বেও লেখা দু'টি একই মাপের বা মানের নয় এবং ভাবসম্পদের আত্মসাৎ নয়। তিনি অবশ্য বলেছেন — 'এটা আমি মানতে রাজী আছি, মোহিতলালকে লেখাটি পড়তে শুনে তার (নজরুলের) মনে হয়তো একথাটা আসতে পারে যে, এ ধরনের একটি কবিতা লেখা যায়।'

১৯৭৩-এর "কালস্রোত" পত্রিকাতে আমি উভয় কবির প্রবন্ধ ও কবিতার একটি তুলনামূলক আলোচনা করি এবং সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দেখাই। আমি দেখাই শেষ পর্যন্ত মোহিতলালের লেখাটি গদ্য এবং নজরুলেরটা কবিতা। পরবর্তীকালে আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং কবি আবদুল কাদিরও এর উপর আলোচনা করেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন —

> কবি-মানসের অঙ্কশায়ী প্রেরণা-ভূমিতে মোহিতলালের কবিতাটি নজরুলের 'বিদ্রোহী কবিতা ফলাতে সহায়তা করেছিলো, এতে আমি সন্দেহ দেখি না।.... আমার বিশ্বাস, বিদ্রোহীর মনোজমি তৈরী করেছে ঐ রচনাটি।

আর কবি আবদুল কাদির এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পর লিখেছেন —

> "আমি" শব্দ ব্যবহারের ভঙ্গী 'বিদ্রোহী'কে করেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং তাঁর নবোদ্ভাবিত মুক্তক ষন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হয়েছে এই ভঙ্গির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ও অনুকূল। নজরুলকে 'আমি' শব্দ দিয়ে কবিতা শুরু করবার এই কায়দা প্রবর্তন করতে মোহিতলালের পরানুকরণজাত 'গদ্য' রচনা স্মরণ করতে হয়নি।

কবি আবদুল কাদির দেখিয়েছেন মোহিতলালের বহু আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "প্রভাত সঙ্গীত কাব্যের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় 'আমি' শব্দটিকে অতিরিক্ত পর্ব হিসেবে ব্যবহার করে লিখেছেন :

www.pathagar.com

আমি ঢালিব করুণাধারা;
আমি ভাঙিব পাষাণকারা;
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।

এবং আবদুন কাদিরের মতে "নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'আমি' শব্দের বারংবার প্রয়োগ এই আঙ্গিকেই হয়েছে। এবং তিনি হুইটম্যানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে তাঁর Song of Myself কবিতাটিতে 'I' শব্দের পৌনপুনিক ব্যবহার আছে– যাঁর কবিতা করাচী সেনানিবাসে থাকতে নজরুল পাঠ করেছিলেন। আবদুল কাদির তাঁর পক্ষ সমর্থনে এ সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নিম্নোক্ত বক্তব্যটির উদ্ধৃতি দেন :

> "মোহিতলালের পক্ষ থেকে বলা হল 'বিদ্রোহী' নজরুলের মৌলিক রচনা নয়, কয়েক বছর আগে 'মানসী'তে প্রকাশিত মোহিতলালের 'আমি' নামক সন্দর্ভের ভাবানুবাদ। নিরপেক্ষ বিচারে — এ অভিযোগ ভিত্তিহীন।... দুয়ের মধ্যে সুরের বা মনোভঙ্গীর আসমান জমিন ব্যবধান। সর্বশেষে 'আমি' প্রত্নতত্বের বস্তু, 'বিদ্রোহী' চিরন্তনের কবিতা।

নিরপেক্ষ বিচারে মোহিতলালের 'আমি'র সঙ্গে 'বিদ্রোহী'র সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি বৈসাদৃশ্য প্রচুর। প্রধান যে পার্থক্য তা শুধু গদ্য ও কবিতায় নয় — পার্থক্য লক্ষ্যের এবং রসসৃষ্টির। 'বিদ্রোহী' কবিতা উদ্দীপনামূলক বীররসের কবিতা 'আমি' সন্দর্ভ তা নয়। 'বিদ্রোহী' ও 'আমি'র মধ্যে আকৃতিগত যে সাদৃশ্যটা প্রথমে চোখে পড়ে তা হল ছন্দের নয় উপমার, উদ্দেশ্যের নয় তাত্ত্বিকতার। দুটি লেখাই উপমা-মালায় সাজানো। 'বিদ্রোহী'তে যে বীর ও রৌদ্ররসের চমক আছে, আমিত্বের যে নিখুঁত রূপায়ণ আছে সে রস ও রূপ 'আমি'তে নেই। মোহিতলালের লেখাটি পড়ে মনে হয় কোন এক অজ্ঞাত মহাকবির একটি কবিতাকে তিনি গদ্যে রূপান্তরিত করেছেন। আর নজরুল একটি নিরস গদ্যকে রসোদ্দীপ্ত মহাকাব্যে রূপান্তরিত করেছেন। আমার মনে হয় মোহিতলাল ও নজরুলের লেখা দুটোর পার্থক্য সম্বন্ধে এ ধরনের একটা উপমা দেয়া যায় : কোন এক পরিবারে বাজার থেকে গোশ্‌ত আনা হয়েছিল। রান্না-আগ্রহী পরিবারের ছোট্টমেয়েটি সেটি রান্নার জন্যে বায়না ধরে। তাকে সেটা রাঁধতে দেয়া হল কিন্তু সে রান্না কারও মুখে রুচল না। বাড়ীর গিন্নী যখন সুষম মশলা দিয়ে সেই একই গোশ্‌ত পাকালো তখন তা হল সুস্বাদু, মুখরোচক। বলা বাহুল্য মোহিতলালের গদ্যটিকে যদি গিনি সোনার সঙ্গে তুলনা করা যায় ত নজরুলের 'বিদ্রোহীকে তুলনা করা যায় শ্রেষ্ঠ সোনারুর তৈরী মুক্তাখচিত স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে। সে জন্যেই বলা যায় নজরুল মোহিতলালের অনুসরণ করেননি বা তাঁর লেখার দ্বারা প্রভাবিত হননি বরং বলা যায় তিনি তাঁকে ব্যবহার করেছেন; যেমন পৃথিবীর অনেক মহাকবিরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কবিকে ব্যবহার করে তাদের সৃষ্ট সামান্যকে

www.pathagar.com

অসামান্য করে তোলেন। এর প্রমাণ 'আমি' ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হলেও কোন বাঙালী পাঠক চিত্তকে তা উদ্বোধিত করতে সক্ষম হয়নি এবং ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মোহিতলাল এটিকে প্রকাশ করতেও সাহস পাননি। কারণ সাহিত্য-বোদ্ধা মোহিতলাল জানতেন তাঁর রচনার সাহিত্য-মূল্য যাই থাক সমুজ্জ্বল 'বিদ্রোহী'র তুলনায় তা সূর্যের পাশে প্রদীপ — মলিন নক্ষত্র।

বলা বাহুল্য সাহিত্যের ইতিহাস বলছে নজরুল মোহিতলালের দ্বারা প্রভাবিত হননি। মোহিতলালই নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার প্রমাণ মোহিতলালের লেখা পড়ে নজরুল উচ্ছসিত হননি। নজরুলের লেখা পড়ে উচ্ছসিত হয়ে 'মোসলেম ভারত'-এর সম্পাদককে পত্র লিখেছিলেন মোহিতলাল। শুধু এই নয় নজরুলের প্রশংসা করে তিন তিনটে কবিতা লিখেছিলেন মোহিতলাল। সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন —

> "সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব মোহিতলাল সযত্নে কাটাইতে যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন করিয়া সত্যেন্দ্র-প্রভাব জাগিয়াছিল। --কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব কাটিতে একটু দেরী হইয়াছিল। তাহার উদাহরণ 'কালাপাহাড়' ও 'রুদ্র-বোধন'।

উপরের ঐ উক্তি উদ্ধৃত করে মুজফফর আহমদ লিখছেন —

> "এই থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে নজরুল ইসলাম মোহিতলালের ভাব-সম্পদ আত্মসাৎ করেনি, বরং মোহিতলালই নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন"।

বস্তুতঃপক্ষে 'বিদ্রোহী' কবিতা পৃথিবীর বহু মনীষী কবির বিদ্রোহী চেতনার একটি আশ্চর্য রূপায়ণ। এতে রুমী, হাফিজ, খৈয়াম, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, বাইরন এবং হুইটম্যানের ভাবচৈতন্য প্রশ্রয় পেয়েছে। আমরা যখন শেলীর The Mask of Anarchy-র

> And he wore a kingly crown;
> In his grasp a scepter shone;
> On his brow this mark I saw —
> I AM GOD AND KING AND LAW.

পড়ি তখন নজরুলের "মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর' —পংক্তিটার কথা মনে পড়ে।

কিন্তু আমি শুধু 'অগ্নি-বীণা'র উপর কোন্ কোন্ কবির প্রভাব পড়েছে তা নিয়ে আলোচনা নয় সমগ্র নজরুলের উপর কোন্ কোন্ কবির প্রভাব পড়েছে বা কোন্ কোন্ কবি প্রেরণা

www.pathagar.com

যুগিয়েছে তারই আলাচনা করছি। কিন্তু "অগ্নি-বীণা"র কথা এ জন্যেই প্রথমে বললাম যে সাহিত্যজীবনের সূচনাতেই অলৌকিক মৌলিকতা নিয়ে নজরুল আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রতিটি কবিতার ছন্দ-নির্মাণে তিনি নিজেকে নিজে অতিক্রম করেছেন। অতুলনীয় প্রতিভা ছাড়া এটা সম্ভব হয় না। যে কোন ভাষায় কোন কবি যদি একটি মাত্র ছন্দ সৃষ্টি করতে পারেন — যা ভাষার, বিশেষ করে কাব্যভাষার, সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় তাহলে তাকে অসাধারণ কৃতিত্ব বলে চিহ্নিত করা হয়। সেখানে নজরুল একটির পর একটি ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে নজরুল এটাকে কিভাবে সম্ভব করেছিলেন তার অনুসন্ধান বা তার উৎসের সন্ধান করলে কোন্ কোন্ কবিরা নজরুলের ছন্দ-নির্মাণ-প্রতিভার ভিত্তি রচনা করেছিলেন তা জানা যাবে।

আমি পাঠকের দুটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ১৯২০-এর "মোসলেম ভারতে"র কয়েকটি সংখ্যায় নজরুল-অনূদিত হাফিজের কয়েকটি দীওয়ান বা গজল প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল হাফিজের দীওয়ানের মূল ছন্দে হাফিজের দুটি দীওয়ানের অনুবাদ করেছিলেন। ১৯২৩-এর মার্চের 'প্রবাসী'তে নজরুল 'আরবী ছন্দের কবিতা' শীর্ষক একটি লেখা লেখেন এবং আঠারোটি আরবী ছন্দের অনুকরণে ক্ষুদ্রদেহী কবিতা লেখেন। এই আঠারোটি ছন্দ ছিল : ১. হযজ, ২. রবজ, ৩. রমল, ৪. মোতাকারেব, ৫, সরীএ, ৬. খফীফ, ৭. ময্‌তস্, ৮. মোজারা, ৯. কামেল, ১০. ওয়াফের, ১১. মোতদারিক, ১২. তবীল, ১৩. মদীদ, ১৪. বসীত, ১৫. মন্‌সরহ্, ১৬. করীব, ১৭. যদীদ, ১৮. মশাকেল।

হাফিজের ছন্দে এবং আরবী ছন্দে নজরুল যে কবিতা লেখেন তাতেই বোঝা যায় যে নজরুল গভীরভাবে আরবী এবং পারসী ছন্দের চর্চা করেছিলেন। এবং এ-থেকেই বাংলা কবিতায় তিনি নতুন ছন্দ সংযোজন করতে সক্ষম হন, এ থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন দত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবং বিস্মিত করতে সক্ষম হন মোহিতলালকে। মিলটনের প্যারাডাইস লস্টের সঙ্গে এবং পেত্রার্কের সনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলেই মধুসূদন ব্লাঙ্ক ভার্সের অনুসরণে আমিত্রাক্ষর ছন্দ বা অন্ত্যানুপ্রাসবর্জিত ছন্দ এবং সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। নজরুলও অনুরূপভাবে পারসী ও আরবী ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়াতে তাঁর পক্ষে 'অগ্নি-বীণা' ও বাঙলায় গজল রচনা সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভেদ্য প্রতিভার জাল ছিঁড়ে নজরুলের বেরিয়ে আসার এটাই ছিল প্রধান কারণ। শুধু দিওয়ান-ই- হাফিজের ছন্দ নয়; নজরুল পরবর্তীকালে ওমরের রুবাই অনুবাদ করতে গিয়েও মূল পারসী রুবাই-এর ছন্দে তা অনুবাদ করেন। বলা বাহুল্য শুধু ছন্দ নয় নজরুল রুমী, হাফিজ ও খৈয়ামের ভাব-প্রেরণা দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হন। এই তিন মহাকবি নজরুলের বিদ্রোহী-সত্তা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন। এই কারণটি নজরুল ১৯২৮-এর জানুয়ারীর এক পত্রে ইব্‌রাহীম খাঁকে লেখেন —

www.pathagar.com

"আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে হাফেজ-রুমীকে শ্রদ্ধা করেন –এ-ও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদেরে"।

আমি পূর্বে শেলীর কথা বলেছি কিন্তু নজরুলের বিদ্রোহী-সত্তা সৃষ্টিতে আর একজন কবি সহায়ক ইন্ধন যুগিয়েছিলেন — তিনি আমেকিার জাতীয় কবি হুইটম্যান। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা ত বটেই তাঁর 'সাম্যবাদী 'সর্বহারা' এবং 'সন্ধ্যা' কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় হুইটাম্যানীয় সুর অনুরণিত হয়েছে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না হুইটম্যানের কাব্যের গণতন্ত্রীয় মানবিকতার সুর এবং তাঁর মুক্ত -ন্দের আঙ্গিক প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বহু কবিকে অনুপ্রাণিত করে। বাংলাদেশের প্রধান কবিদের অনেকেও। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রও আছেন, এঁরা সবাই হুইটম্যানের অনুসরণে কবিতা লিখেছেন। ইব্‌রাহীম খাঁকে লেখা চিঠিতে নজরুল হুইটম্যানের নাম দুবার ব্যবহার করেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখছেন —

"সকল সমালোচনার উপরে যে বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী–এই প্রাণহীন আনন্দগুপ্তার কুশ্রী চীৎকারে হুইটম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।"

অন্য জায়গায় লিখছেন —

"এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্যস্রষ্টাদের জন্য নূতন সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়; পুশ্‌কিন; দস্তয়ভস্কি, হুইটম্যান, গোর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসার অধিকার তারা পাবেই।

নজরুল যে শুধু হুইটম্যান পড়েছিলেন তাই নয় তাঁর কবিতার ভাবানুবাদও করেছিলেন যে সে-কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

নজরুলে কয়েকজন ইংরেজ কবি কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্টভাবে অনুসৃত হয়েছেন বা অণুরণিত হয়েছেন। নজরুলের কথায় বেশী করে কীটসের, শেলীর, ইয়েটস, মিলটন এবং ব্রাউনিং-এর কথা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন —

১. তুমি হয়ত মনে করছ - বেচারা শেলী, বেচারা কীটস্, বেচারা নজরুল। (কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা নজরুলের চিঠি।

২. রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায় বলতেন, "দেখ উন্মাদ তোর জীবনে শেলীর মত, কীটসের মত খুব বড় একটা ট্রাজেডি আছে। তুই প্রস্তুত হ"। (প্রাগুক্ত)

৩. এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মত Milton-এর Birds of Paradise-এর মত, [বর্তমান বিশ্বসাহিত্য : 'নজরুল' রচনাবলী (২য় খণ্ড)].

www.pathagar.com

৪. স্বপ্নচারীদের Keats বলেন :

A thing of beauty is a joy forever,
Beauty is truth, truth beauty

(প্রাগুক্ত)

৫. সুন্দরের খেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মন্ত্র — "Beauty is truth, truth beauty. (এলবার্ট হলে দেওয়া নজরুলের অভিভাষণ)

৬. আমার কেবলি মনে পড়ছে (বোধ হয় ব্রাউনিং-এর) একটা লাইন :

"So very mad, so very bad,
So very sad it was, yet it was sweet!

(স্মৃতি থেকে লেখাতে উদ্ধৃতিতে ভুল ছিল। ব্রাউনিং-এর মূল লেখাটি ছিল এমনি :

How sad and bad and mad it was!
But then! how it was sweet!)

(কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা নজরুলের চিঠি)

৭. তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়। পুশকিন, দস্তয়ভস্কি, হুইটম্যান, গোর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। (ইব্‌রাহীম খাঁকে লেখা নজরুলের চিঠি)

৮. এক দিকে নোগুচি, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি Dreamers স্বপ্নচারী; আর দিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ, বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

(বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য : নজরুল রচনা সম্ভার)

কীটসের ইয়েটসের মিল্টন বা ব্রাউনিং-এর কোন কবিতার অনুবাদ নজরুল করেছেন কি না আমার জানা নেই তবে শেলীর ভাব অবলম্বনে জাগার তূর্য বলে একটি কবিতা তিনি লিখেছিলেন যেটা ফান-মনসা'য় মুদ্রিত হয়েছে। শেলীর অতি দীর্ঘ কবিতা The Mask of Anarcley-র ভাবালম্বনে লেখা মাত্র দুস্তবকের কবিতার সেই কাব্যটি Mask of Anarchy-র শেষ স্তবক। মূল স্তবকটি এমনি —

Rise like lions after slumber
In unvanquishable number,
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you —
Ye are many — they are few —

www.pathagar.com

নজরুলের অনুবাদ :

নিদ্রোত্থিত কেশবীর মত
ওঠ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত!

আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী॥

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেল সব সমীরে যেমন ঝরায় শিশির-বারি!
উহারা কজন? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী॥

নজরুল ইসলাম সংস্কৃত কাব্যও পাঠ করেন এবং সংস্কৃত ছন্দে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের "ছন্দ-সাধনায়" শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখছেন :

"এই সময় হুগলীতে সংস্কৃত, ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ তরুণ কবি শ্রীগীস্পতি ভট্টাচার্য বেশ নাম করেছেন।—

গীস্পতি বাবু ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্য তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত কণ্ঠে অনর্গল আবৃত্তি করে যান নজরুলের আড্ডায়। নজরুল মুগ্ধ হন। নজরুলও গীস্পতি বাবুর কাছে সংস্কৃত ছন্দের অনুশীলন করতে আরম্ভ করেন। নজরুলের স্বাভাবিক প্রবণতায় কাব্য রূপ ফুটে ওঠে শ্রুতিধর হিসাবে; ছন্দও ধরতে পারেন শোনার মাধ্যমে। কিন্তু কোন ছন্দের কি নাম তা ঠিক করে দেন গীস্পতি বাবু। কখনও কখনও 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধানের 'ছন্দ' পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবন্ধ করেন উভয়ে।

এই সময় কবি নজরুল তোটক ছন্দ, শার্দুলবিক্রিড়িত, সিংহবিক্রিড়, অনঙ্গশেখর, পঞ্চচামর, শিখরিনী, অনুষ্টুপ, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দে কবিতা লিখতে শুরু করেন। প্রয়োজনবোধে ভাবকে প্রকাশের জন্য দু তিনটে ছন্দ ভেঙে মিশ্রছন্দেও কবিতা লিখেছেন।—

এই সময় কবিকে দেখেছি ভাব ও ছন্দের অনুসন্ধানে মহাকবি কালিদাস প্রমুখের কাব্য, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের শ্লোক পড়তে;"

উল্লেখযোগ্য 'বিষের বাঁশী'র একটি বিখ্যাত কবিতা 'জাগৃহী' নজরুল সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দে লেখেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ এই —

জ্বলে　　বৈশ্বানরের ধূধূ লক্ষ শিখা,
আভ　　বিষ্ণু-ভালে জ্বলে রক্ত-টিকা!
রণ—　　শ্রান্ত অসুর-সুর-যোদ্ধৃ-সেনা,
শুধু　　রক্ত-পাথার, শুধু রক্ত-ফেনা।

www.pathagar.com

আমার ধারণা নজরুলের 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের 'পূবের হাওয়া' (ঝড় : পূর্বতরঙ্গ) কবিতাটির শেষ তিনটি অংশ 'শার্দুল-বিক্রীড়িত', 'সিংহ-বিক্রীড় এবং 'অনঙ্গ শেখর ছন্দে লিখিত। মনে হয় কবিতার এই অংশ :

এইবার গাহি নেচে নেচে
রে জীবনহারা ওঠ্ বেঁচে।
রুদ্র কালের বহ্নি-রোষ
নিদাঘের দাহ গ্রীষ্ম-শেষে
নিবাতে এনেছি শান্তি-সোম,
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্।

এবং এই অংশ—

এস মোর শ্যাম-সরসা
ঘনিমার হিঙ্গুল শোষা
বরষা প্রেম-হরষা,
প্রিয় মোর নিকষ-নীলা!
শ্রাবণের কাজল গুলি'
ওলো আয় রঙিয়ে তুলি
সবুজের জীবন তুলি,
মৃতে কর প্রাণ-রঙীলা॥

সংস্কৃত ছন্দে লেখা। পরবর্তীকালে 'সিন্ধু-হিন্দোলে'র 'বাসন্তী' কবিতায় নজরুল উপরোক্ত কবিতাটির ছন্দ ব্যবহার করেন। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি —

না যেতে শীত-কুহেলী
ফাগুনের ফুল-সেহেলী
এল কি? রক্ত চেলী
করেছে বন-উজালা।
ভুলালি মন ভুলালি,
ওলো ও শ্যাম-দুলালী,
তমালে ঢাল্‌লি লালী,
নীলিমার লাল দেয়ালা॥

'পূবের হাওয়া' কবিতাটি হুগলীতে বিরচিত। এতে মনে হয় প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের নজরুলের সংস্কৃত ছন্দ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যথার্থ।
"শেষ সওগাত" কাব্যগ্রন্থ সংকলিত নজরুলের ছন্দে সঙ্গীতগুচ্ছ ১০টি সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত। এই ছন্দগুলো হল ১. স্বাগতা, ২, প্রিয়া, ৩. মধুমতী, ৪. মত্তময়ূর, ৫.

www.pathagar.com

রুচিরা, ৬. দীপক-মালা, ৭. মন্দাকিনী, ৮. মঞ্জুভাষিণী, ৯. মনিমালা, ১০. ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত এবং সৌরাষ্ট্র ভৈরব। নজরুলের কাব্য-সাধনায় তাঁর ছন্দ-চর্চা সাধনা যে কত গভীর ও বিচিত্র উপরোক্ত চিত্র তার উদাহরণ।

কিন্তু নজরুল সংস্কৃত ছন্দ চর্চা করলেও সংস্কৃত কোন কবি তাঁকে প্রভাবিত করেছেন কি না! আমরা পূর্বে নজরুলের উক্তিতে কালিদাসের নামোল্লেখ হতে দেখেছি। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তির উদ্ধৃতির মধ্যেও কালিদাসের কথা উল্লেখিত হয়েছে। নজরুল তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ১৯৩৭-এ যে চিঠি দেন তাতেও কালিদাস ও তাঁর রচিত 'মেঘদূত'-এর উল্লেখ দেখা যায়। নজরুল লিখছেন —

> তোমার পত্র পেয়েছি-সেদিন নববর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘমেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনর বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল— তা তুমিও হয়ত স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই 'মেঘদূত' বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে। তাঁর প্রিয়ার কাছে।

নজরুল কালিদাস যে পড়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু কালিদাসের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নজরুলের কবি-সত্তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে তিনি বিদ্রোহী অন্যদিকে তিনি প্রেমিক। ইব্রাহীম খাঁকে লেখা তাঁর পত্রে এবং তাঁর 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বিশ্বে কবি সাহিত্যিককে দুভাগে ভাগ করেছেন। একদিকে বাস্তববাদী নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের অন্যদিকে স্বপ্নচারী রূপস্রষ্টাদের। কালিদাস-রবীন্দ্রনাথকে তিনি রূপস্রষ্টাদের দলে ফেলেছেন। দেখতে হবে নজরুল রূপস্রষ্টাদের দলে যেতে পেরেছেন কি না। যদিও নজরুল নিজেকে একদা পুশকিন, দস্তয়ভস্কি, হুইটম্যান এবং গোর্কির সমগোত্রীয় বলে ভাবতেন তবু তাঁর সৌন্দর্যপ্রেমিক শিল্পীমন তাঁকে কালিদাস, ইয়েটস, কীটস ও রবীন্দ্রনাথের মত স্বপ্নচারী রূপস্রষ্টাদের দলে টেনে এনেছিল। তিনি শুধু বলেননি, "সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মন্ত্র — Beauty is tuth, tuth beauty." তিনি শামসুন্নাহার বেগমের কাছে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন —

> "আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সংঘ।

এবং রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'নতুন-চাঁদ'-এর 'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' কবিতায় লিখেছিলেন —

> "হে রস-শেখর কবি, তব জন্মদিনে
> আমি কয়ে যাব মোর নব জন্মকথা!

www.pathagar.com

আনন্দ-সুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নি-গিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব দাহ-জ্বালা!
আমার হাতের সেই খর-তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি।

বিদ্রোহী কবি যে রূপস্রষ্টা কবি হিসেবে নবজন্ম লাভ করেছিলেন এখানে তারই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এটা যে পরিবর্তিত নজরুল সেই নজরুলের মধ্যে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস ও কীটসের চারিত্রিক আদল যে আছে সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে তা ধরা পড়ে। উল্লেখ্য শক্তিমান নজরুলের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রূপকে তাঁরা আড়াল করে প্রকাশিত নন; নজরুলের ধমনীর অন্তঃস্রোতে প্রবাহিত নজরুলের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে উজ্জ্বল করে বিকশিত। আমাদের মনে রাখতে হবে কালিদাস, ইয়েটস, কীটস ও রবীন্দ্রনাথ রূপস্রষ্টা হয়েও একে অপরের থেকে ভিন্ন এবং সেই জন্যেই আমাদের ভুললে চলবে না বিচিত্র বিষয়ে বিকশিত নজরুল কোন একক কবির দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত বা প্রভাবিত নন। মহা উদার এবং গুণীদের গুণের প্রতি অতি-অকৃপণ, অতি-শ্রদ্ধাশীল এবং অতি-বিনয়ী নজরুল যদিও রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত তাঁর 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি' কবিতায় বলেছিলেন—'তোমারি বিচ্যুত ছটা আমি ধূমকেতু!' তবু এই দুই কবির সৃষ্টি' স্বরূপের ভিন্নতা ও পার্থক্য বিপুল ও বিশাল এবং এ পার্থক্য একা শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নয় তিনি যাঁদের শোষণ করে পুষ্ট হয়েছেন সেই দেশী-বিদেশী সকল কবির সঙ্গেও।

আমি এই প্রবন্ধের শুরুতে বলেছি এবং দেখিয়েছি স্বয়ম্ভূ মৌলিক কবি বলে পৃথিবীতে খুব কম কবিই আছেন। উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিও যে, বিশ্ববন্দিত কবিরা তা ছিলেন না — এবং পূর্বসূরীদের নিকট ঋণী হয়েও অনেকে প্রতিভার অলৌকিকতায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুন্নত হয়েছেন। অতএব নজরুলের পক্ষে পূর্বসূরী কারও কাছে ঋণী হওয়া অগৌরবের নয়।

পৃথিবীতে এমন উদাহরণ যথেষ্ট আছে যে কবি কোন ছন্দ সৃষ্টি না করেও অন্যের সৃষ্ট ছন্দে কাব্য নয়, মহাকাব্য রচনা করে গৌরবের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার নতুন ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নজরুল যে নতুন ছন্দ ও কাব্যভাষা সৃষ্টি করেছেন তার জন্যে তাঁর অতুলনীয় কীর্তিকে ক্ষুদ্র করে দেখার অবকাশ কোথায়?

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলিত নজরুল-সাহিত্য

ড. এস. এম. লুৎফর রহমান

॥ ১ ॥

অন্তত বছর বাইশ হলো, অভিযোগ উঠেছে যে, বাঙলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. অনার্স ও এম. এ. পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য মর্মান্তিকভাবে উপেক্ষিত। বিষয়টি সম্পর্কে নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম তাঁর গ্রন্থে ও বিভিন্ন প্রতিবেদনে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটায় গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ তারিখে বাঙলাদেশ টেলিভিশনের 'কথামালা' অনুষ্ঠানে বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা হয়েছে। সে-আলোচনার পর এ দেশের একাধিক দৈনিক জাতীয় পত্র-পত্রিকায় 'খবর', 'আলোচনা', 'সম্পাদকীয়' ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রোতাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। তাঁরা প্রায় সবাই বাঙলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বি.এ. অনার্স ও এম. এ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় নজরুল-সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকর পঠন-পাঠনের জন্য ক্ষোভ ও দু:খ প্রকাশ করেছেন। ক্ষোভ ও দু:খ প্রকাশ এবং এর প্রতিবাদ ও প্রতিকার কামনা করেছেন উক্ত টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গও। ঐ অনুষ্ঠানে প্রতিবেদন উপস্থাপনকারী মজিদ মাহমুদ উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে "অনার্স থেকে এম. এ. পর্যন্ত সর্বমোট দু'হাজার নম্বরের মধ্যে নজরুল-পাঠ্য অংশের নম্বর ২৬। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য অংশের নম্বর ১৬০। তাছাড়া, এম. এ. প্রথম পর্বের পাঠ্যসূচীতে নজরুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দ্বিতীয় পর্বে রাখা হলেও তার বিকল্প পাঠ রয়েছে"। ফলে, অভিযোগ উঠেছে, "নজরুলকে পাঠ না করেই বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পাস করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যসূচী যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁরা যে আমাদের জাতীয় কবির প্রতি আদৌ মনোযোগী নন, সেটি কিন্তু স্পষ্ট। কোথায় যেন একটি 'কিন্তু' রয়ে গেছে।" (দ্রষ্টব্য, আমীন-বিন্ আনওয়ার/টিভি কড়চা/দৈনিক ইনকিলাব/১৭.২.৯৫)।

www.pathagar.com

কথাটি ঠিক-ই। পাঠ্যসূচী প্রণেতারাই বিষয়টি হয়তো ভালভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সমর্থ। কিন্তু তাঁদের একজন না হয়েও আমাদের 'হীনমন্যতা' বা 'দেশ-বিদেশের চাপ' সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তা হলো, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর এদেশের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেছে ভারত-সরকার ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বাঙালী বুদ্ধিজীবী-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মীগণ। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে "ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন"-এর তত্ত্বাবধানে "ভারত-বাংলাদেশ শিক্ষা সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ" গঠিত হয়। এ দেশে শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে, উভয় বঙ্গের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সমভাবে ভারতীয়করণের জন্যই এই সংগঠনের সৃষ্টি। সংগঠনটির প্রথম পর্যায়ে এ দেশের যে তেরজন বুদ্ধিজীবী জড়িত ছিলেন—আজও তাঁরা সুদৃঢ়ভাবেই নিজেদের ভূমিকা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তাঁরা এ দেশের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণও করে চলেছেন। আর এ লক্ষ্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত শিক্ষক-শিক্ষিকা, লেখক-লেখিকা ও সংস্কৃতি কর্মীদের দ্বারা প্রায় প্রত্যেক মহকুমা-স্তর (Level) পর্যন্ত ঐ সংগঠনের প্রচুর শাখা তৈরী করে কাজ চালাতে থাকেন।

পশ্চিম বাঙলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে "উচ্চপর্যায়ে বাংলা বিদ্যার চর্চা"-সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আলোচ্য বিষয়-ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পঠন-পাঠনের 'সিলেবাস'। যদিও বলা হয় যে, "বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-বিদ্যাচর্চার বর্তমান অবস্থাটি পর্যালোচনাই এই সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য"- তথাপি তার অঘোষিত লক্ষ্য ছিল আরও দূর-প্রসারী। তার প্রমাণ ঐ সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পাঠ করলেই পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সেমিনারে ভারতের ১৩টি ও বাঙলাদেশের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি হলো—ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম। সেমিনারে অংশ নেন মোট ৩০ জন্য ব্যক্তি। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করে যে "সর্বসম্মত" সাতটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

"(২) এই সভা মনে করে যে,

ক) অনার্স ও এম, এ, পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের পটভূমি হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্য পঠনের আবশ্যকতা রয়েছে।

খ) বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

গ) বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজের ইতিহাস পঠনের প্রয়োজন রয়েছে।

ঘ) মাতৃভাষার সাহিত্য ব্যতীত অপর একটি ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য পঠনের আবশ্যকতা রয়েছে।

(৪) এই সভা দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষা-সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে; যার ফলে

www.pathagar.com

গবেষণার মান আশংকাজনকভাবে অবনতির দিকে চলেছে। এই অবস্থার প্রতিরোধকল্পে সভা প্রস্তাব করছে—

ক) গবেষণায় আগ্রহী ছাত্রদের জন্য এক বৎসরের একটি গবেষণা-পূর্ব পাঠক্রম প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই পাঠক্রমভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর-ই গবেষক নির্বাচন অভিপ্রেত।

খ) গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তিরোধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা একান্তভাবে অভিপ্রেত।

৫) এই সভা মনে করে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স ও এম.এ. পাঠক্রমে প্রাইভেট পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।

৬) এই সভা প্রস্তাব করছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

৭) এই সভা প্রস্তাব করছে যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ে পঠন-পাঠন সম্পর্কে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করা হোক। 'বাংলা বিদ্যা সমিতি' গঠিত হলে তার উপর এই সমিতি গঠনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।"

উদ্ধৃত প্রস্তাবসমূহ এবং সেগুলোর অন্তর্নিহিত নিম্নরেখ (লেখক কর্তৃক প্রদত্ত) অংশগুলো অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায়, "ভারত ও বাংলাদেশের" বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাঙলা পঠন-পাঠনের সিলেবাস-সম্পর্কিত ঐ 'সেমিনার' একেবারেই 'নিরামিষ' ছিল না। সেমিনারে সব থেকে বেশী জোর দেয়া হয় 'সমিতির গঠনে'র ওপর, যে-সমিতি সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে "পারস্পরিক যোগাযোগ" রক্ষা করবে। এবং উভয় বঙ্গকে একই ধরনের বাঙলা পঠন-পাঠন ঐক্যবদ্ধ করবে। বস্তুত এগুলোই ছিল, এ দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সেই 'বিদেশী চাপ' যার সাহায্যে তারা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়করণে উদ্বুদ্ধ হয়। উল্লেখ্য যে, সেমিনারে, গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে কয়েকটি পরবর্তীকালে বাঙলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও বাস্তবায়ন করা হয়। যেমন, উদ্ধৃত চতুর্থ প্রস্তাবের ক-ধারা অনুযায়ী এদেশে কার্যত এক বৎসরের গবেষণা-পূর্ব এম, ফিল, পড়ানো শুরু হয়। 'প্রাইভেট পরীক্ষা' গ্রহণের ব্যবস্থা রহিত হয়। বাঙলা বিভাগে "বাংলা সাহিত্য সমিতি" গঠন করা হয়, ইত্যাদি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, যে-সব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পড়ানো হয় সেগুলোর পাঠ্যসূচীতে নজরুল ইসলামের অবস্থান কীরূপ গ্রহণ করে তা জানা আবশ্যক। তার আগে খুব অল্পকথায় হলেও ভারতীয় বাঙালী সামন্ত-পুরোহিত, বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর হিন্দুদের একাংশের নিকট এবং ভারতীয় বাঙলার প্রলেতারীয় সরকারের নিকট নজরুল ইসলামের গুরুত্ব কতখানি—তাও জানা আবশ্যক।

www.pathagar.com

বলা প্রয়োজন, পশ্চিম বাঙলার শিক্ষিত বাঙলী হিন্দুদের এক বিশেষ অংশের নিকট নজরুল ইসলাম অপাংক্তেয়। তাঁদের মধ্যে এক দল আছেন, যাঁরা নজরুল ইসলামকে আদৌ কবি বলেই গণ্য করেন না। অপর এক দল, তাঁকে কবি বলে স্বীকার করলেও, তাঁর স্থান, তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের উপরে দান করেন না। আর একদল আছেন—যাঁরা নজরুল ইসলামের যথেষ্ট নিন্দা করে কিছু প্রশংসাও করে থাকেন। খুব কম ভারতীয় হিন্দু লেখক-লেখিকাই আছেন, যাঁরা নজরুল-সাহিত্য বা নজরুল সঙ্গীতের মূল্যায়নে অনেক ভাল কথা বলেও কিছু-না-কিছু নিন্দা করেননি। আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র কিংবা অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার সময়ে নজরুল ইসলামের নাম আদৌ উচ্চারণ করেন না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিম বাঙলার সরকারী তরফে নজরুল ইসলামের আদর-কদর কতটা—তা আলোচনা করা চলে। আলোচ্য প্রসঙ্গে এ-তথ্যটুকুই যথেষ্ট যে, ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার, সরকারী উদ্যোগে কবির "সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি" উপলক্ষে তাঁকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। এটি ছিল "কবি-প্রশস্তি" জ্ঞান; কোন জন্মজয়ন্তী পালন নয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সাল থেকে বামফ্রন্ট-সরকার সরকারী পর্যায়ে নজরুলকে এটুকু সৌজন্য প্রদর্শনও একেবারে বন্ধ করে দেয়; জয়ন্তী-পালনের তো প্রশ্নই ওঠে না। সম্ভবত সে-সময় কবিকে বাঙলাদেশে নিয়ে আসায় ঐ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

যা হোক, এবার পশ্চিম বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় নজরুল-অধ্যয়নের স্বরূপ কি, তা দেখা সমীচীন।

১৯৭২-'৭৩ সালের পূর্বোক্ত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা অনার্স ও এম.এ. পর্যায়ের সিলেবাস উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়; সেগুলো হ'ল- কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, বিশ্বভারতীয়, গৌহাটি, দিল্লী, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সূচীতে,এ তালিকাকে ভাগ ক'রে; 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'বাঙলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে'র কোন আলাদা বিভাগ নির্দেশ করা হয়নি। (দ্রষ্টব্য, নীলরতন সেন-সম্পাদিত, "বাংলা-বিদ্যা চর্চা", উক্ত সেমিনারের "আলোচনা-বিবরণী"- সংলকন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৪/ পৃষ্ঠা-১৬০)

উক্ত এগারোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতীয় আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে নজরুল-সাহিত্য পঠন-পাঠনের স্বরূপ নিম্নরূপ—

১. ক) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. অনার্স পাঠ্য-তালিকায় দ্বিতীয় পত্রটি 'আধুনিক কাব্য' বিষয়ক। একশ' নম্বরের এ পত্রে মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' ও 'নবজাতক'; মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী' এবং যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর 'কাব্য-

www.pathagar.com

মালঞ্চ', পাঠসূচীভুক্ত থাকলেও; নজরুল ইসলামের কোন বই নেই। অন্য কোন পত্রেও নেই। ফলে, ঐ সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স-এর ৭০০ (সাতশ') নম্বরের মধ্যে এক নম্বরও নজরুল-সাহিত্যের ভাগ্যে জোটেনি। নজরুলকে যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীরও নিচের মানের কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অথবা তাঁকে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ইত্যাদি বলে আদৌ বিবেচনা করা হয়নি।

খ) ঐ সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতেও নজরুল-সাহিত্য অনুপস্থিত। অথচ এম. এ. চতুর্থ পত্রের পাঠ্যসূচীর দু'টি ভাগের প্রথম ও অর্ধ্বে র'য়েছে মধুসূদনদত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'; নবীনচন্দ্র সেন-এর "রৈবতক' এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা-মঙ্গল'। আর পরবর্তী অর্ধ্বপত্রে লক্ষণীয়— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কল্পনা', 'শেষ সপ্তক'; অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কাব্য-চয়নিকা'; প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশাৎ ও অন্যান্য কবিতা' এবং জীবনান্দে দাশের 'শ্রেষ্ঠ-কবিতা'। নজরুল, এর কোথাও নেই। তিনি এ পর্যায়ে অক্ষয় বড়ালের সমকক্ষতাও লাভ করতে পারেনি।

২. ক) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় :

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. অনার্স-এর পাঠ্যসূচীতেও 'আধুনিক কবিতা' সম্পর্কীয় চতুর্থ পত্রে নজরুল-সাহিত্য অনুপস্থিত। আলোচ্য পত্রে যাদের সাহিত্য পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে তাঁরা হলেন—মধুসূদন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পাঠ্যগ্রন্থ হ'ল—মধুকবির 'মেঘনাদবধ কাব্য'; বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'; রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'; সত্যেন্দ্রনাথের 'কাব্য-সঞ্চয়ন' এবং মল্লিকের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। নজরুল কোথাও নেই। তাঁকে বিহারীলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জনের পর্যায়ভুক্ত কবি বলেও গণ্য করা হয়নি।

খ) এ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.-'র পাঠ্যসূচীতেও নজরুল-সাহিত্যের স্থান নেই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠপত্র 'আধুনিক কবিতা'-বিষয়ক। এর দু'টো ভাগ। প্রথম ভাগে পাঠ্য-মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র। কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থের উল্লেখ না থাকায় প্রত্যেকের সমগ্র রচনাই সম্ভবত পাঠ্য। দ্বিতয়ী ভাগে পাঠ্য-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় বড়াল, প্রমথ চৌধুরী ও জীবনানন্দ দাশ। কারো কোন গ্রন্থের উল্লেখ নেই। এ পর্যায়েরও কোন স্থানে নজরুল নেই। তাঁকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় বড়াল, প্রমথ চৌধুরীর মত কবিদেরও পংক্তিদান করা হয়নি।

৩. ক) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় :

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. অনার্স-এর পাঠ্যসূচীতে 'আধুনিক কবিতা'র স্থান দ্বিতীয় পত্রে। এতে যাদের নির্বাচিত গ্রন্থ পাঠ্য তাঁরা হলেন-মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। মহৎ ব্যতিক্রম—সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

খ) কিন্তু এ ব্যতিক্রমী নিদর্শন, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে অনুপস্থিত। এখানকার এম.এ. পাঠ্যসূচীর চতুর্থ পত্রে রয়েছে দু'টি ভাগ। প্রথম ভাগে আধুনিক কবিতা; দ্বিতীয় ভাগে আধুনিক নাটক। কোন ভাগেই নজরুল-সাহিত্য নেই। প্রথম ভাগে যাঁদের রচনা পাঠ্য; তাঁরা হলেন—মধুসূদন, বিহারীলাল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন-চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয় চৌধুরী। নজরুল কোথাও নেই। তাঁকে অক্ষয় চৌধুরী—পর্যায়ের কবি বলেও গণ্য করা হয়নি।

৪. ক) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় :

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. অনার্স-এর পাঠ্যসূচীর তৃতীয়পত্রে পড়ানোর জন্য যাঁরা নির্দিষ্ট, তাঁরা হ'লেন—মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। নজরুল নেই। পঞ্চমপত্রে নজরুল আছেন। সৌভাগ্যই বলতে হবে। তবে এ-পত্রে শিরোনাম হলো "Followers of Rabindranath and Criticism" অর্থাৎ পত্রটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাথানুসারী কবিবৃন্দ' এবং দ্বিতীয় ভাগ- 'সমালোচনা'। পাঠ্যতালিকায় আছেন—শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, বলেন্দ্রনাথ (ঠাকুর), সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। সংগতভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়—নজরুল কি রবীন্দ্র-অনুসারী কবি? এ শিক্ষাই কি ছাত্রদের প্রাপ্য?

খ) এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সেমিস্টারে ১৪ নং কোর্সের শিরোনাম 'আধুনিক কবিতা'। উক্ত কোর্সে চারজন কবির চারটি কাব্যগ্রন্থ পাঠ্য। তা হ'ল—নজরুল ইসলামের 'সঞ্চিতা' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'অনুপূর্ব', জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী', ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শর্ত'।

৫. ক) উল্লেখযোগ্য যে পূর্বোক্ত গ্রন্থে (বাংলা-বিদ্যা চর্চা), যাদবপুর, কল্যাণী, বিশ্বভারতীয় ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পাঠ্যসূচী খুব সংক্ষেপে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা-থেকে স্পষ্ট তথ্য লাভ করার উপায় নেই। সে জন্য উক্ত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন নজরুল সাহিত্য পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল কি না; তা জানা যায়নি।

খ) ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পাঠ্যতালিকা পরীক্ষা করলে দেখা যায়—

i) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ. পাঠ্যসূচীতে চতুর্থ পত্র হ'ল 'আধুনিক বাঙলা কবিতা' সম্পর্কে। এ পত্রে মোট ন'জন কবির কাব্যপাঠ্য। তাঁরা হ'লেন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রত্যেকের একটি করে কাব্যগ্রন্থ পাঠ্য। সেগুলো যথাক্রমে 'কবিতাবলী', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'কবিতাবলী,' 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', 'সারদা-মঙ্গল', 'কাব্য-চয়নিকা', 'গোবিন্দ-চয়নিকা', 'কল্পনা', 'অনুপূর্ব'।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পাঠ্যসূচীর অষ্টম পত্রটির নাম-' Later Contemporaries of Rabindranath'- এর দু'টো অংশ— 'কবিতা' ও উপন্যাস'। কবিতার পাঠ্যসূচীতে

www.pathagar.com

আছেন—প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রত্যেকের একটি করে গ্রন্থ পাঠ্য। সেগুলো যথাক্রমে 'সনেট পঞ্চাশৎ', 'কাব্য-সঞ্চয়ন', 'কাব্য-সম্ভার,' 'শ্রেষ্ঠ-কবিতা' ও 'কাব্য-সংগ্রহ'। নজরুল ইসলাম কোথাও নেই। তাঁকে প্রমথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস পর্যায়ের কবি ব'লেও গণ্য করা হয়নি।

ii) কল্যাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ, শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে তৃতীয় পত্রটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'আধুনিক বাঙলা কবিতা'—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ' পর্যন্ত। পাঠ্য-মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা মঙ্গল', দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের কাব্য 'গ্রন্থাবলী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্চিতা' ও অক্ষয়কুমার বড়ালের 'গ্রন্থাবলী'-র নির্বাচিত কিছু কবিতা। এ ক্ষেত্রে নজরুল-কাব্যের কোন স্থান নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, অক্ষয়কুমার বড়ালের মত কৃতী কবি তিনি নন ব'লে মনে করা হয়েছে।

iii) 'বিশ্বভারতীয়' বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় চতুর্থ পত্রের প্রথম অংশে 'আধুনিক কবিতা ও নাটক' নির্দিষ্ট। এতে পাঠ্য পর্যায়ে আছেন—মধুসূদন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম পত্র ক, খ, গ, ঘ ও ঙ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ভাগ-ই অবার 'প্রথম অংশ' ও 'দ্বিতীয় অংশে' পুনর্বিভক্ত। এ পত্রের খ-ভাগের প্রথম অংশে 'আধুনিক কবিতা' ও দ্বিতীয় অংশে 'রবীন্দ্রনাথ' পাঠ্য। প্রথম অংশে রয়েছেন—মধুসদন, বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও নজরুল ইসলাম।

এই পত্রের-ই চতুর্থ ভাগে (Group-D) পুনরায় 'আধুনিক কাব্য প্রকৃতি' (Form of literature / Modern) পাঠ্যসূচীভুক্ত। এর প্রথম অংশটি ফের দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ 'গদ্য' অন্যভাগ 'পদ্য'। পদ্য অংশে পাঠ্যসূচীভুক্ত—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল , দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলদেব, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র, হরগোবিন্দ ও সত্যেন্দ্রনাথ।

উল্লেখ্য যে, এই পত্রের সমস্ত অংশই নিশ্চয় পাঠ্য নয়। সংকলনে কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকায় যদি ধ'রেও নেওয়া হয় পত্রটির পাঁচটি ভাগের দশটি অংশই পাঠ্য; তাহলেও একশ' নম্বরের এ পত্রে দশ নম্বর হয়েছে-পাঁচ জন কবির মধ্যে বিভক্ত। অর্থাৎ বিশ্বকবির বিশ্বভারতীয়তে বিশ্ববিদ্রোহীর জন্য বরাদ্দ মাত্র দু'নম্বর। একে সহজেই উপেক্ষা করা চলে। না-পড়লেও চলে। কিন্তু পূর্বোক্ত ডি-বিভাগের প্রথম অংশের গদ্য ও পদ্য—দু'ভাগের নির্দিষ্ট লেখক ও কবিদের রচনা পড়তেই হবে; যদিও সেখানে নজরুল ইসলামের নামও নেই। এ বিভাগের আলোচ্য অংশ সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হ'য়েছে- "1st half ; A general study is to be made. But a special study of the works of the following authors is essential." (দ্রষ্টব্য, নীলরতন সেন, পূর্বোক্ত, পরিশিষ্টে প্রদত্ত এম.এ. পাঠ্যসূচীর পৃষ্ঠা-৩২)। এ থেকে স্পষ্ট 'বিশ্বভারতী'তে নজরুল বাদ দিয়ে বাঙলায় অনার্স ও এম.এ. পাস অনায়াসে করা চলে।

www.pathagar.com

অতএব, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল-সাহিত্য ও নজরুল-প্রতিভা অজ্ঞাতনাম বলদেব, রামকৃষ্ণদের সমকক্ষ বলেও গণ্য নয়।

iv) গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় :

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর প্রথম পত্র দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ—প্রাচীন কবিতা ও দ্বিতীয় ভাগ—আধুনিক কবিতা। দ্বিতীয় ভাগে পাঠ্য—মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য', বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা-মঙ্গল', শরৎচন্দ্র চৌধুরীর 'দেবীযুদ্ধ', রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ও বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। নজরুল ইসলামের নাম-গন্ধও নেই।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ পত্রেও 'আধুনিক কবিতা ও প্রবন্ধ' পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের বিষয়-'মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ পাঠ্য' এবং দ্বিতীয় ভাগের বিষয়—'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ পাঠ'। এই দ্বিতীয় ভাগে যে পাঁচজন কবি-সাহিত্যকের রচনা পাঠ্য, তাঁরা হ'লেন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। পাঠ্যগ্রন্থ যথাক্রমে—'কবিতাবলী', 'ব্রজাঙ্গনা', 'বৃত্রসংহার', 'কুরুক্ষেত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ' এবং 'সাহিত্য ও সাধনা'। নজরুল ইসলাম কোথাও নেই।

আলোচ্য প্রসঙ্গে বলা দরকার, নীলরতন সেন-এর সংকলন থেকে 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', 'রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়', 'পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'রবীন্দ্র-ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে'র এম.এ. শ্রেণীর পাঠ্যসূচীও পাওয়া যায়। তিনি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. অনার্স শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা যোজনা করেননি। ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যায়—

ক) কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় :

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পাঠ্যসূচীতে দু'টি খণ্ড বিদ্যমান। পূর্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। দু'টি খণ্ডেই ৪০০ ক'রে মোট ৮০০ নম্বর।. পত্রসংখ্যা চার। প্রত্যেক পত্র দু'ভাগে বিভক্ত। 'পূর্বার্দ্ধ' ও 'উত্তরার্দ্ধ'। এ পাঠ্যতালিকায় উত্তর খণ্ডের উত্তরার্দ্ধ পত্রের নাম— 'বরীন্দ্রোত্তর কবিতা"। পাঠ্য-নজরুলের 'সঞ্চিতা' মোহিতলাল 'বিস্মরণী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'সুকান্ত সমগ্র'। মোট নম্বর ৪০। নজরুলের ভাগে ১০। বিশ্বভারতীর থেকে পাঁচগুণ বেশী সন্দেহ নেই। কে বলে নজরুল দুর্ভাগা?

খ) রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় :

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ, শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় তৃতীয় পত্রের পাঠ্য বিষয় 'আধুনিক কবিতা ও নাটক'। পাঠ্য গ্রন্থকারগণ যথাক্রমে-মধুসূদন (নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থ; নাম উল্লেখ নেই), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, ডি,এল, রায় ও জীবনানন্দ দাশ। নজরুল কোথাও নেই।

www.pathagar.com

গ) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় :

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পাঠ্যতালিকায় বাঙলা মোট ৮০০ নম্বরের। পত্র আটটি। ষষ্ঠ পত্রের শিরোনাম 'কবিতা ও নাটক'। পাঠ্য—মধুসূদন (নির্বাচিত রচনা), বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের-ই উক্ত পাঠ্যতালিকার অষ্টম পত্রে পাঁচটি বিষয়ের যে কোন একটি 'বিশেষভাবে পাঠ্য' বলে নির্দেশিত। মহাকাব্য, গীতিকাব্য, উপন্যাস, নাটক ও ছোট-গল্প শীর্ষক পাঁচটি শাখার মধ্যে গীতিকাব্যে পাঠ্য হ'য়েছেন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, কামিনী রায় ও অক্ষয় বড়াল। নজরুল ইসলাম কোথাও নেই। তাঁকে কামিনী রায়, অক্ষয় বড়াল থেকে নিম্নপর্যায়ের কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গল্পকারের স্বীকৃতি তো নেই-ই।

ঘ) রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় :

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-পাঠ্যতালিকা দেওয়া হ'য়েছে, তাতে চতুর্থ পত্রের দ্বিতীয় ভাগে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' পাঠ্য বিষয় রূপে নির্দেশিত হ'লেও, সেখানে নজরুল ইসলামের কোন অন্তর্ভুক্তি আছে কি না বলা কঠিন। কারণ, কারো কোন নামোল্লেখ নেই।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, ভারতের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের (দিল্লী) বি.এ. অনার্স ও এম.এ. উভয় শ্রেণীতে নজরুল পাঠ্য। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. অনার্সে ৬০ নম্বরের মধ্যে তাঁর ভাগে প'ড়েছে ১২; আর এম.এ. কোর্স-এ ৫০ নম্বরের মধ্যে ১২.৫। এছাড়া, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েই মাত্র একটি পত্রে ১০০ নম্বরের মধ্যে তাঁর ভাগে পড়েছে ২০ নম্বর। কিন্তু এম.এ.-তে এক নম্বরও নেই। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. অনার্সে নজরুল পাঠ্য নেই বটে, কিন্তু এম.এ.-তে র'য়েছে এবং সেখানে ১০০ নম্বরের মধ্যে তাঁর জন্য মাত্র ১০ নম্বর বরাদ্দ। আর বিশ্বভারতীতে ১০০ নম্বরের একটি পত্রে তাঁর জন্য বরাদ্দ সাকুল্যে দু'নম্বর। মস্করা আর বলে কাকে!!

কিন্তু কেন এই উপেক্ষা, কেন এই মস্কারা—তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কারণ, সব কিছুই কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। আলোচ্য বিষয়টিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে সে-সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে 'আজাদী-উত্তর ('৭১-এর) বাঙলদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল-সাহিত্যের পঠন-পাঠন বা অধ্যয়নের অবস্থা কি, তা লক্ষ্য করা আবশ্যক। কারণ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী (নামান্তরে, তথাকথিত মার্কসবাদী) ভারতীয় বাঙলায় 'অকম্যুনিস্ট' কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনাবলী অধ্যয়ন আবশ্যক ব'লে বিবেচিত না-হ'লেও না-হ'তে' পারে; কিন্তু বাঙালী জাতীয়তাবাদী বাঙলাদেশে সেই '৪৭ সাল থেকেই নজরুল সাহিত্যের অধ্যয়নে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে এই 'স্বাভাবিক আগ্রহ'—কতটা বাস্তবে রূপায়িত হ'য়েছে এবং হ'চ্ছে তা নিম্নোক্ত আলোচনায় পরিস্ফুট হবে।

www.pathagar.com

॥ ২॥

বলা আবশ্যক যে, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর, বাঙলা বিভাগের প্রধান হিসেবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যাঁরা দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মুসলমান ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি ১৯৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষে মাত্র এক বছরের জন্য বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পান। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন গনেশ চরণ বসু। তারপর দায়িত্বে আসেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫২ থেকে '৫৪ পর্যন্ত। তখনও পর্যন্ত অনার্স এবং এম.এ. পর্যায়ের পাঠ্যতালিকায় নজরুল ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হননি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র পর ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত একটানা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন মরহুম অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। ১৯৫৫ সালে তাঁর সময়েই প্রথম নজরুল সাহিত্য সামান্য রূপে পাঠ্যসূচীভুক্ত হয়। ফলে গোটা পাকিস্তান আমলেও কবি নজরুলের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান ইত্যাদির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। নজরুল সম্পর্কে সে-সময় প্রধান অভিযোগ ছিল, তিনি পাকিস্তানপন্থী ছিলেন না, এমন কি, খাঁটি ইসলামী/মুসলিম কবিও তিনি নন। এ-মনোভাব, ঐ শ্রেণীর এদেশী গৌড় দক্ষিণপন্থীদের যে আজও আছে, তার প্রমাণ দেওয়া যায়।

কিন্তু পাকিস্তানী আমলের নজরুল-বিদ্বেষ, দ্বিতীয়বারের স্বাধীনতা-উত্তরকালে থাকার কথা ছিল না। দু:খের বিষয়, সেই অভাবিত ব্যাপার এবার পাকিস্তানী আমল অপেক্ষাও অধিকতর দু:সময় রূপে আবির্ভূত হ'য়েছে। এবার নজরুল-বিদ্বেষের নতুন মাত্রা লক্ষণীয়। অভিযোগ অভিনব। তা হলো—নজরুল নাকি ধর্ম-নিরপেক্ষ নন, কবি নন। এমন কি, তাঁকে একজন "চাল-চুলোহীন রাজনৈতিক উদ্বাস্তু" বলতেও কেউ কেউ দ্বিধা করেনি।

এসব কথা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষজাত হ'তে পারে। হ'তে পারে-চিংড়ি মাছের মত কারো কারো পেটের সঞ্চিত মল মাথায় ওঠার ফল অথবা অন্য কিছু। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে, বিশেষত, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিচার-বিবেচনা, কথাবার্তা কিংবা নজরুল মূল্যায়নের তো একটা নির্দিষ্ট মান থাকা উচিত। সে-ঔচিত্যবোধ যেমন পাকিস্তানী আমলে ছিল না; তেমনি বাঙলাদেশী আমলেও নেই। দু:খ এখানেই। কবি নজরুল না হয় পাকিস্তানবাদী কবি 'ছিলেন' না। কিন্তু তিনি তো একশ' পার্সেন্টি খাঁটি অসাম্প্রদায়িক বাঙালী কবি ছিলেন। তিনি তো বাঙালী জাতির জন্য নিরংকুশ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। দেশ-বিভাগ, জাতি-বিভাগ, ভাষা-বিভাগ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ তিনি তো কদাচ চাননি। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কি কোন খাদ ছিল? তবু কেন, আজকের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের একশ্রেণীর পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট তিনি অবহেলিত ও উপেক্ষিত? নজরুল ও তাঁর সাহিত্য সঙ্গীতকে যাঁরা উপেক্ষা করে— তারা কি কবি? সাহিত্যিক? সাহিত্য-রসিক? সঙ্গীত-প্রেমিক? স্বাধীনতাকামী? স্বাধীনতার সপক্ষশক্তি? মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক চেতনায় বিশ্বাসী? দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের বর্তমান অস্তিত্বে বিশ্বাসী? তাঁরা নিজেরা যথার্থ বাঙালিত্বে, অসাম্প্রদায়িকতায়, ধর্ম-নিরপেক্ষতায় আস্থাশীল?

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আগ্রাসনবাদ, আধিপত্যবাদ, পরপদলেহন-বিরোধী ?

তা যে নয়, তা তাঁরা সেই ১৯৭২ সালের প্রথম সপ্তাহেই দিয়েছেন। সেদিন তাঁরা ভারতীয় বাঙলায় বসে এদেশের শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিরোধী-সংগঠন সৃষ্টি করেই সে প্রমাণ দিয়েছেন। এ লেখক গত ২৪.২.৯৫ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে হাল আমলে এ দেশে নজরুল-বিদ্বেষের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করেন। "পাঠ্য-সূচীতে নজরুল ও তার উপেক্ষার উৎস" শীর্ষক ঐ নিবন্ধে জানানো হয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ 'স্বাধীন' হবার পর, ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বাঙলার রাজধানী কোলকাতায় 'ভারতীয় সংস্কৃতি-ভবনে'র উদ্যোগে, এ দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভারতীয়করণের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং দু'দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, বিচারপতি প্রভৃতি ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি সর্ববঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। নাম—"ভারত-বাংলাদেশ শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ"।

তারপর এই সংসদের-ই নেপথ্য উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী শিক্ষাক্ষেত্রে উভয় বঙ্গের "অভিন্ন বাঙলা পাঠ্যসূচী" প্রণয়নের জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় বাঙলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে ভারত ও বাঙলাদেশের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা "উচ্চপর্যায়ে বাংলা বিদ্যার চর্চা" তথা বাংলাদেশ ও ভারতের যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা র'য়েছে-সে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে এক-ই ধরনের বাঙলা সিলেবাস অনুসৃত হয়, তার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সেমিনারে বাঙলাদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেগুলো হ'লো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন—বাঙলা বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড: নীলিমা ইব্রাহীম। ঐ সেমিনারে তিনি একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। সেটি পরবর্তীকালে আংশিক প্রকাশিত হয়।

কিন্তু বাঙলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও যে সে-সময় ও পরবর্তীকালে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে সুবিচার করা হয়নি, তা এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে-সময় ঐ সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ১ম বর্ষ অনার্স শ্রেণীর জন্য যে পাঠ্যসূচী প্রণীত ও অনুমোদিত হয়, তাতে চতুর্থপত্রে "আধুনিক বাঙলা কবিতা" শিরোনামে চারজন কবির অন্যতম ছিলেন নজরুল। ঐ চার জন কবি যথাক্রমে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও জসীমউদদীন। মোট ১০০ নম্বরের এই পত্রে নজরুলের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৫ নম্বর মাত্র। অনার্স শ্রেণীর পঞ্চম পত্রটি ছিল ১০০ নম্বরের। নাম-"আধুনিক বাঙলা গদ্য"। এ পত্রে মধুসূদনের নাটক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ;' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'

www.pathagar.com

(তিন খণ্ড) এবং শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-চার পর্বই পাঠ্যসূচীভুক্ত হ'লেও নজরুল ইসলামের কোন নাটক, নাটিকা, গল্প-গ্রন্থ বা উপন্যাসের নামও নেই।

ঐ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অনার্স শ্রেণীতে চতুর্থ পত্রের ক-অংশে চারখানি কাব্যের মধ্যে একখানি—নজরুল ইসলামের "অগ্নি-বীণা" মাত্র পাঠ্য ছিল। পত্রটির ক-অংশের নির্দিষ্ট নম্বর ছিল ৬০। অতএব, নজরুলের ভাগ্যে ও ভাগে পড়েছিল মাত্র ১৫। একই সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে চতুর্থ পত্রে চারজন কবির অন্যতম হিসেবে নজরুল ইসলামের দু'টি গ্রন্থ—'অগ্নি-বীণা' ও 'সিন্ধু-হিন্দোল' পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। নম্বর বরাদ্দ করা হয় ২০ মাত্র।

তবে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই নজরুল ছিলেন 'অবিকল্প'।

অন্যদিকে পূর্বেই বলা হ'য়েছে, ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ১ম পর্বে নজরুল ইসলামের কোন বই পাঠ্য ছিল না। রাজশাহী, চট্টগ্রামেও নয়। তবে সে-সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ পর্বে প্রথম পত্রের দু'টি অংশের খ-ভাগে সত্যেন্দ্রনাথ ও জসীমউদদীনের সঙ্গে নজরুল পাঠ্য তালিকাভুক্ত হ'লেও এই খ-ভাগের একটি বিকল্প জুড়ে দেওয়া হয়। সেটি হ'ল-ঐ তিনজন কবির বদলে "তিরশোত্তর কবিতা" বা "Bengali Poetry since 1930". এখানে লক্ষণীয় যে, আধুনিক কবিতার সূত্রপাত যে নজরুল ইসলামের দ্বারা, তাঁকে এবং জসীমউদদীনকে বাদ দেবার কৌশল হিসেবেই 'বিকল্প' জুড়ে দিয়ে তার সীমা বেঁধে দেয়া হ'য়েছে ১৯৩০-এর পর থেকে পাঠ্যবিষয় নির্দেশ ক'রে। এই খানে ১৯২০ থেকে পাঠ্য বিষয় নির্দেশ ক'রলেই যে যথার্থ হ'ত এবং নজরুল ও জসীমউদদীন বিকল্পে ও সাধারণভাবে পাঠ্যসূচীভুক্ত হ'তেন, তা সত্য। আরও বলা দরকার যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পত্রের এই খ-ভাগের মোট নম্বর ৪০। নজরুলের ভাগে ১৩'র সামান্য বেশী; তদুপরি বিকল্প। এ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ পর্বের পাঠ্যতালিকায় প্রথমপত্রে সাতজন কবির অন্যতম নজরুল ইসলাম। পত্রটির মোট নম্বর ১০০। নজরুলের ভাগে ১৪ অপেক্ষা কিছু বেশী। তবে যারা তৃতীয় পত্রের 'বিকল্প' গবেষণা-পত্র গ্রহণ ক'রবে, তাদের এই প্রথম পত্র প'ড়তে হবে না। পড়তে হবে এর Alternative একটি পত্র। তার দু'টি অংশ। ক-অংশে আধুনিক বাঙলা-কাব্য। তাতে আছেন-মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও কাজী নজরুল ইসলাম। আর খ-অংশ-রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্য। পাঠ্য বই পাঁচখানি। যথা-সোনারতরী, ক্ষণিকা, বলাকা, পুনশ্চ ও শেষলেখা। নম্বর ৫০+৫০। অর্থাৎ নজরুল ইসলামের ভাগে ১৬'র সামান্য বেশী।

এই সময়ের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী আরও কৌতুককর। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমপত্র 'গদ্য ও উপন্যাস'। এই পত্রের দু'টি অংশ। ক-অংশে চারজন গদ্য লেখক; খ-অংশে তিনজন। এ তিনজন শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী ও কাজী নজরুল। নম্বর বরাদ্দ ৪০। নজরুলের ভাগে ১৩-'র কিছু বেশী। কিন্তু এই খ-অংশের আবার একটি বিকল্প জুড়ে

www.pathagar.com

দেয়া হ'য়েছে। সেখানেও তিনজন— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা পুরো 'পেপার' ১০০ নম্বরের।

এই ধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তীকালের পাঠ্যতালিকায় দেখা যায়-বর্তমানে 'চালু' সিলেবাসে বাঙলা প্রথম বর্ষ অনার্স-এর "আধুনিক বাংলা কবিতা-১"-এর অন্তর্ভুক্ত তিনজন কবির অন্যতম-কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অপর দু'জন মাইকেল মধুসূদন ও বিহারী লাল। এঁদের প্রত্যেকের ভাগে প'ড়েছে ৪০ নম্বরের তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১৩-এর কিছু বেশি। পাঠ্যগ্রন্থ একটি ক'রে। 'নজরুল-রচনাবলী'র মধ্যে "অগ্নি-বীণা"। এক্ষেত্রে ১০৩-এর 'বিকল্প' ১০৪ নং কোর্স। নাম "আধুনিক বাংলা কবিতা-২"। সেখানে যে তিনজন কবির রচনা পাঠ্য; তাঁরা হ'লেন—মাইকেল, কায়কোবাদ ও নজরুল ইসলাম। নম্বর বন্টন অভিন্ন। অনার্স-এর তিন বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য মোট ১৬টি কোর্সের মধ্যে একটি মাত্র কোর্সে নজরুলকে স্থান দেওয়া হ'য়েছে এবং তার জন্য বরাদ্দ করা হ'য়েছে মাত্র ১৩ থেকে ১৬ নম্বরের (অনুশীলনী ধরলে) কাছাকাছি।

পক্ষান্তরে, অনার্স প্রথম বর্ষে ১০৫ ও ১০৬ নং কোর্সে "আধুনিক বাংলা নাটক-১" ও তার বিকল্প "আধুনিক বাংলা নাটক-২"-এর উভয় স্থানে মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র থাকলেও, নজরুল নেই। এ বছরে রবীন্দ্রনাথও পাঠ্যসূচীভুক্ত হননি; যা আপত্তিকর। তবে, অনার্স ২য় বর্ষের পাঠ্যসূচীতে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে বর্তমান। এই বর্ষের কোর্স-২০৫, "আধুনিক বাংলা-কথা সাহিত্য-১"-এ তিনজন গদ্য লেখককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা হ'লেন-বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। বঙ্কিম ও শরতের যথাক্রমে 'কপালকুণ্ডলা' ও 'গৃহদাহ' পাঠ্য হ'লেও রবীন্দ্রনাথের কোন একটি উপন্যাস না দিয়ে, এখানে দেওয়া হ'য়েছে 'গল্পগুচ্ছে'র স্থান। "বিশেষভাবে পাঠ্য গল্প"-২৫টি। এই কোর্সের বিকল্প-২০৬, "আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য-২"। প'ড়তে হবে দু'জনের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-এর। প্রথম জনের 'বিষবৃক্ষ'; দ্বিতীয়ের 'চতুরঙ্গ' ও 'গল্পগুচ্ছ'। 'বিশেষভাবে পাঠ্য গল্প"-২৫টি। এরপর ২০৭ নম্বর কোর্স। নাম "আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য-৩"। প'ড়তে হবে তিন জনের রচনা। তাঁরা হ'লেন-বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও মানিক বন্দোপাধ্যায়। প্রথম জনের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', দ্বিতীয়ের 'গল্পগুচ্ছ' ও তৃতীয় জনের 'পদ্মানদীর মাঝি'। 'গল্পগুচ্ছের' "বিশেষভাবে পাঠ্য গল্প"-২৫টি।

অত:পর কোর্স-২০৮। নাম-"রবীন্দ্র সাহিত্য-১"। পাঠ্য ছ'টি গ্রন্থ। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা'; 'বিজর্সন' (নাটক) ও 'আধুনিক সাহিত্য' (প্রবন্ধগ্রন্থ)। এ পত্রের বিকল্প-২০৯ নম্বর কোর্স। নাম-"রবীন্দ্রসাহিত্য ২"। পাঠ্য ছ'টি গ্রন্থ। যথাক্রমে-'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'রক্তকরবী ' (নাটক), ও 'সাহিত্য' (প্রবন্ধগ্রন্থ)। শেষোক্ত গ্রন্থ থেকে "বিশেষভাবে পাঠ্য প্রবন্ধ"- ১০টি। এরও বিকল্প-কোর্স-২১০। নাম— "রবীন্দ্রসাহিত্য-৩"। এই কোর্সে ছ'টি গ্রন্থ পাঠ্য। পূর্বোক্ত চারখানি কাব্যসহ 'মুক্তধারা' (নাটক) ও 'সাহিত্যের পথে"। শেষোক্ত বইটি থেকে "বিশেষভাবে পাঠ্য প্রবন্ধ"-১৪টি।

www.pathagar.com

সাহিত্যের এই রকম নতুন হ'য়ে ওঠবার জন্য যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চ:স্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমি তরুণ ব'লব তাঁদের-ই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণ বর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ ক'রতে হয় না।" [দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী/পুনর্মুদ্রণ-১৩৬৮/পৃষ্ঠা-২০১]। গ্রন্থশেষে 'রচনা পরিচয়ে' বলা হ'য়েছে— "আলোচ্য রচনাটি উক্ত মৌখিক অভিভাষণের কবিকৃত অনুলেখন।" [দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃষ্ঠা-২৯০]।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ২য় বর্ষের দশটি কোর্সের মধ্যে ৬টি কোর্স করা হয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্যের এবং এগুলোর মধ্যে থেকে ১০০ নম্বরের দু'টি কোর্স পড়তেই হবে। তাহ'লে অনার্সের ৩ বছরব্যাপী পাঠ্য ২৬টি কোর্সের মধ্যে দু'টি কোর্সে রবীন্দ্র-সাহিত্য প'ড়তে হবে ১০০ নম্বরের এবং নজরুল-সাহিত্য প'ড়তে হবে ১৩ থেকে ১৬ নম্বরের। অবশ্য, এইটুকুও না পড়লে ক্ষতি নেই। কারণ, একটি কোর্সের তিনজন কবির একজনকে বাদ দিয়েও পাস করা কঠিন নয়। ক্লাস পাওয়াও নয়।

এক-ই ধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ১ম পর্বে নজরুল পাঠ্য নয়। শেষ পর্বে অবশ্য ৪০৩ নম্বর কোর্সে পাঁচজন কবির অন্যতম হিসেবে নজরুল বর্তমান। এর বিকল্প ৪০৪ নম্বর কোর্সেও নজরুল আছেন পাঁচজনের একজন। অতএব, ৪০ নম্বরের এই দু'টি কোর্সে নজরুল-সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ ৮ নম্বর। এটা প'ড়লেই-বা কি, আর না-প'ড়লেই-বা কি? তদুপরি ১৪টি কোর্সের মধ্যে ৮টি কোর্স নিতে হবে এবং ঐ দু'টির কোনটিই-বাধ্যতামূলক নয়। পক্ষান্তরে, এই পর্বে ৪১১ নং কোর্সটি, "রবীন্দ্রসাহিত্য", এবং সেটি "বাধ্যতামূলক"। অতএব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. শেষ বর্ষের ৮টি কোর্সের ৪০০ নম্বরের মধ্যে নজরুল পেয়েছেন ৮ থেকে ১০ (অনুশীলনী ধ'রলে); আর রবীন্দ্রনাথ ৪০ থেকে ৫০। এই হ'ল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে গত পাঁচ শিক্ষাবর্ষব্যাপী চালু পাঠ্যসূচী। জাতীয় কবির এমন জাতীয় মর্যাদা আর কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

[দ্রষ্টব্য, পাঠক্রম, শিক্ষাবর্ষ, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩। এবং পরবর্তী সময় ১৯৯৪-৯৫ পর্যন্ত। বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত]

॥ ৩ ॥

বস্তুত কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখনকার একপেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী এবং বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগী বলে বিবেচনা করেননি। যে-শিক্ষা-ব্যবস্থায়, তখনকার বাঙালী জাতির শতকরা ৬০ ভাগ (মতান্তরে ৫৫%) মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না, কবি তাকে অভিনন্দন জানাতে পারেননি। সে জন্য তিনি শিক্ষা-ব্যবস্থার ঐ অপূর্ণতা দূর ক'রে, গোটা বাঙালী জাতির (মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে), সামগ্রিক চাহিদা পূরণের উপযোগী এমন একটা নতুন জাতীয়তাবাদী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েমের

www.pathagar.com

কথা বলেন যা কখনও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ও তাদের অনুসারীদের প্রশংসা অর্জন করেনি। উভয় রাষ্ট্রে নজরুল-সাহিত্যের অধ্যয়নে অনাগ্রহের কারণ মূলত এটাই।

নজরুলের বিভিন্ন প্রবন্ধ, ভাষণ ইত্যাদি লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায় তিনি শিক্ষা, শিক্ষালয়, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে সেকালে যা ব'লে গিয়েছেন, বর্তমানের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সে-সব কথা গুরুত্বহীন হয়নি, বরং সমধিক গুরুত্ব লাভ ক'রেছে। তিনি 'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'জাতীয় শিক্ষার ধরন' সম্পর্কে লিখেছেন, "জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অনুকরণের আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশস্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায় আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহাৎ খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে।"

বাঙলাদেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কেও কি কবি নজরুল ইসলামের এই বক্তব্য শতকরা একশ' ভাগ-ই সত্য নয়? 'বিশের দশক'-এর নয়; 'নব্বই-এর দশক'-এর জাতীয়তার দিক দিয়ে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় কি আজও প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে? গত ২৬ বছর ধ'রে কি প্রতি নিয়তই শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব আমরা হারিয়ে ফেলছি না? আর সেই সঙ্গে বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণ ও তাদের সমস্ত ভালো-মন্দকে "ভালো" বলে গ্রহণ করে-আমরা হাস্যাস্পদ ও "হনুকরণপ্রিয়" জাতিতে অধ:পতিত হইনি? নিজের 'শক্তি', 'স্বজাতির বিশেষত্ব' হারিয়ে, নিজেদের 'আত্মা' ও 'জাতীয় সত্য'কে খর্ব ক'রে, সেই ১৯৭২ সাল থেকেই আমরা মনুষ্যত্বের যে-অবমাননা ক'রে চ'লেছি তার প্রধান কারণ কি আমাদের শিক্ষার মধ্যেই নিহিত নয়? স্বদেশের মধ্যেই যে, বিশ্বকে আবিষ্কার ক'রতে হয় ও সীমার মধ্যে থেকেই সসীমের সুর বাজাতে হয়-এসব কথা কি সেদিনের চেয়ে আজ এদেশে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে ওঠেনি? অবশ্যই উঠেছে। আর সে কারণে আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্ত:সারশূন্যতা নিয়ে দুর্ভাবনার অন্ত নেই। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালানোর বিরাম নেই।

বস্তুত, প্রথম স্বাধীনতার প্রায় ৫১ বছর পর, আজও আমরা আমাদের শিক্ষাকে জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড় করাতে পারিনি। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে, ভাবী দেশ-সেবকের চরিত্র ও জীবন-গঠন উপযোগী নয়— সে কথাও সত্য। বিদেশের, বিজাতির, বিষাক্ত বিষ-বাষ্প লেগে যে, তাদের মুঞ্জরিত জীবন-পুষ্প শুকিয়ে যাচ্ছে। বলপ্রয়োগে তাদের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনাস্থা জন্মিয়ে, নিজেদের শক্তির ওপর অবিশ্বাসী, অলস ও অকোজো ক'রে তোলা হ'চ্ছে সেকথাও আজ বর্ণে বর্ণে সত্য। কোন দেশেরই জাতীয় শিক্ষার চরিত্র এমন হ'তে পারে না। অথচ বাঙলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

www.pathagar.com

সম্পর্কে এই অচিন্তনীয় ব্যাপার-ই আজ সত্য। দেশের ছেলেরা আজ দেশের সীমানার গুরুত্ব, স্বাধীনতার মর্যাদা, সার্বভৌমত্বের মূল্য, দেশের উদাহরণ ও কাহিনীতে উদ্বুদ্ধ হবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। তারা স্বধর্মের সত্যকে অশ্রদ্ধা ক'রে পরধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'চ্ছে এবং নিয়ত হুজুগে মেতে গলাবাজির জোরে স্টেজ ফাটিয়ে বক্তৃতা দেয়া শিখছে। এতে যে জাতির কোন উপকার-ই হ'চ্ছে না-তা সুস্পষ্ট। কাজেই এই শিক্ষা যে, শিক্ষা নয়,—বহু আগেই কবি নজরুল, তাঁর-কালের পটভূমিতে সে কথা বিশ্লেষণ ক'রে ব'লে গিয়েছেন। আজ স্বাধীন বাঙলাদেশের জাতিগত প্রক্রিয়ায় সে-সব কথা যে 'অভ্রান্ত দিক-নির্দেশক হ'য়ে উঠেছে'- তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সেকালের সঙ্গে একালের অবস্থার কী আশ্চর্য এই মিল! '৪৭ সালে যে- জিনিস নিজস্ব নয় ব'লে অন্যের ভুল-দাগে দাগা বুলানো ত্যাগ ক'রে, যাদের মুখ ভেংচে বেরিয়ে এসেছিলাম; আজ আবার আমরা তাদেরই হুবহু 'হনুকরণ' ক'রে সেই সব ভুল-দাগে দাগা বুলিয়ে তৎসমুদয় 'হামারা' বলে নির্লজ্জের মত বুককে সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। বাংলাদেশের কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর পাতা উল্টালেই তার প্রমাণ মিলবে। অতএব, জাতীয় কবির মতই জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য-সচেতন কবি নজরুল ইসলাম সেকালের ভিন্ন পটভূমিতে শিক্ষা সম্পর্কে যা ব'লে গিয়েছেন, তা একালের জন্যও যে অনুসরণীয় এবং অপরিহার্য—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্পষ্ট ভাষায় তিনি সঠিকভাবেই ব'লেছেন—"আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হোক, যাহা আমাদের জীবন-শক্তিকে ক্রমেই সজাগ ও জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে-শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।"

কবি নজরুল এরকম শিক্ষা-পদ্ধতির যে দাবী সেকালে জানিয়েছেন—তা কি এদেশের জন্য আজকের দিনেরও দাবী নয়? অবশ্যই তা আজকেরও দাবী। কিন্তু সে-দাবী পূরণ ক'রবে কে? কবি ঐ দাবী পূরণ না হবার কারণ সম্পর্কে দু'টি বিষয়কে দায়ী ক'রেছেন। তার একটা হ'ল শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অযোগ্যতা এবং অন্যটা শিক্ষকদের অযোগ্যতা। শিক্ষার ব্যর্থতার জন্য এ দু'টি বিষয়-ই কি আজও এদেশে দায়ী নয়?

কবি "জাতীয় শিক্ষা" নিবন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-নিয়োগের রাজনৈতিক বিবেচনার পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, "যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রফেসর বা অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই কি নিজ নিজ পদের উপযুক্ত? কত উপযুক্ত লোককে ঠকাইয়া শুধু দু'টো বক্তৃতা ঝাড়ার দরুন ইহারা অনেকেই নিজের রুটি জোগাড় করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। আজ আমরা তাদের নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি এখনও এই রকম ব্যাপার চলিতে থাকে, তবে বাধ্য হইয়া আরও অনেক অপ্রিয় সত্য কথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। পবিত্রতার নামে, মঙ্গলের নামে এমন জুয়াচুরিকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ একদম ফর্সা।" কবির এই বক্তব্য '৭২-উত্তর স্বাধীন বাঙলাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিশন রিপোর্টে বর্ণিত, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিদান

www.pathagar.com

সম্পর্কীয় তথ্যাদি এবং পরবর্তী সময়ে—আজ পর্যন্ত প্রকাশিত অপ্রকাশিত এ সম্পর্কীয় তথ্যাবলী থেকে জানা যায়। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কারা কিভাবে ফর্সা ক'রছে তা কবির মানসপটে সেই সময়েই প্রতিভাসিত হয়।

নজরুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের সম্পর্কেও চিন্তা ক'রেছেন এবং তাঁদের সম্বোধন ক'রে বলেছেন, 'যে কওম, যে জাতি চলছে গোরস্তানের পথে, ফেরাও তাকে সেই পথে-যে পথে চ'লে তারা একদিন পারস্য সাম্রাজ্য, রোম সাম্রাজ্য জয় ক'রেছিল, আঁধার বিশ্বে তৌহীদের বাণী শুনিয়েছিল, তোমাদেরই মাঝ থেকে বেরিয়ে আসুক তোমাদের ইমাম—দাঁড়াও তাঁর পতাকাতলে। তহরিমা বেঁধে বল 'আল্লাহু আকবর,' হাঁকো হায়দারী হাঁক, সপ্ত আসমানে চাক হ'য়ে ঝ'রে পড়ুক খোদার রহমত, নবীর দোয়া। চাঁদ-সেতারা গ'লে পড়ুক কল্যাণের 'পাগল-ঝোরা'।

আর্ত-পীড়িত কোটি কোটি মজলুম ফরিয়াদ ক'রছে— কে ক'রবে এদের ত্রাণ? তোমাদের চর্বি জ্বালিয়ে জ্বালাও আবার দ্বীনের চেরাগ, এই অন্ধ পথহারা জাতিকে আলো দেখাও। তোমাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে গ'ড়ে তোল পুলসেরাত—সেই পুলের উপর দিয়ে জয়যাত্রা করুক নতুন জাতি। তোমাদের শিক্ষা তোমাদের জ্ঞান অর্জন যদি তোমাদের মাঝেই নি:শেষিত হ'য়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ-শিক্ষা, বর্জন করো এ-জ্ঞানার্জন। নওকরীর জন্য, দাসখত লেখার কায়দা-কানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করো, তবে জাহান্নামে যাক তোমাদের এই শিক্ষা-পদ্ধতি, এই শিক্ষালয়!"

কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ কি? দোষ রাজনীতিকদের, শিক্ষকদের, শিক্ষা-অধিকর্তাদের। তাদের জন্যই আজ বাঙলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, এমন ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্টি ক'রতে পারছে না যারা এই জাতির সুসমৃদ্ধ ও গৌরবময় বিশ্বব্যাপী ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। অথচ সেসব না জানলে বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জাগরণ হ'তেই পারে না। তাই ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য, কবি সেকালেই তাঁর পূর্বোক্ত বক্তৃতায় বলেন, "তোমাদের আমি দেখেছি, তোমাদের অতিক্রম ক'রে সহস্রাধিক বৎসর দূরে, ওহোদের যুদ্ধে, বদরের ময়দানে, খয়বরের যুদ্ধে। দেখেছি ওমর ফারুকের বিশ্ববিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিক রূপে, দেখেছি দূর আফ্রিকায় মূসা-তারিকের দক্ষিণে, দেখেছি মিসরের পিরামিডের পার্শ্বে, পিরামিড ছাড়িয়ে গেছে তোমাদের উন্নতশির। দেখেছি ইরানের বিরাণ মুলুক আবাদ করতে, তার আলবোর্জের চূড়া গুঁড়া করে দিতে। দেখেছি জাবলুত-তারেকের-জিব্রালটারের অকূল জলারাশির মধ্যে নাঙ্গা শমসের হাতে ঝাঁপিয়ে পড়'তে। দেখেছি সেই জলরাশি সাঁতরে পার হয়ে স্পেনের কর্ডোভায় বিজয়-চিহ্ন অঙ্কিত ক'রতে। দেখেছি ক্রুসেডের রণে, জ্বিহাদের জঙ্গে সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের সেনাদলের মাঝে—দেখেছি কুরূপা ইউরোপকে সুরূপা করতে। সেদিনও দেখেছি—রীফ সর্দার আবদুল করীমের সাথে, বিশ্বত্রাস কামালের পাশে, পাহ্লভীর দক্ষিণে, ইবনে সউদের সম্মুখে। যুগে যুগে তোমরা এসেছ ভাবী নেশনের নিশানবর্দার হ'য়ে। কোথায় সে শামশের, কোথায় সে বাজু, সেই দরাজ দস্ত? বাঁধো আমামা, দামামায় আঘাত হানো আর একবার তেমনি ক'রে।"

www.pathagar.com

সেকালের মত আজকের দিনের বাঙলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব থেকে প্রবাহিত ঐসব ঐতিহাসিক গৌরবগাঁথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের বর্তমান 'নেশনে'র নিশান-বর্দার হবার অনুপ্রেরণা সঞ্চারের প্রয়োজন নেই কি? অবশ্যই তা আছে। আর সে প্রয়োজন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা ভিন্ন অন্য কার রচনার দ্বারা মিটতে পারে? কবি ছাত্রদের মধ্যে শুধু সহস্রাধিক বৎসর পূর্বের বীরত্বের রূপ দেখেননি; সহস্রাধিক বর্ষ পরবর্তী জাতীয় বীরত্বের ছবিও দেখতে পেয়েছেন।

কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে, বৃটিশ-উত্তরকালে মুসলমানদের উদার অভ্যুদয় বিশাল অবদান সম্পর্কে হিন্দুরা শুধু বৃটিশ কারসাজিতেই কিছু জানতে পারেনি, তা নয়; সেই সঙ্গে তাদের নিজেদেরও ছিল বিরোধিতা, সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি। বস্তুতপক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে এ-দেশে যে-নতুন ঈঙ্গ-ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়, তার মূল লক্ষ্যই ছিল মুসলিমবিদ্বেষী ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী-জাতীয়তা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের নির্মাণ। নানা রকম কাল্পনিক,মিথ্যা ও বিদ্বেষ-বিষদুষ্ট সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি মুসলিম ইতিহাসের সত্য রূপ বিনষ্ট কিংবা বিকৃত করাও ছিল এই সময়কার ঈঙ্গ-হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতি ইতিহাস-চেতনার অপর লক্ষ্য। ঐ সময়ে রচিত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', 'রাজাবলী,' 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী; আরও পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তার নামে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতীয়তার জাগরণ, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, শান্তি নিকেতন-প্রতিষ্ঠা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে বৃটিশ আমলের গোটা প্রায় দু'শ বছর-রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুরা মুসলিম-বিরোধী যে-অভিযান পরিচালনা করেছে—তারই ফলে, আধুনিক কালের হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে মুসলিম সভ্যতার ঐতিহাসিক রূপ ও ভূমিকা সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহও যে এ বিষয়ে কি রকম ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্পর্কে সে কালের একজন হিন্দু লেখকও বলেছেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যত শিক্ষাই প্রদান করুক, একটি বিষয়ে সরকারের (না কর্তৃপক্ষের?) বেশ নজর আছে। মুসলমানদের ইতিহাসটা প্রথম হইতে বাদ দেয়া হইয়াছে। ইউরোপে যে তাহরাই জ্ঞান লইয়া গিয়াছিল, তাহা আমাদের দেশের হিন্দু বা মুসলমান ছেলেরা জানে না, যখন ইংল্যান্ডে সামান্য ধর্মভেদের নিমিত্ত রাণী মেরী শত শত বিভিন্ন মতাবলম্বীদের আগুনে দগ্ধ করিয়াছিল; তাহার বহু পূর্বে যে, বোগদাদ শহরের ইহুদী প্রভৃতি জাতিগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিত, তাহা আমাদের শেখানো হয় না।.... কিন্তু আজ মুসলমান শক্তি বিপন্ন।.... আজ যে-যন্ত্র ভারতের বুকে অক্টোপাশের মত রক্ত শোষণ করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, সেই যন্ত্রই ভারতের বাহিরে ইসলামের শক্তি নাশে নিযুক্ত রহিয়াছে।"

নজরুল ইসলাম ও বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হিন্দুদের নিকট থেকে মুসলমানদের শ্রদ্ধা করতে হ'লে, গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থারই পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কোন মুসলমান যদি তার সভ্যতা, ইতিহাস, ধর্ম-শাস্ত্র কোন কিছু জানতে

www.pathagar.com

চায়, তবে তাকে আরবী, ফার্সী বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভাল করে কসরৎ করতে হবে। ইংরেজী ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গী রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাঙলা ভাল ক'রে শেখে না, তার আবার আরবী, ফার্সী। কাজেই ন' মন তেলও আসে না, রাধাও নাচে না।"

এই অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে, কবি সেদিন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের যে ট্রাজেডি দেখেছিলেন, আজকের দিনে বাঙ্‌লাদেশী মুসলমান সমাজে সে ট্রাজেডি আরও মর্মান্তিক রূপ ধারণ ক'রেছে। এখন আমরা 'কাছের মানুষ'টিকে তো দূরের কথা, 'নিজের মানুষ'টিকেই চিনতে পারছিনে। হিন্দুদের দিক থেকেও সেকালের হিন্দুরা যতটুকু আরবী, ফার্সী ও উর্দু শিখতেন—এখানকার এ দেশী হিন্দুরা তাও শেখেন না। ফলে, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা একমাত্র মাদ্রাসাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে; সাধারণ শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এরই পরিণাম স্বরূপ আজ স্বাধীন দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান, তার ধর্ম, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে নিজেদের গৌরবময় অবদানের কথা কিছুই জানে না। জানতে চায়ও না। কবি ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা আরবী, ফার্সী ও উর্দু শিখে সে ভাষায় নিহিত নিজেদের সম্পদ বাঙলায় অনুবাদ না করলেও হিন্দুরা ব'সে থাকেনি। তারা মুসলিম ও বৃটিশ, এই উভয় যুগেই সংস্কৃত থেকে তাদের প্রায় সমুদয় সাহিত্যাবদান এবং ধর্মশাস্ত্রাদি অনুবাদ ক'রে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধ'রেছে। সেসব শুধু হিন্দুরাই অধ্যয়ন করেনি বা করে না; মুসলমানরাও ক'রেছে এবং করে। ফলে, ঐসব সাহিত্যের প্রভাবও সমভাবে মুসলমান ও হিন্দু, এই উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষিত সমাজের ওপর প'ড়েছে। এতে মুসলমান আত্মহারা, সম্বিৎহারা, ইতিহাস-ঐতিহ্য-ধর্ম-সভ্যতা হারা হ'চ্ছে এবং গ্রহণ ক'রছে হিন্দুর ভাল-মন্দ সব কিছু। আর এভাবেই বাঙ্গীয় "মুসলমানরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত; তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজ ধর্ম-সভ্যতা ইত্যাদির সাথে"। বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন তো দূরের কথা, বরং তা এমন পর্যায়ে উপনীত হ'য়েছে যে, সাধারণ শিক্ষায় অতি উচ্চ শিক্ষিত একজন বাঙলাদেশী মুসলমান, তার নিজ জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে কি না সন্দেহ। প্রসঙ্গত বলা দরকার আরবী, ফার্সী, উর্দুর পরে ইংরেজী ভাষায়, নজরুল-কথিত ইসলামের যে-"ফিরিঙ্গী-ইতিহাস" র'য়েছে—স্বাধীনতার পর, তাও এ দেশের শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে—স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজী ভাষার চর্চা প্রায় উঠিয়ে দিয়ে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নজরুল সাহিত্যের অধ্যয়ন জাতীয় চেতনাকে যাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী চেতনার বাইরে কোন স্বতন্ত্র রূপ দানের ভূমিকা না রাখতে পারে, তার জন্যই যে, পশ্চিম বাঙলা ও বাঙলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নজরুল সাহিত্যের অধ্যয়নকে সযত্নে, সভয়ে সরিয়ে রাখা হ'য়েছে ও হ'চ্ছে—তাতে কোন সেন্দহ নেই।

তথ্য সূত্র :

['নজরুল একাডেমী পত্রিকা' চৈত্র ১৪০৪, ২য় বর্ষ ২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ।]

www.pathagar.com

নজরুল, প্রমীলা, সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস

ড: আবুল হাসান শামসুদ্দিন

১.

নজরুল বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিশ্বমাপের এক অনন্যপ্রতিভা। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যগগনে চোখ-ঝলসানো দীপ্তির ভেতরে বাংলা সাহিত্যের আর সব অগ্রজ কবিরা যখন জোনাকির মত ম্রিয়মাণ, বাইশ বছরের তরুণ যুবক কাজী নজরুল ইসলাম তখন জ্বলে উঠলেন বিদ্রোহের বিদ্যুদ্দীপ্তিতে। তাঁর বিপুল সাড়াজাগানো 'বিদ্রোহী' কবিতা ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'বিজলীতে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে মাসিক 'মোসলেম ভারতে'ও (কার্তিক সংখ্যা, ১৩২৮) প্রকাশিত হয়। তৃতীয় দশক বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের উত্থানের যুগ। ঐতিহ্যগত ভাষা ও ছন্দের অনুসারী হয়েও স্বীয় প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা তিনি নিজেই বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে কাব্য ক্ষেত্রে এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন। যথার্থভাবে তিনিই প্রথম কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব বলয় সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে সমর্থ হলেন। তিরিশোত্তর কালের যেসব বিজ্ঞ সমালোচক নজরুলকে এটুকু স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেছেন, মহাকালের বিচারে তাঁদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে। নজরুল আজ সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষের হৃদয়ে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

২.১.

নজরুল শুধু কবি নন, তিনি ছিলেন একাধারে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবিতা ও গান রচনা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গদ্য রচনায়ও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ছোটগল্প, নাটক, নাটিকা, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং পত্রিকার জন্য রচিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ সৃজনশীল বয়সের একটা দীর্ঘসময় নিজের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার পরিমণ্ডল ছেড়ে দূর দেশে সেনা ছাউনির বিরূপ পরিবেশে অবস্থান করেও কাজী নজরুল ইসলাম ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের

www.pathagar.com

'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'' 'স্বামীহারা, 'হেনা' প্রভৃতি গল্প এবং প্রথম উপন্যাস 'বাঁধনহারা'র কিছুটা অংশ করাচী বাস কালে রচিত। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা, ১৩২৬ সালের (১৯১১ খ্রি:) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক 'সওগাতে' ছাপা হয়। লেখক তখনও করাচীতে। এই প্রথম লেখা থেকেই নজরুল বাংলা গদ্যের চলিত রীতিকে অবলম্বন করেছেন এবং ভাষা-ব্যবহারে আশ্চর্য নৈপুণ্য এবং মৃদু শ্লেষাত্মক তির্যক ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

২.২

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য রচনায় সাধুরীতির পরিবর্তে চলিতরীতি অবলম্বন করেন প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' প্রকাশের (মে ১৯১৪, বৈশাখ ১৩২১ সাল) পর থেকে। প্রমথ চৌধুরী গদ্যে চলিত রীতি প্রবর্তনের প্রধান উদ্যোক্তা ও অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহেই চলিত ভাষা ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায় এবং যেকোনো ভাব প্রকাশে এই ভাষারীতির অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁর চোখে ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের হাতে চলিত ভাষা ব্যবহারের এ যাদু আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর অসংখ্য ছোট গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদিতে। এ সময়ে নজরুল গ্রাম্য এক বালক মাত্র। এর অল্প পরেই ১৯১৭ সালে তিনি সৈনিকের খাতায় নাম লিখেয়ে ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগদান করেন; চল যান সুদূর করাচী আর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে।

এ সময় করাচীতে অবস্থান করেই নজরুল 'ব্যাথার দান' গল্পগ্রন্থের 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' 'স্বামীহারা' 'হেনা' ইত্যাদি গল্পগুলি রচনা করেন। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ নজরুল বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডল থেকে বহুদূরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পরিবেশে থেকেও বাংলা গদ্যের আধুনিকতম চলিত রীতি ব্যবহারে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। অথচ এ সময়ের পরেও দীর্ঘদিন ধরে অনেক খ্যাতকীর্তি লেখক বাংলা গদ্যের সাধুরীতির অনুশীলন করেছেন। গদ্যের চলিত রীতির শক্তি ও সৌন্দর্য নজরুল তাঁর এই প্রাথমিক প্রয়াসেই অত্যন্ত সহজে আয়ত্ত্ব করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য গল্প, বিশেষ করে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে দেখি গদ্যের চলিত রীতির সঙ্গে সমাজের নিচুতলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নির্ভেজাল কথ্যভাষার ব্যবহারে চরিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত ও বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। এতে কাহিনীর বাস্তব ভিত্তিভূমিও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনীর' (১৯১৯) দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। গল্পের শীর্ষ দেশে বন্ধনী ঘেরা ছোট্ট ভনিতায় লেখকের বক্তব্য 'বাঙালী পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক' 'নেশার ঝোঁকে' তাঁর কাছে এই কাহিনী বলেছিল। স্কুলের সীমানা পার হওয়ার আগেই অভিভাবকদের খেয়ালে তার দুবার বিয়ে হয়েছিল। দু স্ত্রীই অকালে মারা যায়, স্নেহময়ী মা-ও মারা যান। পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। এই বিষাদান্ত কাহিনী লেখক হালকা চটুল ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন এবং শ্লেষাত্মক তির্যক ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে গল্পের প্রথম অংশ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত হল :

www.pathagar.com

"কি ভায়া! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মত লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ! তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল। তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বলতে কি? আমার সেসব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমার করে দিলেন হাতির চেয়েও পুরু, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম। আর কাজেই দুচারজন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বলব, 'কুচ পরওয়া নেই,' কিন্তু আমার এই 'নাজোক' জায়টায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠব। তোমার 'বিরাশি দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারেনা। কিন্তু যখনই পাকড়ে বস, 'ভাই, তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে', তখন আমার অন্তরাত্মা ধুক্‌ধুক্ করে ওঠে, পৃথিবী ঘোরার ভৌগলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে বা জোনাকি পোকা জ্বলে উঠতে পারে, তা আমার মত এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।'
[কাজী নজরুল ইসলাম ঃ 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', নজরুল রচনাবলী, বা. এ. ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭৫]

সতের-আঠারো বছরের এক সদ্য যুবার এ লেখা, এমন প্রাণবন্ত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী অথচ চটুলভঙ্গির গদ্য সে যুগে, নজরুল ছাড়া আর কারো কলম থেকে বেরোয়নি।

৩.১

কাজী নজরুল ইসলাম উপন্যাস লিখেছেন তিনটি : ১. বাঁধনহারা (১৯২৭ খ্রিঃ ১৩৩৪ বাংলা); ২. মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০, ১৩৩৭); ৩. কুহেলিকা (১৯৩১, ১৩৩৮)।

'বাঁধনহারা', কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রথম উপন্যাস। তাঁর করাচী বাসকালে এর রচনা শুরু। মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকে (বৈশাখ ১৩২৭) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭-এ। প্রকাশ করেন গোপাল দাস মজুমদার, ডি.এম লাইব্রেরী, কলকাতা।

'বাঁধনহারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের কাছে লেখা কতকগুলি পত্রের মাধ্যমে এর আখ্যানিভাগ গড়ে উঠেছে।

করাচী সেনানিবাসে অবস্থানরত নুরুল হুদা এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র বা নায়ক। রবিয়ল, মনুয়র, রাবেয়া, মাহবুবা, সাহসিকা, সোফিয়া, সাহসিকা ইত্যাদি অন্যান্য প্রধান চরিত্র। নুরুল হুদা যদি বিদ্রোহী সৈনিক হয়, তাহলে সাহসিকা বিদ্রোহিনী।

১৯১৭ সালে সদ্য যুবা নজরুলের সৈন্যদলে যোগদানের পেছনে কোন অর্থনৈতিক কারণ

ছিল না। অভাবের তাড়নায় তিনি সৈনিকের খাতায় নাম লেখান নি। সে সময় তিনি সিয়ারসোল রাজ এস্টেটের বৃত্তি নিয়ে রাজস্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ছিলেন। ছাত্র হিসেবেও তিনি মেধাবী ছিলেন। অনায়াসেই তিনি এন্ট্রান্স পাশ করে যেতেন। তবে কি ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির লক্ষ্যে আধুনিক সামরিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তিনি ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন? নজরুলের লেখাতেই এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পের দারা ও সয়ফুল মুলক রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর বেলুচিস্তা থেকে মধ্য এশিয়ায় গিয়ে 'লালফৌজে' যোগদান এবং প্রতি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। নজরুলের আরো কয়েকটি গল্পের নায়ক যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, যেমন— 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' 'রিক্তের বেদন' এবং 'ঘুমের ঘোরে' ইত্যাদি। বিশ ও তিরিশের দশকে লেখা গল্পে-উপন্যাসে বিপ্লবের উল্লেখ সর্বপ্রথম নজরুলের লেখাতেই পাই।

বাঁধনহারার নূরুল হুদা বিদ্রোহী সৈনিক নজরুলেরই প্রতিরূপ বলে মনে হয়। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার নির্দেশে সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছে:

> 'আমাদের 'মোবিলিজেশন অর্ডার' বা যুদ্ধসজ্জার হুকুম হয়েছে। তাই চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। খুব শীঘ্র আরব-সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে গিয়ে, তাই আমার আনন্দ আর আমাতে ধরছেনা। আমি চাচ্ছিলাম আগুন- সারা বিশ্বের আকাশে-বাতাসে, বাইরে-ভিতরে আগুন, আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী অন্তরের আগুন নিয়ে, আর দেখি কোন আগুন কোন আগুনকে গ্রাস করে নিতে পারে।'

কাজী নজরুল ইসলাম রূপী নূরুল হুদা তাঁর কোম্পানীর সাহেব ক্যাপ্টেনের অন্যায় হুকুমের প্রতিবাদ করলে ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। নূরুল হুদা এতে রেগে গিয়ে সাহেবের বাম চোয়ালে এক প্রচণ্ড ঘুষি লাগায়। ফলে—

> 'তিনিও অবিলম্বে পপাত ধরনীতলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মূর্ছার হাতে-কলমে অভিনয়! তারপর, আমায় ঠেলে ঢোকানো হল 'কোয়ার্টার গার্ডে' বা সামরিক হাজতে। তারপর বিচারে ২৮ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ও গারদখানায় বাস! কুছ পরোয়া নেই। আমি এই সশ্রম কারাদণ্ডকে ভয় করলে আর জান দিতে আসতাম না। দু:খ-কষ্টই ত আমার অপার্থিব চিরদিনের চাওয়া-পাওয়ার ধন। ও যে আমার অলঙ্কার! তাই হাসিমুখেই তাকে বরণ করে নিয়েছি।'

এটাতো সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সৈনিক কাজী নজরুল ইসলামেরই মনের কথা। করাচী সেনানিবাসের কয়েদখানা থেকে মনুয়রকে (মনো) লিখিত নূরুল হুদার এই পত্রেই অন্যত্র আছে :

> 'যে সামরিক শিক্ষালাভের সৌভাগ্য বাঙালি এই প্রথম লাভ করেছে, তাকে এইরকম নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেক সম্মত? আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সামরিক

www.pathagar.com

শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের লোকের এত আশা, আমাদের প্রতি তাঁদের এত স্নেহ-আদরের সম্মান আমাদের প্রাণ দিয়েও রাখতে হবে। প্রাণত দিতেই এসেছি, তাই বলে লক্ষ্যচ্যুত হলে চলবে কেন? এ ভীরুতা যে সৈনিকের দুরপনেয় কলঙ্ক।'

সৈনিক-জীবনের গল্প-কাহিনীর ভেতর দিয়ে এভাবে আমরা নজরুলের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহী সত্তারই পরিচয় পাই। অপেক্ষাকৃত তরুণ-বয়সে লেখা এ উপন্যাসে বাংলা গদ্যের চলিত রূপের প্রয়োগে লেখক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় এবং বিভিন্ন নর ও নারীর জবানীতে আবেগ-অনুভূতির রূপায়ণে নজরুল ভাষা-শিল্পী হিসেবে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্র চিত্রন স্বাভাবিক ও লেখকের কৃতিত্বের পরিচয়বাহী। তবে এ উপন্যাসে দেশ ও সমাজের ব্যাপক ও গভীর রূপায়ন অনুপস্থিত।

৩.২

'মৃত্যুক্ষুধা' কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় উপন্যাস, ১৩৩৭ (১৯৩০ ইঃ) সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১৩৩৬ সালের ফালগুণ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'মৃত্যুক্ষুধা' রচনার সময় নজরুল সপরিবারে কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। শহরের উপকণ্ঠে চাঁদ সড়ক এলাকার শ্রমজীবী দরিদ্র মুসলমান ও খ্রিস্টান পরিবারের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের করুন কাহিনী অবলম্বনে নজরুল এ উপন্যাস রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুজাফফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

> "১৯২৬ সালের ২ রা জানুয়ারি তারিখে নজরুল ইসলাম হুগলি ছেড়েছিল এবং সেদিনই অল্প ক ঘণ্টার ভিতরে সে কৃষ্ণনগরে পৌছে দিয়েছিল। কৃষ্ণনগরে প্রথম যে বাড়িতে নজরুলের ওঠার ব্যবস্থা শ্রী হেমন্ত কুমার সরকার করেছিলেন, সেটা ছিল গোলাপট্টি মহল্লার মদন সরকারের গলিতে। .... এটা হেমন্ত বাবুদের পুরানো বাড়ি ছিল। .... মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে অনেকগুলি সম্মেলন হয়েছিল .... বঙ্গীয়প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য সে (নজরুল ইসলাম) লিখেছিল 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। .... সম্মেলন ইত্যাদির ঝামেলা মিটে যাওয়ার পরে নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে একটা ভালো বাড়ি পেয়ে সেই বাড়িতে উঠে গেল। বাড়িটি ছিল স্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট বাড়ি হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এতো বেশি খোলা ময়দান ছিল যে, তাকে বাগান বাড়িও বলা যায়। বাড়ির মালিক ছিলেন একজন খ্রিস্টান মহিলা। ......ওই জায়গাটা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত 'চাঁদসড়ক' এলাকা। শ্রমজীবী খ্রিস্টান ও মুসলিমদের বাস এই এলাকায়। নজরুলের উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' এই পরিবেশেই লেখা হয়েছিল।" [কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৫৬-৫৭]

www.pathagar.com

'মৃত্যুক্ষুধা' যে সময়ে রচিত হয় (১৯২৬-২৭ ইং), তখন পর্যন্ত বাংলার কথাশিল্পীদের দৃষ্টি শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডীর বাইরে, কঠোর জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত হতশ্রী শ্রমজীবী মানুষের বস্তিতে গিয়ে পৌঁছায়নি। এক্ষেত্রে নজরুলই পথিকৃৎ। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে তিনি চাঁদ সড়কের পার্শ্ববর্তী দরিদ্র বস্তির শ্রমজীবী মুসলমান ও খ্রিস্টান পরিবারগুলির জীবন-সংগ্রামের করুণ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই বাস্তবভিত্তিক বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ইতিহাসে 'মৃত্যুক্ষুধার' স্থান অনন্য।

৩.৩

পেটের ক্ষুধা মানুষকে কিভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তার আজন্ম লালিত ধর্মবিশ্বাস এবং মন-মানসিকতাকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে ফেলে, কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার চিত্র এঁকেছেন 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে। কৃষ্ণনগর শহরের পার্শ্ববর্তী চাঁদ সড়কের বস্তিবাসী একটি অসহায় দরিদ্র পরিবারের প্রতিদিনকার দু:সহ জীবন সংগ্রামের কাহিনী এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। নজরুলের নিজের পারিবারিক জীবনও তখন আর্থিক টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছিল। তাই গণ মানুষের সাহিত্য শিল্পীর সহজাত প্রবণতাতেই তিনি তিনি হৃদয়ের সবটুকু দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে চাঁদ সড়কের বস্তিবাসীদের জীবনচিত্র এঁকেছেন।

বৃদ্ধা বিধবা গজালের মা, তিনটি বিধবা পুত্রবধূ, তাদের প্রায় ডজন খানেক ছেলেমেয়ে আর একমাত্র জীবিত ছেলে আঠারো-উনিশ বছরের যুবক প্যাঁকালে— এই নিয়ে পরিবার। গোটা পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব প্যাঁকালের উপর। সে রাজমিস্ত্রিরির কাজ করে। সেটা জীবিকার প্রয়োজনে। তার সখের কাজ হল টাউনের থিয়েটারের দলে সখি সেজে নাচ-গান করা। বাবু-ঘেঁষা হয়ে সে নিজেও একটু বাবু গোছের হয়েছে। কিন্তু রাজমিস্ত্রিরি সামান্য আয়ে সংসার খরচ চালিয়ে সে বাবুয়ানার রসদ জোটাতে পারে না। চুল আঁচড়বার জন্য চার আনা পয়সা জমিয়ে একটা আয়না কেনার সাধ্য তার হয় না। থালা ভর্তি জলের দিকে তাকিয়ে সে চুলে টেড়ি কাটে। পাড়ার যুবতী খ্রিস্টান মেয়ে কুর্শিকে সে ভালবাসে। কুর্শি কালো হলেও তার চেহারায় লাবণ্য আছে। প্যাঁকালে তাই তার অনুরাগী। তার মা এবং দুই ভাবী তার সুন্দরী মেজোভাবীকে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। প্যাঁকালে এতে রেগে গিয়ে বলে, এরকম করলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এ পরিবারে খ্রিস্টান মিশনারী প্রবেশ করে। মুমূর্ষূ সেজবৌকে খ্রিস্টান নার্সের বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য প্রদানে এবং তাদের সহৃদয় ব্যবহারে মেজবৌ আকৃষ্ট হয়। মিশনারীরা তাকে লেখাপড়া ও কাজ শিখিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেয়ার আশ্বাস দেওয়ায় সে মিশনে যায়। ছেলে-মেয়ে দুটিও তার সঙ্গে যায়। এদিকে সেজবৌ ও তার ছেলে দুজনে একই সঙ্গে মারা যায়। এরপর মেজবৌ খ্রিস্টান হয়ে যায়। মিশনারীরা তাকে চাঁদসড়কে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে বরিশাল মিশনে পাঠিয়ে দেয়। প্যাঁকালেও খ্রিস্টান হয়ে কুর্শিকে বিয়ে করে। মিশনারীদের সুপারিশের জোরে সে বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের অফিসে চাকরি পায়।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ থেকে উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশের শুরু। এ অংশের প্রধান বিষয় আনসার ও রুবী প্রসঙ্গ। আনসার বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত সমাজকর্মী, দেশকর্মী ও সংসার বিরাগী। কৃষ্ণনগরের নাজির সাহেবের স্ত্রী লতিফা ওরফে বুঁচি তার খালাতো বোন। বিচিত্র খেলাফতি পোশাক পরে সে এখানে এসে ওঠে। কৃষ্ণনগরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তরুণী কন্যা সদ্য-বিধবা রুবি তার বাল্যপ্রণয়ী। মাঝখানে কয়েক বছর তাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। রুবিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া হয়েছিল এক অর্থলোভী যুবকের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের এক মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। রুবি স্বামী বলে তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। তথাপি সে বিধবার বেশ পরে আচার-নিষ্ঠ জীবন যাপন করে। তবে এখনো সে মনে-প্রাণে আনসারকেই ভালবাসে। কৃষ্ণনগরে বহুদিন পর তাদের পরস্পরের দেখা হয়। কিন্তু আনসার এখানে ব্যস্ত থাকে শ্রমজীবী মানুষদেরকে সংঘবদ্ধ ও অধিকার সচেতন করে তোলার কাজে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের টনক নড়ে। আনসার গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হয়। এরপর রেঙ্গুন কারাগারে বন্দী থাকাকালীন আনসার দুরারোগ্য যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। শেষ সময়ে সরকার কৃপা করে তাকে মুক্তি দেয়। আনসার তখন আরোগ্য লাভের চেষ্টায় দক্ষিণ ভারতে ওয়ালটেয়ার সমুদ্র সৈকতে চলে যায়। রুবি তার বান্ধবী লতিফার কাছে এ সংবাদ শোনা মাত্র বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে ওয়ালটেয়ারে ছোটে। আনসারের অন্তিম মুহূর্তে সে প্রাণপণ তার সেবা করে। কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না; সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আনসারকে সেবা করার ফলে রুবিও সেই মরণ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এ যেন ভালবাসার জন্য স্বেচ্ছামরণ।

ওদিকে মেজ-বৌ অভাবের তাড়নায় সন্তান কোলে খ্রিস্টান হয়ে, বরিশাল মিশনে নিজের জীবন কাটিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু ছেলেটি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অসুখে ভুগে শত অনুরোধেও সে আর ফিরে যায়নি। বস্তির ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য সে একটি স্কুল খোলার চেষ্টা করে। পাড়ার শিশুদেরকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে, সে তাদের মধ্যে নিজের শিশুপুত্রকে খুঁজে পায়। প্যাঁকালেকে খান বাহাদুর সাহের কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরি দেয়ায় প্যাঁকালে ও কুর্শি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়।

এখানেই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের কাহিনীর সমাপ্তি। প্যাঁকালে, তার মা ও বিধবা তিনভাবী এবং তাদের ডজনখানেক ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের মূল আখ্যা ভাগ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বস্তির আরো কিছু মানুষ। এরা কৃষ্ণনগর শহরের অদূরবর্তী চাঁদ সড়কের বিত্তহীন মেহনতী মানুষ। সংসার জীবনে এদের দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। তথাপি বাঁচার সংগ্রামে এরা পিছিয়ে থাকে না। একদিকে খ্রিস্টান পাদরীরা প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস পায়; অপরদিকে মোল্লা-মৌলবীরা গুনাহর ভয় দেখিয়ে দরিদ্রের সামান্য সম্বলটুকুও হাতিয়ে নেয়। এই পটভূমিতে কাজী নজরুল ইসলাম প্যাঁকালেদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের আশা ও বেদনা এবং কঠোর সংগ্রামের যে বাস্তব রূপ এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা পাঠক-হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

৩.৪

কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের মধ্যে 'মৃত্যুক্ষুধা' সবচেয়ে সার্থক। পটভূমি

www.pathagar.com

নির্বাচন, কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র সৃষ্টি সংলাপ ও ভাষা ব্যবহার— এসব দিক থেকেই 'মৃত্যুক্ষুধা'য় অভিনবত্ব দেখা যায়। কল্লোল-যুগের কোন কোন লেখক বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষকে গল্প-উপন্যাসে নিয়ে এলেও নজরুলের আগে তাদের দিকে দরদমাখা এমন সহানুভূতির দৃষ্টি আর দেননি। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে যখন সমাজের নিচের তলার সাধারণ মানুষকে মর্যাদার আসন দেওয়ার আয়োজন চলছে, তখন নজরুলের হাতে চাঁদ সড়কের বস্তিবাসী দরিদ্র শ্রমজীবী নারী-পুরুষের সংগ্রাম জীবনের রূপায়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। চরিত্রচিত্রন এবং সংলাপ ব্যবহারেও লেখক পরিমিতিবোধ, বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের প্রথম অংশে প্যাকালে, তার মা ও তিন বিধবা ভাবী এরাই প্রধান পাত্র-পাত্রী। এদের সঙ্গে বস্তিবাসী বিভিন্ন পেশার আরো অনেক নারী-পুরুষ এসেছে। এদের মধ্যে প্যাঁকালের প্রেমিকা খ্রিস্টান তরুণী কুর্শিও একজন। সমাজের একেবারে নিচের স্তরের তরুণ-তরুণীকে লেখক নায়ক-নায়িকা করেছেন। সেদিক থেকে বর্তমান সময়েও এ উপন্যাসের বিশেষ মূল্য ও তাৎপর্য রয়েছে।

'মৃত্যুক্ষুধার' পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আমরা বিপ্লবী, স্বদেশব্রতী আনসারকে প্রথম দেখতে পাই। বলতে হয়, এখান থেকে কাহিনী নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু তাতে মূল সূত্র ছিন্ন হয়নি। মূল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আনসার রুবি এবং আনসার মেজবৌ কাহিনী সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে মৃত্যুপথযাত্রী আনসারের সেবায় রুবির আত্মবিসর্জন অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। রুবির এই আত্মদান ভাবালুতাপ্রসূত হলেও এর একটা সৌন্দর্য আছে। আনসার ও রুবির জীবনের করুণ পরিণতি পাঠকদের নিকট থেকে প্রচুর সহমর্মিতা ও সমবেদনা আকর্ষণ করেছে।

আনসার চরিত্রের মধ্যে নজরুলের নিজের বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিত্ব এবং নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের ছাপ পড়েছে। আনসারের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের পরিচয় প্রকাশ পায়নি। নির্যাতিত ও অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণীকে আত্মসচেতন করে তোলাই তার কর্মতৎপরতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। চাঁদ সড়কে এ ভূমিকাই তাকে পালন করতে দেখি। এখানে স্বল্পসময় অবস্থানকালে শ্রমিক ও মজুরদের মধ্যে কাজ করে সে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর প্রধান কারণ, এদেরকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই এরাও তাকে নিতান্ত আপনজনের মত ভালবেসেছে। আনসার ছিল দেশপ্রেম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সর্বহারার দুঃখ মোচনের মহান ব্রতে ব্রতী।

কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' বাংলা সাহিত্যে বাস্তবভিত্তিক সামাজিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। চাঁদ সড়কের বস্তিবাসী দরিদ্র মানুষগুলির সংগ্রাম জীবনের রূপ গভীর মমতায় লেখক এখানে তুলে এনেছেন। নজরুল জানতেন, জনজীবন নিয়ে সার্থক উপন্যাস লিখতে হলে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সে অভিজ্ঞতাই তিনি অর্জন করেছেন চাঁদ সড়কের ধারে প্রায় চার বৎসর বসবাস করে। নজরুল আরো জানতেন, উপন্যাসের কাহিনীকে বাস্তবোচিত করতে হলে চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ও লোকজ ভাষা প্রয়োগ করতে হবে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে ভাষা-ব্যবহারে আমরা লেখকের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিরই

www.pathagar.com

পরিচয় পাই। এ উপন্যাসে আমরা বস্তিবাসী মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষার নিখুঁত প্রয়োগ দেখে বিস্মিত হই। এমনকি, গ্রামের অশিক্ষিত, অমার্জিত নারীদের কলহ-কোন্দলের ভাষাও তিনি হুবহু তুলে এনেছেন নিপুণ দক্ষতায়।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে রাজনৈতিক বিদ্রোহ নেই, তবে আত্মনিবেদিত দেশকর্মী আনসারের শ্রমিক সংগঠনে ভবিষ্যৎ বিপ্লবী রাজনীতির পূর্বাভাস পাই। অন্যদিকে বিভিন্ন চরিত্রে জীবনধারনের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় আছে।

৪.১

কাজী নজরুল ইসলামের তৃতীয় উপন্যাস 'কুহেলিকা' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে। প্রকাশক ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা। ১৩৩৪ সালের 'নওরোজ' পত্রিকার শ্রাবণ থেকে ভাদ্র সংখ্যায় 'কুহেলিকা'র পঞ্চম পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েচিল। 'নওরোজ' ১৩৩৪ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গেলে 'কুহেলিকা' ধারবাহিকরূপে সাপ্তাহিক সওগাতে বের হয়েছিল। [নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড, বা.এ. পৃ: ৯০৬-০৭] 'নওরোজ' পত্রিকায় মুদ্রিত পঞ্চম পরিচ্ছেদটি কোন অজ্ঞাত কারণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'কুহেলিকা' উপন্যাসে গৃহীত হয়নি [ঐ রচনাবলী, পৃ: ৯০৩]

কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম দুটি উপন্যাসে কাহিনী পরিকল্পনার দিক থেকে যেমন অভিনবত্বের দাবীদার, তৃতীয় উপন্যাসেও তেমনি আরেকটি নতুন দিক দেখতে পাই। 'কুহেলিকা' বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবীদের নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস।

'কুহেলিকা'র নায়ক জাহাঙ্গীর বা উলঝলুল একজন আপোষহীন সত্যব্রতী। তার ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে যেন চির-বিদ্রোহী নজরুলেরই ছায়াপাত ঘটেছে।

জাহাঙ্গীরের শিক্ষক, বিপ্লবী নায়ক প্রমত্ত জাহাঙ্গীরকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাকে দলে নেওয়ায় প্রমত্তকে দলের অন্যান্যদের প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু প্রমত্ত মানতে রাজী হয়নি যে বাংলার মুসলমান ছেলেরা বিপ্লবের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারবে না। প্রতিবাদকারীদের উদ্দেশে প্রমত্ত সেদিন যে জবাব দিয়েছেন তা নজরুলের নিজের কথারই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।

> "দেখ, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপানি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এ মতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই সে বাঙলার মুসলমান ছেলে বিপ্লব বাদীদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। তোমরা বলবে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরী লোভী, না হয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ঐ রকমের, তা বিশ্বাস করবার তো কোনো হেতু দেখিনে। তাছাড়া, আমরা ওদের চেয়ে কম চাকুরী লোভী, কম ভীরু এ বিশ্বাস করতে আমার লজ্জা হয়। ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাঙলারই জলবায়ু দিয়ে তো ওদেরও রক্ত অস্থি মজ্জার সৃষ্টি। যে শক্তি, যে তেজ, যে ত্যাগ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই তা থাকবে না কেন? তাছাড়া আমি মুসলমান ধর্মের যতটুকু পড়েছি, তাতে জোর করেই বলতে পারি যে, ওদের ধর্ম দুর্বলের সান্তনা 'অহিংসা পরম ধর্ম'কে কখনো বড়ো করে দেখেনি। দুর্বলেরা অহিংসার যতো

www.pathagar.com

বড়ো সাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দিক না কেন, ও জিনিসটি মুসলমানেরা অভ্যাস করেনি বলে ওতে ওদের অগৌরবের কিছু নাই।' [পূর্বোক্ত রচনাবলী, পৃ: ৬৪৮]

জাহাঙ্গীর জমিদারের সন্তান হলেও দেশসেবায় সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত বলে বিলাসিতাকে প্রশয় দেয়নি। সে কলকাতায় সাধারণ মেসে বসবাস করে। সারা কলকাতার অলিগলিতে ধুলা-কাদা মেখে সে হেঁটে বেড়ায়। এজন্যই তার আরেক নাম উলঝলুল। বিপ্লবী নায়ক প্রমত্তর কাছে সে যখন দীক্ষা নেয়– 'জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী, সে সময় হঠাৎ একদিন সে জানতে পারে তার মা কলকাতারই 'একজন ডাকসাইটে বাইজি' এবং 'পিতা চিরকুমার'। অর্থাৎ সে তার 'পিতামাতার কামজ সন্তান।'

নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানার পর জাহাঙ্গীর অন্যরকম হয়ে যায়। সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার জীবন থেকে সব হাসি আনন্দ মুছে যায়। প্রমত্তকে সে বলে: 'দেশ সেবার পবিত্র ব্রত আমায় দিয়ে হবে না প্রমত্-দা'। প্রমত্ত তার এই হতাশার কারণ জানতে চাইলে জাহাঙ্গীর তার জন্মবৃত্তান্ত খুলে বলে। প্রমত্ত তখন গভীর স্নেহে জাহাঙ্গীরকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে, '..... ওতে তোর লজ্জার কি আছে বলত। যদি লজ্জিতই হতে হয় বা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয়, তা করবে তারা, যারা এর জন্য দায়ী। কোন অসহায় মানুষই ত তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়।'

জাহাঙ্গীর গুরুর বাক্যে অনেকখানি প্রবোধ পেলেও 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এ কথাটি সম্পূর্ণত মেনে নিতে পারে না। জাহাঙ্গীর লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, 'মিথ্যা ও মন্ত্র! ও মন্ত্র মিথ্যা! জননী নয়, জননী নয়,– শুধু জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরিয়সী।' [পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৫৫]

বিপ্লবী দলের সান্নিধ্যে জাহাঙ্গীরের জীবনে আমরা দুজন নায়িকাকে দেখতে পাই। একজন হল জাহাঙ্গীরের বন্ধু হারুনের বোন তহমিনা ওরফে ভূনী, আরেকজন বিপ্লবী দলেরই কর্মী চম্পা। মনের হাজারো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও জাহাঙ্গীর তাদের প্রতি গভীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাদেরকেও আকৃষ্ট করেছে। তথাপি জাহাঙ্গীর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রমত্তর নির্দেশে সে অনেক বিপজ্জনক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে আন্দামানে নির্বাসিত হয়।

৪.২.

নজরুলের করাচীর সেনানিবাসে বাসকালে রচিত গল্প এবং উপন্যাস তিনটির আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে এগুলোর নায়ক-চরিত্রের মধ্যে নানাভাবে ব্যক্তি নজরুলেরই প্রতিফলন ঘটেছে। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র 'বওয়াটে যুবক', 'রিক্তের বেদন'-এর সৈনিক নায়ক আর 'ঘুমের ঘোরে'র আজহার এদের মধ্যে চরম আবেগপ্রবণ, আত্মাভিমানী, তরুণ মুখ নজরুলকে দেখতে পাই। আবার 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসের নূরুল হুদা, 'মৃত্যুক্ষুধা'র আনসার আর 'কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীর চরিত্রের মধ্যেও যেন ব্যক্তি নজরুলকেই নানভাবে নানারূপে দেখি। নজরুল একাধারে বিপ্লবী দেশ কর্মী, সৈনিক, আবেগ-উদ্বেগ তরুণ প্রেমিক। সর্বহারাদের সংগঠক ও আত্মার আত্মীয়।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের তিন কবি

আবদুল মান্নান তালিব

ইকবাল; রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম তিনজন সমসাময়িক মহাকবি উপমহাদেশের একটি বিশিষ্ট সময়কালকে চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজদের আগমনের পর পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠেছিল চিন্তা-দর্শন ও সাহিত্যে তার প্রকাশ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বলিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন এ তিনজন মহাকবি।

এ তিন মহাকবি ছিলেন উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ধর্মীয় গোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধি। দু'টি বড় ভাষা বাংলা ও উর্দুতে তাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে তাঁদের আবির্ভাব ঘটলেও তাঁদের সাহিত্যচর্চার পরিণত সময়টা ছিল বিশ শতকের প্রথম তিন দশক। এ সময়ই বৃটিশসূর্য মধ্য গগন থেকে অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়ে। একদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ও পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার প্রবল জোয়ার এবং অন্যদিকে উপমহাদেশের বড় বড় জাতিগুলির নব উত্থান প্রচেষ্টা এ সময়টার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

উপমহাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি পরিচিতিমূলক যে কোন বিষয়ের কথা বললেই এ এলাকার দু'টি বড় জাতি হিন্দু মুসলমানের কথা এসে পড়ে। হাজার বছর থেকে এরা এ বিশাল ভূখণ্ডে বাস করে আসছে। এরা প্রতিবেশী কিন্তু প্রতিযোগী। এদের মধ্যে সদ্ভাব, বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি থাকলেও বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মের ব্যবধানটাও কম নয়। আর এ ব্যবধান দূর করার কোনো পথও নেই। একজন তওহীদে বিশ্বাস করলে অন্যজন বিশ্বাস করে শিরককে। একজন তার শিরককে একমেবা দ্বিতীয়মের রূপে অদ্বৈতবাদের চাদরে কখনো আবৃত করার প্রচেষ্টা চালালেও তার সারা জীবন, চিন্তা ও কর্ম দ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। তার কর্মের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে শিরক। অন্যজন উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে জীবনযাত্রা ও জীবনকর্মের ক্ষেত্রে কখনো কখনো শিরকে লিপ্ত হলেও সেটা তার বিশ্বাস ও আদর্শের পরিপন্থী এবং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে একটি পদস্খলন

www.pathagar.com

হিসাবে চিহ্নিত ও স্বীকৃত হয়। পরবর্তীকালে এ জন্য সে তওবা করেও অনুতপ্ত হয়।
এর মধ্যে এখানে আগমন হয় তৃতীয় শক্তির। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বৃটিশ তথা ইংরেজ, চিন্তাগত দিক দিয়ে পাশ্চাত্যবাদ এবং ধর্মীয় দিক দিয়ে খৃষ্টবাদ তথা খৃষ্টীয় জাতির খৃষ্টধর্মের অস্তিত্ব উপমহাদেশে ইতিপূর্বেই ছিল। কিন্তু পরিমাণ এত কম ছিল যার ফলে কখনো অনুভবযোগ্য হয়নি। ইংরেজ আসার পর খৃষ্টবাদ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমত শাসকের ধর্ম। দ্বিতীয়ত ষোল সতের শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও পরবর্তীকালের শিল্প বিপ্লবের জোয়ারে খৃস্টধর্মের যে সংস্কার সাধিত হয় এবং যার ফলে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্তি গড়ে ওঠে, ধর্ম একটি বিজ্ঞানবিরোধী, প্রগতিবিরোধী উন্নত জীবনবোধবিরোধী মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং এভাবে ব্যক্তি জীবনেই তার প্রভাব হওয়ার ফলে হিন্দু-জীবনবাদের সাথে তার একটা সামঞ্জস্য গড়ে ওঠে। মুসলমানদের সাথে সাত আটশো বছর থেকে পাশাপাশি বসবাস করলেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান ঘোচেনি এবং যে মনের মিল হয়নি শাসক ইংরেজের সাথে হিন্দুদের সে ব্যবধান অনেকটা দূর হয়ে যায় এবং আশ্চর্য মনের মিলনও হয়।
আর মুসলমানরা। শাসক ইংরেজদের সাথে তাদের সম্পর্কটা কেমন হয়? ইংরেজরা হিন্দুদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। ফলে মুসলমানদের শাসক ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক কোনদিন ভালো হয়নি। ইংরেজরা তাদেরকে সবসময় শত্রু, প্রতিযোগী ও বিদ্রোহী মনে করেছে এবং তারাও ইংরেজদের মনে করেছে জানী দুশমন। আবার ইংরেজদের মনে ছিল মুসলমানদের সাথে তিনশো বছরের ক্রুসেড যুদ্ধের স্মৃতি। বৃটিশ ভারত শাসনের সময় ইংরেজরা সবসময় একথা মনে রেখেছিল। এরি প্রেক্ষাপটে তারা ভারতীয় সামাজিকতা, সাহিত্য ও চিন্তা দর্শনে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালায়।
ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে যদি আমরা এই সমগ্র প্রেক্ষাপটে বিচার করি, তাহলে তাদের সঠিক মূল্যায়ন হবে বলে আমি মনে করি। তাঁরা তিনজন ছিলেন বড় কবি। ফলে তাঁরা ছিলেন তাঁদের জাতির হৃৎস্পন্দন। জাতীয় অংগন থেকে আলাদা হয়ে তাঁরা বড় কবি ছিলেন না, যে চেষ্টা মাইকেল করে ব্যর্থ হয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বৃহত্তর হিন্দু জাতির প্রতিনিধি। ধর্মে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। সনাতন হিন্দু ধর্মের একটি সংস্কারবাদী গোষ্ঠী। সনাতন হিন্দু ধর্মের সমালোচক হলেও তিনি হিন্দুজাতির সমালোচক নন। মাইকেল মধুসূদনের মতো হিন্দু জাতি গোষ্ঠীর বাইরে যাবার ভুলটি তিনি করেননি। শক হুন দল পাঠান মোগলকে এক দেহে লীন করে একটি ভারতীয় জাতি গড়ে তোলার যে স্বপ্ন তিনি দেখেন হিন্দু জাতিগোষ্ঠীর বাইরে তার অস্তিত্ব ছিল না। তাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা তিনি করতে পেরেছিলেন। কারণ বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি মুসলিম জাতির অস্তিত্ব বিকাশমান হতে যাচ্ছিল। বৃটিশ শাসনের আওতাধীন হিন্দু জাতির উত্থান প্রচেষ্টায় তিনি

www.pathagar.com

সহায়তা করেন। এজন্য পাশ্চাত্যবাদ, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য চিন্তাদর্শনকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার সেথা হতে সবে আনে উপহার'— সমগ্র হিন্দু জাতির আকাংখা এটাই ছিল। সাধারণত হিন্দু-চিন্তার সংকীর্ণতা তাঁকে কম স্পর্শ করতে পেরেছিল। তাঁর মধ্যে যতটুকু ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা এসেছিল তার মূলে বেদ ও উপনিষদের অবদান ছিল না। তার মূলে ছিল তাঁর ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির বাইরে পদচারণা, ইউরোপীয় চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সাথে সক্রিয় যোগাযোগ এবং বিশেষ করে দীর্ঘকাল, বরং কয়েক পুরুষ থেকে, পারিবারিক পর্যায়ে ফারসী সাহিত্যের সাথে গভীর সংযোগ।

ইংরেজদের তিনি প্রশংসা করেছেন। ইংরেজ শাসনের জয়গান গেয়েছেন 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' বলে। পাশ্চাত্যবাদের বাইরে হিন্দু জাতির অবস্থানকে তিনি সমর্থন দেননি। পাশ্চাত্যবাদে উজ্জীবিত হয়ে ভারত-ভূমিতে হিন্দুজাতির নব উত্থানই তিনি কল্পনা করেছেন। তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অংশ নেননি। তাঁর সাহিত্য হিন্দুবাদকেই প্রসারিত করেছে। পাশ্চাত্যবাদের সহায়তায় তার সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যতাবাদের অন্ধকার কিছুটা দূরীভূত করার প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছেন। হিন্দু জাতি তাঁর সাহিত্যের সংস্কারবাদিতাকে মূল্য দিয়েছে।

সমসময়ে ইকবাল এসেছেন পাঞ্জাবের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবার থেকে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন। পাশ্চাত্য চিন্তাদর্শনকে নিকট থেকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। পাশ্চাত্য এর প্রতিফলন দেখে শিউরে উঠেছিল। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বলে পাশ্চাত্যের জাতিগুলি সারা দুনিয়া শাসন করছিল। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার ঘটছিল দুনিয়াব্যাপী। তাদের নিজ দেশের সামাজিক অবক্ষয়েরও বিস্তৃতি ঘটছিল সারা দুনিয়ায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার এ করুণ পরিণতি ইকবাল লক্ষ্য করছিলেন। ইসলামী চিন্তাদর্শনও তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী মুসলিম মিল্লাতের অবক্ষয়, পরাধীনতা ও পরাজয় তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তিনি দেখছিলেন যথার্থ ইসলামী বিধান থেকে মুসলমানদের সরে যাওয়াই তাদের পতন ত্বরান্বিত করেছে এবং মুসলমানদের পতন বিশ্বকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারা ও চিন্তা-দর্শনের কঠোর সমালোচনা করলেন। এরি ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের যাবতীয় দুরারোগ্য ব্যাধি ও সুস্থ মানবিকতা বিরোধ-দুষ্ট ক্ষতকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা নেতিবাচক ছিল না। শুধু একটি ধ্বংস ও প্রলয়ের বিষাণ ছিল না। এই সংগে তিনি মুসলমানদের ইসলাম ছাড়া অন্যান্য মতবাদ ও চিন্তাদর্শন পরিহার করে প্রকৃত ইসলামী ভাবধারায় জীবন গঠন করার আহ্বান জানালেন। এজন্য তাঁর প্রথম আহ্বান ছিল স্বাধীনতার। ইংরেজদের শাসন থেকে মুক্তি। তাঁর সমস্ত কবিতায় এই স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে

www.pathagar.com

আছে। এমনকি নিজে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন। বিশ্বে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি একটি স্বপ্নের দেশের চিত্র আঁকলেন। পরবর্তীকালে তাঁর ইন্তেকালের পরে পাকিস্তান নামে সে দেশটির জন্ম হলো ঠিকই কিন্তু তাঁর চিন্তাদর্শন অনুযায়ী সে দেশটির পরিচর্যা না হবার কারণে শুরুতেই পংগুত্ব বরণ করলো। কিন্তু তাঁর চিন্তা, তাঁর সাহিত্য, তাঁর কবিতা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ভাষায় এখন তার অনুবাদ হচ্ছে। মুসলমানদের সাথে সাথে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতির বিবেকেও তা আঘাত হানছে। ইকবালের কবিতা ও চিন্তাধারা মানুষের বসবাস উপযোগী একটি নতুন জাতি সৃষ্টিতে মুখর। এ জগতের বাসিন্দা শুধু মুসলমান নয় সমগ্র মানব সম্প্রদায়। ইকবাল মূলত উর্দু কবি হলেও তাঁর অধিকাংশ ও মূল্যবান কবিতাগুলি ফারসী ভাষায় রচিত।

প্রায় সমসময়ে তৃতীয় মহাকবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। বৃটিশ বাংলার এক গরীব মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। দারিদ্র্যই ছিল সেকালের মুসলিম পরিবারের কপালের লিখন। তাই শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু পারিবারিক ও জাতীয় ঐতিহ্য, বাংলার ও বাংলার বাইরের বিভিন্ন এলাকা সফর ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ তাঁকে অত্যন্ত সচেতন করে তোলে। পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয়। তাই স্বাধীনতার বাণী নিয়েই তিনি সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন। তিনি অত্যন্ত সমাজ-সচেতন ছিলেন; পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মাত্রাজ্ঞানও পুরোপুরি ছিল। তিনি বাংলার এমন এক সমাজ থেকে এসেছিলেন যারা একশো বছর ধরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিধ্বস্ত, পরাজিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসেছিল। আবার এমন এক সমাজের মাধ্যমে তাঁর বাণী ও কবিতা জনসমক্ষে উপস্থাপন করার সুযোগ পাচ্ছিলেন যারা ছিল এদেশে ইংরেজের শাসন-প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি ও ইংরেজদের কোলাবোরেটর। ইংরেজ ও তারা উভয়ে মিলে তখন মুসলমানদের ওপর জুলুম শাসন চালাচ্ছিল। তাই তিনি স্বাধীনতার কবি না হয়ে 'বিদ্রোহী' হিসাবে আখ্যায়িত হলেন। যেমন ১৮৫৭ সালের ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বাধীনতা যুদ্ধ —স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত না হয়ে আখ্যায়িত হয়েছে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে।

প্রেস, প্রকাশনা শিল্প ও সংবাদপত্র ছিল পুরোপুরি হিন্দুদের দখলে। বাংলা ভাষাটাকেও তারা একশো বছরের মধ্যে হিন্দুয়ানী ঢংয়ে তৈরী করে ফেলেছিল। তার ইতিপূর্বেকার ছশো বছরের ইসলামী ও মুসলমানী ঐতিহ্য অবদান ও অংশ গ্রহণকে একেবারেই কেটে বাদ দিয়েছিল। মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে বাংলার সাধারণ মানুষ যে সরল স্বচ্ছন্দ ভাষায় কথা বলতো [অন্তত কালিপ্রসন্ন সিংহের হুতুম পেঁচার নকশায় তার কিছুটা নমুনা পাওয়া যাবে] তাকে বাদ দিয়ে মৃত সংস্কৃতের তরজমা করে সাহিত্যে একটি নতুন ভাষার উদ্ভব ঘটানো হলো। একশো বছর ধরে তার একতরফা ব্যাপক চর্চা, বিশেষ করে ছাপাখানার আবির্ভাব তাকে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদির

www.pathagar.com

বাংলা তরজমা করে তার নাম রাখা হলো বাংলা ব্যাকরণ। ফলে সংস্কৃত ভাষা হয়ে গেলো বাংলা ভাষার উৎস এবং আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দ হয়ে গেলো বিদেশী ভাষা। অথচ হাজার বছর আগের চর্যাপদেও সংস্কৃতের দৌরাত্ম্য তেমন দেখা যায় না যেমন উনিশ শতকের ফোর্ট উইলিয়ামী বাংলায় দেখা যায়।

এই ভাষায় হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শন ও হিন্দু ভাবধারা সহজেই স্থান পেতে পারে কিন্তু ইসলামী ভাবধারা ও মুসলমানী শব্দের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। যেমন 'নামাজ' না বলে বলতে হতো প্রার্থনা। 'আল্লাহ' না বলে বলতে হতো ঈশ্বর বা বিধাতা। 'রসূল' না বলে বলতে হতো প্রবর্তক। অথচ ইসলামী পরিভাষার এই সংস্কৃত তরজমাগুলির অর্থের সাথে ইসলামের দূরবর্তী সম্পর্ক নেই বরং তার তাৎপর্য ইসলামী বিশ্বাসেরই বিরোধী।

এভাবে বাংলার ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষাকে সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে জবরদস্তি খেদিয়ে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র অঙ্গনকে মুশরেকী কায়দায় গড়ে তুললো। মসজিদের 'আজান'ধ্বনি গায়ের জোরে বন্ধ করিয়ে দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা সেখানে কেবল ঘটা করে কাঁসার ঘন্টা বাজাবার ব্যবস্থা চললো। নজরুল ইসলাম এ ব্যবস্থা মেনে নিলেন না। তিনি জানালেন প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি ইসলামী ভাবধারা ও মুসলমানী শব্দকে বাংলায় পুন প্রতিষ্ঠিত করলেন। এটা তাঁর একটি যুগান্তকারী কর্ম। তাঁর কবিতায় ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী দর্শন ও মুসলমানী আচার-অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বাংলায় মুসলমানদেরকে তিনি শুনিয়েছেন জাগরণের বাণী। সত্যিকারভাবে নজরুলের কবিতা ও গান যেভাবে বাংলার দারিদ্র্যপীড়িত ও চরম হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদেরকে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব হয়নি। এটা তাঁর দ্বিতীয় যুগান্তকারী কর্ম। তাঁর তৃতীয় যুগান্তকারী কর্ম হচ্ছে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ এবং এ জন্য জেল-জুলুম-অত্যাচার ভোগ। এটা ছিল তাঁর ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার।

আমরা এখানে শুধমাত্র ইসলাম ও মুসলমানের কথা বললেও নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ব্যাঙ্গ রচনায় সকল ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এটাও তাঁর ঐতিহ্যেরই অংশ। কারণ একজন সত্যিকার মুসলমান সবার জন্য নিজেকে নিবেদিত করে। তাঁর বিশ্ব-মানবতার প্রতিও আহবান আছে। যেখানে জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অবিচার, শোষণ অধিকারহরণ সেখানেই তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ। তাই নজরুল ইসলাম শুধু বাংলার কবি নন, তিনি বিশ্বমানবতার কবি।

www.pathagar.com

নজরুল-কাব্যে নারী

জাহানারা আরজু

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নজরুল তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-ধারায় কখনো উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, কখনো অগ্নিস্রাবী বিসুবিয়াসের ধূম্রউদ্গীরণে প্রমত্ত, কখনো মৃদু হিন্দোলে দোলায়িত।

সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী ধারার এহেন সংমিশ্রণ ও সুসামঞ্জস্য একমাত্র মাইকেল মধুসূদন ছাড়া প্রাচ্যের আর কোন কবির মধ্যে দেখা যায়নি। একথা স্বীকার্য, মাইকেলের কাব্য-প্রকৃতি ও পথ ছিল সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের। উনিশ শতকের মধ্যাহ্ন আকাশে মাইকেল ছিলেন প্রদীপ্ত এক সূর্য—প্রধানত মহাকাব্যের কবি। নজরুল ইসলাম বিশ শতকের সার্থক বিদ্রোহী কবি।

রবীন্দ্র-প্রতিভাব বহুমুখী সর্বগ্রাসী যাদুমন্ত্রে যখন বাঙালী কবি মানস সম্মোহিত, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বকীয়তায় বিচ্ছিন্ন, বিস্ময়কর এক সত্তা নিয়ে নজরুলের আবির্ভাব। তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল নির্ভীক প্রাণের দৃপ্ত ঘোষণা :

বল বীর —
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির!
(বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা)

নজরুলের নতুন বিদ্রোহ-চেতনার পৃথিবীতে যুগযুগ লাঞ্ছিত নারীত্বের এক নবতর জয় ঘোষিত হলো। যে শোষণ-পীড়ন ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল-কাব্য উদ্যত খড়্গস্বরূপ সেখানে নারীর অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যুগের পর যুগ সমাজ, সংস্কার, ধর্ম ইত্যাদির নাম করে নারীসমাজের বুকের উপর যে বঞ্চনা ও নিপীড়নের কালো পাথর চাপা রয়েছে তার হিসেব নিলে দেখা যাবে, নারীই এই সামাজিক অবিচারের মুখ্য শিকার।

www.pathagar.com

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নারীর আলেখ্য যেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেখানে নারী দেবী, মায়াবিনী, কুহকিনী। তার স্বতন্ত্র সত্তার কথা দূরে থাক সেখানে তার মানবী সত্তার মৌলিক দাবীই স্বীকৃত হয়নি; নারী সেখানে পুরুষের স্বপ্নাদিষ্ট অলৌকিক দেব-দেবীর খেয়াল-খুশীর ক্রীড়নক! মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রেমীসত্তার প্রকাশ হয়েছিল বৈষ্ণব কাব্যের অথৈ ভাব-সাগরে 'কানুপ্রেমে পাগলিনী'র 'ঘর কহীনু বাহির, বাহির কহীনু ঘর'— এবং চণ্ডীঠাকুরের করুণাশ্রিতা রজকিনীর রভস অভিসারিণীরূপে। এ যুগের গোড়ার দিকে মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে বিশেষ করে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় কবি অনেকটা মানবীয় সত্তার আবেদন এনেছিলেন, যা ছিল সে যুগে অকল্পনীয়। দৌলত কাজীর' 'লোর চন্দ্রানী' এবং 'সতীময়নাতে'ও নারী অনেকটা তার বাস্তব রূপে প্রকাশিতা। কিন্তু নারী-চরিত্র সেখানেও পরিপূর্ণ মানবিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তুলনামূলকভাবে উত্তরমধ্যযুগের গাথা-সাহিত্যে, বিশেষ করে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মধ্যে নারীর প্রেমী ও সাংসারিক সত্তার বিকাশ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে মাইকেলের কাব্যে নারীসত্তার প্রকাশে যুগপৎ বীররস, করুণরস ও প্রেমরসের সংমিশ্রণ দেখতে পাই। বীরাঙ্গনা ও প্রেমিকারূপের উপস্থিতিতে মাইকেল-কাব্যে নারী-চিত্র উজ্জ্বল। সনাতন ভারতীয় আদর্শ এবং পশ্চিমের আধুনিক নারী স্বাধীনতার আদর্শে সে-সব নারী-চরিত্রের সৃষ্টি। এরই উত্তরসূরী হিসেবে মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যে ও নারী চরিত্রে বীররস, প্রেমরস, করুণরসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কায়কোবাদের গীতিকবিতায় মানবীয় আবেদন লক্ষণীয়। নারী সেখানে হাসি-কান্না ও প্রেম-বিরহে একান্ত নারী। 'অশ্রুমালা' কাব্য তারই স্বাক্ষর বহন করছে। তবে একথা সত্য যে, কায়কোবাদ উনিশ শতকের কাব্যধারাকেই বহন করেছেন। তাঁর কবিতার দেহে ভাব ও ভাষায় বিশশতকের তিলমাত্র চরিত্র-লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিহারীলালের হাতে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জন্ম। বৈষ্ণব কাব্যের চটুল বিষয়, ভাব ও ভঙ্গী অনেকটা উত্তীর্ণ হয়েও তিনি নারী-বন্দনা করতে গিয়ে দেবী আরাধনা ত্যাগ করতে পারেননি। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে তাই আমরা দেবী ও মানবীরই সনাতন সংমিশ্রণ দেখতে পাই। 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সাধের আসন' কাব্যে কবি নারী-চরিত্র-চিত্রণে অনেকটা স্বচ্ছ :

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার
যে ক'দিন বাঁচি তবু গো নারী,
উদার মধুর মুরতি তোমার
যেন প্রাণ ভরে আঁকিতে পারি।
(বঙ্গ সুন্দরী)

এ পর্যন্ত কবি-সাহিত্যিকগণ নারীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় নীরব, নির্লিপ্ত দর্শক হয়ে এসেছেন, তার অবস্থার প্রতিকারের কোন সোচ্চার দাবী জানাতে পারেননি। এ অভিশাপের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে মাথা তুলে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, রাজা রামমোহন,

www.pathagar.com

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। পাশ্চাত্য মানবতাবাদের প্রেরণায় এঁদের সাহিত্যে নারী ও পুরুষের দুটি স্বাধীন সত্তার কথা স্বীকৃত হ'ল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রে নারীসত্তার মুক্তি সাধনের যে প্রাথমিক প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, তারই পরিণতি দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বললেন :

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা—
যাবনা বাসর কক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
(সবলা : মহুয়া)

নজরুল-কাব্যে নারীসত্তার এই স্বাধিকারের দাবী আরো পূর্ণ পরিণত স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু সে স্বীকৃতির চারিত্র্য আলাদা। এর মূল প্রাণশক্তির জন্ম ইসলামের সাম্যবোধ থেকে, যেখানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সমঅধিকারের মৌল ও অলঙ্ঘনীয় দাবী স্বীকৃত, যা আর কোন ধর্মে এতটা দ্ব্যর্থহীনভাবে ধ্বনিত হয়নি। নজরুল তাই সমঅধিকারভিত্তিক নারীসত্তার কল্পনায় এত স্বচ্ছ, নির্ভীক ও সোচ্চার :

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারি, অর্ধেক তার নর।
* * *
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশাথে হয়েছে বধূ
পুরুষ এসেছে মরু-তৃষা লয়ে, নারী জোগায়েছে মধু।
* * *
কোনকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী নারী।
(নারী : সাম্যবাদী)

কবি যখন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় চরম বিদ্রোহের বাণী ঘোষণা করেছেন সেখানেও পাশাপাশি নারীর সৌন্দর্য-মহিমা সৃষ্টি করেছেন। তিনি যে "একহাতে বাঁশের বাঁশরী" আর হাতে "রণ-তূর্য" নিয়ে সাহিত্যের আসরে নেমেছেন— তাঁর কবি-জীবনের সূচনা-পর্বেই সেকথার সত্যতা ফুটে উঠেছে। তাঁর কাব্য-চরিত্রে তাই কঠিন-কোমলের সংমিশ্রণ ঘুরে ফিরে এসেছে :

আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি
ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার

www.pathagar.com

কাঁকন-চুড়ির-কনকন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচুলি নিচোর।
(বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা)

নজরুল জীবন ও সাহিত্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি করেননি, তাঁর কাব্যে নারী অতিমানবীয় সত্তায় আবৃত নয়, নারী তাঁর কাব্যে সমঅধিকারের আসনে আসীন। "স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরী'তে বন্দিনী নারীকে যখন তিনি দাসীত্বের সকল চিহ্ন ফেলে দিয়ে মুক্তির মন্ত্রে ডাক দিয়েছেন, তখন সে নারীকে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তাকে তিনি সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশও দিয়েছেন :

ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুঁড়ি,
আঁধারে তোমারে পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্নচুড়ি।
যে ঘোমটা তোমারে করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন যেথা যত আভরণ।
(নারী : সাম্যবাদী)

রবীন্দ্রনাথেও নারীর প্রেম-শক্তি সাধনার বিকাশ দেখেছি। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য-নাট্যে এই সবল প্রেম-শক্তির অধিকারিনী নারীকে দেখতে পাই,— যে নারী শুধু পুরুষের ছায়ানুরাগিনী বাঞ্ছিতা সৌন্দর্য-প্রিয়া নয়, যে পুরুষের কঠিন জীবন-সংগ্রামের সমগামী হতে চায়—

পূজা করি রাখিবে মাথায়
সেও আমি নহি,
অবহেলা করি রাখিবে পিছনে
সেও আমি নহি
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সঙ্কটের দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।
('চিত্রাঙ্গদা')

যে পটভূমিতে নজরুল-কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে, সে যুগ ছিল যুদ্ধ, বিপ্লব, পরাধীনতার এক ধ্বংসোন্মুখ মুহূর্তে। দেশের আকাশ-বাতাস তখনকার বারুদের ঘ্রাণে শ্বাসরুদ্ধ, পায়ের নীচের মাটিতে জরাজীর্ণ মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা, আর্তের হাহাকার—এই পটভূমিতে তাঁর কাব্যে নারী চরিত্রের সৃষ্টি। সে নারী তাই বিদ্রোহিনী স্বাধিকার ও সংগ্রামের বিশেষ বৈচিত্র্যে ও মহিমায় মহিমান্বিতা। এই নতুন নারীসত্তার উদ্বোধনে কবি সব রকম উদ্দীপক উপমা ও চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন :

www.pathagar.com

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন,
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারী ঝনন্-ঝন্!
(রক্তাম্বর ধারিণী মা: অগ্নিবীণা)

সমাজ-ব্যবস্থার চাপে দু:খদরিদ্র্য ও অবমাননার সাথে নিয়ত সংগ্রামে পরাজিতা যে নারী, সমাজের চোখে সে ভ্রষ্টা হলেও দরদী কবির অন্তরের বেদনা তার জন্যেও সমপরিমাণে উৎসারিত। মানুষের গড়া সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাই তাঁকে প্রচন্ড বিক্ষোভে বলতে শুনি :

কে বলে তোমারে বারঙ্গনা মা কে দেয় থুথু ও গায়ে?
হয়তো তোমারে স্তন্য দিয়াছে সীতা সম সতী মায়ে।
নাই হলে সতী তবুও তোমরা মাতা ভগিনীর জাতি;
তোমাদের ছেলে আমাদের মত তারা আমাদের জ্ঞাতি।
(বারাঙ্গনা : সাম্যবাদী)

কবি বিদ্রোহী এবং প্রেমিকও। এবং স্বভাবতই প্রেমিকই জয়ী হয়েছে। তাই এক সময় দেখতে পাই বিদ্রোহী কবির রক্ত-আঁখি অশ্রুভারে আনত, তার সকল বিদ্রোহ প্রিয়তমার পায়ের কাছে লুটিয়ে ধন্য। সারাজীবনের বিদ্রোহ এক প্রশান্ত সমাপ্তিতে সমর্পণের আনন্দে ভরপুর :

হে মোর রাণী ! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণতলে এসে।
(বিজয়িনী : ছায়ানট)

নজরুল-কাব্যের কঠোর কোমলের যে বৈপরীত্য– সে বৈপরীত্যে তাঁর সৃষ্ট নারী অনন্যা। কোথাও সে হৃদয়-রাজ্যের একক সম্রাজ্ঞী, কোথাও বিরহ-বিধুরা প্রিয়া, কোথাও সলাজ বধু, কোথাও কম্পিতা কুমারী, কোথাও মমতাময়ী মা। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নারী চরিত্র-চিত্রণে দার্শনিক তত্ত্বের ভারে বা স্তরের বাহুল্যে নারীর প্রকৃত স্বরূপ চাপা পড়েনি। তাতে যে চিত্রকল্প এবং দার্শনিক মতবাদ এসেছে, তা নারীর সৌন্দর্য, ত্যাগ ও প্রেমকে মহিমাই দান করেছে। প্রাণহীন প্রতিমার বদলে রক্তমাংসের মানবীই ধরা দিয়েছে সেখানে। কবির 'অ-নামিকা' কবিতাটিতে একথার তাৎপর্য মিলবে। কবি যদিও 'অ-নামিকা'র প্রথম দিকে বলেন :

অনন্তযৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনাসংগিনী
তোমারে বন্দনা করি—

কিন্তু পরে আবার তাঁকেই বলতে শুনি যা' পুরুষের চিরন্তন আবেদন নারীর কাছে,—

www.pathagar.com

প্রিয়া হয়ে এলে প্রেমে, বধূ হয়ে এলে না অধরে
দ্রাক্ষাবুকে রহিলে গোপনে তুমি শিরীন শরাব
পেয়ালায় নাহি এলে!

(অ-নামিকা : সিন্ধু-হিন্দোল)

মানবিক সত্তার প্রেম-বিরহের নিখুঁত ছবি হয়ে অসংখ্য নারীচিত্র তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে :

এই চরণ সে বক্ষে চেপে
চুমেছে, আর দু'চোখ ছেপে
জল ঝরেছে, তখনো মা কইনি কথা অহঙ্কারে,
এমনি দারুণ হতাদরে করেছি মা বিদায় তারে।
(অবেলার ডাক : দোলনচাঁপা)

ঐ রাঙাপায়ে রাঙা আলতা প্রথম যেদিন পরেছিলে,
সেদিন তুমি ভুলেও কিগো আমায় মনে করেছিলে?
আলতা যেদিন পরেছিলে?

(আলতাস্মৃতি : ছায়ানট)

এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া,
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই! আমার স্বপনে
তুমি নিখিল রূপের রাণী মানস-আসনে।

(এ মোর অহঙ্কার : জিঞ্জীর)

আবার যখন শিউলি ফুলে
ভরবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে ফুল গাঁথতে মালা
কাঁপবে তোমার কঙ্কন—
কাঁদবে কুটীর অঙ্গন।

(অভিশাপ : চক্রবাক)

আমার কিসের সজ্জা, কিসের লজ্জা, কিসের পরাণ পণ?
মাগো বক্ষে আমার বিশ্বলোকের চিরচাওয়ার ধন!

(মুখরা : দোলনচাঁপা)

তুমি মলিন বাসে যখন থাক সবার চেয়ে মানায়!
তুমি আমার তরে ভিখিরিনী, সেই কথা সে জানায়।

(সাধের ভিখারিনী : দোলনচাঁপা)

www.pathagar.com

আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা
ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা।
(ভীরু : জিঞ্জীর)

নজরুল কাব্য-মানস এই বিচিত্ররূপিনী নারীর প্রেমের আগুনে যেন নিখাত সোনা হয়ে উঠেছে। তাই তাঁরই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি :

তুমি আমায় ভালবাস তাইত আমি কবি,
আমার এ রূপ সে যে তোমার ভালবাসার ছবি।
(কবিবাণী : দোলনচাঁপা)

মাতৃত্বের বিকাশেই যে নারীর সার্থক রূপায়ণ। তার বক্ষকুলায় যে আশ্রয়ের নিবিড়তা, স্নেহ-আতপ্ত বুকে যে সদা হারানোর ব্যাকুলতা— তা অনেক কবিতায় রূপ পেয়েছে :

'মা' 'মা' ডেকে দাঁড়ায় যে এই শক্তিহীনার দ্বারে
মানিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে।
ওরে তাইত ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি,
ওরে আমার হারামণি! ওরে আমার পাখী!
(শায়ক বেঁধা পাখী : ছায়ানট)

'চক্রবাক' নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রেম-কল্পনামূলক কাব্যগ্রন্থ। এখানে কবি-প্রিয়া প্রেমে বিরহে, মানে, অভিমানে এক অনির্বচনীয় রূপ লাভ করেছে। এখানে কবি-প্রকৃতির মধ্যে তাঁর প্রিয়াকে খুঁজে চলেছেন। 'এ হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে' স্মৃতির মন্থনে কবির চিত্ত ভারাক্রান্ত। এখানে তাঁর নারীকল্পনা আরো যেন বেশী অনুভূতিশীল :

তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল রেখা,
তোমার দেহের মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
(বাতায়নপাশে গুবাকতরুর সারি : চক্রবাক)

অথবা—

তুমি কি পদ্মা, হারানো গোমতী, ভুলে যাওয়া ভাগিরথী—
তুমি কি আমার বুকের তলায় প্রেয়সী অশ্রুমতী?
(কর্ণফুলী : চক্রবাক)

অথবা—

পদ্মাতীরে তীরে রাতে আজো খুঁজে ফিরি;
কত নামে ডাকি তোমা,— মহাশ্বেতা শিরী,
লায়লি, বকৌলি, তাজ, দেবী, নারী, প্রিয়া।
(তুমি ভুলিয়াছ মোরে : চক্রবাক)

কবির কাব্যলোকের নারীকল্পনা 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থে এসে ধ্যান-গম্ভীর রূপলাভ করেছে। এখানে এসে কবি যেন পেছনের দিনগুলোতে আর একবার ফিরে তাকাতে চান। এখানেও

www.pathagar.com

আবেগ আছে, উদ্দাম আছে, ব্যথা আছে, কথা আছে— সবার উপরে রয়েছে শিল্পচেতনার প্রলেপ যা এ কাব্যকে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দান করেছে :

জরাগ্রস্ত জাতিরে শোনাই নবজীবনের গান,
সেই যৌবন-উন্মাদ বেগ, হে প্রিয়া, তোমার দান,
হে চির-কিশোরী, চির-যৌবনা! তোমার রূপের ধ্যানে
জাগে সুন্দর রূপের তৃষ্ণা নিত্য আমার প্রাণে।
আপনার রূপে আপনি মুগ্ধা দেখিতে পাও না তুমি,
কত ফুল ফুটে ওঠে গো তোমার চরণ-মাধুরী চুমি'।
(আমার কবিতা তুমি : নতুন চাঁদ)

নজরুল কাব্য-ধারায় এই নারীকল্পনা দেশ-কাল ছাড়িয়ে চিরন্তন নারীসত্তার জয়গান করেছে। নারীর সৌন্দর্য, সাহস, শক্তি, ব্যথা ও ভালবাসার কথা যেখানে যতটুকু পেয়েছেন, তুলে ধরেছেন। তাই 'খালেদে'র জন্য 'বেদুঈন'বালার রোজাক্লিষ্ট মুখখানা এক ঝলকে চিরকালের অক্ষয় ছবি হয়ে আছে :

খর্জুর-বীথি আজিও ওড়ায় তোমার জয়ধ্বজা,
তোমার আশায় বেদুইনবালা আজিও রাখিছে রোজা।
(খালেদ : জিঞ্জীর)

মোহররমের মর্সিয়া ক্রন্দনে চিরকালের আকাশ-বাতাস বিধুর। সেই শোকাতুরা দু'টি নারীহৃদয় যেন ব্যথার তীব্রতায় চির নারীর সব ব্যথা-বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছে— যা ঘরে ঘরে আজো মানুষকে কাঁদায়। একজন পুত্রহীনা, অপরজন সদ্য বিবাহিতা বিধবা :

মা ফাতেমা আসমানে কাঁদে খুলি কেশপাশ,
বেটাদের লাশ নিয়ে, বধুদের শ্বেতবাস।
রণে যায় কাসেম ঐ দু'ঘড়ির নওশা,
মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা।
হায়! হায়! কাঁদে বায় পূরবী ও দখিনা—
কঙ্কন পঁইচি খুলে ফেল সখিনা।
(মোহররম : অগ্নি-বীণা)

সর্বোপরি, কবির কথায় "জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান" হযরত খাদিজার মুখে যখন আত্মপ্রত্যয়ের কয়েকটি কথা শুনি, তখন শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। নজরুল-কাব্যের অক্ষয় পটে এ চিত্র চির-ভাস্বর, চির-উজ্জ্বল :

সাধ্বী পতিব্রতা খাদিজাও কহেন স্বামীর সনে
"দূর কর ঐ লাত্‌মানাতেরে পূজে যাহা সব-জনে,
তব শুভ বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ময়ের দিশা—
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।
(মরু-ভাস্কর)

www.pathagar.com

নজরুলের অজস্র গানে ও গজলে নারীর অপরূপ মনোময় ও গীতিময় রূপ ধরা পড়েছে। নারীত্বের মানবীয় সত্তার বিমূর্ত আবেদনে আর কোন গীতিকারই বোধ হয় এক্ষেত্রে নজরুল প্রতিভাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। দু'চারটি গানের চরণ এখানে দেওয়া গেল :

পূরব দেশের আমি পুরনারী
এনেছি গাগরি ভরি অমৃতবারি,
পদ্মাপারের আমি পদ্মিনী বধূ,
এনেছি শাপলা পদ্মের মধু।
*   *   *
মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী দেব খোঁপায় তারার ফুল,
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল।
*   *   *
কুনাল কি পড়ল ধরা পীযুষভরা ঐ চাঁদো মুখে!
কাঁদিছে নার্গিসের ফুল লাল কপোলের কমল বাগানে।

এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে,
টলমল জল মোতির মালা
দুলিছে ঝালর পলকে।
*   *   *
তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে,
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে।
*   *   *
সাহারার বুকে মাগো তুমি মেঘ-মায়া
তপ্ত মরুর বুকে স্নেহ-তরু ছায়া।

উপমা-উৎপ্রেক্ষার আশ্চর্য প্রয়োগ-নৈপুণ্য নজরুলের নারীকল্পনাকে মোহনীয় এবং মহিমান্বিত করেছে। কত শত টুকরো ছবি এই উপমায় দানা বেঁধে উঠেছে; অপূর্ব মুগ্ধতায় তা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। উপমা-উৎপ্রেক্ষার কয়েকটি টুকরো ছবি দেওয়া গেল:

'আধ ফোটা বউ মউল বউল বোলতা-ব্যাকুল বেলকুঁড়ি'
'মিষ্টি, ধারাল মিছরির ছুরি, মিশরী মেয়ের হাসি'
'আঙ্গুর লতার অলকগুচ্ছ, ডাসা আঙ্গুরের থোপা'
'মুক্তা ফলেছে, আঁখির ঝিনুকে',
'বাঁকায়ে ভুরুর ধনু ফুল-অতনু কুসুম শর হানে'
'মানিনী ঝেঁপেছে মুখ নিশীথিনী কেশে'— ইতাদি।

নজরুল তাঁর কাব্য-বৈচিত্রের রঙধনু আকাশে যে মেঘ-রৌদ্রের ছবি এঁকেছেন, নারী কল্পনায় সে ছবি একাধারে কঠোর, বাস্তব, জীবন্ত, মন্ময় ও মধুর— যা নজরুল কাব্য-সাহিত্যকে স্বমহিমায় চির-সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।

www.pathagar.com

নজরুলের মানব দর্শন

আল মুজাহিদী

বাংলা সাহিত্যে মানব জীবনের শক্তি, গতি ও জয়াশা উচ্চকিত হয়েছে প্রথম, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়। মানুষের 'দ্রোহ চেতনা' মানব দর্শনে স্থাপিত করায় যে অদম্য, অকৃত্রিম বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন তিনি– সে বিশ্বাস অন্তর্ভূমে প্রোথিত হয়েছিলো তাঁর নিজ মাত্রার অস্তিত্ববাদী চেতনার নিরিখেই। তিনি 'মানব-সংক্ষোভ'-কে তাঁর 'চিন্তাসুষমা'র আলোক বিন্দুর ওপর সমান্তরালভাবে সংস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেখানে সুন্দর, যেখানে সত্য, যেখানে কল্যাণ এবং দারুণ দ্রোহ–সেখানেই জন্ম নেয় তার নবতর জীবনবোধের বীজকণা।

'মানব বিশ্বাস' এবং 'মানব অস্তিতি' নজরুল কাব্যের মূল ভিত্তিভূমি এবং এক সুবিস্তীর্ণ দিগন্ত-ও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের দাবানলদাহ্য প্রত্নস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েও তিনি মানুষের অস্তিত্ব ও বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল থেকে সর্বমানবিকতাবাদের বাণীকেই উচ্চকিত করেছেন। যুদ্ধ কিংবা সাময়িক ধ্বংসযজ্ঞ কখনো মানবসভ্যতা ও মানবাস্তিত্বের অমোঘ প্রবাহ ও সোনালি ঐশ্বর্যকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে যেতে পারে– এ রকম কোনো অনিশ্চিতিবোধ কখনোই নজরুলকে পেয়ে বসেনি। মানুষের পৃথিবীতে অ-মানুষের দাপট থাকতে পারে– সেটা একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। সুন্দরের ভুবনে অসুন্দরের আস্ফালন ঘটে যেতে পারে সেটাও সাময়িক, ক্ষণকালীন– এটা নজরুল বিশ্বাস করতেন একান্তচিত্তে।

মানব সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই মানুষ এক 'দ্রোহসত্তার' অধিকার অর্জন ক'রে এসেছে। এ দ্রোহসত্তা তার স্বভাবজাত। স্রষ্টা যেন সৃষ্টিকে না চাইতেই নিজ থেকে এ 'দ্রোহ' অর্পণ করেছেন। এ 'দ্রোহ' মানব জীবনের স্বভাবজ সম্পূরক মাত্র। এর অতিরেক কিছু নয়। কাজী নজরুলের সমস্ত সৃষ্টি কৃতির আলো- উৎস এই 'দ্রোহচেতনা'। যে 'দ্রোহচেতনা'

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে একেবারেই প্রথম। একেবারেই আকস্মিক। আর এ আকস্মিকতার কোনো তুলনা নেই বাংলা কবিতার ইতিহাসে। কাজী নজরুল ইসলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে 'মনুষ্যত্ব বোধ' এবং 'সংস্কৃতি- চেতনা' সংযোগ করেছেন সেটা একেবারেই অবিস্মরণীয় ঘটনা। লাঞ্ছিত, অপহৃত মানবিকতাকে উদ্ধার করে মানুষের ভেতর পুন:প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি যে শৈল্পিক ও নান্দনিক সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন– সেই মহান মানবিক সংগ্রামের দ্রোহে-ই কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী'। মনুষ্যত্বের জন্যে, মানবিকতার বিপুল বৈভব অর্জনের জন্যে তিনি তাঁর লেখনীকে সংগীনে পরিণত করেছিলেন। মসিকে অসি ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। কবি মায়াকভস্কি বলেছেন, 'I want my pen to be equated with the beyonets.' নজরুল তাঁর কালের দেয়ালে উজ্জীবিত যে সমকালীনতা উৎকীর্ণ করেছিলেন কালের দেয়াল থেকে তার সে সৃষ্ট কালজ ঐশ্বর্যকে কখনো ঝেড়ে ফেলে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ নজরুল মানব জীবনের সম্যক সংক্ষোভ প্রবণতাকে স্থান দিয়েছেন তাঁর কবিতায়; সে সংক্ষোভ প্রবণতা সমকালীন হলেও কালোত্তীর্ণ– অর্থাৎ কালজ হয়েও কাল অতিক্রমকারী সর্বজনীন, সর্বকালীন মানবদ্রোহ প্রবণতা। কাজী নজরুল ইসলাম এক অর্থে সমকালীন। কিন্তু সকল অর্থে সর্বজনীন, বিশ্বজনীন।

সমকালীন সত্যের পাশ কাটিয়ে কেবল কল্পনার গজদন্ত মিনারের চূড়ে ব'সে কাব্য চর্চা– মানুষের হৃদয়ের অন্ত:স্থল কতটা স্পর্শ করতে পারে সেটা বিবেচনার বিষয়। মানুষ তার সময়, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাহলে পর সভ্যতা ও প্রগতি থেকেও বিচ্যুত হয়ে পড়বে সে। সভ্যতার, ইতিহাসের ভাঙচুর ও মোড় ফেরানো পাশগুলো এড়িয়ে একজন কবি একাকি, নি:সঙ্গ, অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট কোন্ নির্জন পথে যাত্রা ঘেরাটোপ ডিঙ্গিয়ে জীবনের মর্মবস্তু খোঁজ করেছেন। এ অনিষ্ট তার একার নয়।

অনেকের, অধিকাংশের। বৃহত্তর মানব জনসমষ্টির। কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার ভেতর যৌবনের জঙ্গমতা এবং পৌরুষের পল্লবতা সন্ধান করেছেন।

> জাগো দুর্মদ যৌবন! এসো তুফান যেমন আসে,
> সুমুখে যা পাবে দ'লে চ'লে যাবে অকারণ উল্লাসে;
> আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
> কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।
> বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণ-খোলা হাসি,
> স্বাধীনতা পরে হবে– আগে গাও "তাজা ব-তাজার" বাঁশী!
>
> ....
>
> সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরি চূড়ে
> বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে!
> ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বদ্ধ সংস্কার,

www.pathagar.com

মরিচা ধরিয়া প'ড়ে আছ সব আলির জুল্‌ফিকার।
জাগো উন্মাদ আনন্দে দুর্মদ তরুণেরা সবে,
নাইবা স্বাধীন হ'ল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে!
(দুর্বার যৌবন: নতুন চাঁদ)

নজরুলের মানুষ 'বড়' এবং মহীয়ান। তাঁর মানুষ– জরাজাড্যহীন জঙ্গম মানুষ। কোনো বিশেষ 'জাতের' মানুষ নয়। সকল জাতের মানুষ। সকল ধর্মের মানুষ। সকল বর্ণের মানুষ। কোনো বিশেষ ধর্ম দিয়ে, জাত দিয়ে, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দিয়ে মনুষ্যত্বকে আড়ষ্ট করা যায় না। এই সাম্প্রদায়িক ঘোরে নজরুল কখনো কোনভাবেই আড়ষ্ট কিংবা আচ্ছন্ন হননি। তিনি খোলা রেখেছিলেন তাঁর অক্ষিকোটরের স্বর্ণকান্ত মণিদু'টো আর হৃদয়ের অতল-পাথার। মানুষকে স্পর্শ করার জন্য যে অতলান্ত হৃদয়ের প্রয়োজন সে হৃদয়-জলধি নজরুলের ছিল। জীবনের বিশাল বারিধি-বক্ষে তিনি সবসময়ই বেয়েছেন উজান-বৈঠা। তাঁর জলযান ছিল হৃদয়মন্থিত রসদে পরিপূর্ণ। নজরুল জীবনের জন্য জীবন-সত্তার গূঢ়ার্থ খুঁজেছেন। জীবনের জন্য আহরিত মনুষ্যত্বকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। 'মসজিদকে' বড় করে 'মন্দিরকে' ছোট করেননি তিনি। 'মন্দির'কেও বড় করে 'মসজিদকে' ছোট করেননি কখনো।

নজরুলের মানব দর্শনে– আবহমানকালের মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নটি চারিয়ে উঠেছে। তিনি জাত-পাতের সকল স্থূলতা, সংকীর্ণতা এবং কাল-পরিসরতা বর্জন করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন মানুষকে। মনুষ্যত্বের ভিতটি কখনো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার আস্তর দিয়ে গড়ে তোলা যায় না। 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন :

> হিন্দু-মুসমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি। তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল।... হিন্দু-মুসলমান পাশপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে– 'বাবাগো' 'মাগো'! মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে! দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির-কলঙ্কিত হইয়া রহিল। ভুতে-পাওয়ার মত ইহাদের মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদের মস্‌জিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দু:খ-ভোগ করিতে হইবে।.... মানুষের পশুবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্মান্ধদের কত কাপুরুষ না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল!" (রুদ্র-মঙ্গল)

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার প্রথম সার্থক রূপকার– সাম্প্রদায়িক ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি ও সংস্থিতি স্থাপনের। তিনি মানবজাতির ভেতর ধর্মের ফারাক খোঁজেননি। হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান এসব জাতিগত বেষ্টনি ও বন্ধনী অতিক্রম ক'রে সকল জাতির ভেতর যে মানবিক সংস্কৃতি অবস্থান ক'রে সেই সুন্দর, সুষমা-সঞ্জাত ভূখণ্ডটি আবিষ্কার

www.pathagar.com

করতে চেয়েছেন। এবং বিশ্বমানব সংস্কৃতির প্রতিনিধি হ'য়ে পৃথিবীর দরোজায় দরোজায় পরিভ্রমণ করেছেন। বিশেষ ক'রে তদানীন্তন ভারতবর্ষে বিশ্বমানব ঐক্যবাদের (Pan humanism) অন্তর্লীন বাণীই প্রচার করেছেন। ধর্ম যেখানে জীবনাচরণের পরাকাষ্ঠা– সেই ধর্মকে ক্ষুদ্র, স্বার্থান্ধ অভিধায় বন্দী ক'রে রাখতে যে ধুরন্ধর মানুষেরা একটুও বিচলিতবোধ করে না– তাদের বিরুদ্ধে নজরুলের শাণিত খড়গ-কৃপাণ উদ্যত ছিল। ধ্বংসের বিপরীতে সৃষ্টি, অকল্যাণের বিপরীতে কল্যাণ আর অসাম্যের বিপরীতে সাম্যের জয়গাঁথা রচনা করেছেন নজরুল। এ মানব দর্শনে তিনি উজ্জীবিত ও উচ্চকিত।

> "মহামারী, মারীভর, ধ্বংস আমাদের উল্লাস। রক্ত আমাদের তিলক, রৌদ্র আমাদের করুণা। এরই মাঝে আমাদের নবসৃষ্টির অভিনব তপস্যা শুরু হবে। এস আমার সূর্য-তাপস তরুণের দল। সান্ধ্য-শ্মশান আর গোরস্থান আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনী, আলেয়া আমাদের সান্ধ্য-প্রদীপ, মড়াকান্না আর পেচক-শিবাদির আমাদের মঙ্গল হুলুধ্বনি। মরীচিকা আমাদের লক্ষ্য, আঘাত আমাদের আদর, মার আমাদের সোহাগ। সর্বনাশ আমাদের স্নেহ, বজ্র-মার আমাদের আলিঙ্গন। উল্কা আমাদের মালা-খসা ফুল, সাইক্লোন আমাদের প্রিয়ার এলোকেশ। সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার, অনন্ত নরক-কুঞ্জ। এই অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালানো রুদ্র-চুল্লির মধ্যে বসে তোমাদের নবসৃষ্টির সাধনা করতে হবে। তোমাদের এই রুদ্র-তপস্যার প্রভাবে সকল নরকাগ্নি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, যেমন 'ইবরাহীমের' পরশে 'নমরুদের' জাহান্নাম ফুল হয়ে হেসে উঠেছিল। এস আমার অভিনব তরুণ তপস্বীর দল। তোমাদের ধ্বংসের আহ্বান করছি। এস।"
>
> ['আমরা লক্ষীছাড়ার দল' : দুর্দিনের যাত্রী : নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)]

মানুষের পৃথিবীতে মানুষের নবসৃষ্টির তপস্যা করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করার নেই। মানব সমাজের মধ্যে তরুণ সম্প্রদায়কে সূর্য-তাপস হিসেবে আহ্বান করেছেন তিনি। তারা যেন নবজাগরীর বেশে ঘুমন্তদের জাগিয়ে তুলতে পারে সেই উদাত্ত আহ্বানবাণী ব্যক্ত করেছেন নজরুল। নজরুল মানব দর্শন গণ-চেতনার দর্শন। গণমানস জাগ্রত করার দর্শন। আমরা লক্ষ্য করবো, গণচেতনা ইতিহাস চেতনার পরিপ্রেক্ষিতটিকে মানুষের দৃষ্টির পরিসরকে পরিব্যাপ্ত করে গেল। এখানে একটি উদ্ধৃতি তুলে দেয়া আবশ্যক মনে করি।

> "যাঁহারা নজরুলকে শুধুই বিদ্রোহীরূপে, Intellectual. anarchist (বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসবাদী) রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা নজরুল-কাব্যে গণচেতনার প্রকাশকে পরিষ্কাররূপে বুঝেন না। সর্বত্রই তাহারা লক্ষ্য করেন একটা বাঁধনহারা, ভাঙনপ্রিয়, দুর্দশ সন্ত্রাসবাদীর অস্থির পদচারণা, নিষ্ফল আক্রোশ ও অত্যাচারীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার দুর্বার বাসনা।.... জাতীয়

www.pathagar.com

সামাজিক জীবনে গণশ্রেণীর অসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার যে ক্ষমতা গণচেতন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য এবং 'গণ'কে সমাজের প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষ করা যে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, সেইদিক হইতে নজরুল কাব্য কতদূর গণচেতন সাহিত্যের মর্যাদা পাইতে পারে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নাই, তাহা কেহ জানিতেও চেষ্টা করেন না। ইহা নজরুল সাহিত্য তথা নজরুলের প্রতি একটা চরম অবিচার।"
['নজরুল কাব্যে গণচেতনা' : সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়]

নজরুলের জীবনদর্শন মানব দর্শনের একটি মহৎ ভূমিকা। যে ভূমিকার ঐতিহাসিকতা আছে। মানব জীবন সংগ্রামের ধারাবাহিক পরম্পরা আছে। এ পারম্পর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে তাঁর মানব জীবন দর্শনের মূল সূত্রটি খুঁজে বের করা সহজতর হবে। আত্মবিশ্বাসী না হ'লে কোনো মানুষই জীবনের সন্ধান করতে পারে না। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করাও তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। নজরুল বলছেন :

"আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি– কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই, – আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তার জন্যে ঘরে বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত, আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্মউপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাঁটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।"
[রাজবন্দী : নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)]

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নিজের ভেতরকার 'মানুষটির' ওপর গভীর বিশ্বাস রাখতেন। যে বিশ্বাস থেকে তিনি তাঁর সমাজ মানবসত্তা এবং বৈশ্বিক মানবসত্তার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবির আত্মামূলত সত্য দ্রষ্টা ঋষির আত্মা। যিনি সত্য দ্রষ্টা হয়ে যেতে পারেন– তিনিই শেষত: সত্য দর্শনের মালিক, অধীশ্বর। নজরুল সেই শিল্পিত, সাত্যিক সম্বোধি অর্জন করেছিলেন– তাঁর মানব দর্শনের অভিজ্ঞতায়।

www.pathagar.com

নজরুলের গদ্যসাহিত্য

অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কবি হিসাবেই সমধিক খ্যাত। নজরুল ইসলামের নামের আগে 'কবি, 'বিদ্রোহী কবি' ইত্যাদি অভিধা প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। মূলত: তিনি কবি ছিলেন। তাই তাঁর প্রধান পরিচয় কবি হিসাবেই। সাহিত্যের আদিতম এবং সম্ভবত: সমৃদ্ধতম শাখাও কবিতা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার বিকাশ ঘটেছে পরবর্তীকালে, বলা যায়, আধুনিককালে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার বিকাশ ঘটার পর দেখা গেছে, প্রকৃত কবিরা শুধু কবিতা চর্চাতেই তৃপ্ত থাকেননি, সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় কমবেশী পদচারণা করেছেন এবং কবিতার ক্ষেত্রে যেমন অন্যান্য শাখায়ও তেমনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ মূলত: কবি। কবি হিসাবে তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যে নন; বিশ্ব-সাহিত্যেও অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। কিন্তু কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য সকল শাখায় তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ছোটগল্প, প্রবন্ধ উপন্যাস, নাটক, পত্র-সাহিত্য ইত্যাদি সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় তাঁর সাফল্য অনন্যতুল্য।

কাজী নজরুল ইসলামও বাংলা সাহিত্যের তথা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর বিচরণ ছিল সহজ, স্বচ্ছন্দ। নজরুলের এসব রচনাবলী মোটামুটি নিম্নরূপ :

এক— গল্প
দুই— উপন্যাস
তিন— নাটক
চার— প্রবন্ধ
পাঁচ— কথিকা
ছয়— সম্পাদকীয়
সাত— পত্র-সাহিত্য
আট— অভিভাষণ

www.pathagar.com

কোন কোন গবেষকের মতে কবি নজরুল ও গদ্যশিল্পী নজরুলের সৃষ্টিসম্ভার সংখ্যার দিক দিয়ে প্রায় সমান। নজরুলের গদ্য বিষয়ক একটি গবেষণাগ্রন্থে নজরুলের ৪২টি কাব্যগন্থের পাশাপাশি ৪১টি গদ্যগ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। (দ্র. ডক্টর সৈকত আসগর/নজরুলের গদ্য রচনা: ভাবলোক ও শিল্পরূপ)। তবে এ তালিকা কতটা সম্পূর্ণ সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। নজরুলের গান যেমন এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তাঁর অন্যান্য সকল লেখার ক্ষেত্রেই অনুরূপ ধারণা পোষণ করা চলে।

নজরুলের গদ্য রচনা সম্পর্কে ,দু'জন সমালোচকের দু'টি মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নজরুল যে প্রধানত: কবিতা তাঁর গদ্যের ভাষাতেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপরোক্ত গ্রন্থে ডক্টর সৈকত আসগর তাই বলেছেন: 'তাঁর গদ্য কবির গদ্য, তিনি গদ্যের কবি'। গদ্য–শিল্পী হিসাবে তাঁর ভাষা ও আঙ্গিকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নতুনত্বের ছাপ বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও গদ্যশিল্পী হিসাবে তাঁর যে কৃতিত্ব তা তাঁর কবি-কৃতির তুল্য নয়। কবি হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব ও সাফল্য কেবল অসাধারণ নয়; অনন্য। তাই নজরুল সম্পর্কে আলোচনা মানেই তাঁর কাব্য কৃতির আলোচনা, তাঁর গদ্য বা অন্যান্য রচনা সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। অথচ তাঁর অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান মোটেই নগণ্য বা কিঞ্চিৎ নয়; বরং অনেকের তুলনায়ই তা অসাধারণ ও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। নজরুলের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও তাঁর সম্যক মূল্যায়নের জন্য এগুলোর যথাযথ আলোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

নজরুলের গদ্য-রচনা সম্পর্কে অন্য আর একটি মন্তব্য অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। এটিও তাঁর গদ্য-ভাষা সম্পর্কে। নজরুলের কাব্য-ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে অসংখ্য আরবী-উর্দু-ফার্সী-তুর্কী শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। এটি নজরুলের কাব্য-ভাষার এক অনন্যতুল্য বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণ সৌন্দর্য। এতে যেমন ওজস্বিতা সৃষ্টি হয়েছে তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাঙালী মুসলমানের জীবন ও আর্তিও অতিবাস্তব ও জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। মূলত: এটা আধুনিক বাংলা-কাব্যে একান্তভাবে নাজরুলিক কবি-ভাষা হলেও বাংলা-কাব্যে এটা সম্পূর্ণ অভিনব নয়। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলের শুরু থেকেই (১২০১ ইসায়ী) বাংলা ভাষার সাথে অসংখ্য আরবী-ফার্সী-তুর্কী-উর্দু শব্দের মিশ্রণ ঘটে বাংলা ভাষাকে সুসমৃদ্ধ করে তোলে। এ ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থরাজিও রচিত হয়। মূলত: উনবিংশ শতকের শুরুতে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃতপ্রধান, আরবী-ফার্সী-তুর্কী-উর্দু শব্দ বিবর্জিত কৃত্রিম বাংলা ভাষা চালু হবার পূর্ব পর্যন্ত এটাই ছিল প্রকৃত বাংলা ভাষা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালী কবিই এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। নজরুল সেই সনাতন বাংলা ভাষাকেই আশ্রয় করলেন। বলা বাহুল্য, নজরুলের জন্য কাব্য-ভাষা মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ অনুসৃত নয়, নজরুলের অসাধারণ সৃজন-প্রতিভার গুণে তা একান্তভাবে নাজরুলিক।

www.pathagar.com

কিন্তু নজরুলের গদ্য রচনায় আশ্চর্যজনকভাবে এ বিশিষ্ট ভাষা-রীতির প্রায় অনুপস্থিতি সচেতন পাঠককে অনেকটা বিস্ময়াভিভূত করে। বিশিষ্ট কবি-সমালোচক আবদুল কাদিরের ভাষায়: 'মুসলমানী বাঙ্গালায় তাঁর কোন দ্য রচনা নেই।' আবদুল কাদির তাই অনেকটা আক্ষেপের সুরেই বলেছেন : 'নজরুল যদি তাঁর জবরদস্তিহাতে 'আলালী' গদ্যের বিকাশ সাধনে উদ্যোগী হতেন, তবে হয়তো বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও মুসলমানী বাঙ্গালার প্রবেশ সুঠাম হতো, নজরুল সে প্রয়াস করেননি। [দ্র. আবদুল কাদির/যুগ কবি নজরুল)।

'মুসলমানী বাঙ্গালা'র 'সুঠাম' অবয়ব লাভ না করলেও নজরুলের গদ্য-ভাষা হয়েছে একান্তভাবে কবির ভাষা এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য অবশ্যই চোখে পড়ার মত। প্রাজ্ঞ সমালোচক আবদুল কাদিরের মতে, তাঁর গদ্যের ভাষা যেমন 'কবিত্বময় তেমনি ব্যঞ্জনাময়। অনুপ্রাস ও উপমা এ গদ্যকে দিয়েছে কবিতার লালিত্য ও সুরঝংকার। (দ্র. ঐ)।

নজরুলের প্রথম দিককার কবিতার চেয়ে তাঁর গল্পগুলো ছিল অধিক জনপ্রিয়। অবশ্য তাঁর এ সময়কার গল্পগুলোতে নানা ক্রটি-বিচ্যুতি, অসংযম ও ভাবের অপক্কতা ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর পরিণত বয়সের কয়েকটি গল্প অবশ্য এসব ক্রটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা থেকে বহুলাংশে মুক্ত এবং সেগুলো নজরুলকে ছোটগল্প লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে দেয়। নজরুলের ছোটগল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সেগুলো একান্তভাবে জীবনবাদী, জীবন-বাস্তবতা ও জীবন-অভিজ্ঞতা কবিত্বময় ভাষা ও আবেগ-মধুরতার সাথে প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে। তাই পাঠকের মনকে তা সহজেই আপ্লুত ও আকর্ষিত করে।

নজরুলের প্রকাশিত প্রথম লেখা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ (১৯১৯ সালের মে) সংখ্যা মাসিক 'সওগাতে' ছাপা হয়। এটি খুব একটা উন্নত মানের গল্প না হলেও 'কাহিনী বলার অনুপম ভঙ্গী, রস-উদ্রেককারী ভাষা এবং অভিনব উপমা' ব্যবহারের কারণে 'মুসলিম মানসে তা পরম বিস্ময়ের সঞ্চার করে। (দ্র. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ ঐ)। নজরুল তখন সৈনিক হিসাবে করাচী অবস্থান করছিলেন। করাচীতে বসেই তিনি তাঁর এ আত্মজৈবনিক ধরনের গল্পটি লেখেন। এতে তাঁর ছন্নছাড়া জীবনের কথা, দু:খ-বেদনা ও নানা বাস্তব অবস্থা ও বিষয়ের বর্ণনা আছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ১৩২৪ সালে (১৯১৭ ইসায়ী) রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজস্কুলে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রথমে নওশেরাতে ট্রেনিং লাভ করেন। তারপর করাচীতে ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে যোগদান করেন। সেখানে অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর কর্মদক্ষতার বলে ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার-মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হয়ে সৈন্যদলের রসদ ও ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ সময় বাঙালী পল্টনের জনৈক পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের সান্নিধ্যে এসে 'দিওয়ানা-ই-হাফিজ', 'মসনভী রূমী' প্রভৃতি সাহিত্যের বিশ্বখ্যাত ক্লাসিক গ্রন্থরাজি পড়ার সুযোগ লাভ করেন। এতে তাঁর জ্ঞানের প্রসারতা, কবি-কল্পনা ও মানস-পরিমণ্ডলের অসাধারণ ব্যাপ্তি ঘটে। ছোটবেলায়

www.pathagar.com

তিনি মক্তবে চাচার নিকট আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। করাচীতে পাঞ্জাবী মৌলভীর নিকট ফার্সী ভাষার জগৎ-বিখ্যাত গ্রন্থরাজি অধ্যয়নে তাঁর কোনই অসুবিধা হয়নি। ফলে কালজয়ী মহৎ সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তিনি এক অপরিসীম আনন্দ ও ঔৎসুক্য নিয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ফার্সী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর বিশ্বজনীন কবিতা-সত্তার বিকাশ সাধনে এ সময়কার অভিজ্ঞতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

করাচীতে বসেই নজরুল ফার্সী কবি হাফিজের একটি সুবিখ্যাত গজলের মূল ভাবধারা নিয়ে তাঁর 'সালেক' গল্পটি রচনা করেন। 'সালেক' তাঁর 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'রিক্তের বেদন' গল্পটি এক সৈনিকের রোজনামচা। 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের সবগুলো গল্পই করাচীতে 'আরব সাগরের বিজন বেলায়' (আবদুল কাদির/নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ) বসে লেখা। নজরুলের 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের 'ব্যথার দান' গল্পটিও তিনি করাচী থাকতেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন ছাপার জন্য। ১৩২৬ সালের মাঘ সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় ওটি ছাপা হয়। ঐ গল্পটিতে 'সিরাজ বুলবুলের দিওয়ান' এবং মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর গজলের উল্লেখ আছে। ঐ সময় তিনি 'দিওয়ান-ই-হাফিজ'-এর ছয়টি গজলও বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৩২৬ সালের কার্তিক সংখ্যা 'সাহিত্য পত্রিকা'য় নজরুলের সুবিখ্যাত 'হেনা' গল্পটি ছাপা হয়। 'হেনা' গল্পটি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। ১৩২৬ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সওগাতে' ছাপা হয় নজরুলের 'স্বামীহারা গল্প'। এ সময় 'মেহেরনিগার', ও 'রাক্ষুসী' 'ঘুমের ঘোরে' নামক নজরলের আরো কটি গল্প ছাপা হয়।

এরপর বেশ কয়েকটি বছর নজরুল কোন গল্প লেখেননি। তখন তিনি কবিতা লেখায় একান্ত ভাবে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর একটার পর একটা কবিতা বাংলা সাহিত্যাংগনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'সে কবিতার উত্তেজনা, ওজস্বিতা, ভাব-কল্পনা, ভাষার অভিনবত্ব এবং তীক্ষ্ম উজ্জ্বল দ্যুতি তার ধমনী উত্তেজক ছন্দ তাঁর গল্প লেখার খ্যাতিকে ম্লান করে দিল।' (শাহাবুদ্দীন আহ্মদ, ঐ)।

এর দীর্ঘকাল পর ১৯৩০ ইসায়ীর দিকে অনেকটা পরিণত বয়সে নজরুল আরো কয়েকটি গল্প রচনা করেন। এগুলো হলো: 'পদ্ম গোখরো', 'অগ্নিগিরি', 'জিনের বাদশা' ও 'শিউলিমালা'। ১৯৮১ সালে 'বনের পাপিয়া' নামে 'কাফেলা' পত্রিকায় নজরুলের একটি অপ্রকাশিত গল্প প্রকাশিত হয়। অনেকের ধারণা, এটিও নজরুলের পরিণত বয়সের রচনা। পদ্মগোখরো গল্পে সন্তান-বৎসল মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন আর্তি এবং তৎসঙ্গে জনক-জননীর লোভের কুৎসিত ছবি অংঙ্কিত হয়েছে। নজরুলের স্কুল-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈলজানন্দের পিতার হবি ছিল সাপ নিয়ে খেলাধূলা, সাপ ধরা, সাপ পোষা ইত্যাদি। নজরুল ছোটবেলায় এগুলো গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করতেন। বড় হয়ে পদ্মগোখরো লেখার সময় তাঁর কৈশোরের সেই স্মৃতিগুলো হয়তো তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। 'জিনের বাদশা' গল্পে এক গ্রাম্য তরুণের জন্য প্রেম, দুষ্টবুদ্ধি ও ব্যর্থতাক্লিষ্ট জীবনে পরিবর্তনের

www.pathagar.com

চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'অগ্নিগিরি' গল্পে আপাতপ্রশান্ত এবং অতিশয় একটি ভাল মানুষ সীমাহীন উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে অকস্মাৎ বিস্ফোরিত অগ্নিগিরির ন্যায় দানবিক শক্তিতে জেগে উঠে খুনী মানুষে পরিণত হবার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। 'শিউলিমালা' দেহাতীত প্রেমের সম্ভ্রম মিশ্রিত ভালবাসার পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'বনের পাপিয়া' গল্পে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপ অঙ্কিত হয়েছে। পরিণত বয়সের এ পাঁচটি গল্পে নজরুল যথার্থ জীবন-শিল্পী হিসাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

১৩২৭ সালের বৈশাখে নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আফজাল-উল-হকের পিতা কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় 'মোসলেম ভারত' প্রকাশিত হলে এর প্রথম সংখ্যা থেকেই নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় উপন্যাস এই প্রথম। এখানে এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রেমের ব্যর্থতা পরে বিদ্রোহের অগ্নিশিখার জন্ম দেয়। এর প্রথম অংশ লেখা হয় করাচীতে। এ পত্রোপন্যাসে 'সাহসিকতা'র এক সুদীর্ঘ পত্রে প্রথমত: প্রেম, সে প্রেমের ব্যর্থতা এবং সবশেষে বিদ্রোহের যে অগ্নুৎগারী বর্ণনা রয়েছে, অনেকের মতে, তারই পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে পরবর্তীকালে তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায়।

'বাঁধনহারা'র পর নজরুল এ জাতীয় পত্রোপন্যাস আর লেখেননি। এরপর তাঁর গদ্য রচনা হিসাবে পাওয়া যায় 'কুহেলিকা' ও 'মৃত্যুক্ষুধা' নামে দুটি উপন্যাস। ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে কলকাতা থেকে আফজাল-উল-হকের সম্পাদনায় মাসিক 'নওরোজ' পত্রিকা প্রকাশিত হলে সেখানে নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাসের প্রথমাংশ ছাপা হয়। 'নওরোজ' পাঁচ সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গেলে পরে 'কুহেলিকা' ধারাবাহিকভাবে 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' 'সওগাতে'র ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হয়। 'মৃত্যুক্ষুধা' কৃষ্ণ নগরের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। 'মৃত্যুক্ষুধা'র নায়ক 'আনসার' এবং 'কুহেলিকা'র নায়ক 'জাহাঙ্গীর' নজরুলেরই বন্ধন মুক্ত ছন্নছাড়া জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বলে অনেকের ধারণা।

নজরুলের নাটকের সংখ্যা কত হবে? কারো কারো মতে নজরুলের এবং নজরুলের অবদানসমৃদ্ধ নাটক-নাটিকার সংখ্যা হবে শতাধিক। নজরুলের রচিত সব নাটক-নাটিকার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। এ সম্পর্কে জনৈক নজরুল-গবেষকের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়:

> "নজরুল ৮৪টি নাটক ও নাট্যকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর লেখা নাটক-নাটিকা-কমিক-নক্সা ৫৯টি এবং তাঁর সঙ্গীত রয়েছে, অপরের লেখা এমন নাটক ২৫টি। বাংলা নাট্যজগতে নজরুলকে পাওয়া যায় রচয়িতা, নির্দেশক, সংগঠক, অভিনেতা, উদ্যোক্তা, পৃষ্ঠপোষক, গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক এবং সঙ্গীতাচার্য হিসাবে। বাংলা নাটকের ইতিহাসকাররা নজরুলকে যথাযোগ্য মর্যাদা

www.pathagar.com

দেননি।" (তথ্যঃ অনুপম হায়াতের প্রবন্ধ, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ মে, ১৯৯৩)।

জনৈক সমালোচকের দৃষ্টিতে,

> "আসলে নজরুলের জীবনটাই তো একটি ঘটনাবহুল নাটক।... তিনি দশের দশকে যখন মাত্র দশ কিংবা ১২ বৎসরের তখন এই লেটো দলে যোগদান করেন এবং চিরাচরিত লেটো গানের ধারাকে রদবদল করে তাতে কিছু রঙ চড়িয়ে উন্নত মানের পালাগান রচনা করতে সক্ষম হন। আর সে কারণেই ঐ বয়সেই তিনি 'গোদা-কবি' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লেটো পালা রচয়িতা আখ্যায় ভূষিত হন। দলের ওস্তাদ হিসাবে স্থান লাভ করেন।" (আসাদুল হক/গণমাধ্যমে নজরুল)।

লেটোর দলে থাকাকালে নজরুল যে সব পালাগান রচনা করেন, সেসবগুলোর হদিস এখন আর পাওয়া যায় না। যে কয়টির কথা জানা যায় তার মধ্যে (১) শকুনি বধ, (২) দাতাকর্ণ, (৩) চাষার সঙ্ (৪) ঠগপুরের সঙ্, (৫) মেঘনাদ বধ, (৬) কবি কালিদাস, (৭) আকবর বাদশাহ, (৮) রাজপুত্র নামগুলি এখনো শোনা যায় খুড়া, নিমসা এবং চুরুলিয়া অঞ্চলের গ্রামগুলিতে। (তথ্যঃ নজরুল রচনা সম্ভার ২, সম্পাদনায় আব্দুল আজিজ আল-আমান)।

১৩৩৪ সালে মাসিক 'নওরোজ' পত্রিকায় নজরুলের 'সেতুবন্ধ' ও 'ঝিলিমিলি' নামে দুটি নাটিকা ছাপা হয়। এছাড়া বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে নজরুলের যে সব নাটক, নাটিকা, গীতি-বিচিত্রার তালিকা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:

(১) ভূতের ভয় (২) মধুমালা (৩) জাগো সুন্দর চিরকিশোর (৪) ঈদ (৫) গুল-বাগিচা (৬) অতনুর দেশ (৭) বিদ্যাপতি (৮) বিষ্ণুপ্রিয়া (৯) বিজয়া (১০) শ্রীমন্ত (১১) পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার (১২) বাসন্তিকা (১৩) ঈতলফেতর্ (১৪) বিলাতী ঘোড়ার বাচ্চা (১৫) বাঙালি ঘরে হিন্দী গান (১৬) জন্মাষ্টমী (১৭) প্ল্যানচেট (১৮) সাপুড়ে (১৯) বনের বেদে (১৯) লাইলি মজনু।

এছাড়া নজরুল সাতটি অন্যের লেখা নাটকে গান লিখেছেন। এবং অন্যের লেখা ৬টি নাটিকার সংলাপে গান রচনা করেন। উপরের বিশটি নাটকের বাইরে নজরুল-গবেষক আসাদুল হক আরো কয়েকটি নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন: (১) আলেয়া (২) মদিনা (৩) বাসন্তিকা, এবং কয়েকটি গীতি-নাট্য: (১) সাম সোজনায় কড়ি মধ্যম (২) কাবেরী নদী জলে (৩) আকাশ বাণী (৪) সারা ব্রীজ (৫) শিল্পী।

অবশ্য উপরে আসাদুল হক উল্লেখিত ৫টি ছাড়াও নজরুল-রচনাবলীতে প্রদত্ত ২০টি নাটকের মধ্যে ৬টি গীতি-নাট্য। এগুলো হলো: (১) জাগো সুন্দর চিরকিশোর (শিশুদের জন্য) (২) ঈদুল ফেতর্ (৩) গুলবাগিচা (৪) অতনুরদেশ (Love land) (৫) বিজয়া (৬) পুতুলের বিয়ে (ছোটদের জন্য)। অতএব এগুলোকে নজরুলের গদ্য-রচনার মধ্যে বিচার করা সমীচিন নয় বলে মনে করি।

www.pathagar.com

তবে নজরুলের নাটক সম্পর্কে একটি কথা বলা আবশ্যক। তিনি নাটকের মঞ্চ-সফলতার দিকে অতিরিক্ত খেয়াল রাখতেন। কীভাবে নাটকটি সফলভাবে মঞ্চে অভিনীত হতে পারে, দর্শক-শ্রোতাদের মনোযোগ ও মনোরঞ্জন হতে পারে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। ফলে নাটকের কলা-রীতি, শিল্প-সৌন্দর্য ও চিরন্তন আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবহেলা-ঔদাসীন্য তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নাট্যকারদের অন্যতম হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। নজরুল কোন ব্যাপারেই তেমন স্থিতধী হবার তেমন অবকাশ পাননি, অনেকটা হুজুগে এবং মুহূর্তের প্রয়োজনে তিনি সবকিছু করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এরূপ অবস্থায় সফল কবিতা, গান ইত্যাদি রচনা করা সম্ভব হলেও সফল নাটক রচনার জন্য চাই স্থিরতা, ধৈর্য ও গভীর অধ্যাবসায়। দুর্ভাগ্যবশত: নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে নজরুলের জীবনে তার বড় অভাব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এত বিপুল সংখ্যক, বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক নানা ধরনের মঞ্চ-সফল, দর্শক-নন্দিত নাটক রচনা কি বিস্ময়কর নয়?

নজরুলের প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা মোট পাঁচটি: (এক) যুগবাণী (দুই) রাজবন্দীর জবানবন্দী (তিন) দুর্দিনের যাত্রী (চার) রুদ্র মঙ্গল ও (পাঁচ) ধূমকেতু। 'যুগবাণী' কবির তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ কিন্তু প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। কার্তিক, ১৩২৯ (২৬ অক্টোবর, ১৯২২) প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার এটি ২২ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখে বাজেয়াপ্ত করে। পরে ৩১ মার্চ, ১৯৪৭ তারিখে স্বাধীনতার প্রাক্কালে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। নজরুলের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের চৈত্র মাসে (এপ্রিল, ১৯২৩)। তৃতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৯২৬)। চতুর্থ প্রবন্ধ গ্রন্থ 'রুদ্র মঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ (১৯২৭) সালে। সরকার এ গ্রন্থটিও বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর পঞ্চম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয় ১৩৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (জানুয়ারী, ১৯৬১)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর করাচী থেকে ফিরে নজরুল সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে সাংবাদিকতার সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০ ইসায়ীতে মৌলভী এ.কে.ফজলুল হক 'নবযুগ' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক বের করেন। 'নবযুগ' ছিল রয়াল সাইজের এক পাতার কাগজ। এটা সম্পাদনার ভার ছিল প্রধানত: নজরুল ইসলামের উপর। অন্যতম সম্পাদক ছিলেন কমরেড মোজাফফর আহমদ। নজরুল তখন থাকতেন ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটে। 'নবযুগে' নজরুল যে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন তার কতকগুলো সংকলন করে ১৯২২ সালে 'যুগবাণী' নামে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

'নবযুগ' নজরুলের সম্পাদনায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুদির পর নজরুল সেখান থেকে গা-ঢাকা দেন। ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর নজরুল ১৩২৯ সালের ২৫ শ্রাবণ (১১ আগস্ট, ১৯২২) ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট থেকে অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' বের করেন। ফুলস্কেপ সাইজের আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম রাখা হয় এক আনা। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার পত্রিকা বের হতো। প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয় নজরুলের

www.pathagar.com

ধূমকেতু কবিতা :

> আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন: মহাবিপ্লব-হেতু
> এই স্রষ্টার শনি মহাকাশ ধূমকেতু।

ধূমকেতু হয়ে উঠেছিল পরাধীন ভারতের বিশেষত: নির্যাতীত, অধ:পতিত বাঙালীর মহাজাগরণের অগ্নিশপথ দীপ্ত নির্ভীক মুখপত্র। তাই রবীন্দ্রনাথ একে স্বাগত জানিয়ে লিখলেন :

> আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
> আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
> দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
> উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
> অলক্ষণের তিলক রেখা
> রাতের ভালে হোক না লেখা,
> জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
> আছে যারা অর্ধচেতন!
> (২৪শে শ্রাবণ: ১৩২)

ধূমকেতুর পাশাপাশি ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে নজরুলের 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উভয়ের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে ডক্টর সুকুমার সেন লিখলেন :

> "দমকা হাওয়ার কবি শুধু 'অগ্নিবীণা' বাজাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি 'ধূমকেতু'ও ছাড়িলেন। কবিতার ঝঙ্কার যাহাদের কানে কানে কোনদিন পশিবে না, তাহারাও 'ধূমকেতু'র ঝাপটা হইতে রেহাই পাইলেন না।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮)।

নজরুল 'ধূমকেতু'র জন্য যেসব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন তা থেকে বাছাই করে ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর, ১৯২৬) 'দুর্দিনের যাত্রী' এবং ১৩৩৩ সালে (১৯২৭) 'রুদ্রমঙ্গল' নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে তা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

'ধূমকেতু' পত্রিকাটিও ছিল স্বল্পায়ু। এরপর ১৩৩২ সালের ১লা পৌষ (১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫) ৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে 'লাঙল' প্রকাশিত হলে নজরুল তার প্রধান পরিচালক হন। নজরুলের পল্টনের বন্ধু শ্রী মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর নামমাত্র সম্পাদক। এর প্রথম সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল নজরুলের সুবিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতা। ১৯২৬ ইসায়ীর ১৫ই এপ্রিল

www.pathagar.com

১৫'শ সংখ্যা প্রকাশের পর 'লাঙল' আর প্রকাশিত হয়নি। এরপর ১৯২৬ ইসায়ীর ১২ই আগস্ট (১৩৩৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ) 'লাঙল' পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয়ে 'গণবাণী' প্রকাশিত হয়। 'গণবাণী'তে নজরুলের বহু গান, কবিতা ও প্রবন্ধ ছাপা হয়।

১৯৪০ ইসায়ীর অক্টোবরে মৌলভী এ.কে. ফজলুল হকের দলীয় মুখপত্র রূপে নব-পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। নজরুল এবারও প্রধান সম্পাদক হলেন। এছাড়াও দৈনিক সেবক, মোসলেম ভারত, সওগাত, সাপ্তাহিক সওগাত, নওরোজ প্রভৃতি পত্রিকার সাথে তিনি গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। এভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

নজরুলের গদ্য–রচনার একটি বিশিষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর প্রণীত স্বরলিপিতে। নজরুল ইসলাম শুধু বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকারই নন; তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-বিশারদ। দেশীয় বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ছাড়াও বিদেশী অসংখ্য রাগ-রাগিনী সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং সেসব রাগ-রাগিনীতে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি নিজেও নতুন নতুন রাগ-রাগিনী তৈরী করেছেন। বিশ্বের সঙ্গীত-জগতে এমন অসাধারণ প্রতিভা এক বিস্ময়কর বিষয়। নজরুল তাঁর রচিত অধিকাংশ গানে নিজেই সুরারোপ করেছেন এবং তার স্বরলিপিও তৈরী করেছেন। এ স্বরলিপি যেমন সঙ্গীত শাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ, বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও তেমনি এক বিশিষ্ট নিদর্শন।

নজরুল সঙ্গীতের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'নজরুল স্বরলিপি'। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের ভাদ্র মাসে (২৫ আগস্ট, ১৯৩১)। দ্বিতীয় স্বরলিপি গ্রন্থ 'সুরলিপি' প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালের ভাদ্রমাসে (১৬ আগস্ট, ১৯৩৪)। তাঁর তৃতীয় স্বরলিপি গ্রন্থ সুরমুকুর প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালের ভাদ্রমাসে (৪ অক্টোবর, ১৯৩৪)। "এরপর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৭৮ খৃ. পর্যন্ত প্রতি খণ্ডে কিছু কমবেশি ২৫টি করে নজরুল সঙ্গীত ও তার স্বরলিপি সুরবাহার, নবরাগ, সুরমল্লার, পটদীপ, বেণকা, নার্গিস গীতি আলেখ্য, রাগবিচিত্রা, লৌহকপাট, সুর ও বাণী, ঘর ঘুলানো সুরে, সুরছন্দা; কলগীতি, সুরধনী ও মেঘমল্লার এই ১৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরে ১০০ করে সংগীতের ৯টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।" (আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত : অপ্রকাশিত নজরুল, পৃ. ৩৫৫)।

১০ জুলাই, ১৯৪২ নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এর পূর্বেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি তার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। নজরুলের জীবনের শেষ দিককার অভিভাষণগুলোতে এ অনুভূতির প্রকাশ সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে জনৈক বিশিষ্ট নজরুল গবেষক লিখেছেন :

"সম্বিত হারানোর পূর্বে তিনি প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মরাজ্যে ছিলেন। এ সময়ে রচিত অসংখ্য গানে তাঁর এই মানস-স্বরূপ চিত্রিত হয়ে আছে। সজ্ঞান জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর প্রদত্ত কয়েকটি অভিভাষণে, কবি-চিত্তের স্বরূপটি যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা একাধারে কর্মজগৎ হতে তাঁর বিদায় এবং অধ্যাত্মরাজ্যে অন্তর্লীনতার কথা সুস্পষ্ট এবং গভীরভাবে ব্যক্ত করে।" (আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত অপ্রকাশিত নজরুল, পৃ. নয়)।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট লেখা কাজী নজরুল ইসলামের চিঠিপত্রও বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট লেখা তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৫টি চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে এককভাবে তিনি সর্বাধিক ৮টি চিঠি লিখেছেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনকে। আরো যাঁদেকে তিনি লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কমরেড মুজাফফর আহমদ. সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, শৈলজানন্দ, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, হাবীবুল্লাহ্ বাহার, জসীম উদদীন, ইজাব উদ্দীন, শামসুন নাহার মাহমুদ, ব্রজবিহারী, শ্রীমন্মথ রায়, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মীজানুর রহমান, এম. সিরাজুল হক, মুরলীদা, মাহফুজুর রহমান, আনওয়ার হোসেন, শ্রী শচীন কর, আবুল হোসেন, আবদুল কাদির, আজিজুল হাকিম, নার্গিস আসার খানম প্রমুখ।

নজরুলের গদ্য-রচনা আকারে-অবয়বে যেমন বিশাল, বিষয়-বৈভবে তেমনি বিচিত্র। কবিত্বময় লালিত্যপূর্ণ ভাষা, আনন্দ-বেদনাপূর্ণ জীবনের দার্ঢ্য প্রকাশ এবং সর্বোপরি নজরুলের জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ধারে তাঁর গদ্য-রচনা অতীব মূল্যবান ও গভীর তাৎপর্যবাহী। নজরুল বিশ্বমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা, তাঁর অমর, মহৎ, শাশ্বত কাব্যের সাথে তাঁর গদ্য-রচনার তুলনা অযৌক্তিক, কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে নজরুলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গদ্য-রচনা নি:সন্দেহে এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

তথ্যপঞ্জী :

১. বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল রজনাবলী', ৪র্থ খন্ড
২. আবদুল কাদির/ নজরুল প্রতিভার স্বরূপ
৩. ঐ / যুগ কবি নজরুল
৪. আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত/অপ্রকাশিত নজরুল
৫. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ/ছোটগল্পে নজরুল ইসলাম
৬. ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী/নজরুল-সাহিত্য
৭. মুহম্মদ নূরুল হুদা/নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহ : প্রস্তাবনা
৮. ডক্টর সৈকত আসগর/ নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহ : প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে
৯. শেখ দরবার আলম / গণ-মাধ্যমে নজরুল
১০. অনুপম হায়াৎ / গণ-মাধ্যমে নজরুল
১১. আসাদুল হক / গণ-মাধ্যমে নজরুল।

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নজরুল

মোশাররফ হোসেন খান

কবি নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬], তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে তিনিই আমাদের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য প্রতিভা। কবি রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার কথা স্মরণে রেখেও নজরুল সম্পর্কে আমরা নির্দ্বিধায় এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা উচ্চারণ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথকে উত্থাপন করে নজরুল বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ অনেক বড়ো প্রতিভা। কিন্তু, নজরুলের শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন দ্বন্দ্ব নেই আছে পার্থক্য। এই পার্থক্য দুই শ্রেষ্ঠ কবির দৃষ্টিতে, মনোভূমিতে, মানসে এবং উচ্চারণে। এই পার্থক্য বিপুল-বিশাল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণে মুক্তির স্বপ্ন আছে। কল্পনা আছে। আধ্যাত্ম চিন্তা আছে। পরিপাটি জীবনের কথা আছে। বিরহের কথা আছে। কিন্তু মানুষের মুক্তির জন্যে ব্যাকুলতা নেই। দ্রোহ নেই। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা নেই। তারুণ্যের ঔদ্ধত্য নেই এবং উজ্জ্বলতা নেই। কিন্তু এসকল চরিত্র নজরুলে আছে। তাঁর সাহিত্যে মানুষ ও মানবতা এত ব্যাপক-এত বিস্তৃত, এত জীবনঘনিষ্ঠ ও এত আন্তরিক যে আমাদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। রবীন্দ্র সাহিত্যের দর্শন ও আধ্যাত্মবাদের শক্ত খোলসের বাইরে-সমাজ, ও যুগযন্ত্রণায় পিষ্ট মানুষের আহাজারি এবং তাদের জীবনচিত্র খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু নজরুলের উচ্চারণে তা হয়ে উঠেছে বাস্তব ও হৃদয়স্পর্শী। রবীন্দ্রসাহিত্যে দূরবর্তী প্রচ্ছন্ন সত্তা আছে কিন্তু ব্যক্তি নেই। সমাজ আছে। মানুষ আছে কিন্তু তা স্পর্শহীন। আর নজরুলে আছে ব্যক্তি, সমাজ, জীবন ও যুগযন্ত্রণার এক বিস্তৃত ময়দান। এখানেই দুই শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে যোজন-যোজন দূরত্ব ও ব্যবধান।

কবি নজরুল যে সমাজকে দেখেছিলেন, যে মানুষকে দেখেছিলেন তা ছিল তাঁরই বাস্তবে দেখা সমাজ ও মানুষ। যেখান থেকে তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। অর্থাৎ সেই সমাজ ও মানুষের অস্তিত্বের ভেতর নজরুলের ছিল বসবাস। নজরুলের দেখা এ সমাজ এবং

www.pathagar.com

মানুষের সাথে আমরা পরিচিত। আমরা যুক্ত। আর রবীন্দ্রনাথ যে সমাজ এবং যে আত্মার কথা বলেছেন তা এতটাই স্বপ্নাচ্ছন্ন ও অদৃশ্যের ব্যাপার যে—আমরা তাকে ধরতে পারিনে। ছুঁতে পারিনে। হয়তো বা কখনো কোন এক অলস মুহূর্তের শুধু কল্পনাবিলাসমাত্র। সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের সামাজিক দায়বদ্ধতার কোন আভাসও পাইনে। মনে হবে, রবীন্দ্রনাথের দেখা সেই সমাজ, সেই মানুষের অবস্থান এই পৃথিবীতে নেই, আছে অন্য কোন গ্রহে। এজন্যই বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা হতাশ স্বরেই বলেছিলেন ঃ

> মনে হল তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন। মনে হল তাঁর জীবন দর্শনের মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।

আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আক্ষেপ করে বলেছিলেন ঃ

> রবীন্দ্র সাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে তার সাথে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে, তাকে পরীর দেশ বললেও বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।

অথচ ব্যতিক্রমী নজরুল। তাঁর সাহিত্যের সারাৎসারই হলো মানুষ ও মানবতা। মানুষ বলতে সাধারণ মানুষ। ভাগ্যাহত মানুষ। নিষ্পেষিত মানুষ। কেবল নজরুলেরর কণ্ঠেই শুনতে পাই এই আর্তচীৎকার :

> জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
> জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত।

কিংবা—

> প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
> যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।

যিনি মানুষকে ভালবাসেন, তিনি মানুষের সুখ-দু:খের সাথী হয়ে যান। মানুষের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন। তাদের কষ্টে তিনি কাঁদেন। তাদের সুখে তিনি খুশি হন। আর যিনি মানুষকে ভালবাসেন, কেবল তিনিই তাদের মুক্তির দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে পারেন। মানুষের বন্দীদশায় কেবল তিনিই উচ্চারণ করতে পারেন :

> কারার ঐ লৌহ-কপট
> ভেঙ্গে ফেল্, কররে লোপাট
> রক্ত-জমাট
> শিকল-পূঁজোর পাষাণ-বেদী।

www.pathagar.com

ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।

নজরুল যে সমাজকে দেখেছিলেন, সেই সমাজের বুক জুড়ে কুলি, মজুর থেকে শুরু করে সমাজের উঁচুতলার-প্রত্যেকেই আছে। এমনকি আছে কয়লার খনির শ্রমিকরা পর্যন্ত। মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নজরুলের ছিলো এক অপ্রতিরোধ্য উচ্চকণ্ঠ।

শুধু বিদেশী বেনিয়ার থেকেই তিনি মানুষের মুক্তি কামনা করেননি, তিনি মুক্তি কামনা করেছিলেন স্বদেশের জুলুমবাজ শকুনদের হাত থেকেও। রানীগঞ্জে কয়লাখনির শ্রমিকদেরকে দেখেও নজরুলের হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। আর তাঁর হৃদয়স্পর্শী অভিব্যক্তি তিনি প্রকাশ করলেন এভাবে :

> কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে.দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ-ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বেশী বাঁচে না; তাঁহারা দিবারাত্রি খনির নীচে পাতালপুরীতে আলো-বাতাস হইতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনে ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া দিয়াছেন। কোম্পানী তো তাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ হতভাগ্যদের স্বাস্থ্য, আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও চাইবেন না। এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কেহ কখনো চিনিতে পারিবেন না যে, ইহারা মানুষ কি প্রেত-লোক ফেরতা বীভৎস নর কঙ্কাল!..... দেশের সমস্ত কল-কারখানায়, আড়তে, গুদামে ভাবিয়া চিন্তিয়া 'মানুষ হত্যার' এইরূপ শত শত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবে।

মানুষকে প্রকৃত অর্থে ভালবেসেছিলেন নজরুল। এই মানুষের ভেতর কোন শ্রেণী বা ধর্মভেদ ছিল না। ছিল না শ্রেণী বৈষম্য। একমাত্র নজরুলকেই আমরা পাচ্ছি, যিনি আজীবন সাম্য ও সম্প্রীতির কথা বলেছেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা বলেছেন। বলেছেন হৃদয় নিংড়ানো সর্বশেষ ভালবাসার শক্তি দিয়ে।

> ঐ শোনো, তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী, আমাদের ধর্ম বিদ্বেষ নাই, জাতি বিদ্বেষ নাই, বর্ণ বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য অভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের ঐ মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি।

www.pathagar.com

এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান" আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে' পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ্ করিব না।

অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন :

এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দু:খ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, আমাদের এ বঞ্চিত মিলন বড় দু:খের বড় কষ্টের ভাই।..... আমাদের প্রীতি-বন্ধন অক্ষয় হোক। আমাদের এ মহা মিলন চিরন্তন হোক।

কিংবা—

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান।

মানব প্রেমের এই অক্ষয়-অমর বাণী কেবল আমরা নজরুলেই প্রত্যক্ষ করি। তিনি সাম্যের কথা বললেও, হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা বললেও—তা সম্ভব হয়নি। সেটা যেমন হয়নি বিশের দশকেও তেমনি আজও। মুসলমানরা হিন্দুদেরকে আপন ভাবলেও হিন্দুরা তা পারেনি। তাদের ছুঁৎমার্গ স্বভাব আগেও যেমন ছিল, এখনো তাই আছে। অথচ, নজরুল এই অসম্ভবকে সম্ভব করার স্বপ্ন দেখেছেন। নজরুল এই দু:স্বপ্ন দেখার সাহস পেয়েছিলেন— কারণ তিনি যে সমাজ, যে ধর্ম থেকে উঠে এসেছেন, সেই মুসলিম সমাজ ও পরিবারে মানুষের ভেতর প্রভেদের মতো হীন কাজের নজীর ছিল না। আশরাফ আর আতরাফের প্রভেদ মুসলিম সমাজে থাকতে পারেনা। থাকতে পারেনা কোনো ভেদ-বৈষম্য। হিন্দু ধর্মে আছে। ছিল। এবং বোধকরি আগামীতেও থাকবে। এজন্যই সম্ভবত জমিদার বংশোদ্ভূত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশৈশব ছুঁৎমার্গের দুষ্টক্ষত ছিল। যে জন্য তিনি কখনোই মুসলমানকে সম্মানের চোখে দেখতে পারেননি। এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দুকেও তিনি সম্মান দেখাতে শেখেননি।

নজরুল ইসলাম ইসলামী সংগীত যেমন লিখেছেন, তার পাশাপাশি শ্যামাসঙ্গীতও লিখেছেন। নজরুলের সাহিত্যে যেমন মুসলমানের কথা আছে, তেমনি হিন্দুদের কথাও আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তা নেই। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই তা করেননি। তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও ছিলনা। রবীন্দ্রে আছে দাসত্বের বন্দনা। আর নজরুলে আছে শৃংখল ভাঙ্গার বজ্রকঠিন শপথ। রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'আমাদের' বলেছেন, সেই আমাদের মধ্যেও প্রকারান্তরে হিন্দু জাতিকেই বুঝিয়েছেন। এখানেও তাঁর ব্যাপকতা নেই। কিন্তু নজরুল

www.pathagar.com

যেখানে 'আমাদের' বলেছেন, সেই 'আমাদের' মধ্যে পৃথিবীর সকল মানুষই সমুপস্থিত। এজন্যই নজরুল বৈশ্বিক। নজরুল সকলের। নজরুল সকল দেশের। নজরুল সকল কালের। কালের উর্ধে।

এই সাম্যবাদের কবি, এই বিশ্ব কবিকে—এই বাংলাদেশেই কোন কোন মূর্খ পণ্ডিত 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে তৃপ্তিবোধ করে। এখন আর বুঝতে কষ্ট হয় না যে, যতোটা না ধর্ম বিদ্বেষের কারণে, তার চেয়েও বড় কারণ নজরুলাতঙ্ক। নজরুলাতঙ্কে তারা সর্বদা কম্পমান। নজরুলের সর্বকূলপ্লাবী প্রতিভার সামনে দাঁড়াবার এবং কাউকে দাঁড় করাবার শক্তি ও সাহস তাদের নেই। আর এজন্যে খণ্ডিত করে, বিকৃত করে, ভুল ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করে নজরুলকে তারা এদেশ থেকে ক্রমশ মুছে দিতে চায়। মুছে দিতে চায় নানা প্রকার ছল চাতুরি আর অপকৌশলের ছদ্মাবরণে। কিন্তু সেটা কি আদৌ সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন হিন্দু পরিবারে। আর আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ যেহেতু মুসলিমবিদ্বেষী সুতরাং ধর্মগত সুবিধার কারণে রবীন্দ্রনাথ এই দেশে ক্রমশ হয়ে উঠেছেন আবেগাক্রান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু নজরুল ইসলাম আছেন আমাদের প্রতিদিনকার পাঠাভ্যাসে, আমাদের হৃদয়ে, আমাদের জাগরণে। নজরুল আছেন আমাদের সংকটে এবং সংগ্রামে। তিনি আছেন আমাদের চেতনায় এবং আমাদের স্বাধীনতায়। এজন্যই নজরুল অনি:শেষ।

নজরুল আছেন এবং নজরুল থাকবেন, এই দেশে। এই উপমহাদেশে। তাকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনা। না, বোধ করি দু'দশ শতকেও তা সম্ভব হবে না।

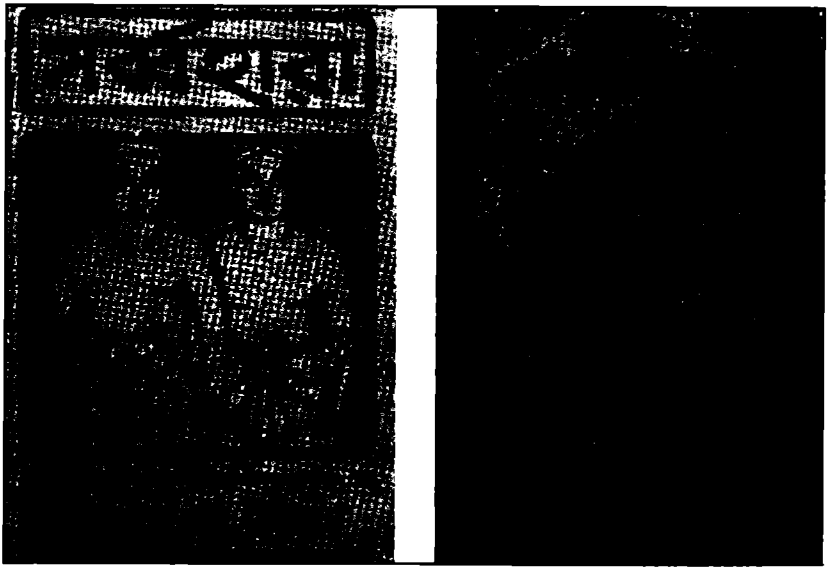

নজরুল রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

নজরুল কাব্যে সাম্যবাদ : দার্শনিক ভিত্তি

হাসান আলীম

কাজী নজরুল ইসলামই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সাম্যবাদী দর্শন নিয়ে কবিতা, গান, গল্প উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করেছেন। সাম্যবাদ নিয়ে পুরো একটি কাব্য 'সাম্যবাদী' শুধু বাংলা সাহিত্যেই অদ্বিতীয় নয় বিশ্ব সাহিত্যেও এর জুড়ি মেলা ভার। মানবিক সাম্যবাদ তথা মানুষে মানুষে শ্রেণী বৈষম্য ভেদের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা সাম্য, সামাজিক সাম্য, নারী-পুরুষের সাম্য তথা সার্বিক সাম্য নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নজরুল ছিলেন একনিষ্ঠ। সাম্যবাদ নিয়ে 'সাম্যবাদী' কাব্যে নজরুল বেশ কিছু সাড়াজাগানো কবিতা রচনা করেছেন। সাম্যবাদ নীতিতে একনিষ্ঠ হওয়ার পেছনে রয়েছে নজরুলের সাম্যবাদী মানস গঠনের ভিত্তিভূমি। তাঁর এই সাম্যনীতির ভিত্তিভূমি ছিল ইসলাম।

নজরুলের শৈশব, কৈশোর, যৌবন গঠনে ইসলামী আবহ বিশেষভাবে কাজ করেছে। নজরুলের মানসিক প্রবৃদ্ধিতে রয়েছে ইসলামের উদার সাম্য দর্শন।

নজরুলের পূর্ব-পুরুষেরা আরবী ফারসী ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন যা পরবর্তিতে নজরুলে দানা বেধে ওঠে। তাঁর বাড়ীর নিকটে ছিল কামেল পুরুষ হাজী পাহলোয়ানের মাজার এবং পীরপুকুর। নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন ঐ মাজারের খাদেম এবং মাজার মসজিদের পেশ ইমাম। তিনি সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নজরুল তাঁর আব্বার প্রভাবে প্রভাবন্বিত হয়েছিলেন। নজরুলের চাচা কাজী বজলে করিম ভাল আরবী ফারসী জানতেন। তিনি ফারসী ভাষায় কবি গান রচনা করতেন। নজরুল তাঁর এই চাচার নিকট থেকে আরবী ফারসী রপ্ত করেন। চাচার মত তিনিও লেটো দলের জন্য আরবী ফারসী মিশ্রিত কবিগান রচনা করেন। নজরুল শুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করতে পারতেন। মসজিদের ইমামতিও তিনি করেছেন।

যৌবনে ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে ভর্তি হয়ে করাচী যান। সেখানে এক পাঞ্জাবী মৌলানার কাছে রুমী, জামী ও হাফিজের কাব্য অধ্যায়ন করেন। নিবিড়ভাবে পরিচিত হন আরবী ফারসী উর্দু ভাষার বিপুল ঝংকারময় শব্দরাজীর সঙ্গে।

www.pathagar.com

করাচী থেকে ফিরে এসে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মুজফফর আহমদের আনুকূল্য পান। সমাজতন্ত্রের সাম্যদর্শনের সাথেও পরিচিত হন। ইসলামের ব্যাপক জ্ঞান থাকায় ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের সাম্যদর্শনের তুলনামূলক জ্ঞান আহরণ করেন। নজরুল মুজফফর আহমদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন কিন্তু তাঁর দর্শনকে গ্রহণ করেন নি।

করাচী থেকে ফিরে যখন কোলকাতার বাবুশ্রেণীর নিকট নজরুল সর্বান্তকরণে স্থান পাননি তখন বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সংগঠনে তাঁর সাদর সংকুলান হয়।

এ প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির জুবিলি উৎসবে সভাপতির ভাষণে বলেন: 'কয়েকজন বন্ধুর আহ্বানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নেই। এখানে আমি বন্ধুরূপে পাই মি: মুজফফর আহমদ, মি: আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুগণকে।'

নজরুলের ইসলাম ও কম্যুনিজম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকার কারণে সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষিত হননি বরং ইসলামের সাম্য দর্শন যে কম্যুনিজম থেকে উন্নত তা উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন :

(১) আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।

আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে। এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোন ধর্ম এতবড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি।

[১৩৪৭ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য–সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ]

(২) ইসলাম ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে— কোরান মজিদে এই মহাবাণীই উত্থিত হয়েছে। এক আল্লাহ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তার আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানব ধর্ম। — আল্লাহ আমার প্রভু, রসূলের আমি উম্মত, আল কোরান আমার পথ-প্রদর্শক। [আমার লীগকংগ্রেস]

নজরুলের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড কাব্যপ্রতিভা। একই সাথে কাব্যপ্রতিভা ও ইসলামী সাম্য দর্শন তাঁর মধ্যে সমভাবে বিরাজ করায় তাকে তিনি কাব্যের মাধ্যমে ভিন্ন মাত্রা দান করেন। তত্ত্ব প্রচার বা রাজনীতি, দার্শনিকতা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তাঁর লক্ষ ছিল মানুষের মুক্তি। মানব সমাজে মানবিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তিনি এ বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। গান রচনা করেন। মাঠে ময়দানে সোচ্চার হন। জেলও খাটেন স্বাধীনতা হরণকারী বিদেশী বেনিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধতা করে।

www.pathagar.com

১৯২৫ ডিসেম্বর বাংলা ১৩৩২ সালে নজরুলের 'সাম্যবাদী'কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ পায়।

এ গ্রন্থে ১১ টি কবিতা রয়েছে যথা ঃ (১) সাম্যবাদী (২) ঈশ্বর (৩) মানুষ (৪) পাপ (৫) চোর-ডাকাত (৬) বীরাঙ্গনা (৭) মিথ্যবাদী (৮) নারী (৯) রাজা প্রজা (১০) সাম্য (১১) কুলি মজুর।

নজরুলের সাম্য দর্শনের মধ্যে রয়েছে মানুষে মানুষে অভেদ নীতি। যথা :

(১) গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নাই কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ কাল–পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সবদেশে সবকালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জাতি।– (মানুষ)

(২) গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।— (সাম্যবাদী)

(৩) তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার
তোমার হৃদয় বিশ্ব দেউল সকলের দেবতার। (ঐ)

(৪) শোনো মানুষের বাণী—
জনমের পর মানব জাতির থাকে নাক কোন গ্লানি।— (বারাঙ্গনা)

(৫) শোন ধর্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোন সে প্রভেদ নাই। (ঐ)

(৬) হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।— 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।'

(৭) ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি। (আমরা সেই সে জ্ঞাতি) (বুল বুল ২য় খণ্ড)

(৮) যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত। (বিদ্রোহী)

কবি 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ ছাড়া 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের প্রচুর কবিতায় সাম্যবাদ তথা মানবতাবাদকে শিল্পময় করে কাব্যময় করে তুলে ধরেছেন। নজরুল ছাড়া আর কোন কবি এমন কি রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল পর্যন্ত এই সাম্যবাদ কে তুলে ধরেননি। কাব্যে সাম্যবাদ নজরুলের নতুন সৃষ্টি।

www.pathagar.com

কোরআন হাদীসের ব্যাপক অধ্যয়ন, তা থেকে সাম্যবাদকে চিহ্নিতকরণ এবং ইসলামের মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)সহ চার খলিফার জীবনে সাম্যবাদের যে চর্চা ছিল নজরুলের তা জানা ছিল এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। নজরুল বড় কবি ছিলেন বলেই এই সাম্যবাদকে কবিতায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পবিত্র কোরানের বিভিন্ন সূরায় মানব সাম্যবাদ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে —

(১) 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'(নিসা ঃ আয়াত-১)

(২) 'তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে অত:পর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন'। (যুমার : ৬ নং আয়াতের অংশ) (৩) হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও।' (হুজুরাত : আয়াত ১৩)

মানবতার মুক্তিদূত মহাসাম্যবাদী হযরত মুহাম্মাদ (সা) মানবিক সাম্য প্রসঙ্গে বলেন 'আননাসু সওয়াসিয়াহ' অর্থাৎ সকল মানুষ সমান।

'আল-ইনসানু আখুল ইন্‌সানি হাব্বা আস কারিহা' অর্থাৎ, 'ভালবাসুক বা ঘৃণা করুক, 'সকল অবস্থাতে মানুষ মানুষের ভাই'।

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যবাদ সমন্বিত কবিতাও নজরুল রচনা করেছেন। যথা—

(১) দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল। (কুলি-মজুর)

(২) তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে। (ঐ)

(৩) যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জোচ্চর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণি জাতি–সঙ্ঘেতে আজ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত ইটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
(চোর-ডাকাত)

www.pathagar.com

মানুষে মানুষে ভেদা ভেদ নেই বলে সবার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার সমান। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যতত্ত্বে যে কোন মতবাদে যাই থাক বাস্তবে রূপদান করেছে ইসলামের মহাপুরুষেরা। নজরুল এই ঐতিহ্যের অনুসারী বলেই তাঁর পক্ষে সাম্যের এই ঘোষণা এবং সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়েছে।

নজরুল নারী পুরুষের ব্যবধান অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য ব্যবধান দূর করার কথাও দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেছেন। ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়েই উভয়ের পরিপূরক, পোশাকের মত। মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত রয়েছে—এই বাণী নারীকে উঁচু মর্যাদায় আমিন করেছে। নারীর কর্মের ফল পুরুষের সমান সমানই গ্রহণ করা হয়েছে। তাইতো নজরুল বলেন—

(১) সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। (নারী)

(২) অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়। (ঐ)

নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা-কোন মতবাদ বা তত্ত্বকথা হিসেবেই পরিচিত হয়নি। নজরুল তার সাম্যবাদী ইসলামী এই দর্শনকে মানবতাবাদে উন্নীত করেছেন। কোন তত্ত্বকথা বা মতবাদ রূপে নয় বরং কাম্য সুন্দর হিসেবে তা টিকে গিয়েছে সাহিত্যের অমরায়। শ্লোগান হয়েও নয় বরং শিল্প সুন্দর কাব্য, ভাষায় তা হৃদয়ে হৃদয়ে প্রসারিত হয়।

ডঃ ইকবালের মধ্যেও ইসলামের এই সাম্যবাদী চেতনা ছিল।

'উঠো মেরী দুন্‌য়াকে গরীবো কো জগা দো
কাখে উমরী কে দরো দিওআর ছিলা দো
জিস খেত সে দহকান কো ময়স্‌সরনা হো রোযী
উস খেতকে হর খোশা এ গন্দুম কো জলা দো।'
(বাল-ই-জিব্রীল)

ওঠো,জগতের ভুখানাঙাদের জাগিয়া দাও,
ধনীর যক্ষ পুরীর প্রাচীর কাঁপিয়ে দাও,
খেতের শস্যে যে কৃষকের কোন হিস্যা নেই
সে খেতের প্রতি শস্য দানায় আগুন দাও।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথে সাম্যবাদের এই বলিষ্ঠ শিল্পময় আওয়াজ নেই। তিনি আনন্দবাদ তথা মানব প্রেমের জয়গান গেয়েছেন কিন্তু মানব সমাজের বৈষম্য, ভেদাভেদ, জুলুমপীড়নের বিপক্ষে সোচ্চার হতে পারেননি। তার বিশাল রচনা সম্ভারে মানবতা বোধ এসেছে কিন্তু সাম্যবাদ প্রকটিত হয়নি। তবে মানুষের মূল পরিচয়- দুর্বলের প্রতি তার দরদ বেশ কিছু কবিতায় ফুলে উঠেছে—

(১) শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে,
বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।
কহিলাম আমি, তুমি ভূ স্বামী, ভূমির অন্ত নাই
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়ো জোর মরিবার মতো ঠাঁই।
(দুই বিঘা জমি ঃ চিত্রা)

(২) আম্র কহে, একদিন হে মাকাল ভাই
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই, মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি
মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি। (গৃহভেদ : কণিকা)

(৩) পশু শিশু নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
দোহারে বাধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।
(পরিচয় : চৈতালী)

রবিঠাকুর সমাজের সাম্য তিরহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা বা আকুতি প্রকাশ করেননি। নজরুলই বাংলা সাহিত্যে 'সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠার একক দাবীদার। নজরুলের আকুতি,

'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি,
সাম্য মৈত্রি এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি খ্যাতি।'

মুসলিম জাতিই সারা বিশ্বে সাম্যমৈত্রী তথা মানবতাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বপ্নচারী সাম্যবাদী কবি তাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন—

এক দেহ এক দিল এক প্রাণ,
আমির-ফকির এক সমান,
এক তকবীরে উঠি জেগে, আমার হবেই হবে জয়।

সাম্যবাদী এই সমাজ গড়ার জন্য কবি ইসলামের মহানবীকে অনুসরণ করার কথা অত্যন্ত দরদের সাথে বলেছেন—

www.pathagar.com

মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন
এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই কহিল যে জন,
মানুষের লাগি' চির-দীন বেশ নিল যে জন
বাদশা-ফকির এক শামিল করিল যে জন,
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি।
আজি মাতিল বিশ্ব নিখিল মুক্তি-কলরোলে॥

সাম্যবাদী নজরুলের এই স্বপ্ন মিথ্যা নয়।

ইসলামের সাম্যবাদ প্রসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির পণ্ডিতবর্গ ভাল মন্তব্য করেছেন।

Mr. H.A.R.; Gibb তার Whither Islam পুস্তকে বলেন :

Islam has still the Power to reconcile apparently irreconcilable elements of race of Tradition. If ever the oppostion of the great societies of the East and the West is to be replaced by co-operation, the mediation of Islam is an indispensiable condition.

—জাতি এবং ঐতিহ্যের দৃশ্যত: অসামঞ্জস্য উপাদানগুলির সামঞ্জস্য বিধানের শক্তি এখনও ইসলামের আছে। যদি কখনও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বড় বড় সমাজের বিরোধিতার স্থানে সহকারিতা আনতে হয়, তবে ইসলামের মধ্যস্থতা একটি অপরিহার্য নির্ধারণ।

চুরুলিয়ায় যে মক্তবে নজরুল পড়াশোনা করেন

www.pathagar.com

নজরুল : পথিকৃত কবি

ফাহমিদ-উর-রহমান

নজরুল তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সফলতা লাভ করেছেন। তার মনোহরণ কবিতা, চিত্তবিদারি গান এবং জীবনমানতা সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্খা, প্রত্যাশা, প্রত্যয় ও জাগরণের মর্মমূলে স্থান করে নিয়েছে। তার মত করে আর কেউ বাঙালী পাঠকদের, আরো বিশেষ করে বললে বাঙালী মুসলমানদের চিত্তবৃত্তিতে এত বেপরোয়া ভাবে শিকল ভাঙার গান গাওয়ার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। নজরুলের আগেও বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অনেক সাহিত্যব্রতীর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হলো তাদের সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যয়ের পূর্ণ তেজ আমরা কখনো পুরোপুরি অবলোকন করতে পারিনি। নজরুলের মধ্যে এসে আমরা সেই অঙ্গীকারের শব্দগুলো দেখে প্রথমবারের মত সচকিত হয়ে উঠি।

নজরুল তাঁর কবি-জীবনের সূচনাতে শাতিল আরব, মোহররম, কোরবানী, খেয়াপারের তরণী প্রভৃতি যেসব জনপ্রিয় কবিতাগুলো লিখেছিলেন তার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল মুসলমানের স্তিমিতপ্রাণ জীবনধারার প্রতি ক্ষোভ ও ধিক্কার, সেই সাথে নতুন করে জীবনারম্ভের প্রতি নিষ্কুণ্ঠ কামনা: বলা বাহুল্য কবিতাগুলোর নতুনত্ব, অভিনবত্ব ও বাণীর অপূর্ব বিদ্যুৎ দীপ্তি সেকালেই বাংলা সাহিত্যে কবির ভবিষ্যৎ স্থান কোথায় হবে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ঘোষণা করেছিল। এরপর কবি 'বিদ্রোহী' হাতে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। বিদ্রোহীর অন্তর্গত বাণী তার আগের লেখা কবিতাগুলো থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয় বরং বলা যায় বিদ্রোহীতে এসে তার প্রত্যয়ের পূর্ণতা লাভ ঘটে এবং নিজের অশেষ শক্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি আরও বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। বিদ্রোহীর প্রকৃতি বিচার করতে গেলে মানতেই হবে এমন তারুণ্যের, শক্তির ও উন্মাদনার কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নেই। বিদ্রোহীর মধ্যে কবির এক ধরনের আত্মবোধ আর আমিত্বের যেমন অঙ্গীকার আছে তেমনি তিনি নিজেকে বিবেচনা করেন জগতের সমস্ত দুঃস্থ মানবতার মুক্তিপথের কাণ্ডারী হিসেবে। একালে যারা জীবনবাদ ও গতিবাদের শ্রেষ্ঠ কবি, আমিত্বের অঙ্গীকার ঘোষণার

www.pathagar.com

যারা বার্তাবাহী যেমন ইকবাল ও ওয়াল্ট হুইটম্যান তাদের সাথে কবির বিদ্রোহীর অন্তর্গত বাণীর চমৎকার এক সাযুজ্য লক্ষণীয়। বিদ্রোহীর এই সব চরণ লক্ষ্য করবার মতো।

আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ
আমি চিনেছি আমারে আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ

নজরুলের কবিতার এই গতিমানতার দিকটি বুঝতে হলে আমাদেরকে তার সময় ও কালের দিকে নজর দিতে হবে। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম যখন কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিসেবে বাংলা সাহিত্যের তোরণদ্বারে করাঘাত করতে শুরু করেন, তখন বাঙালী মুসলমানের জীবনে চলছিল এক সর্বব্যাপী হতাশা ও প্রত্যয়হীনতার মধ্য দিয়ে। সিপাহী বিদ্রোহ ও ওহাবী বিদ্রোহ তখন পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। ইংরেজের অপচার ও নৈরাজ্য প্রতিরোধ করবার শক্তি তখন মুসলমানদের একেবারেই নেই অথচ তাদের বিক্ষুব্ধ মানসিকতা তখনও খুঁজে ফিরছে একজন নিশানবরদারকে। এরকম দিক-বিদেশহীন অবস্থায় নজরুলের আবির্ভাব হয়েছিল, যখন তার প্রয়োজন পড়েছিল জিঞ্জীর ভাঙা গানের বাণী তৈরীর। মোহররম কবিতার বিখ্যাত চরণগুলো আমরা মনে করতে পারি—

দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম—
লহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।

অথবা নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্যান-ইসলামী কবিতা আনোয়ার পাশার দুএকটি চরণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেয়া যেতে পারে—

আনোয়ার! আনোয়ার!!
যে বলে সে মুসলিম জিব ধরে টানো তার!

এ সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে সমসাময়িক মুসলমান সমাজের জন্য এক প্রবল বেদনা ও বিক্ষোভ যেমন মর্মরিত হয়েছে তেমনি তাদের জড়তা, নির্জীবতা, আর নিস্পৃহতাকে আঘাত করেছেন তিনি প্রচণ্ড গতিতে। নজরুল সাহিত্যের এই জীবনমানতা ও গতিমানতা হচ্ছে তার স্বকাল ও স্বসমাজের গতানুগতিকতা ও অচলায়তন ভাঙার অঙ্গীকার।

নজরুল বাংলার আপামর মুসলমান জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন এই কারণে যে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রকৃত রূপটিকে তিনি পরিপূর্ণভাবে বাংলা কবিতা ও সংগীতের জগতে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। কবি তাঁর সুবিখ্যাত 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন বিশ্ব কলালক্ষীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। এই মুসলমানী ঢংটা তার মত আর কেউ বাংলা সাহিত্যের জগতে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। নজরুল এক হিসাবে বাংলা সাহিত্য বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন বিপুল পরিমাণ আরবী ফারসী উর্দু শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে। পলাশীর বিপর্যয়ের পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে ইংরেজ পাদ্রী ও হিন্দু পণ্ডিতদের বাংলা সাহিত্যকে

www.pathagar.com

মুসলমান প্রভাব মুক্ত করার জন্য যে রণমহড়া শুরু হয়েছিল বলা চলে নজরুল সেই বিপদাশংকা থেকে আমাদের রক্ষা করেছিলেন। নজরুলের আগে যে সমস্ত মুসলমান কবি ও লেখকেরা এসেছিলেন তাদের সৃষ্টিতে এই মুসলমানী ঢং-এর অনপুস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তাদের সৃষ্টিতেও আকুতি ছিল কিন্তু যা ছিল না তা হচ্ছে বাঙালী মুসলমানের মুখের ভাষা, তাদের দৈনন্দিন সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিফলন। দেশ ও জাতির প্রতি নজরুলের এই প্রেম মোহমুগ্ধতা, অঙ্গীকার ও আত্মনিবেদনের ছোঁয়াই তাকে এ কালে পথিকৃত কবির। ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে।

চুরুলিয়ায় যে বাড়িতে নজরুল জন্মলাভ করেন

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
জাতিসত্তার প্রয়োজনে নজরুল

নজরুল কেন জাতীয় কবি ?
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

কাজী নজরুল ইসলাম এবং আমরা
আখতার-উল-আলম

হারিয়ে যাওয়া মুক্তোর সন্ধানে
কমোডর (অব:) এম. এ. রহমান

জাতীয় কবি ও বিশ্বকবি
ওবায়দুল হক সরকার

নজরুল জন্মশতবর্ষ এবং কতিপয় প্রস্তাব
মুন্সী আবদুল মান্নান

নজরুল প্রতিভা : আমাদের জাতিসত্তার নিরিখে
মাসুদ মজুমদার

নজরুলের ব্যথার দান : প্রেম এবং দেশপ্রেম
রফিক মুহাম্মদ

www.pathagar.com

নামাপাড়ার পথে, শুকনির বিলের কিনারে এই সেই বটগাছ যার ডালে এবং নিচে বসে
কবি নজরুল বাঁশী বাজাতেন।

www.pathagar.com

নজরুল কেন জাতীয় কবি?

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

নজরুল কেন জাতীয় কবি? এরকম একটি প্রশ্ন অনেকের মনেই রয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্নটি লিখিত এবং অলিখিতভাবে, উচ্চারণও করেন। নজরুল কেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি? এমন প্রশ্নের অস্তিত্বও রয়েছে অনেকের মনে, কেউ-কেউ লিখিত এবং অলিখিতভাবে প্রশ্নটি উচ্চারণ ও উপস্থাপন করেছেন। এসব প্রশ্ন নিয়ে অনেকে বিতর্কেও জড়িয়েছেন।

নজরুল কেন জাতীয় কবি? কিংবা, নজরুল কেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে 'জাতীয় কবি' কে হতে পারেন, জাতয় কবি কাকে বলা যায়, জাতীয় কবি ও তাঁর কব্যে চারিত্র্যধর্ম কি, সে সম্পর্কেই আলোচনা করতে হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে হতে পারেন, কার সেই অধিকার ও দাবী রয়েছে, কার কাব্যের চারিত্র্যধর্ম সে-দাবী ও অধিকারের অনুকূলে, সে-সম্পর্কেও আলোকপাত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথমেই বলে নেয়া ভালো যে, জাতীয় কবি তিনিই হতে পারেন- যাঁর কাব্যে জাতির আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-কল্পনা, সংগ্রাম-সাধনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, এবং সামগ্রিক আত্মপরিচয় বিধৃত। জাতীয় কবি তিনিই হতে পারেন- যার কাব্য শুধু জাতীয় সাহিত্যের ভান্ডারই সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে না, জাতীয় ভাষাই সমৃদ্ধ করে না, দেশের মাটি, মানুষ, প্রকৃতি এবং দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-কল্পনা, সংগ্রাম-সাধনার রূপায়ণ ঘটায় ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও স্বাতন্ত্র্য নির্বিশেষে সবার পরিচয় বিধৃত করে। জাতীয় কবি তিনিই হতে পারেন– যার কাব্য সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বশীল। জাতীয় কবির কাব্যের প্রকৃতি ও চারিত্র্যধর্ম সম্পর্কে হয়তো আরও অনেক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া যেতে পারে। তবে সংক্ষেপে এ কথা বলতেই হবে যে, যে-কবির রচনায় ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশ ও জাতির অন্তর্গত সর্বশ্রেণীর মানুষের আত্মপরিচয় ও আশা-আকাঙ্খার,

www.pathagar.com

সংগ্রাম-সাধনার প্রতিফলন এবং বলিষ্ঠ রূপায়ণ নেই, তিনি জাতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রূপকার হয়তো হতে পারেন, কিন্তু জাতীয় কবি হতে পারেন না।

এই প্রেক্ষিতে 'জাতি' এবং 'জাতীয়-সাহিত্য' ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোকপাত করতে হয়, জাতি এবং জাতীয় সাহিত্য কাকে বলা যায়, জাতি ও জাতীয় সাহিত্যের সংজ্ঞা ও চারিত্র্যধর্ম কি, সে বিষয়েও আলোকপাত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। 'জাতি' কাকে বলে, কি উপাদানে জাতি গঠিত হয়, জাতির সংজ্ঞা কি— এ নিয়ে নানা মতভেদ আছে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও অন্ত নেই। তবুও সংক্ষেপে বলা যায়, ভৌগলিক এলাকা, দেশ রাষ্ট্র, ধর্ম, ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদিই জাতি গঠনের উপাদান হিসাবে কাজ করে, এসবের এক বা একাধিক উপাদানকে কেন্দ্র ও অবলম্বন করেও জাতি গঠিত হতে পারে। মোটামুটিভাবে একথা বলা চলে যে সমাজবদ্ধ মানুষের এক বা একাধিক জাতিরূপে গড়ে উঠার কিংবা কোনো বিশিষ্ট জাতিগঠনের মূলে অনেক উপাদানই কাজ করে, বহুকালের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারা, বংশ, ধর্ম, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্য এবং একই ঐতিহাসিক বিকাশ জাতিগঠনে বিশেষরূপে সহায়তা করে। তবুও অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, জাতি গঠনের আসল উপাদান হচ্ছে একটি সিন্টিমেন্ট এবং একটি অনুপ্রেরণা। আর এই সেন্টিমেন্ট হচ্ছে সাম্যবোধের এবং অনুপ্রেরণা হচ্ছে একই জনসমষ্টির অধিকারী হওয়ার প্রবণতার। বস্তুত: মানুষের জাতীয়তাবোধের পেছনে একসঙ্গে বাস করার অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছা কার্যকর, যাকে বলা যেতে পারে পারিবারিক অনুভূতিরই পরিশোধিত ব্যাপ্তি।বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, এই ধরনের অনুভূতি থাকলে একটি জাতিকে একটি রাষ্ট্রে সংগঠিত করা সহজ। বস্তুত: জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার এবং জাতি গঠনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কোনটি কখন প্রাধান্য পাবে, এবং একসঙ্গে বাস করার অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবে, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই নির্ভর করে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর।

জাতি গঠনের উপাদান, অবলম্বন ও কার্যকারণ সম্পর্কে এখানে যে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো, তার আলোকে এবং প্রেক্ষিতে দেখলে, ভারতীয় জাতি, বাঙালী জাতি, হিন্দু জাতি, মুসলিম জাতি ইত্যাকার জাতি এবং ভারতীয় জাতীয়তা, বাঙালী জাতীয়তা, হিন্দু জাতীয়তা, মুসলিম জাতীয়তা ইত্যাকার জাতীয়তার উদ্ভব, বিকাশ, বিবর্তন এবং কার্যকারণের সূত্রসন্ধান মিলবে। এবং কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য কেন বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আত্মপরিচয়, জাতির আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-কল্পনা, সংগ্রাম-সাধনার ধারক-বাহক হতে পেরেছে। তিনি কেন বৃটিশ যুগেই জাতীয় কবির অভিধায় চিহ্নিত হয়েছেন, কেন তিনি জাতীয় কবির দাবীদার হতে পারেন, তার যথার্থতাও উপলব্ধি করা যাবে। প্রথমে বৃটিশ যুগের অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের পটভূমি এবং প্রেক্ষাপটের কথাই ধরা যাক। অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের পটভূমিতে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় বিচারে ভারতের অধিবাসী

www.pathagar.com

মাত্রই ভারতীয় এবং ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও, সবাই ভারতীয় জাতীয়তার অন্তর্গত– এই ছিল তখনকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জনসম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের দাবী। যদিও ধর্ম, ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিচারে ভারতের অধিবাসীরা এক ও অভিন্ন জাতি নয়, ভারতে বহু জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রাদায়ের বাস একথাও বাস্তবতার আলোকে এবং যুক্তি-তর্কের সাথেই উচ্চারিত হয়েছে। তবুও, অবিভক্ত উপমহাদেশ তথা বৃটিশ ভারত এক দেশ ও এক জাতি– এই বক্তব্য এবং সংজ্ঞা সূত্র মেনে নিলেও দেখা যায় যে, কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে রয়েছে ভারতীয় জাতীয়তার বলিষ্ঠ ও বিচিত্র প্রতিফলন, উপমহাদেশ তথা অবিভক্ত ভারতের সমগ্র জনমণ্ডলীর আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-কল্পনা ও সংগ্রাম-সাধনা তাতে বাঙ্ময়, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামী প্রেরণায় তা উজ্জীবিত। অবিভক্ত ভারতে জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রনায়ক কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে যেমন ভারতীয় পটভূমিতে স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি-প্রীতি ও জাতীয়তাবোধ বাঙ্ময় করে তুলেছেন, তেমনি বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়ে কারাবন্দীও হয়েছেন, জেলে গিয়েও তিনি রচনা করেছেন শিকল ভাঙ্গার গান। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়, ভাষা-সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসী নিয়ে গঠিত যে 'ভারতীয় মহাজাতি' তাদের আশা-আকাঙ্খা, সংগ্রাম-সাধনার রূপকার হিসাবে দেখলেও নজরুল কেন জাতীয় কবি, এ সত্য উপলব্ধি করা যাবে।

বর্তমান আলোচনার গোড়াতেই উল্লেখিত হয়েছে যে, জাতি ও জাতীয়তা বিভিন্ন পর্যায়ে নানা উপাদানে গঠিত হয়, এবং তাতেও বিবর্তনের স্পর্শ লাগে, জাতি ও জাতীয়তা সর্বদা ও সর্বথা এক ও অভিন্ন থাকে না। অবিভক্ত উপমহাদেশে এবং সেই বৃটিশ যুগে ভারতীয় জাতীয়তার পরিপোষক থাকলেও, কাজী নজরুল ইসলামও এ-সত্য জানতেন এবং মানতেন। সেই কারণেই অভিন্ন ভারতীয় জাতীয়তার প্রবক্তা হলেও, সেকালেই তিনি বাঙ্গালী জাতীয়তা এবং হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তা সম্পর্কেও ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। জাতিগঠনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ভূমিকা পালন করে, সে সম্পর্কেও নজরুলের চেতনা ছিল অত্যন্ত গভীর। এ কারণেই নজরুল ভারতীয় জাতীয়তা ও জাগরণের গান গেয়েছেন আবার তারই কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে: 'মোরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান/ মুসলিম তার নয়নমণি/হিন্দু তাহার প্রাণ।' ধর্ম যে জাতি গঠন ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির এক বড় উৎস ও প্রেরণা, এ সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন বলেই ভারতীয় জাতীয়তা এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক বড় প্রবক্তা হয়েও নজরুল প্যান-ইসলামিজমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন: 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।'

বৃটিশ যুগে ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, সে কথা অবিভক্ত বাংলায় এবং বাঙালী জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতেও সত্য ছিল এবং সে কারণে বৃটিশ যুগে অবিভক্ত বাংলার পটভূমিতেও হোক, আর বাঙলার পটভূমিতে

www.pathagar.com

এক বৃন্তে দু'টি কুসুম' হিন্দু-মুসলমান' সম্পর্কে এবং তাদের মিলন, ঐক্য ও সম্প্রীতি বিষয়ে অনেক অনুপ্রেরণাদায়ক কবিতা গান রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, ভারতীয় পটভূমিতে হোক, আর বাঙলার পটভূমিতেই হোক, নজরুল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, মিলন এবং সম্প্রীতি কামনা করলেও, তারা যে ভৌগোলিক ও দেশীয় পটভূমিতে এক বৃন্তে দু'টি কুসুম' এবং এক বৃন্তে একটি বা অভিন্ন কুসুম নয়, এ সত্য বিস্মৃত হননি। অর্থাৎ জাতি এবং জাতীয়তার বিচারে ফেডারেশনই (ফিউশন নয়) ছিল নজরুলের কাম্য। নজরুল ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সব মানুষের তথা সমগ্র জনমন্ডলীর জাগরণ ও নব-উত্থান কামনা করেছেন, তাদের আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-কল্পনা ও সংগ্রাম-সাধনার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এ কথা যেমন অবিভক্ত ভারতের, তেমনি বাংলার পটভূমিতেও সত্য। তবুও, ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সব মানুষের তথা সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্খার, স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-অনুভূতির, সংগ্রাম-সাধনার রূপকার হলেও হিন্দু-মুসলমান— এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় ভারত ও বাংলার প্রধান দুই জনগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় আত্মপরিচয় ও জাতীয়তাবোধের ধারকদের আকাঙ্খা ও অভীপ্সাই নজরুল কাব্যে স্বতন্ত্রভাবেও ভাষা পেয়েছে। এ-কারণেই, হিন্দু-মুসলিম মিলিত জাতীয়তার দিক থেকেই হোক, যে-ভাবেই দেখা হোক না কেন, জাতীয় আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-কল্পনা, আবেগ অনুভূতি ও সংগ্রাম-সাধনার রূপকার হিসাবে নজরুল জাতীয় কবির দাবীদার থেকেই যান।

ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত আত্মপরিচয়ের নিরিখে না দেখে যদি কেবল সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এবং আর্থ-সামাজিক ও শ্রেণীগত অবস্থান থেকেও দেখা হয় তা'হলেও এ-সত্য স্বীকার করতে হবে যে, জাতীয় কবি তিনিই হতে পারেন যার কাব্যে দেশ ও জাতির জনমণ্ডলীর অন্তর্গত সাধারণ মানুষ, সব পেশাজীবী জনগণ তথা কৃষক, শ্রমিক, জেলে, কুলি-মজুর নির্বিশেষে সবার-শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের জীবন ও যন্ত্রণা এবং আশা-আকাঙ্খা ও সংগ্রাম-সাধনা ভাষা পায়। নজরুল-কাব্যে এ ব্যাপারটি যে অত্যন্ত ব্যাপক ও বলিষ্ঠভাবে ঘটেছে, তিনি যে দেশ জাতির অন্তর্গত অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দু:খ, আশা-আকাঙ্খা এবং স্বপ্নকল্পনাই তাদের রচনায় প্রতিফলিত হয়, সর্বজনীন আবেদনের অধিকার অর্জন করে। কিন্তু কবিও কোনো না কোনো দেশ ও সমাজ সীমার বাসিন্দা এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতির অন্তর্গত। সে-কারণেই তাঁর কাব্যেও স্বদেশ স্বজাতি এবং স্বদেশের মানুষের আলেখ্য বিধৃত হয়, তাদের আশা-আকাঙ্খা ও সুখ-দু:খ ভাষা পায়। নজরুলের কাব্যে প্রধানত: স্বদেশ ও স্বজাতির এবং স্বদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দু:খ, স্বপ্ন-কল্পনা ও সংগ্রাম-সাধনার কথা ভাষা পেয়েছে এবং দেশ, সম্প্রদায় ও জাতি নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন মানুষের অভীপ্সাও রূপায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় কবি তিনিই হতে পারেন, যিনি আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বজনীনতার ব্যাপারটাকে অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা করেন না, কিন্তু দেশীয় ও জাতীয় ব্যাপারকে স্বদেশ ও স্বজাতির মানুষকে বড় করে দেখেন। নজরুল কেন জাতীয় কবি– বর্ণিত নিরিখে বিচার করে দেখলেও তার উত্তর মিলবে।

www.pathagar.com

জাতীয় কবি শুধু দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় তথা মাতৃভাষায় কাব্যরচনা করেই তার দায়িত্ব শেষ করেন না তিনি তার কাব্য সাধনার মাধ্যমে ভাষাকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেন, দেশ ও জাতির অন্তর্গত জনমণ্ডলীর তথা সাধারণ মানুষের ভাষাও তার রচনায় স্থান দেন, জনজীবনে প্রচলিত ঘরোয়া জবান তথা শব্দাবলী, বাকভঙ্গী, ইডিয়ম ইত্যাদিও গ্রহণ করে ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন. জনজীবনের সঙ্গে সেতুবন্ধনও রচনা করেন। স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্গত সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে, দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যধারার সঙ্গে এবং বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলিম এই দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পারিবারিক ও সামাজিক ভাষার বিশেষত: ঘরোয়া জবানের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের ছিল ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়। সমগ্র জাতীয় জীবন এবং জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন বলেই নজরুল তাঁর কাব্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে যেমন রূপায়ণ ঘটিয়েছেন, তেমনি তাঁর কাব্যের ভাষায় অবলীলায় ব্যবহার করেছেন উভয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রচলিত ভাষার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। নজরুল কবিতায় শুধু সূক্ষচেতনা এবং সৌন্দর্যের সাধনাই করেননি, সাধারণ মানুষের বিচিত্র সমস্যা, সুখ-দু:খ-বেদনাবোধ এবং সংগ্রাম সাধনাকেও তিনি কাব্যের উপজীব্য করে নিয়েছেন, এবং বিষয়ের তাগিদেই নজরুলকে অনেকখানি প্রচলিত ভাষা- ঘরোয়া জবান ব্যবহার করতে হয়েছে, হাত পাততে হয়েছে হিন্দু-মুসলিম উভয় ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে। নজরুলের আবির্ভাবে শুধু বাংলা কাব্যে উপজীব্যেরই পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটেনি, ভাষারও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সংস্কৃত ও হিন্দু ঐতিহ্যমণ্ডিত শব্দাবলী ও ভাষার পাশাপাশি এবং স্বতন্ত্রভাবেও বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত আরবী-ফারসী শব্দাবলী ও ভাষা ব্যাপকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছে। এই বাস্তবতার আলোকে দেখলেও নজরুল কেন জাতীয় কবি- এই সত্যের সূত্র সন্ধান মিলবে।

সাহিত্যের ইতিহাসই একথা সপ্রমাণ করে যে, সমগ্র জাতির (তা সে ভৌগলিক, ভাষাগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যগত- যেদিক থেকেই হোক না কেন) উত্তরাধিকারকে প্রাণ-সম্পদরূপে গ্রহণ করতে পারলে তবেই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। কারণ জাতীয় সাহিত্য শুধু জাতীয় ভাষা এবং ভৌগোলিক রূপ-প্রকৃতিকেই রূপ দেয় না, তা জাতির শত শতাব্দীব্যাপী মন-মানস এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিচয়ও রূপায়িত করে। জাতীয় নবজাগরণের অন্যতম বলিষ্ঠ অগ্রনায়ক এবং জাতীয় সাহিত্যের অনন্য সাধারণ রূপকার নজরুল এ-সত্য স্পষ্টত উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের এবং বাংলারও দুই স্বতন্ত্র প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়— হিন্দু ও মুসলমানের এবং এই জাতির সুদীর্ঘকালীন ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি অনেকটাই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, অভিন্ন জাতীয় মানসচেতনাও গড়ে ওঠেনি, এবং এ উপলব্ধির পটভূমিতেই নজরুল জাতীয় ঐক্য সাধনের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেষ্টা করেছেন, সাহিত্যেও উভয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি সংস্থাপন এবং মিলনের প্রয়াস চালিয়েছেন। উল্লেখ্য, মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রেই ভাষা ও সাহিত্যে এই মিলনের সাধনা করেছেন, ফলে দুই সম্প্রদায়ের পরিচয় ও উত্তরাধিকার তাঁদের রচনায় বিধৃত হয়েছে। নজরুল ছিলেন ভারতের এবং বাংলারও জাতীয় জাগরণের কবি। দেশের আপামর সাধারণ এবং দুই প্রধান ধর্মীয় জনসম্প্রদায়ের জাগরণ ও মুক্তির প্রেরণারই বাণীরূপ দিয়েছেন তিনি। ফলে তাঁর রচনায় যেমন মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনা, আশা-আকাঙ্খা এবং মানস-পরিচয় রূপ পেয়েছে, তেমনি রূপ পেয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের সামগ্রিক মানস-পরিচয়ও। ভাষা ও সাহিত্যে- ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি যেমন মিলনের পথ রচনার চেষ্টা করেছেন, তেমনি এ সত্য বাস্তবে তুলে ধরেছেন যে, দুই জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্রধর্মীয় জাতিগত চৈতন্য সৃষ্টির প্রয়োজনে এবং মানসরূপে সাহিত্যিক রূপায়ণের স্বার্থে দুই স্বতন্ত্রধর্মী ও ঐতিহ্যনির্ভর সাহিত্য রচনাও অপরিহার্য। বৃটিশ যুগে ভাষা ও ভূগোলের অভিন্নতা সত্ত্বেও নজরুল বাস্তব কারণেই এ সত্য উপলব্ধি না করে পারেননি। এখানেই নিহিত নজরুল সাহিত্যের জাতীয় চারিত্রের আসল পরিচয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানস-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার নজরুলের কবিতা-গানে রূপ লাভ করেছে। আর এ কারণেই, জাতীয় আশা-আকাঙ্খার রূপায়ণে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে এবং সকল জাতীয় সংকটে নজরুলের গান, কবিতা ও অন্যান্য রচনার বাণী উভয় সম্প্রদায়ের– সব বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে, উভয়ের এবং সবার মনোবিকাশের ধারায়ই নজরুলের গান-কবিতা ইত্যাদির আবেদন হয় অমোঘ। এদিক থেকে দেখলেও নজরুল কেন জাতীয় কবি– তাঁর উত্তর মিলবে।

নজরুল যে কারণে জাতীয় কবি— ঠিক একই কারণেই বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

আলোচনায় নজরুল কেন জাতীয় কবি— এ বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করেছি। সে-আলোচনার শেষে আমাদের বক্তব্য ছিল, নজরুল যে কারণে জাতীয় কবি ঠিক একই কারণেই বাংলাদেশের জাতীয় কবি। আমাদের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের স্বার্থেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় পটভূমি ও জাতিগত আত্ম-পরিচয় সংক্ষেপে বিধৃত করা দরকার, একই সঙ্গে বৃটিশ যুগে-অবিভক্ত ভারতীয় উপ-মহাদেশে এবং বিশেষভাবে সেকালের অবিভক্ত বাংলায় নজরুলের সাহিত্য-সাধনা ও বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের পটভূমিতে তাঁর চিন্তাচেতনা এবং মানসধারাও সংক্ষেপে বিধৃত করা বাঞ্ছনীয়।

উল্লেখ্য, কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন চলতি শতকের বিশের দশকে— বৃটিশ যুগে এবং অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলার পটভূমিকায়। স্বাভাবিক কারণেই নজরুলের কবিতা-গান ও অন্যান্য রচনায় অবিভক্ত ভারত ও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশে ভৌগোলিক রূপ-প্রকৃত নি:স্বর্গ সৌন্দর্য-মহিমা এবং মাটি ও মানুষ বিচিত্ররূপে বিধৃত হয়েছে। তবুও, অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের পটভূমিকায় দেখলেও, সেকালে বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপ-প্রকৃতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা এবং মাটি ও

www.pathagar.com

মানুষই নজরুলের কবিতা, গান ও অন্যান্য রচনায় ব্যাপকভাবে এবং গভীরতররূপে প্রতিফলিত। এর বাস্তব কারণ এই যে, বৃটিশ যুগে এবং অবিভক্ত ভারতের পটভূমিকায় সাহিত্য-সাধনা করলেও নজরুল জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় এবং অবিভক্ত উপমহাদেশের পটভূমিকায় সাহিত্য-সাধনা এবং জীবন-চর্চা করলেও, নজরুলের সাহিত্য-সাধনার ভাষা বাংলা- যা একাধারে কবির মাতৃভাষা এবং সামগ্রিক আত্মপ্রকাশের ভাষাও বটে। সুতরাং, নজরুলের কবিতা গান ও অন্যান্য রচনায় স্বাভাবিকভাবে এবং বাস্তবসম্মত কারণেই আপন সন্নিহিত পরিবেশের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ তৎকালীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপ-প্রকৃতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা, মাটি ও মানুষ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ব্যাপকতররূপে ও গভীরতরভাবে বিধৃত হয়েছে। নজরুল পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেও, তাঁর বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপ প্রকৃতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা এবং মাটি ও মানুষের পরিচয় ব্যাপকতর রূপে বিধৃত হয়েছে, তার কারণ নজরুলের জীবনের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত। তাঁর জীবনের একটা বড় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অর্থাৎ কৈশোর, যৌবন ও পরবর্তী কর্মজীবনেরও বিভিন্ন অধ্যায় কেটেছে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে, যা তাঁর সাহিত্য কর্মে ও মনোবিকাশের ধারায় ব্যাপক ও গভীর প্রভাব ফেলেছে। এ দিকটি আমরা পরবর্তীতে পর্যালোচনা করবো।

নজরুল তাঁর একটি রচনায় এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে দেশ শুধু দেশের নিসর্গ-সৌন্দর্য, পাহাড়-পর্বত-নদী-নালা এবং মন্দির-মসজিদ নয়, তাঁর কাছে দেশ অর্থ-দেশের মানুষ। এই ধারণা ও উপলব্ধির কারণেই, মূলত: রোমান্টিক মানস-প্রবণতা এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার হলেও, নজরুল তাঁর কবিতা-গান ও অন্যান্য রচনায় শুধু স্বদেশের ভৌগোলিক রূপ-বৈচিত্র্য, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা এবং ব্যক্তিমনের আর্তি-আকুলতা প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করেননি, তিনি দেশের মানুষের সুখ-দু:খ, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-সাধনা, আশা-আকাঙ্খা, সংগ্রামী প্রেরণা এবং বাস্তব জীবন-চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন, শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার নিপীড়ন, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদি সব ধরণের মানবতা-বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন, সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে। স্বদেশের এবং ব্যাপক অর্থে বিশ্বের মানুষও নজরুলের কাছে বড় ছিল বলেই তিনি শুধু শিল্পের সাধনায় এবং কলা-কৈবল্যবাদে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের স্বপক্ষে এবং বিশেষভাবে স্বাধীন স্বদেশের মানুষের সপক্ষে লেখনি চালনা করেছেন, সহযাত্রী হয়েছেন তাদের সংগ্রামের। স্বদেশের মানুষ তাঁর কাছে কত বড় ছিল তা একটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট হবে: 'স্বদেশ বলিতে বুঝেছি কেবল/দেশের পাহাড়মাটি বায়ু জল/দেশের মানুষ ঘৃণা করে চাই/ করিতে দেশ স্বাধীন/যত যেতে চাই তত পথে তাই/ হই মা ধূলি-বিলীন। (গুল-বাগিচা) বস্তুত: আমার দেশের মাটি/ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি –এই ধরণের অনেক স্বদেশ-প্রেমমূলক গান ও কবিতার রচয়িতা নজরুল যে দেশের মানুষকে আপন আত্মীয়বোধে চিনে নিয়ে এবং তাদের সংগ্রামের সাথী হয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখ্য, স্বদেশপ্রেম মানুষের একটি মজ্জাগত প্রবণতা। নিতান্ত

www.pathagar.com

উৎকেন্দ্রিক কিংবা ছিন্নমূল না হলে কেউ দেশপ্রেম বর্জিত হতে পারেন না। দেশের মাটি, মানুষ ও ভৌগোলিক রূপ-প্রকৃতির সাথে গভীর ও নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যদিয়েই স্বদেশপ্রেম উৎসারিত হয়। বস্তুতপক্ষে স্বদেশপ্রেম শুধু ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য-প্রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের জনগোষ্ঠীর সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়েও স্বদেশ-প্রেম উৎসারিত। স্বদেশ-প্রেমিক কবি শুধু দেশের নি:স্বর্গ-বন্দনার মধ্যে তার আবেগ ও স্বপ্ন-কল্পনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন না, তিনি দেশ-মাটি, আবহাওয়ার পটভূমিতে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা ও কামনা-বাসনাকে রূপায়িত করেন। আর এ সূত্রেই তাঁর দেশপ্রেম আপন চেতনার রঙ্গে রঞ্জিত হয়। অবিভক্ত উপমহাদেশের পটভূমিকায় কিংবা স্বতন্ত্রভাবে তদানীন্তন বাংলার পটভূমিকায় অথবা পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায়- যে পটভূমিকায় স্থাপন করেই দেখা হোক না কেন, এ সত্য প্রতিভাত হবে যে, নজরুল তার গান-কবিতা ও অন্যান্য রচনায় স্বদেশের ভৌগোলিক রূপ-প্রকৃতি এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্য-সম্ভারকে তুলে ধরলেও, বস্তুতপক্ষে তাঁর গান কবিতায় কিংবা অন্যবিধ রচনায় দেশ-বন্দনা নিছক আবেগ-অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, নজরুলের দেশপ্রেম স্বজাত্যপ্রীতি ও জাতীয়বোধের পটভূমিকাও খুঁজে পেয়েছে। স্বদেশ প্রেমের রূপকার হিসাবে নজরুল সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা ও মুক্তিস্পৃহাকে তার গান ও কবিতার বাঙ্ময় করে তুলেছেন। সমগ্র দেশের জনমন্ডলীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হিসাবে তার কাব্যে যেমন জাগরণবাণী উচ্চারিত হয়েছে তেমনি স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর নবজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও তা সঞ্চারিত করেছে, ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণায় রেখেছে অবিস্মরণীয় অবদান।

এ সত্য অনস্বীকার্য যে, নজরুল এসেই বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ও স্বজাতি চেতনা একটি ব্যাপক পটভূমি খুঁজে পায়। নজরুল স্বধর্ম ও স্বজাতির উত্থান কামনা করেছেন, মুসলমানকে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্বপ্নে উজ্জীবিত হতেও আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কবিতা-গানে হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও বিচিত্ররূপে এবং রেখায় ধরা দিয়েছে। এ কারণেই চলতি শতকের বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে নিরুত্তাপ সমাজ-জীবনে তিনি যে নতুন অনুভূতির উত্তাপ সঞ্চারিত করেছিলেন, তাতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এবং জাতি গোষ্ঠিই সমভাবে অনুপ্রাণিত হলো। নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো: যেথায় মিথ্যা ভন্ডামি তাহা করব সেথাই বিদ্রোহ/ধামাধরা/জামাধরা/মরণভীতু চুপ রহো/আমরা জানি সোজা কথা/পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ/ এই দুলালুম বিজয় নিশান/ মরতে আছি মরব শেষ। (বিদ্রোহীর বাণী)। অনস্বীকার্য যে, অবিভক্ত উপমহাদেশের তথা তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতাই ছিল নজরুলেরও লক্ষ্য এবং কাম্য, তিনিও স্বদেশ বলতে 'ভারত' এবং 'বাংলা' দুই-ই বুঝতেন। ১৯২২ সালে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুল দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন এবং তাতে লিখেন 'ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টারাজ বুঝে না। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।' বস্তুত: সেকালে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে ভারতের স্বাধীনতাই ছিল ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিষে

www.pathagar.com

উপমহাদেশের সব জনমণ্ডলীর কাম্য। কিন্তু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা, বিদ্বেষ, ইংরেজের কূটকৌশল ইত্যাদি বহুবিধ কারণে অবিভক্ত উপমহাদেশ তথা ভারত ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি, ১৯৪৭ সালে বিভক্ত উপমহাদেশ তথা ভারত বিভক্তরূপে 'ভারত ও পাকিস্তান' এ দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। সে পটভূমিকা ও কার্যকারণ বিশ্লেষণের আগে বলা আবশ্যক যে, স্বাধীনতার চারণ কবি এবং হিন্দু মুসলিম নবজাগরণের বাণীবাহক নজরুল বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতার তূর্যবাদক হলেও বাংলার নবজাগরণ বিশেষত: পূর্ববঙ্গের নবজাগরণ এবং স্বাধীনতার স্বপ্নও তাঁর চোখে স্পন্দিত হয়েছে, সেই বৃটিশ পরাধীনতার যুগেও স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন এবং এ দেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্খা থেকেই বিদ্রোহী কবি উচ্চারণ করেছিলেন : 'স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম/সুপ্তবঙ্গে জাগুক আবার/লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম/ কবি তার স্বাপ্নিক-দৃষ্টিতে একদা দেখেছিলেন 'পদ্মা-বুড়িগঙ্গা বিধৌত পূর্ব-দিগন্তে/ তরুণ-অরুণ বীণা বাজে/ তিমির বিভাবরী অন্তে/' একদা নজরুল 'বাঙ্গালীর বাঙলা' দীর্ঘ নিবন্ধে লিখেছিলেন, 'এই পবিত্র বাংলাদেশ/বাঙালীর— আমাদের 'দিয়ে 'প্রহারেন ধনঞ্জ তাড়াব আমরা করিব না ভয়/ যত পরদেশী দস্যু ডাকাতে/ 'রামাদের' 'গামাদের'। সেই বৃটিশ-যুগেই বাংলার বিশেষত: পূর্ববাংলা বা পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপপ্রকৃতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য শোভা এবং সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন মানুষ ও তাদের জাতিগত চৈতন্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'পূর্ববঙ্গ'জীবন্ত হলে, নতুন করে জেগে উঠলে, হিম জর্জর ভারতও নবীন বসন্তে জেগে উঠবে। তিনি লিখেছিলেন: 'পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা বিধৌত পূর্ব-দিগন্তে/তরুণ-অরুণ বীণা বাজে তিমির বিভাবরী অন্তে ব্রহ্ম মুহূর্তের সেই পুরবাণী/জাগায় সুপ্ত প্রাণ, জাগায় নবচেতনা দানি/সেই সঞ্জীবনী বাণী শক্তি তার ছড়ায়/ পশ্চিমে সুদূর অনন্তে।/ উর্মিছন শত নদী স্রোত-ধারায় নিত্য পবিত্র/সিনানশুদ্ধ-পূর্বববঙ্গ/ঘনবন কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য শক্তি প্রবুদ্ধ পূরববঙ্গ/ আজি শুভ লগ্নে তারি বাণীর বলাকা/ অলখ বোমে মেলিল পাখা/ঝংকার হানি তারি পূরধানী জীবন্ত হউক হিম-জর্জর ভারত/নবীন বসন্তে। (পূরববঙ্গ)। সন্দেহ নেই, নজরুল অবিভক্ত ভারত তথা বৃটিশ উপমহাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ছিলেন, এবং বাংলার সংগ্রামী চেতনা ও স্বাধীন সত্তার অন্তর্নিহিত রূপও তাঁর দৃষ্টিতে এবং চৈতন্যেও ধরা পড়েছিল। চল্লিশের দশকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের 'নবযুগ' আমলে রচিত 'জাগো সৈনিক আত্মা' শীর্ষক কবিতায় নজরুল লিখেছেন: 'জাগো অনিদ্র অভয় মুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ/ তোমাদের পদধ্বনি শুনি হোক অভিনব উত্থান/পরাধীন শৃংখল কবলিত পতিত এ ভারতের।/ এসো যৌবন রণ-রস ঘন হাতে লয়ে শমসের।' এবং 'নবাগত' শীর্ষক কবিতায় নজরুল লিখেছেন, মনে পড়ে আজ পলাশীর প্রান্তর/ লরিক লোভ কামানের গোলা বারুদ লইয়া যথ/ আগুন জ্বালিল স্বাধীন এ বাংলায়।' বস্তুত: বৃটিশ যুগে পরাধীন ভারতের জন্যে সুগভীর মর্মবেদনা, স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্খার পাশাপাশি নজরুলের রচনায় বাংলার— এবং বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার স্মৃতি সঞ্জাত বেদনাও মর্মরিত হয়েছে, 'লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম' এর কথা স্মরণ করেও কবি বেদনাহত হয়েছেন। চল্লিশের দশকে এবং 'নবযুগ' পর্যায়ে রচিত অনেক কবিতা গানে নজরুল বাংলার এবং

www.pathagar.com

বিশেষভাবে পূর্ববাংলার সংগ্রামী সত্তার ও প্রাণচৈতন্যের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, বাঙ্গময় করেছেন 'আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন' এর বিচিত্র দিক। নজরুলের ভাষায় 'ঘুমাইয়া ছিল আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন/বহু বৎসর মুখ চেপে ছিল পাঠানের আবরণ/... ঘুমাইয়া ছিল পাথর হইয়া তার বুকে যত প্রাণ, অগ্নিগোলক হইয়া ছুটিছে তীরবেগে সে পাষাণ/ (আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন)।

আগেই বলেছি উপমহাদেশ বিভাগ এবং বাংলার বিভক্তিও নজরুলের কাম্য ছিল না, তিনি আজীবন হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও সম্প্রীতি কামনা করেছেন, ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে যত বিদেশী শাসকদের, শোষকদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে চেয়েছেন। ভারতীয় জাতীয়তাবোধে এবং স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হলেও নজরুল বাঙ্গালী চেতনায়ও 'উদ্বুদ্ধ ছিলেন, যেমনি তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবোধে এবং ইসলামী চেতনায়। স্বদেশ প্রেমিক নজরুলের পক্ষেই তাই উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল 'কিছুতেই যেন ভুলিতে নারি এ মাটির মায়ের মায়া/মোর ধ্যানে হেরি আল্লার পাশে এই বাঙলার ছায়া।' স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ— এ কথা মনে রাখলে স্বদেশ প্রেমিক নজরুলের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। 'বন্ধুরা এসো ফিরে শীর্ষক কবিতায় নজরুল বেদনাহত চিত্রে বলেছেন, 'তোমরা বন্ধু কেহ অগ্রজ, অনুজ সোদর সম,/ প্রার্থনা করি ভাঙ্গিয়া দিও না মিলনে মম। এই সেতুঁ আমি বাঁধিব আমার সারা জীবনের সাধ/ বন্ধুরা এস, ভেঙ্গে দিব যত বিদেশীর বাধা বাঁধ।' কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই দাঁড়া। যে, স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলিম– এই দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, এবং অবিভক্ত বাংলার প্রেক্ষিতে একই ব্যাপার ঘটে। স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী এবং দাবীদার মুসলমানরা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ আমলেই বহুকাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিলনের এবং স্বাধীনতার জন্যে লড়াইয়ের চেষ্টা না করেছে, এমন নয়। কংগ্রেসী, স্বদেশী, অসহযোগ ইত্যাদি আন্দোলনের ইতিহাসে রয়েছে তার পরিচয়। কিন্তু সেই রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা এবং মিলনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর মানুষের সংকীর্ণচিত্ততা এবং প্রতিবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের অনুদারতার দরুন, আন্তরিকতার আর সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নেয়ার মতো উদার মনোভাবের অভাবে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্ম নেয় নাই বলিয়াই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল' তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশতঃ সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানবে না।... আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের আপাতত: যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের পক্ষে ইহাই প্রকৃত উপায়।'

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ কাল ১৩১৮, দ্রষ্টব্য: 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য বাংলা একাডেমী প্রকাশিত।

www.pathagar.com

উপরোক্ত বক্তব্যের পটভূমিতে পর্যালোচনা করলে, নজরুল এবং আরও অনেকের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম মিলন কেন সম্ভব হয়নি, কেন দ্বিজাতিত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীর ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কেন অবিভক্ত বাংলাও বিভক্ত হয়ে যায়। তাই অনুধাবন করা সহজ হবে। ইতিহাস ঐতিহ্য ইত্যাদি অনেক কিছু জাতি গঠনের উপাদান হিসাবে কাজ করে, তবুও জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার এবং জাতি গঠনের অভিন্ন উপাদানের মধ্যে কোনটি কখন প্রাধান্য পাবে, এবং একসঙ্গে বাস করার অনুভূতি, আবেগ, ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই নির্ভর করে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর। একথা মনে রাখলে, কেন উপমহাদেশের মুসলমানরা বৃটিশ আমলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছিল তা যেমন বোঝা যাবে, তেমনি সাবেক পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক, ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস এবং পশ্চিমাদের শাসন শোষণ ও বঞ্চনা নীতির কাহিনী পাঠ করলে বোঝা যাবে কেন, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষ ভৌগলিক ও ভাষাগত জাতীয়তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, কেন অগণিত শহীদদের আত্মদানের মাধ্যমে স্বতন্ত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। নজরুলের কবিতা-গান ও অন্যান্য রচনা কেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অপরিসীম অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছে, এবং কেন তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি সে সত্যও উপলব্ধি হবে।

মনে রাখতে হবে, কাজী নজরুল ইসলাম উপমহাদেশ বিভাগ এবং বাংলা বিভাগেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, উপমহাদেশের মুসলিম নবজাগরণ এবং জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতে, মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীর প্রেক্ষিতেও ভারত উপমহাদেশে বিভক্ত হয় এবং একই ভাবে বাংলাও বিভক্ত হয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে ছিল। এর কার্যকরণ ইতিপূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে। বাংলার এবং ব্যাপক অর্থে উপমহাদেশের মুসলিম নবজাগরণে নজরুলের কবিতা, গান ও অন্যান্য রচনার যে ব্যাপক ও গভীর ভূমিকা, তার কথা স্মরণে রাখলে এ সত্য অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যে, নজরুল উপমহাদেশ ও বিশেষভাবে বাংলা বিভাগের পক্ষপাতী না থাকলেও তাঁর মুসলিম জাগরণমুলক কবিতা গান ইত্যাদি পরোক্ষ হলেও মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমার লীগ কংগ্রেস শীর্ষক এক আত্ম উন্মোচনমূলক নিবন্ধে নজরুল বলেছেন যে, তিনি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের দুই আনার সদস্য না থাকলেও, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুসলিম নবজাগরণ আন্দোলনে তার ভূমিকা ও অবদান কংগ্রেসী নেতা এবং মুসলিম লীগ নেতাদের চেয়ে কম নয়। অনুরূপভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বহু বহুকাল আগে বৃটিশ যুগে এবং ১৯৪২ সালেই নজরুল অসুস্থ ও বাকশক্তিহীন হয়ে গেলেও নজরুলের কবিতা, গান ও অন্যান্য রচনা এদেশের মানুষের

www.pathagar.com

স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছে। একদা নজরুল 'পূর্ববঙ্গ' শীর্ষক কবিতায় এবং 'বাংগালীর বাংলা' শীর্ষক নিবন্ধে যথাক্রমে 'পূর্ববঙ্গের' নবজাগরণ তথা সুপ্ত চেতনার উত্থান অনুধাবন ও কামনা করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন 'যত পরদেশী' দস্যু-ডাকাতে/'রামাদের' 'গামাদের,- বাংলাদেশ থেকে তাড়াবেন। বস্তুত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমা অবাঙ্গালী শাসক শোষকদের পরাজয়ে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এ দিক থেকে দেখলেও নজরুল কেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি তা অনুধাবন করা সহজ হবে।

নজরুল শুধু বাংলাদেশের ভৌগলিক রূপ-প্রকৃতি এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমার অনন্য সাধারণ রূপকারই নন, তিনি এখানকার জনগণের, দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মানস চেতনা এবং জাতীয়তাবোধেরও অসামান্য রূপকার। শুধু ভৌগলিক এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার দিক থেকেই নয়, সমাজ-সংস্কৃতির সংগঠনের দিক থেকেও, নজরুলের রচনা বাংলাদেশের জনগণের মানসচেতনা এবং আশা-আকাঙ্খা ও সংগ্রাম সাধনার প্রতিনিধি স্থানীয়।ধর্মনিরপেক্ষতা এবং শ্রেণীগত অবস্থানের নিরিখে দেখলেও লক্ষ্য করা যাবে যে, বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগণ তথা দারিদ্র্যপীড়িত, শোষিত বঞ্চিত মানুষ নজরুলের কবিতা গান ও অন্যান্য রচনায় বিচিত্ররূপে বিধৃত হয়ে আছে। বাংলাশের ভৌগলিক, রূপ প্রকৃতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য মহিমা ইত্যাদির পাশাপাশি এদেশের মানুষের জাতীয় আত্মপরিচয়, মানস-চৈতনা, জনজীবন এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্খা ও সংগ্রাম সাধনার কথা নজরুলের রচনায় অনবদ্যভাবে ও অনুপ্রেরণা সঞ্চারীরূপে বিধৃত হয়ে আছে বলেই তিনি জাতীয় কবিরূপে জনহৃদয়ে অভিষিক্ত। আজও সকল দুর্যোগে ও সংকটে এ দেশের মানুষের এবং সামগ্রিকভাবে জাতির হৃদয়ে অনুপ্রেরণা-সঞ্চার করে নজরুলের বাণী 'দুর্গগিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার/লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার/' কিংবা, 'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানেনা সন্তরণ,/ কান্ডারী। আজ দেখিব তোমার মুক্তিপণ।/ হিন্দু না ওরা মুসলিম?/ ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?/ কান্ডারী। বল ডুবেছে মানুষ সন্তান মোর মার।'

অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের প্রেক্ষিতে এবং সে সময় রচিত নজরুলের জাগরণমূলক ও মানবতাবাদী চিন্তা প্রসূত রচনার আবেদন চিরন্তন ও অমোঘ। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলোচনায় বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ভাষাভিত্তিক ইত্যাদি যে-কোনো প্রেক্ষাপটেই বিচার করেই দেখা হোক না কেন, নজরুল যে কারণে জাতীয় কবি, ঠিক একই কারণে বাংলাদেশেরও জাতীয় কবি। বাংলাদেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতি এবং সমাজের সঙ্গে নজরুলের ব্যাপক ও গভীর সম্পর্ক আর এদেশের শ্যামল মাটিতে তাঁর শেষ-শয্যা গ্রহণের ও অম্লান স্মৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে তা আরও যথার্থ এবং তাৎপর্যবাহী হয়ে ওটে।

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলাম এবং আমরা

আখতার-উল-আলম

কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' একটি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যধর্মী উপন্যাস। অনেকেই তার এই উপন্যাসটি পড়েছেন। অনেকে আবার পড়লেও তেমন গভীরভাবে এর মর্ম অনুধাবন করার কোন গরজ অনুভব করেন নাই। আমি নিজেও ছিলাম সেই দলের। বেশকিছু কাল বাংলাদেশ টিভিতে যখন এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ ধারাবাহিকভাবে আগে প্রচারিত হচ্ছিল তখন আমার মত অনেকেই কিন্তু চমকে উঠেছিলেন। টিভিতে কুহেলিকা উপন্যাসের ওই নাট্যরূপ দেখতে গিয়ে মনে হয়েছিল আমাদের ইতিহাসের এক হারান অধ্যায় যেন কথা কয়ে যাচ্ছে। এই দেশটা যে একদা গোটা উপমহাদেশের সাথে বৃটিশদের অধীনস্থ ছিল এবং বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের এই দেশের আমাদের নিজস্ব সমাজের বিশেষত মুসলিম বাংলার তরুণ যুব সম্প্রদায়েরও যে একটা দারুণ সক্রিয় ভূমিকা ছিল, আমরা অনেকেই আজ যেন তা ভুলতে বসেছি।

বস্তুত কাজী নজরুল ইসলাম-এর আবির্ভাব না হলে বাঙালী মুসলমানের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি যে কোথায় হারিয়ে যেত, বিশেষত এদেশের ভাষা, সাহিত্য ও কালচারের ক্ষেত্রে তা নতুন করে ভেবে দেখবার সময় এসে গেছে। ইতিহাস চেতনায় প্রয়োজনীয়তাটা এক্ষেত্রেই সবচাইতে বেশী। কুহেলিকা উপন্যাসে জাহাঙ্গীরের জন্ম সংক্রান্ত বিদ্রোহ, বন্ধু হারুনের বাড়ীতে তার গমন, হারুনের পাগলী মা, তার অভিজাতগর্বী অন্ধ পিতা, খোন্দকার সাহেব, হারুনের দুই বোন ও এক ভাই সব মিলে এমন একটা পরিবেশ যে পরিবেশকে এদেশের শুধু সেকালের নয়, একালেরও বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্বশীল বলা যেতে পারে। স্মর্তব্য যে, নজরুল ইসলামের কালেই আনোয়ারা, মনোয়ারা ধরনের উপন্যাস এদেশে চালু ছিল এবং সেগুলো কম জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু তখনো এমন কোন সাহিত্যিক গুণ ও মানসম্পন্ন উপন্যাস আমাদের ছিল না যে উপন্যাস সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের দিন গুজরান সঠিক ও যথাযথভাবে চিত্রিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। এমন কি কবি গোলাম মোস্তফার মত

www.pathagar.com

স্বাজাত্যগর্বী লেখকের বেলাতেও আমরা দেখেছি তার একাধিক উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী ভিন্ন সমাজের।

কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম কবি যিনি কাব্য সাহিত্যকে রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের বাইরে নিয়ে এলেন এবং এ বিষয় তাকে সহায়তা করেছিল তার নিজস্ব সমাজের স্বতন্ত্র পটভূমি। কাজী কবির কবিতার এই বিদ্রোহ এবং শব্দের গতি ঝংকার নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তারা উপন্যাস, সাহিত্য বিশেষত 'কুহেলিকা' গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়লে দেখা যায়, এক্ষেত্রেও তিনিই প্রথম সাহিত্যিক যিনি বাঙালী মুসলমানের জীবনকে তাদের সামাজিক-পারিবারিক আদব-কায়দা, ভাষা ও বাকভঙ্গী সহকারে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গন ও প্রাঙ্গণে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, পুঁথি সাহিত্যের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে তিনিই বাঙালী মুসলমানকে আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করেছেন। সেকালের বাঙালী মুসলমান সমাজে একদিকে ছিল পুঁথির চর্চা অন্যদিকে ছিল উর্দু ও ফার্সী শায়ের ও গজলের গাওনা। কাজী নজরুল ইসলামই বাঙালী মুসলমান সমাজের জন্য প্রথম নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা আশা ও আকাঙ্খার আলোকে সাহিত্য পদবাচ্য কবিতা ও সঙ্গীত হামদ ও নাত, গান ও গজল বাংলায় রচনা করলেন। তিনিই একমাত্র কবি ও গীতিকার যিনি সকলের পশ্চাদমুখী বাঙালী মুসলিম সমাজের গোঁড়াপন্থীদের সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা এমনকি 'কাফের' ফাতোয়ার জিল্লতি অগ্রাহ্য করেই সমাজের অঙ্গন ও প্রাঙ্গণে পরিবারের অন্দরের ও অন্ত:পুরে অবাধে নিজস্ব স্থান করে নিলেন।

এজন্য অবশ্য 'ফার্সী' শব্দে কবিতা লিখে, পাতনের ধরনের কঠাক্ষ এং গালিগালাজ তাকে কম হজম করতে হয় নাই। আজ বাঙালী মুসরিম সমাজ অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে। সেকালে একদিকে পশ্চাদমুখী সমাজের রক্তশাসন অন্যদিকে প্রতিবেশী সমাজের অনুদার উপেক্ষা সবকিছু অগ্রাহ্য করেই কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালী মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র, স্বাজাত্যবোধকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যথাযথ রূপে উপস্থাপন করতে কোনরূপ দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচে ভোগন নাই। আর সেই 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহসের' দরুনই তিনি সময়ে মুসলিম বাংলার মাথারমণিও বুকের ধন হতে পেরেছিরেন।

আজ আমাদের সমাজে কবি, সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, গায়ক, গীতিকারের কোনও অভাব নাই। কিন্তু কয়জনের সৌভাগ্য হয়েছে এমনভাবে সমাজের ও পরিবারের ঠিক মাঝখানটাতে জায়গা করে নেয়ার? রমজানের সাধনায় ঈদ উল ফেতরের আনন্দে, কোরবাণীর উৎসব, ঈদে মিলাদুন্নবী আয়োজনে, মিলাদ মাহফিলের পবিত্র পরিবেশ, মহররমের মর্সিয়া ও শোক গীতিতে, নামাজের মসলায় ও আকুল আর্তির মোনাজাত পীর-ফকির, সূফী-দরবেশদের মারফতি, মুর্শিদী সাধনায় সর্বোপরি ইসলামী চেতনার ও জাতীয় এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার ভাঙ্গার ব্যাপারে আধুনিক তরুণ মানসের জীবনবাদী বিদ্রোহে আর কে পেরেছেন সর্বক্ষেত্রে এমন করে নিজের স্থান

www.pathagar.com

করে নিতে? আজ এই মুহূর্তে কাজী কবির এই ধরনের স্বতন্ত্র, স্বাজাত্যবোধের সমূহ সৃষ্টিকে যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে মুছে ফেলা হয়— দেখা যাবে শুধু বাংলাদেশের নয়, গোটা উপমহাদেশের বাংলা ভাষা ভাষী কোটি কোটি মুসলমান সব দিক থেকে সবচেয়ে নি:স্ব, সবচেয়ে কাঙ্গাল ও সবচেয়ে হতমান এক জাতিতে পরিণত হয়ে গেছে। অন্য কোন দিক থেকে না হোক, অন্তত এই দিকে থেকে কাজী নজরুল ইসলামে আবির্ভাবের যথাযথ মূল্যায়ন যদি না করা হয়, তাহলে কাজী কবির উপরে বটেই বাংলা ভাষা ভাষী মুসলিম সমাজের উপরেও অধিকার করা হবে সবচেয়ে বেশী।

আধুনিক যুগ মানেই আন্তর্জাতিকতার যুগ। বাঙালী মুসলমান মাত্রই আন্তর্জাতিক এই চেতনায় ইতিহাসের যে ধারাটিকে একান্ত আপন বলে মনে করে, নিজেকে সে ইতিহাসের সাথে যুক্ত করে নিয়ে গর্ব গৌরব অনুভব করে, তাও কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভায় যতটা মূর্ত হয়ে ধরা দেয় অন্য কারো রচনায় ততটা নয়। অধুনা এক শ্রেণীর সমালোচক, বুদ্ধিজীবী বাঙালী মুসলমানের এই মুসলিম বিশ্ব প্রীতিকে ততটা সুনজরে দেখতে চান না। তাদের ধারণা, এটা নাকি বাঙালী মুসলমানদের হীনমন্যতার বহি:প্রকাশ। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে ওইসব বুদ্ধিজীবী সমালোচক নিজেরা তলে তলে ভিন্ন আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে যুক্ত। তাদের ক্ষেত্রে সেটা যদি হীনমন্যতার পরিচয় না হয় তাহলে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিতে মূর্ত মুসলিম আন্তর্জাতিকবাদ কেন হীনমন্যতার অপবাদে পরিত্যাজ্য হবে? বলতে দ্বিধা নাই বাংলা ভাষা ভাষী মুসলমানদের পরম সৌভাগ্য এটাই যে, তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাদের হাত ধরে সুদূর শাতিল আরবের তীরে নিয়ে গেছেন কারবালার বীর শহীদের আজলা ভরা প্রাণে তাদের স্পন্দিত করেছেন; ইরানের গুলিস্তানের আর বুস্তানের গানে আর গজলে তাদের মাতোয়ারা করে তুলেছেন।

শুধু কি তাই? মুসলিম বাংলার মানস জমিনের প্রতিনিধি হয়ে তিনিই প্রথম এশিয়ার নব প্রভাত সূর্য জামালুদ্দিন আফগানীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। মিসরের সাদ জগলুল পাশার জাতীয় জাগরণ আন্দোলনে, রীফ সর্দার আব্দুল করীমের তেজবীর্যে, আফগান নেতা আমানুল্লাহর আধুনিক চিন্তা-চেতনায় এবং সর্বোপরি তুর্কী বীর কামাল পাশার আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তায় হয়েছেন আলোড়িত, আন্দোলিত। বস্তুত কাজী নজরুল ইসলামই হচ্ছেন সেই নব যুগের নকীব যিনি এই বাংলাদেশের কুটির হতেই স্বপ্ন দেখেছেন দূর আরবের। সে আরব শুধু বালি আর পাহাড়ের আরব নয়, সে আরব আদর্শের আরব, বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সা) জীবন দর্শন বাস্তবায়নের আরব মানবতার জয়গানে মুখরিত আল কোরআনের ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত পরিবেশের আরব। হযরত আবু বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), আম্মা খাদিজা (রা), মা ফাতেমা (রা), হাসান-হোসেন (রা), খালেদ, তারেক মুসা, খাওলা ও সাকিনার আরব। গোটা ইতিহাস এভাবেই স্পন্দিত হয়েছে কাজী কবির গান ও কবিতার হাজারো বাণীতে ও ছন্দে, শত শত রচনায় ও প্রকাশনায়।

www.pathagar.com

জানি এক শ্রেণীর সমালোচক এর পাশাপাশি কাজী নজরুল ইসলামের ভিন্নধর্মী রচনার ভিন্নতর ভাবধারার কথা তুলে তর্ক করতে চাইবেন। ওইসব সৃষ্টিও যে কাজী নজরুল ইসলামের এবং সেসব সৃষ্টিতেই যে তিনি সমভাবে সার্থক আমরা কস্মিনকালেও তা অস্বীকার করি না। বরং আমরা এই বলে গর্ব করি যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আর কোন কবি-সাহিত্যিক এভাবে এদেশের বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারার বহুমুখী আশা ও আকাঙ্খাকে একই সঙ্গে একই জীবন কলমে আর কখনই এমনভাবে মূর্ত করে তুলে ধরতে পারেন নাই। নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেও।

বস্তুত আমরা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে দেখি আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ চোখ দিয়ে, আমর তার রচনার স্বাদ গ্রহণ করি আমাদের নিজ নিজ আশা-আকাঙ্খার সাথে মিলিয়ে নিয়ে, এবং সর্বোপরি তার সমগ্র সৃষ্টিসহ আমরা তাকে একান্ত আপন বলে মনে করি আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাপূরণের প্রধান রূপকার হিসাবেই। এখানে কোন দ্বিধা নাই, জড়তা নাই, নাই কোন কূটতর্ক। বাংলার এই মানস জমিনে একদা যে কবি জামানার বুলবুল হয়ে নিজ কলকণ্ঠে সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, একদা যিনি এই ঘুমন্ত জাতির মহলায় আঁধার পুরে ধ্বনিয়ে তুলেছিলেন ভোরের আজান, তার সেই অগ্রণী ভূমিকা এই দেশ, এই জাতি স্মরণ না করেই পারবে না। জাতীয় কবি শিরোপা এই জন্যই তার প্রাপ্য।

ত্রিশালের কাজীর শিমলা গ্রামের এই বাড়িটি দারোগা রফিজউল্লাহর। ১৯১৪ সালে দারোগা সাহেব আসানসোল থেকে কিশোর নজরুলকে এই বাড়িতে নিয়ে আসেন।

www.pathagar.com

হারিয়ে যাওয়া মুক্তোর সন্ধানে

কমোডর (অব:) এম. এ. রহমান

আজ আমরা সবাই মিলে নেমেছি হারিয়ে যাওয়া মুক্তোর খোঁজে। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর এই উচ্ছ্বাস দেখে আমি আবেগে আপ্লুত। মনে হয় এবার আমরা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিশ্বকবির আসনে সমাসীন করতে সক্ষম হব।

এত যুগ ধরে এদেশের বুদ্ধিজীবিরা এবং শাসকগোষ্ঠী যেভাবে সযত্নে ও সুকৌশলে নজরুলকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেভাবেই আমরা তাঁর মূল্যায়ন করেছি এবং তাঁকে এক প্রতিভাবান কবি হিসেবে দেখে এসেছি। কিন্তু আজ নজরুলকে এদেশের নজরুল গবেষকগণ যেভাবে ফুটিয়ে তুলছেন তা দেখে জনতা-বুকে ঝড় উঠছে সত্যের সন্ধানে ও হারিয়ে যাওয়া মুক্তোর খোঁজে তারা নির্ভয়ে বিশ্ব প্রকম্পিত করে নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করছে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় —

> দূর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
> লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

জনতার বুকে আজ সত্যের ও সাহসের তুমুল উচ্ছ্বাস মনে হচ্ছে। নজরুলের ভাষায়—

> মানেনি ক' তারা শাসন ত্রাসন বাধা-নিষেধের বেড়া—
> মানুষ থাকে না খোয়াড়ে বন্ধ থাকে বটে গরু-ভেড়া

কবি একদিকে কঠোর, কঠিন, বিদ্রোহী- ভেঙে সব চুরমার করে দিতে চান, অন্যদিকে সাম্যের গান গেয়ে গেয়ে ফেরেন। কবির চিন্তা সুদুরপ্রসারী—এক মুহূর্তে তিনি ভূলোক, দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া জয়ের নেশায় মহাশূন্যে চলে যান; আবার অন্য মূহূর্তে তিনি বলেন—

> "মম ব্যর্থ জীবনবেদনা
> এই নিশীথে লুকাতে নারি

www.pathagar.com

তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।"

বাল্যকাল থেকেই কবি ছিলেন নিতান্তই একা, অবহেলিত। দুঃখু মিয়া নামে পরিচিত। শতবাধা বিপত্তি তার প্রতিভাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারেনি তাই তিনি গর্জে উঠেছেন অন্যায়কে রুদ্ধ করার জন্যে। একদিকে তিনি বিদ্রোহের অনলে নিজেই দগ্ধ হন আবার অন্যদিকে তিনি সৃষ্টিকর্তার নিকট ফরিয়াদ জানান কেন এই ধরনীর ধুলিমাখা সন্তান তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কেন চির-অবনতরা তাদের শির উঠিয়ে হাঁকবে না—

এবার বন্দী বুঝেছে মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান

নজরুলের কাব্য ও গানের সংকলন যা আমরা এতদিন ধরে দেখেছি, পড়েছি তাতে তাঁকে বিদ্রোহী সাম্যবাদী এবং সামাজিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি যে বাঙ্গালী মুসলমানদের অন্তর্নিহিত আশা আকাঙ্খাকে জীবন ও সাহিত্যের পাতায়, গানে ও ছন্দে অঙ্কিত করেছেন ইতিহাসের পাতায় তা স্বল্পই লিখিত হ'য়েছে। তাই কবি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছেন। নজরুলকে পূর্ণভাবে তুলে ধরার প্রয়াসে আজ এই "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" স্মরণিকা সত্যিকার অর্থে প্রসংশার দাবীদার। এই সংকলন থেকে একজন উপলব্ধি করতে পারবেন যে নজরুল মানে জীবনসত্যের সাহসীপ্রকাশ, নজরুল মানে জনতরঙ্গের মুক্ত আহ্বান, নজরুল মানে তৌহিদী চেতনার নিরঙ্কুশ ডাক, নজরুল মানে সমগ্র জাতির সুপ্ত সুন্দর চেতনা।

নজরুলের জীবদ্দশায় তাঁকে কাটাতে হয়েছে জেলে অথবা বৃটিশরাজের জুলুম থেকে বাঁচার জন্যে এখানে ওখানে লুকিয়ে। দুঃখ দৈন্য পুলিশি তাড়না, মৌলভী ও মোল্লাদের টিটকারী, হিন্দুদের আক্রমণ তাকে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত করে রাখত এমনভাবে যে কবি নিশ্চিন্তে কোথাও অবস্থান করতে পারতেন না। পরিবারে ছিল অশান্তির আগুন, বুকে ছিল পুত্র ও স্বজনহারার বেদনা, দারিদ্রের প্রহার, বন্ধু-বান্ধবদের ধিক্কার তাকে সত্যিকার অর্থেই দুঃখী করে তুলেছিল। তাই নজরুল চির বিদায়ের আগে বলেছিলেন—

"যেদিন চলে যাবো সেদিন হয়তোবা বড় বড় সভা হবে, কত প্রশংসা, কত কবিতা বেরোবে আমার নামে, দেশপ্রেমিক ত্যাগী, বীর বিদ্রোহী—বিশেষণের পর বিশেষণ। টেবিল ভেঙে ফেলবে থাপ্পড় মেরে বক্তার পর বক্তা। এই

www.pathagar.com

অসুন্দরের শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধ দিনে তুমি যেন যেয়ো না যদি পার চুপটি করে বসে আমার অলিখিত জীবনেরর কোন একটা কথা স্মরণ কর।"

কিভাবে আমরা আমাদের প্রিয় 'কবি-শ্রেষ্ঠ' নজরুল ইসলামকে স্মরণ করতে পারি? আজ অতি দুঃখের সাথে অবলোকন করছি যে জাতীয় কবিকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উৎখাত করার সুক্ষ্ম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। নজরুল সাহিত্য একদম চর্চা না করেও একজন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করতে পারে। রবীন্দ্র সাহিত্য না পড়ে কিন্তু একজন পাশ করতে পারে না। আমরা কি নজরুল সাহিত্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠযোগ্য অংশ খুঁজে পাইনা? এসবই হচ্ছে চক্রান্ত করে নজরুলকে আড়াল করে রাখার খেলা।

আমরাও নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াস চালাবো এই বাংলার বুকে। কোন প্রয়োজন নেই সরকারী সাহায্য ও সহায়তার—যদি থাকে আপনাদের মনে নজরুল-প্রীতি তাহলে যাঁর যতটুকু সামর্থ্য তা নিয়েই এগিয়ে আসুন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ড গড়ে তোলার জন্যে।

'কে ধরবে হাল কার আছে হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।

নজরুলকে আমরা বিতর্কে জড়াতে চাই না। নজরুল সারা বাংলার কবিই নয় সারা বিশ্বের কবি। কবি হিসেবে তার দর্শন তাঁর তেজোদীপ্ত লেখনী তাঁর সৃজনশীলতার নিরিখে তিনি সারা বিশ্বের কবি, তিনি চিরকালের কবি।

নজরুলের যে দর্শন সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে :

আল্লা আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়
আমার কিসের শংকা
কোরআন আমার ডংকা
ইসলাম আমার ধর্ম মুসলিম আমার পরিচয়।

তিনি চির-বিপ্লবী কিন্তু বিপ্লব কার জন্যে? সে কথা তিনি জানিয়েছেন—

"আমি আল্লাহ্‌র সৈনিক মোর কোন ভয় নাই
তাহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই

www.pathagar.com

তুফান আমার জন্মের সাথী আমি বিদ্রোহী হাওয়া
জেহাদ জেহাদ বিপ্লব বিদ্রোহ মোর গান গাওয়া"

নজরুল এই জগতে এক বিস্ময়- তাঁর সীমিত কার্যময় জীবনে তিনি সাহিত্যের সমগ্র প্রাঙ্গণে বিচরণ করেছেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন।

যে মহান কবি বাঙালী মুসলমানদের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করেছেন, আপ্রাণ ও আযাদীর স্পৃহায় শিকল ভাঙার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেই চিরঞ্জীব কবি আজও আমাদের মধ্যে জাগ্রত আছেন এবং সেই অক্ষত বিশ্বাস নিয়েই সমগ্র জাতি আজ তার শতবার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে। জন্মবার্ষিকীতে নজরুলকে আমরা কি উপহার দেব? নজরুলের আত্মা সন্তুষ্ট হবে যদি বাঙালী তাদের জাতিসত্তাকে সঠিকভাবে চেতনা ও বিশ্বাস নিয়ে সমুন্নত রাখতে পারে।

নজরুলকে আমাদের মধ্যে জাগ্রত রাখতে হলে এই দিনে চলুন আমরা নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অঙ্গীকার গ্রহণ করি।

মহান আল্লাহ্ আমাদের কামনা বাস্তবায়নের তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কাজীর শিমলা গ্রামের দারোগা বাড়ির পুকুর পাড়ে প্রতিষ্ঠিত 'নজরুল পাঠাগার'।

www.pathagar.com

জাতীয় কবি ও বিশ্বকবি

ওবায়দুল হক সরকার

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বৎসর ব্যাপী অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি সেমিনারও হয়েছে। এইসব সেমিনারে অধিকাংশ নজরুলগবেষক নজরুল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে এসেছে। তাঁদের বক্তব্যে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উপর ভর করেই যেন নজরুল টিকে আছে অর্থাৎ নজরুলের অস্তিত্বের মূলে যেন রবীন্দ্রনাথ।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকেই শ্রেষ্ঠ জানতাম, কিন্তু নজরুলকে পড়ার পর আমার সে ধারণা পাল্টে গেল। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস বলেছেন নজরুল হিন্দু-মুসলমান সবার কবি। অবিভক্ত বাংলার জাতীয় কবি। বস্তুত: নজরুল হিন্দু ধর্মকেও তুলে ধরেছেন আবার মুসলমান ধর্মকেও। রবীন্দ্রনাথ শুধু হিন্দু ধর্মকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর কোন রচনায় মুসলমানের আল্লাহ-রাসূল (স:) এর উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাই কালের খণ্ডিত কবি।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সারদীয় দেশ ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ রায় রচিত 'রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্ম' প্রবন্ধটিতে দেখা যায় বর্ণভেদ প্রথা বাস্তবায়নে নিবেদিত প্রাণ ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ। সুদীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধটির কিছু আগে তুলে ধরা হলো ঃ

"১৯০১ সালের ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। নাম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, এবং প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ এবং এই বিদ্যালয়ের চরিত্র সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়। আদর্শ হল প্রাচীন ভারতের তপোবন, শিক্ষকেরা, গুরু, ছাত্রেরা ঋষিকুমার/তপোবন যে ঐতিহাসিক সত্য, শুধু অতীতের নয় চিরকালের সত্য— এ আদর্শ যে মোটেই কালাতিক্রান্ত নয়, অবিলম্বে একালের জীর্ণ ভারতবর্ষকে উদ্বিগ্ন করে এক মহাজীবনের আবির্ভাব হবে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তপোবন বিদ্যালয়ের কাঠামো যে সর্বভারতীয় হওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়নি, অন্তত তখন মনে হয়নি।

www.pathagar.com

ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্বকে সেদিন তিনি অল্পবিস্তর গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পরে অনেক পরে তপোবনের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয়ে তিনি নিজেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আপাততঃ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ের কথাটা বলি।—

নিয়মাবলীতে বলা হল ঃ 'ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধাবান করিতে চাই।' অনতিকাল পরে দেখা গেল, ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশ আর হিন্দুধর্ম এক হয়ে গিয়েছে।

বিদ্যালয়ের জীবনচর্চায় প্রাচীন ভারত দেখতে দেখতে হিন্দু ভারত হয়ে উঠল। হিন্দুধর্মের বর্ণাঢ্য ছটা-মণ্ডলের সম্মোহনে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ একজন অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে উঠলেন। এবং আশ্রম বিদ্যালয়ে সংহিতার অনুগমন, বর্ণাশ্রম-নির্দিষ্ট ভেদাভেদ, ব্রাহ্মণ্য গরিমা সবই ঢুকে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন অ-ব্রাহ্মণ শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রণম্য নয়।

প্রণাম সমস্যা বিষয়ে একটি চিঠিতে এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৯) "যাহা হিন্দু সমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না, সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শনপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।" –সত্যেন্দ্রনাথ রায় : রবীন্দ্রমননে হিন্দুধর্ম শারদীয় দেশ ১৪০৫ কলকাতা পৃ: ৩০৩

উপরোক্ত উদ্ধৃতির "ক্রমে রবীন্দ্রনাথ একজন অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে উঠলেন।" হিন্দুত্বের গণ্ডী ভেদ করে রবীন্দ্রনাথ আর বেরিয়ে আসতে পারেন নি। নজরুল কিন্তু সব সংকীর্ণতার গণ্ডী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত মুক্ত মনের কবি- মানবতার কবি। রবীন্দ্রনাথ দোতালার কবি, আর নজরুল মাটির মানুষের কবি। জীবনের যত ক্ষেত্রে নজরুলকে দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথকে সেভাবে দেখা যায় নি।

"একদিন ওরা দু'জনে মিলে 'ধ্রুব' নামে একটা বাইস্কোপ দেখতে গেল। তখন টকি চালু হয়ে গেছে। বাইস্কোপের পাত্র পাত্রীরা কথা বলে গান গায়। ধুতি পরা নারদ মুনি যেই গান গাইতে ঢুকলো অমনি মানুষ উত্তেজিতভাবে বললো নারদ কে সেজেছেন জানিস? উনি কাজী নজরুল ইসলাম।

প্রতাপ অবাক। কবি নজরুল যে বাইস্কোপেও পাঠ করেন তা তার জানা ছিল না, এবং আজো সে নজরুলের গান শুনেছে বটে। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাকে দিসনে আজি দোল' এই গান খানি তো সকলের মুখে মুখে ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ পূর্ব-পশ্চিম প্রথম খণ্ড : তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯৭; আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড কলিকাতা-৯ সকলের মুখে তখন শুধু নজরুল সঙ্গীত ধ্বনিত হতো। রবীন্দ্র-সঙ্গীত নায়ক-গায়ক নজরুলকে আবার রণক্ষেত্রেও দেখা গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য নজরুল সিপাই থেকে হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু নয় এই উপমহাদেশে কোন কবির রণ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা নেই। সে দিক দিয়ে নজরুল

www.pathagar.com

ভারতবর্ষের একমাত্র সৈনিক কবি। নজরুল ছিলেন প্রকৃত স্বাধীনতাকামী আর সে জন্য তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ তোষণ করতেন বলে নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়ে গেছেন। বহুমুখী প্রতিভার দিক দিয়ে নজরুল যেন মহাসাগর আর রবীন্দ্রনাথ সাগর।

যার শেষ ভাল তার সব ভাল। উভয়ের জীবনের শেষ পরিণতির যদি তুলনামূলক চিত্র তুল ধরা হয় তাহলে প্রমাণিত হবে যে কে স্রষ্টার নিকট স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বহু পূর্বে গত হয়েছিলেন তাই রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিণতি প্রথমে দেখা যাক।

কলকাত থেকে প্রকাশিত সারদীয় শনিবারের চিঠি ১৩৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক ড: অমিতাভ চৌধুরী রচিত "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর জন্য দায়ীকে?" শীর্ষক প্রতিবেদনটি। বেদনাদায়ক প্রতিবেনটির অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

"মহাপুরুষদের পরিণত বয়সে মৃত্যুও অকাল মৃত্যু। যেমন রবীন্দ্রনাথ। রূপে-রসে-সৃষ্টিকর্মে আশি বছরের পরিপূর্ণ জীবন তাঁর। কিন্তু তাঁকে জ্বর সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারেনি। জ্ঞান হারানোর আগে পর্যন্ত মন ছিল ক্রীয়াশীল। ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাই সকাল ৯টায় অপারেশন টেবিলে যাবার আগেও কবিতা লিখেছেন, 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা ছলে হে ছলনাময়ী' কবিতাটি তিনি মুখে মুখে বলে যান, লেখেন রাণীচন্দ। তাকে বলেন 'কিছু গোলমাল আছে পরে ঠিক করর খন।'

কিন্তু তাঁর শেষ রচনা সংশোধন করার সুযোগ দিলেন না ডাক্তার ও আত্মীয়স্বজনরা। তাঁর অনিচ্ছায় অপারেশন করিয়ে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছেন ঘনিষ্ঠজনেরা। এমন অনিন্দসুন্দর দেহকান্তি, প্রশান্ত মুখমণ্ডল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে ঠোঁটের ও চোখের কোণে চরম বিরক্তি নিয়ে। এই ধরনের একটা যুগন্ধর পুরুষকে চিকিৎসার নামে ছেলেখেলা অমার্জনীয় অপরাধ। আমি যদি বলি, যে সাবধানতা নেওয়া উচিত ছিল, তা করা হয়নি বলে এবং রোগীর ইচ্ছাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে প্রচন্ড যন্ত্রণার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন সমাপ্ত করে দেয়া হয়েছে, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। সেদিন যা ঘটেছিল তা হত্যারই নামান্তর।

প্রথমত: রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অস্ত্রোপচারের বদলে তাঁর কবিরাজী চিকিৎসা হোক। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের চিকিৎসায় তিনি ফলও পাচ্ছিলেন। কিন্তু বারবার দোনামনা করে শেষমেষ ঠেলে দেওয়া হয় ছুরিকাঁচির কাটাকাটির টেবিলে। দ্বিতীয়ত: সেকালের সবচেয়ে বড় ডাক্তার নীলরস সরকার চাননি অপারেশন হোক। তবু ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের জবরদস্তিতে নীলরস সরকারকে সরে যেতে হয়। তৃতীয়ত: কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথের স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শের উপর বারবার নির্ভর করা গোটা ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তোলে। চতুর্থত: অপারেশনের ব্যবস্থা কোন ভাল হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে না করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরাবাড়ীর বারান্দায় করে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা না নেওয়ায় সেপটিক হয়ে

www.pathagar.com

তিনি মার যান। পঞ্চমত: অ্যানাস্থেশিয়ার ভাল ব্যবস্থা না হওয়ায় কবিকে অপারেশনের সব যন্ত্রণা সজ্ঞানে সহ্য করতে হয়। ষষ্ঠত: অপারেশনের পর কোন ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স না রেখে ঘনিষ্ঠজনদের উপর সেবার ভার দেওয়া রবীন্দ্রনাথের ক্ষতির কারণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসা হলো জোঁড়াসাকোর বাড়িতে। কবে অপারেশন হবে রবীন্দ্রনাথকে জানানো হয়নি। ৩০ জুলাই সকালে রবীন্দ্রনাথকে নতুন কবিতা ডিকটেশন দিচ্ছেন। হাঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এলেন ডা: ললিত ব্যানার্জী। এসেই বললেন-একটি অপারেশন হবে। রবীন্দ্রনাথ চমকে গেলেন।

ষ্ট্রেচারে করে বারান্দায় আনা হল তাঁকে। প্রষ্ট্রেট কাটা নয় তলপেটে একটা জায়গা ফুটো করে ইউরিন বেরোনোর রাস্তা করে দেওয়া ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে বলে মুত্র পিউবিক সেস্টোস্কনি। লোকাল অ্যানাস্তাশিয়া দিতে পঁচিশ মিনিট সময় লাগল। রবীন্দ্রনাথ সব টের পেলেন। ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করলেন চোখ বুঁজে। ৩ আগষ্ট থেকে অবস্থার অবনতি হলো। ৫ আগষ্ট থেকে জ্ঞান ছিল না। ৭ আগষ্ট মারা গেলেন। হল সেপটিক, হল ইউরেমিয়া। বাহির বারান্দায় ভাল প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছাড়া অপারেশন করলে এমনটি তো হবে। ভাল নার্সিং হোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন? তাহলে এতো কষ্টের মধ্যে তাঁকে বিদায় নিতে হত না। প্রথমে চিকিৎসা বিভ্রাট, পরে অবিবেচনায় অযত্ন। আশ্চর্য!

মৃত্যু তো হলো, তারপর আরও অবিবেচনা। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার প্রতি আবার বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর যেন শোক মিছিলে কোন উদ্ধামতা না হয়। আমার নামে কোন জয়ধ্বনি যেন না দেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললে কি হবে, তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে রবীন্দ্রনাথের মরদেহকে ছেড়ে দিলেন বিশৃঙ্খল জনতার হাতে। রবীন্দ্রনাথ দিশেহারা হয়ে অন্য ঘরে নিস্ত্রান্ত, প্রশান্ত মহলানবিশ বরানগরে জ্বরে শয্যাশায়ী, ডাক্তাররা সব নিজেদের বাড়ীতে, শান্তিনিকেতনে কেউ গান গাইছেন মালা গাঁথছেন, মন্ত্র পড়ছেন, শেষ শয্যা সাজাচ্ছেন, মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার খাট বানাচ্ছেন, কাঁদছেন। আর ততক্ষণে ঠাকুরবাড়ীর কোলাপসিবল গেট ভেঙ্গে জনতা মহর্ষি ভবনে ঢুকে টেনে হিচড়ে দেহ নিয়ে চলে গেল জনস্রোতের মাঝখানে।

যেখানে কেউ তাঁকে বহন করার ছিল না। তাঁর অমন সুন্দর শরীর নিমতলার দিকে ভেসে চলল এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু ধ্বনি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি জয়' 'বন্দে মাতরম' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য ভাল। তাঁর দেহ ঠেলাঠেলিতে মাটিতে পড়ে যায়নি। পড়লে নিমতলায় নিয়ে যাওয়ার আগে কলকাতার রাস্তায় পদদলিত হয়ে কবরস্থ হতে হত। বিশ্বভারতীর বা কলকাতায় এমন কেউ ছিলেন না যে, জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা সুশৃঙ্খল শোক মিছিল বের করবেন। আরও দুর্ভাগ্যের কথা একমাত্র জীবিত পুত্র রবীন্দ্রনাথ মুখাগ্নি পর্যন্ত করতে পারেন নি। তিনি বাড়িতেই মূহ্যমান হয়ে শুয়েছিলেন। সম্পর্কিত একনাতি কলকাতার দিকে নিমতলার ঘাটে যেতে না পেরে হাওড়ায় গিয়ে ওপার থেকে নৌকো করে এপারের ঘাটে আসেন এবং কোন মতে মুখাগ্নি

www.pathagar.com

করেন। যখন মুখাগ্নি করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল বিকৃত। জনতার এতই রবি অনুরাগ যে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর মাথায় চুল ও মুখের দাড়ি সব উপছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই হল গিয়ে কবি প্রয়াণের শেষ দৃশ্য। সারা জীবন সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথকে চিরবিদায় নিতে হল অসুন্দরের হাতে তাঁর নিকটজনেরা যদি অপারেশন না করতেন তাহলে আরও কিছুদিন বাঁচতেন তিনি, আমরা আরও কিছু অসাধারণ রচনা পেতাম–অন্তত কিছু গান ও কবিতা। কিন্তু তা হতে দেওয়া হল না। তারণার সিদ্ধান্তহীনতায় বন্দী হয়ে বিশ্বভারতী ও ঠাকুর বাড়ীর লোকেরা তাকে ঠেলে দিলেন উচ্ছৃঙ্খল জনতার মাঝখানে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতির "সারা জীবন সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথকে চিরবিদায় নিতে হল অসুন্দরের হাতে" উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিণতির করুণ চিত্র তুলে ধরে। অথচ নজরুল নজিরবিহীন মর্যাদায় ও সুন্দরভাবে চিরবিদায় নিলেন। বিশ্বভারতীর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড: অমিতাভ চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথের অপারেশনের ব্যবস্থা কোন ভাল হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে না করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর বারন্দায় করা হলো । যে কারণে তা সেপটিক হয়ে গেল এবং সেপটিকেই রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন? তিনি লিখেছেন "এ্যানস্থেশিয়ার ভাল ব্যবস্থা না হওয়ায় কবিকে অপারেশনের সব যন্ত্রণা সজ্ঞানে সহ্য করতে হয়।" অপারেশনের পর কোন ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স রাখা হয়নি।

অথচ কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকার পি,জি হাসপাতালের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ১১৭ নম্বর কেবিনে দীর্ঘ এক বছর এক মাস এক সপ্তাহ অতি সহজভাবে রাখা হয়। পিজি হাসপাতালে ষ্টুরার্ট সৈয়দ নাসির আলী বলেন :

"আমরা তাঁকে কখনো রোগী হিসাবে দেখিনি-দেখেছি নায়েবে রসূল হিসাবে। তাঁর কবিতা, গান, গজল, আমাদের মনে এই ভাবমূর্তি এঁকে দিয়েছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের শেষ বিদায় বিস্ময়কর সম্মানের ছিল। তাঁর মৃত্যু সংবাদ রেডিওতে পৌছামাত্র নিয়মিত অনূষ্ঠান বন্ধ রেখে হামদ নাত কোরানখানি শুরু হয়ে যায়। মৃত্যুর পনের মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে ছুটে এলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাৎ মোহাম্মদ সায়েম। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল মুশাররফ হোসেন খান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, দিন মজুর, রিক্সাওয়ালাসহ সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ।

দর্শনেস্থ ভক্ত জনতাকে লাইন করাতে পুলিশ হিমসিম খাচ্ছিলেন। কবির মরদেহ কেবিন থেকে এনে আউটডোরের দোতলায় উঁচু মঞ্চে রাখা হলো। গোলাপ আগরবাতি পুড়ছিলো। নশ্বর দেহকে ঘিরে খোশবু। সুগন্ধিত পরিবেশ। মরদেহের পাশে কোরআন শরীফ পাঠ করছিলেন অনেকেই। উত্তাল জনতার ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছে। মিছিল ক্রমেই দুর্বার হয়ে উঠতে লাগল। এমতাবস্থায় কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে নিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত হলো। ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম,

www.pathagar.com

অন্যতম উপদেষ্টা আধ্যাপক আবুল ফজল এবং নজরুল গবেষক ডক্টর রফিকুল ইসলাম প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ এলাকায় নিয়ে সমাধির স্থান নির্বাচন করলেন, যেখানে এই মহান জাতীয় কবির শেষ শয্যা পাতা হবে।

জানাজা ও দাফনের আগে প্রেসিডেন্টের অন্যতম উপদেষ্টা কর্ণেল এম এস হকের তত্ত্বাবধানে পিজি হাসপাতালের ষ্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলী কবিকে শেষ গোসল দেন। ইসলাম পরিচ্ছন্ন ধর্ম। একমাত্র ইসলামেই লাশকে গোসল দেয়া ফরজ করা হয়েছে। অন্য কোন ধর্মে লাশকে পবিত্র করার বিধান নেই। ইসলামে বলাই হয় "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।" রবীন্দ্রনাথকে গোসল না দিয়েই নাপাক দেহেই টেনে হিচড়ে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। গোসলের পর কাফন জড়িয়ে খোশবু মাখিয়ে লাশ সোহরাওয়ার্দী নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তখন লাখো মানুষের ঢল। বিকাল পাঁচটায় কবির নামাজে জানাযা পড়ানো হয়। এই জানাজায় প্রেসিডেন্ট, উপদেষ্টাবর্গ, তিন বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর প্রধান ছাড়াও শরীক হয়েছিলেন ঢাকাস্থ মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতবর্গ। সর্বস্তরেব মানুষও শামিল হয়েছিলেন জানাজায়।

জানাজা শেষে দাফনের জন্য নিকটবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে যাঁরা লাশ বহন করে নিয়ে যান তাদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম, সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকবৃন্দ, উপদেষ্টাবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী প্রমুখ।

আসরের নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কবির মরদেহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করার জন্য যখন আনা হয় তখন সাড়ে পাঁচটা। অপেক্ষমান ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক প্লাটুন সৈনিকের কাছে তখন কমান্ড আসে : লাষ্ট প্রেজেন্ট আর্মস। একের পর এক বিশটি রাইফেল গর্জে ওঠে। ভলী ফায়ার শেষ হলে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অবনমিত হয় রেজিমেন্টাল কালারর্স ও রেজিমেন্টের নিজস্ব পতাকা। জুনিয়র টাইগার নামে পরিচিত সেকেন্ড রেজিমেন্টের বিউগলে বেজে ওঠে লাষ্ট পোষ্ট তথা শেষ বিদায়ের করুণ সুর। একুশবার তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাফনের ওপর থেকে ফুলের স্তূপ সরিয়ে কবির লাশ যখন কবরে নামানো হয় তখনও তিন মিনিট ধরে কেঁপে কেঁপে বাজছিল বিউগলে লাষ্ট পোষ্ট। অন্তিম সুর। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে এ সময় সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসাক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কবির বিখ্যাত গান 'চল্ চল্ চল্' কে এই বেঙ্গল রেজিমেন্ট রণসঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করলেন।

উপস্থিত সবাই কবির কবরে মাটি ছড়িয়ে দেন, পড়েন, 'মিন্‌হা খালাক নাকুম...... উখ্‌রা।' লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে কলেমায়ে 'শাহাদাৎ–আশহাদু আল লাইলাহা.. ।' দাফন শেষ হলো। রুহের মাগফেরাত অর্থাৎ আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করা হলো। প্রেসিডেন্ট সায়েম, বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর তরফ থেকে সমাধিতে মাল্যদান সমাপ্ত হলে তিন বাহিনী প্রধান এবং বাংলাদেশ রাইফেলস প্রধান কবি সৈনিককে শেষ সামরিক অভিবাদন জানালেন।

আমাদের জাতীয় কবির অন্তিম ইচ্ছা ছিল :

www.pathagar.com

"মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই।
যেন গোর থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই ॥
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাযীরা যাবে,
পবিত্র সে পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাগার পাইবে রেহাই ॥
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত
ঐ মসজিদে করে ভাই কোরান তেলাওয়াত।
সেই কোরান শুনে আমি যেন পরান জুড়াই ॥
কত দরবেশ ফকিরদের এই মসজিদের আঙ্গিনাতে
আল্লাহর নামে জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নাম জপতে চাই ॥"

আল্লাহ নজরুলের সেই ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ ইচ্ছা আর পূরণ হয়নি। ড: অমিতাভ লিখেছেন "রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার প্রতি আবার বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমার মৃত্যুর পর যেন শোক মিছিলে কোন উদ্দামতা না হয়। আমার নামে কোন জয়ধ্বনি যেন না দেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললে কি হবে?" শোক মিছিলে উচ্ছৃঙ্খল জনতা উদ্দামতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। 'রবীন্দ্রনাথ কী জয় "বন্দেমাতরম জয়ধ্বনি' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ ইচ্ছাকে পরাজিত পর্যুদস্ত করে ফেলে।

নজরুলের লাশ বয়ে নিয়ে যান বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনী প্রধান প্রমুখ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, রাজধানীর সব গণ্যমান্য ব্যক্তি। ভাব গাম্ভীর্যের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে ধীরে ধীরে জাতীয় কবির লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে-"ততক্ষণে ঠাকুরবাড়ির কোলাপসিবল গেট ভেঙ্গে জনতা মহর্ষি ভবনে ঢুকে টেনে হিচড়ে দেহ নিয়ে চলে গেল জনস্রোতের মাঝখানে। সেখানে কেউ তাঁকে বহন করার ছিল না। তাঁর অমন সুন্দর শরীর নিমতলার দিকে ভেসে চলল এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে। ....রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য ভাল তাঁর দেহ ঠেলাঠেলিতে মাটিতে পড়ে যায়নি। পড়লে নিমতলায় নিয়ে যাওয়ার আগে কলকাতার রাস্তায় পদদলিত হয়ে কবরস্থ হতে হত। বিশ্বভারতীয় বা কলকাতায় এমন কেউ ছিলেন না যে, জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা সুশৃঙ্খল শোক মিছিল করবেন।'

নজরুলের মরদেহ সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে পাকসাফ করে নতুন কাপড়ের কাফন পরিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে জানাজার নামাজ পড়ে অতি যত্ন সহকারে কবরে শায়িত করা হয়। শেষ বিদায়ের সময় কবির চেহারা মোবারক বিকৃত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে "যখন মুখাগ্নি করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল বিকৃত। জনতার এতই কবি অনুরাগ যে, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি সব উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই হল গিয়ে কবি প্রয়াণের শেষ দৃশ্য। সারা জীবন সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথকে চিরবিদায় নিতে হল অসুন্দরের হাতে।"

www.pathagar.com

নজরুল চিরবিদায় নিলেন সুন্দরভাবেই। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছিল মুসলমানদের দেশ (বাংলাদেশের শতকরা নব্বুই ভাগ মুসলমান) বলে। হিন্দু-প্রধান ভারত হলে অবশ্য হতো না। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মুসলমান নজরুলকে কি ভাবে দেখা হতো তা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত নিম্নোক্ত উপ-সম্পাদকীয়তেই দেখা যায়। দৈনিক ইত্তেফাক ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সংখ্যার মঞ্চে নেপথ্যে (উপ-সম্পাদকীয়) এর মন্তব্যের অংশবিশেষ :

"...আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ৩৬ জাতির ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানকে সুনজরে দেখিতেছেন না, সেটা বোধগম্য। তিনি একাধিক স্থানে বলিয়াছেন যে উক্ত সম্মেলনকে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ শিবিরে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিও অতি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্রের কোন কোন মহল 'ঐস্লামিক' জরাক্রান্ত হইয়া বেড়ায় যেভাবে লাথালাথি আরম্ভ করিয়াছেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের নামে 'ইসলাম' শব্দটি যুক্ত থাকায় সেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় নামটি লইয়াও যেরূপ উৎকট ব্যঙ্গবিদ্রুপ আরম্ভ করিয়াছেন (১০ ফেব্রুয়ারী 'ষ্টেটসম্যান', ১১ ফেব্রুয়ারীর 'আনন্দ বাজার' তথা উহাদের জবাবে ১৭ ফেব্রুয়ারী 'জনপদ'-এর উপ-সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য) কেহ যদি উহার বিরুদ্ধে মুখ খুলেন তবে কি তাহা "প্রীতির সম্পর্ক" হানিকর বিবেচিত হইবে।"

"ভারতে নজরুলের দাফন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আর হতো না। মুসলমানের দেশ বলে মুসলমান কবি এই মর্যাদা পেলেন। প্রসঙ্গত: পি,জি হাসপাতালের ষ্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলীর উক্তিটি "আমরা তাঁকে কখনো রোগী হিসাবে দেখিনি, -দেখেছি নায়েবে রসূল হিসাবে" উল্লেখযোগ্য। নায়েবে রসূলকে যথাযথ মর্যাদাদানের জন্য আল্লাহতায়াল বাংলাদেশ রাষ্ট্র করে দিলেন। আর সেজন্যই রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জাতীয় কবির দাফন সম্ভবপর হয়েছিল।

আশ্চর্য, রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন কিন্তু বিশ্বকবিকে নিয়ে মত্ত, জাতীয় কবির পাত্তা নেই। বিটিভির অনুষ্ঠানমালার মধ্যে নাটক সর্বাধিক জনপ্রিয়। ইদানিং বিটিভিতে যতগুলি নাটক প্রচারিত হচ্ছে তার প্রত্যেকটিতে একমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার করা হচ্ছে। একটিও নজরুল সঙ্গীত নেই। উল্লেখ্য, তিরিশ ও চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাংলার নাটক সিনেমায় একমাত্র নজরুল সঙ্গীতের চাহিদা ছিল। রবীন্দ্র সঙ্গীত তখন 'ড্রইংরুম কালচার'। অথচ আজ বাংলাদেশে নজরুল সঙ্গীতকে চাপা দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস বেশ জোরে-সোরে শুরু হয়েছে। সে কি অখণ্ড ভারতের আশায়!

নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী পালন সার্থক করতে হলে সর্বাগ্রে বিটিভির নাটকে রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধ করে দিয়ে নজরুল সঙ্গীত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পূর্ব-পশ্চিম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন অবিভক্ত বাংলার নজরুলের গান সবার মুখে মুখে ছিল। অবিভক্ত বাংলায় যদি সবার মুখে মুখে থাকতে পারে তাহলে বিভক্ত বাংলায়ও (বাংলাদেশ) নজরুল সঙ্গীত সবার মুখে মুখে থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

নজরুল জন্ম শতবর্ষ এবং কতিপয় প্রস্তাব

মুন্সী আবদুল মান্নান

এক অবিনাশী উৎস। কিন্তু আমাদের শোচনীয় দুর্ভাগ্য এই যে, এই অনুপ্রেরণাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার এবং সকলকে তার আলোয় উদ্ভাসিত করার প্রয়াস বলতে গেলে মোটেই লক্ষণীয় নয়। কাজী নজরুল ইসলাম এক ধরনের অমনোযোগ ও অবহেলার দু:খজনক শিকার। তাঁকে জাতীয় কবি ঘোষণার আগে বা পরে আমরা তাঁর ব্যাপারে কি করেছি? তাঁকে আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত করার জন্যই বা কি করেছি? কাজের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আমরা তাঁর দাফন-কাফন করেছি-শেষ শয্যায় শুইয়ে দিয়েছি, তাঁর নামে রাস্তা, ভবন ও ইনস্টিটিউট করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করেছি এবং 'রচনাবলী' প্রকাশ করেছি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ আমাদের এই এবং আমরা মনে করছি, এতেই যথেষ্ট হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম কার্যত বছরের দু'দিনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমায়িত হয়ে পড়ছেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যু দিবসে সরকারী বেসরকারীভাবে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটা করে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে আমরা দায়িত্ব পালনের তৃপ্তি অনুভব করি। কিন্তু, তিনি যে, ধীরে ধীরে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, হারিয়ে যাচ্ছেন, তা উপলব্ধি করতে পারছি না। যিনি আমাদের জাতীয় কবি, তাঁর সম্পর্কে দেশবাসী, এমনকি শিক্ষিত জনরাই বা কতটুকু জানে? কেন তিনি জাতীয় কবি? জাতীয় পর্যায়ে তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজন কতটুকু? এসব জানতে ও জানাতে হলে কাজী নজরুল ইসলামের যে চর্চা হওয়ার দরকার তা কি হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নজরুল পূর্ণাঙ্গ ও অবশ্য পাঠ্য নয়— একথা কি বিশ্বাস করা যায়, না মানা যায়? অথচ বাস্তবতা এই যে, পূর্ণাঙ্গ নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য নয়। তাঁর কিছু গ্রন্থ কেবল ঐচ্ছিক পাঠ্য। জাতীয় কবির পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ তথ্যসম্বলিত কোন জীবনীগ্রন্থ নেই। এটা যেমন নিষ্ঠুর বাস্তবতা, তেমনি তাঁর রচনাসমূহও সহজলভ্য নয়। নজরুল সাধনার বিস্তারিত মূল্যায়নধর্মী একক গ্রন্থ তো নেই-ই, এমনকি বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কোন গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত আলোচনা সমালোচনাধর্মী গ্রন্থও নেই। সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

তাঁর ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, নজরুল কেবল আমাদের স্বীকৃতিতেই আছে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, জীবনে, মননে, আলোচনায় ও মূল্যায়নে নেই।

এ মুহূর্তে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন ও প্রস্তুতি চলছে। জাতীয় কবির জন্মশতবর্ষ বছরব্যাপী কেন, দশকব্যাপীও পালিত হতে পারে এবং এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আমরা তাঁকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারি। ছড়িয়ে দিতে পারি জনগণের মধ্যে, তাদের চেতনার মধ্যে এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। এ ব্যাপারে একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নেয়া যেতে পারে। বছরব্যাপী সরকারীভাবে যে কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে কিংবা বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠন যেসব কর্মসূচি নিচ্ছে তা মোটেই যথেষ্ট নয়— অনেকটা দায়সারা গোছের। এসব কর্মসূচী চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন পূরণ করবে না বা করছে না।

এ ব্যাপারে আমরা একটি খসড়া প্রস্তাব বা কর্মসূচীর রূপরেখা পেশ করতে চাই, যা বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, সংগঠনের কাজে আসতে পারে। শুরুতেই বলে নেয়া প্রয়োজন, আমরা প্রকৃত নজরুলকে চাই-তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চাই এবং সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করতে চাই। এই পাওয়ার মধ্যে, গ্রহণের মধ্যে তাঁর কাছে আমাদের যে ঋণ তা স্মরণ করার ব্যাপারে যেমন আছে তেমনি আছে অনুপ্রাণিত হওয়ার ব্যাপারও। মনে রাখতে হবে তাকে আমাদের প্রয়োজন আছে, আমাদের কাছে তার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রাপ্তি নেই।

প্রস্তাব

১. প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পাঠ্যসূচীতে নজরুলকে অবশ্য পাঠ্য করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে একাধিক আবশ্যিক পত্র থাকতে হবে নজরুল সাহিত্যের ওপর। নজরুল চর্চাকে তরান্বিত ও অব্যাহত রাখার জন্য নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

২. নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করার পাশাপাশি তার প্রতিটা গ্রন্থের আলাদা আলাদা সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে। রচনাবলী ও গ্রন্থ সুলভে বিক্রি ও বিতরণ করতে হবে। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে এবং গ্রন্থাগারগুলোর জন্য নজরুল রচনাবলী বা গ্রন্থ ক্রয় বাধ্যতামূলক করতে হবে। নজরুল সৃষ্টিকর্ম প্রকাশ ও প্রচারের জন্য একটা বড় রকমের তহবিল গড়ে তোলা যেতে পারে। এ ধরনের তহবিল গড়ে তার রচনাবলী বা গ্রন্থ কমমূল্যে পাঠকের কাছে পৌঁছানো সহজ হবে।

৩. নজরুল সৃষ্টি বা রচনার বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-সমালোচনা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সমালোচক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি এ ব্যাপারে হতে পারে। এককভাবে কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের হাতে এ দায়িত্ব তুলে দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

'নজরুল আলোচনা' বা 'নজরুল মূল্যায়ন'ধর্মী গ্রন্থাবলী সুলভে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. নজরুল রচনা বিভিন্ন ভাষায় বিশেষত ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী ও আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। 'নজরুল আলোচনা' এবং নজরুল অনুবাদ প্রকাশ প্রচারের জন্যেও আলাদা তহবিল গঠন করা যেতে পারে।

৫. নজরুলের অগ্রস্থিত রচনা অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে হবে।

৬. নজরুলের গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত সংগীতের সংগ্রহ আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হবে। নজরুল সংগীতের গ্রামোফোন রেকর্ড খুঁজে বের করে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে। সুর সংরক্ষণের ব্যবস্থাও নিতে হবে। স্টাফ মোটেশনের মাধ্যমে স্বরলিপি প্রণয়ন করতে হবে। নজরুল সঙ্গীত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে বহির্বিশ্বে প্রচারের পদক্ষেপ নিতে হবে। নজরুল সংগীত শিক্ষাদানের জন্যে কলেজ পর্যায়ে সঙ্গীত শিক্ষার এক অথবা একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।

৭. পূর্ণাঙ্গ নজরুল জীবনী রচনায় হাত দিতে হবে। তাঁর জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায় ও ঘটনা যাতে অনুপুংখভাবে ঐ জীবনীতে স্থান পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে এক অথবা একাধিক বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী নজরুল জীবনী রচনা করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষায় নজরুলের একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় রচিত 'নজরুল জীবনী'র ইংরেজী অনুবাদও হতে পারে। বহির্বিশ্বে নজরুলকে উপস্থাপনের জন্য ইংরেজীসহ বিভিন্ন ভাষায় রচিত নজরুল জীবনীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

৮. শিশুতোষ রচনাগুলো গ্রন্থাকারে ছবি ও রঙে রেখায় সজ্জিত করে শিশু পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

৯. নজরুলের নাটকগুলোকে বিশেষ আলোচনায় আনতে হবে। সেগুলোকে মঞ্চে নতুনভাবে মঞ্চায়িত করার এবং টেলিভিশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিতে হবে। তার গল্প ও উপন্যাসগুলোকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চায়নের বা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো নিয়ে চলচ্চিত্রও হতে পারে এবং এদিকেও আলাদাভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

১০. নজরুল কয়েকটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন, তাতে অভিনয় করেছেন, গান রচনা-পরিচালনা, করেছেন। ঐ সব চলচ্চিত্রের প্রিন্ট সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

১১. নজরুল জীবনভিত্তিক এক বা একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে। দেশে-বিদেশ তাঁর জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. সাংবাদিক হিসাবে নজরুলের ভূমিকা অবদান বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং সাংবাদিকদের রচনার সংকলন প্রকাশসহ এর ওপর টীকা-ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করতে হবে।

www.pathagar.com

১৩. নজরুলের মাজারকে কেন্দ্র করে বা আলাদাভাবে স্মৃতিসৌধ তৈরী করতে হবে।

১৪. দেশের বিভিন্ন এলাকায় 'নজরুল লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব লাইব্রেরীতে নজরুল রচনা বা সৃষ্টিকর্মের পাশাপাশি তার ও তার সৃষ্টি সাধনার ওপর রচিত সমুদয় রচনাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এতে নজরুল গবেষণা বিশেষভাবে তরান্বিত হবে।

১৫. 'নজরুল যাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই যাদুঘরে 'নজরুল স্মৃতি' সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। তার রচনাসমূহের প্রথম, দ্বিতীয় সংস্করণ, তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি এখানে থাকবে। তাঁর বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু ভাষার হস্তলিপিও এখানে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

১৬. নজরুলের নামে আরও রাস্তা, ভবন, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থার নামকরণ হতে পারে। এমনকি রাজধানীসহ বিভিন্ন মহানগরীতে কিংবা নগরীর উপকণ্ঠে 'নজরুল নগর' গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব নগরে বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিক শিল্পী-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের আবাসগৃহ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

জাতীয় কবিকে কেন্দ্র করে জাতীয়ভাবে ও জাতীয় পর্যায়ে করার যে আমাদের অনেক কিছু আছে, তার কিছু মানের উল্লেখ এখানে প্রস্তাবাকারে করা হলো। এর বাইরেও অনেক কিছু হতে পারে। প্রয়োজন কেবল উদ্যোগ ও পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে আন্তরিক ও কার্যকর ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক মতৈক্যের পাশাপাশি জাতীয় তাগিদ যেমন থাকতে হবে তেমনি সরকারী-বেসরকারী সংস্থা সংগঠনের সমন্বিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

নজরুল প্রতিভা : আমাদের জাতিসত্তার নিরিখে

মাসুদ মজুমদার

এক.

আমাদের কৈশোর, কিংবা যখন বেড়ে উঠছিলাম, সেই চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি সালের কথা। আমরা শুনতাম একজন চারণ কবির কথা, যিনি কিনা ধূতি পরে পুঁথি পড়তেন। কাব্যি করে গজল বাঁধতেন, শিকল ভাঙার গান গাইতেন, সোনার হাতে গদ্য লিখতেন, যাদুর কলমে পদ্য রচনা করতেন, রুটির দোকানের কাজ ছেড়ে বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে মসজিদ-মক্তব ছুঁয়ে ইমামতি করে, লেটোর দলে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াতেন।

চারিদিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেলো। ঠাকুর পাড়ায় গুঞ্জন, মুখুজ্যেরা ফিস্-ফাস্ করছে। আর বিলেতি বাবুদের মাথায় পড়েছে বাজ। কোথাকার কোন এক বর্ধমানী ছেলে-ছোকরা হাবিলদারী শিখে রক্ত গরম করে ইংরেজদের চরমপত্র লিখছে। জানান দিচ্ছে স্বাধীনতার পথ ছাড়। আমরা তখন বাহ্‌রাম সিরিজ গিলি, নয়তো শরৎ বাবুর চলবৎ চটি বই পড়ে রাজ্যের এলেম হাসিলের ভান করি। আর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বলে বেড়াতো— কোথাকার কোন্ এক ম্লেচ্ছ যবন টক্কর দিতে বসেছে ঠাকুরদার সাথে। আবার কেউ কেউ ভারিক্কি চালে মন্তব্য করতো— এবার দেখা যাবে—দুখুর দৌরাত্ম্য। একদল আশাবাদী হয়ে বলতেন, আমাদের ঝাঁকড়া চুলের নজরুল ভারত মাতিয়ে তবেই না ছাড়বে। ঝাঁকড়া চুলের সব্যসাচী ওই কবিকে আমরা যখন জানার বয়সে পৌঁছলাম, তখন তিনি নীরব, বাকরুদ্ধ।

শরৎ সাহিত্যের পিসিমা আর সন্দেশ আমার মনে অনেক আগেই দাগ কেটেছে, কিন্তু রবি ঠাকুরে প্রবেশ করে আমার মনে জিজ্ঞাসা বনেদী জমিদার নন্দন ঠাকুর তো রাঢ়-বঙ্গের বিরাট অংশ জুড়ে জমিদারী তদারকী করতে গিয়ে একবারও কেনো আজান শোনেননি। তার নায়কের ঘুম ভাঙে কাঁসার ঘন্টধ্বনি শুনে। আর কীর্তন ভজন শ্যামা লিখে নজরুলের নায়কের ঘুম ভাঙে আজান শুনে।

www.pathagar.com

'জল পড়ে পাতা নড়ে' আপ্লুত হয়ে পড়লাম, কিন্তু তখনই জল-পানির তফাৎ বুঝে নজরুল বুঝবার আগ্রহ জন্মালো। নজরুল সাহিত্য গ্রহণ-বর্জনের বৈরিতা বুঝবার সুযোগ হলো। ততদিনে বাংলা সাহিত্য নিয়ে 'বুদ্ধিদাস'দের ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কেউ চাচ্ছিলো ভাষাকে খতনা করে কুল-মানে তুলবে, আবার কেউ চাচ্ছিলো মুসলমানী ঝেটিয়ে বিদায় করে কোলকাতাইয়া ভাষার আড়ৎ বানাবে।

সকল প্রান্তিক চিন্তায় বাধ সাধলো বিশাল নজরুল সাহিত্য। একটি জাতিসত্তার সর্বাঙ্গে মাখা নজরুল-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ অবয়বকে আড়াল করে সাধ্য কার? কারণ নজরুল সাহিত্যের মূল সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবতাবাদের গাঁথা। এ তিনটি চেতনা তাঁর জীবনবোধকে সমানভাবে প্রভাবিত করেছিলো। নজরুল জীবন শুরুর একেবারে গোড়াতেই এগুলোর সন্ধান পেয়েছিলেন—ইসলামী আদর্শের ভেতর। কবির জীবনবোধ, চেতনার উৎস এবং সাহিত্য সাধনা একটি অন্যটির সাথে একাত্ম, সম্পৃক্ত এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর মাঝে ভর করে সার্বজনীনতা, ধার্মিক মনে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, যা সামগ্রিক জীবনবোধকে ত্রিলোকের সাথে জড়িয়ে, সমন্বয় করিয়ে— প্রেম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কবির প্রেম-ভাবনা গতানুগতিক নয়। স্বপ্নিল, বর্ণাঢ্য ও বহুমাত্রিক। এখানেই অখণ্ড নজরুলের সাহিত্য পরিচয়।

এই যখন নজরুল সাহিত্যের ভাবনা তখনও 'ওরা' বলতো ও আবার কবি হলো কবে! বাংলা সাহিত্যের রাজধানী ঢাকা-কথাটি আজকাল জোরে শোরে উচ্চারিত হয়। আমাদের সাহিত্যের স্বকীয়তার বীজ যে কোলকাতা থেকে ভিন্ন তা বোঝাবার জন্যই বোধ করি এই সত্যটি ঘুরে ফিরে বার বার অনুরণিত হচ্ছে। নজরুল সাহিত্যের সামগ্রিকতার ভেতর সেই বীজ পত্র-পল্লবিত হয়ে ফলবান ফুলবান হয়েছে। গর্ব কিংবা অহমবোধ দিয়ে একজন কবিকে জাতিসত্তার পরিচয়বাহী করে উপস্থাপন করার সুযোগ হয়েছে। যদিও আজ জাতীয় কবির জাত্যাভিমান থেকে আমরা বহু দূরে অবস্থান করছি। জাতীয় কবি—জাতীয় ফুল, ফল আর মাছের মত সাধারণ জ্ঞানের বইতে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। নজরুল-চর্চার সীমানায় গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে গেছে। গবেষণার পরিসর সীমিত। রাজনৈতিক প্রয়োজনে কবি মূল্যায়িত হন।

দু:খজনকভাবে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ পর্যন্ত নজরুল-চর্চা, সাধনা-গবেষণা উপেক্ষিত। এছাড়া ষড়যন্ত্রের অদৃশ্য প্রেত ও কালোছায়া নজরুলকে বর্জন করার রূপরেখা বাস্তবায়ন করতে চায়।

আমার ধারণা একটি পক্ষ নজরুলকে এমন ধরনের পাত্রে রাখতে আগ্রহী যেনো তিনি পাত্রের রূপ ধারণ করেন। অতি উৎসাহী এই কূপমণ্ডূকরা একজন পূর্ণ অবয়বের নজরুলকে ভয় পায়। কারণ পূর্ণ নজরুলের সবকিছু আছে। আছে প্রেম-প্রীতি থেকে ভজন গাজন সব। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে যে নজরুল মাথা তুলে দাঁড়ায় সেখানটায় আমাদের অহংকার হলেও প্রতিপক্ষের ভীতির কারণ। হারাবার ভয়।

www.pathagar.com

অর্জন-বর্জন ও ভীতি-প্রীতির মাঝখান থেকে নজরুল টেনে তুললে যা দাঁড়ায় সেখানেই নজরুলের আসল পরিচয়। সে পরিচয় এবং আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় একাকার হয়ে লেপ্টে গেছে। একটি অন্যটির মাঝে লীন হয়ে গেছে। একটি গোষ্ঠী জন্মশত বার্ষিকীতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তা আড়াল করতে চায়। দু:খজনক হলো রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পুরো সুযোগটি আজ তারাই হাতিয়ে নিচ্ছে। তারপরও আশার কথা— বাঙালী মুসলমানদের স্বকীয় জাতিসত্তার পরিচয়বাহী আজকের ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা ভাষা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের জীবনবোধ সম্পৃক্ত স্বকীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যাদের প্রবেশের কথা ছিলো না, অথচ প্রতাপের সাথে টিকে ছিলো, তাদের প্রভাব কমে যেতে শুরু করেছে। আর নজরুলমুখী সাহিত্য-চর্চার শূন্যতাবোধ বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে শূন্যতা পূরণের আগ্রহ-আর্তি-আকুতি। তাই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা প্রত্যক্ষ করবো—জাতি নজরুল-চর্চার ভেতরই তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় স্বকীয়তার উৎস-উপাদান সন্ধান করতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কারণ চলনে-বলনে-আবেগ-আচরণে আর জীবন যাপনে সামগ্রিকভাবে আমরা যা, তা পরিমাপ করার জন্য নজরুলই একমাত্র 'যুগোত্তীর্ণ কালপুরুষ'। সময়ের প্রয়োজনে গ্রহণ-বর্জনের এ বাধ্যবাধকতায় জাতীয় কবির পথ রোধ করবার সাধ্য কারো নেই। নজরুল বারবার ঝলসে উঠবেন প্রতিভা আর স্বকীয়তার গুণেই। মৌলিকত্ব এবং সর্বপ্লাবী সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই। এখানে অন্য কোন কবি ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি প্রায়ই অসম্ভব।

দুই.

নজরুল নিয়ে একদল অতি উৎসাহী, অন্য দল নিরুৎসাহী। একদল এড়াতে চান, অপর পক্ষ খণ্ডিত নজরুলকে উপস্থাপন করে তুষ্টি পান।

কিছু অনুরাগীর চোখে নজরুল একজন চারণ কবি। বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে অনেকেই আশ্বস্ত হন। কেউ ভাবেন তিনি গানের কবি, তার চেয়ে ক'কদম বাড়া গান-গজলের কবি। কারো কারো মূল্যায়ন, নজরুল সময়ের কবি ঝড়ের বেগে এলেন, বিদ্যুৎ বেগে বিদায় নিলেন।

এমন সমালোচকও আছেন যারা নজরুলের ঝোঁকপ্রবণতা আবিষ্কার করে বলেন— প্রেম ও সাম্যের কবি। নজরুল সাহিত্যের ভক্ত-অনুরক্ত যেমন প্রচুর তেমনি নিন্দুকেরও শেষ নেই। ভক্তরা আবার দলবিভক্ত, খণ্ড খণ্ড করে নজরুল-চর্চায় তাদের উৎসাহ বেশী। নিন্দুকেরা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তারা নিন্দার ভাষায় হেরফের করেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হন না। তাদের ভাবনা নজরুলকে খণ্ডিত করা হোক আর অখণ্ডই রাখা হোক, তার ভেতর যে মুসলমানিত্ব ভর করেছে সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। হিন্দুয়ানীতে বসবাস, ভজন, কীর্তনে সামান্য চাষবাস, হিন্দু-মুসলমান মিলনে উচ্ছ্বাস—এসব বিচ্ছিন্ন বিষয় তাৎক্ষণিক ও পরিবেশের প্রতিক্রিয়াজাত। আসলে মক্তব জীবন থেকে মসজিদের পাশে কবর পাবার

www.pathagar.com

আকৃতি, রেনেসাঁর জন্য জেহাদ, সব মিলে আগাগোড়া নজরুল একজন বাঙ্গালী মুসলমান। তার মুসলমানিত্বে খাদ ও নিখাদ-এর মাত্রাজ্ঞান বিবেচ্য বিষয় নয়, আসল বিবেচ্য প্রসঙ্গ তার লক্ষ্যমাত্রা, সৃষ্টি বৈচিত্র ও কৌশল, বিষয়বস্তু, উপমা-রূপকল্প চরিত্রচিত্রণ, সময় নির্বাচন এবং মনের গভীর থেকে উৎসারিত ভাব-ভাষার সংমিশ্রণে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা কার জন্য—এখানে শুধু সৃষ্টিসুখের উল্লাসই নয়, একটি জাতির জাগ্রত জাতিসত্তার ভেতর আধমরাদের ঘা দিয়ে জাগিয়ে দেবার বাসনাটাই মুখ্য।

তাদর ভাষায় তার গানে-প্রাণে এবং অবিনাশী সৃষ্টিসুখের মর্মমূলে যে চেতনার চৈতন্য তাকে তাড়িয়ে ফিরেছে সেখানটায় তার স্বপ্ন নিগৃহীত জাতির। শ্রেষ্ঠ জাতিকে উবরণ। সে জাতি কখনো বাঙালী মুসলমান, কখনো মুসলিম উম্মাহ, আবার কখনো ভারতীয় কিম্বা বাঙালী।

নজরুল বিশ্বাসে, আচরণে বাঙালী, মুসলমান, মানুষ, ভারতীয় মুসলিম উম্মাহ সবখানে একাকার। একই সঙ্গে এত রূপ নিয়ে তার কাব্য কেন্দ্রিকতায় কোন বিচ্যুতি নেই। তাহলে তাকে একটু ব্যতিক্রম করে দেখতেই হয়।

নিন্দুকের এমন ভাষায় দরদ আছে, আবার একজন অখণ্ড নজরুলকে আবিষ্কারের অসাধু ইচ্ছেও আছে। উদ্দেশ্য অসাধু হোক, একজন অখন্ড নজরুলকে উপস্থাপন করলে আমি নিন্দুকের নেতিবাচক দিকটাই ইতিবাচকভাবে দেখতেই আগ্রহী। আমার ধারণা, ভক্তদের খণ্ডিত নজরুলের চেয়ে নিন্দুকদের অখণ্ড নজরুলই বাস্তবতার কাছাকাছি এবং প্রকৃত নজরুলকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আমার এই বক্তব্যে এক ধরনের হেঁয়ালি আবিষ্কারের সুযোগ আছে। কারণ আমি সমালোচক-নিন্দুকদের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ থেকে নজরুল আবিষ্কার করতে চাইছি। আসলে আবিষ্কার নয়, উদ্ধার।

সহজ কথায়, নিন্দুক-সমালোচকরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে খতিয়ে খতিয়ে নজরুলের বহুমাত্রিকতা তুলে ধরেছে। এই বহুমাত্রিকতার ভেতর একজন কালোত্তীর্ণ ও সমৃদ্ধ নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যত সহজ—ভক্তদের প্রেমের কবি, মানুষের কবি, বিদ্রোহী কবি প্রভৃতি বিভাজনের ভেতর তত সহজ নয়।

বাংলাদেশের তো বটেই, বিশ্বজুড়ে নজরুল-চর্চার একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে। দু:খের মাত্রাটা এখানে এতটা ছাড়িয়ে যায় যে, যেখানেই নামধারী মুসলমান নজরুল চর্চায় হাত দিয়েছে সেখানেই তারা নজরুলকে বেঁধে দেয় ক'টা নাটকে, প্রেমের গানে, ক'টি কবিতার বেষ্টনীতে কিংবা ভজন-কীর্তনের মধ্যে। আসলে দোলনা থেকে কবর, খেলার আসর থেকে মক্তব-মসজিদ, রুটির দোকান, যুদ্ধের মাঠ, এখানে-সেখানে সর্বত্র যে নজরুল সেই নজরুল কি এতটা ম্লান যে, তাকে একটি খণ্ডিত পরিচিতির ভেতর খুঁজে পেতে হবে! নজরুলের হিন্দুপ্রীতি আর ভীতির ভেতর সময়ের বাস্তবতা আর চৌহদ্দিতে বসবাসের পরিবেশকে ছোট করে দেখার সুযোগ কোথায়? মোল্লা-পুরোহিতকে তিনি কখন

www.pathagar.com

একই পাল্লায় মেপেছেন, আবার কখন 'হিন্দু-মুসলমান জিজ্ঞাসে কোন জন'—বলে হুংকার দিয়েছেন তা বুঝতে হলে সময়টাকে বড় করে দেখতে হবে।

কবি কেন, নবীর জীবনেও সময়টা মুখ্য। সময়কে ধারণ করেন কবি। সেই সময়ের ভেতর যা গ্রাহ্য তাই কবিকে আঁচড় কাটে। স্পর্শকাতরতায় কবি আপনমনে কবি-কল্পনার জাল বোনেন সেখানে নজরুল সময়কে কত বেশী বড় ক্যানভাসে দেখেছেন সেটাই প্রধান ও মুখ্য প্রসঙ্গ।

নজরুল জীবনে সাধুতায় ভরপুর, একেবারে বাঁকহীন বিচ্যুতিমুক্ত একথা বলা যাবে না। কিন্তু সময়টাকে আত্মস্থ করে সাম্য-স্বাধীনতার মর্মমূলে পৌঁছাবার যে বাসনা নজরুল সাহিত্যকে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছে, সেখানে সাহিত্যের যে ব্যাপ্তি ও পরিধি তা বিশ্বসাহিত্যের দিকপালদের সাথে তুলনা করলে, নজরুল কেন বিশ্বকবি নয়— জিজ্ঞাসার এই জবাব দেবে আগামী প্রজন্ম, খণ্ডিত ভাবনায় যারা আচ্ছন্ন কিংবা নিন্দার চিঠি নিয়ে আজও যারা সাম্প্রদায়িক, তাদের জন্য আমার ভবিষ্যদ্বাণীটা করে রাখাই সঙ্গত।

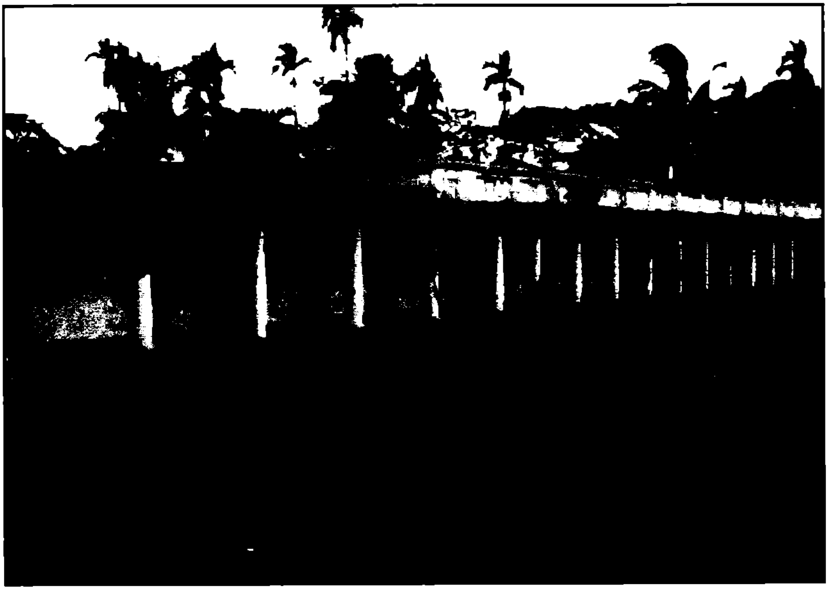

দরিরামপুর হাইস্কুল। এইস্কুলে কিশোর নজরুল পড়তেন। বর্তমান নাম নজরুল একাডেমী দরিরামপুর।

এই স্কুলের দেয়ালে লেখা আছে :

আমি এক পাড়াগেঁয়ে স্কুল পালান ছেলে
ত[illegible] ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও
“[illegible]' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না।
স্কুলের হেডমাস্টারের চেহারা মনে করতেই আমার
আজো জলতেষ্টা পেয়ে যায়।

—কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

কবি ভবন প্রাঙ্গণে নজরুল

www.pathagar.com

নজরুলের ব্যথার দান : প্রেম এবং দেশপ্রেম

রফিক মুহাম্মদ

কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য-রচনা চর্চাকাল মোটামুটি একুশ/বাইশ বছর [১৯১৯-১৯৪১]। এই স্বল্প কার্যকালে কবি দিয়েছেন অমূল্য অশেষ সম্পদ। যা বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সাবলীল বিচরণ বাংলা সাহিত্যকে করেছে পুষ্পিত। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র এবং সম্পাদনা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চির-ভাস্বর। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্র-নান্দনিকতায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে, প্রেম, বিপ্লব ও জাগরণের সৃষ্টিশীলতায় করেছেন উজ্জ্বল।

এই অসাধারণ পৌরুষ-পুরুষ কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা প্রকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়— তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হলো "ব্যথার দান"—যা একটি গল্পগ্রন্থ। কলকাতার মুসলিম পাবলিশিং হাউজ থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১লা মার্চ১৯২২-এ। আর তাঁর কাব্যগ্রন্থ "অগ্নি-বীণা" কলিকাতার অর্থাৎ পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২২-এর অক্টোবর মাসে। এ বছরেই একই পাবলিশিং হাউজ থেকে তাঁর আর একটি প্রবন্ধগ্রন্থ— "যুগবাণী" প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশের পর পর তৎকালীন বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু এর পরও কাজী নজরুল ইসলামের লেখা থেমে থাকেনি। তিনি লিখে গেছেন বিরামহীনভাবে।

নজরুলের রচনা প্রকাশের এই ক্রমানুসারে আমরা পাই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ—'ব্যথার দান'। এই 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থ মূলত এখানে আলোচ্য বিষয়। নজরুলের সাহিত্যকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে বা জানতে হবে সে সময় কালকে। বিখ্যাত দার্শনিক লেখক কার্লাইল বলেছেন— "কোন সাধক লেখক বা শিল্পীই তার যুগ, কাল এবং আবেষ্টনীকে অস্বীকার করতে পারেন না। আর যে অস্বীকার করেন, তাঁর সাহিত্য শিল্প বাস্তববিমুখ হতে বাধ্য।"

নজরুল সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়েও এই কাল, যুগ, বা পারিপার্শ্বিকতাকে জানা প্রয়োজন। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের সাহিত্যিক। এই সময় তিনি

www.pathagar.com

এদেশের মানুষের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবক্ষয় এবং সংকটকে নিরীক্ষণ করেছেন। যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সে সময়ের মানুষের যে বিপর্যয় ও অসহায়ত্বকে কবি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাই তাঁর লেখনীতে অনায়াসে অতি সাবলীলতায় উঠে এসেছে। তাই দেখা যায় নজরুল সাহিত্যে এক বিশেষ অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে মানব প্রেম ও দেশ প্রেম নিয়ে। যা এক অর্থে সাম্যবাদ। তিনি সর্বস্তরের মানুষের জন্যে যেমন সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা তথা বৃটিশদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সর্বদা গর্জে উঠেছে।

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য;

কবির এই যে উচ্চারণ তা থেকেই বোঝা যায়— তাঁর প্রেম ও দেশপ্রেমের দ্বৈতরূপ।

নজরুলের দেশপ্রেমের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানা জনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও অর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তি চেয়েছিলেন; তাঁর পথও তিনি নির্দেশ করেছেন তাঁর লেখনীতে। তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন- সন্ত্রাসবাদ, কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মহত্যার উহাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন। কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কিংবা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নিয়মতান্ত্রিকতা— কারণ তিনি "চিত্তনামা" লিখেছিলেন। কেউ ভেবেছেন- প্যান-ইসলামিজম— কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনটাই নজরুলের দেশপ্রেমের সত্যরূপ সঠিকভাবে উদঘাটনের সম্পূর্ণ সহায়ক নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী। কামাল আতাতুর্কের সুশৃংখল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্যে সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। তবে এ ধারণাতেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি। সাম্য, শান্তি, এবং মুক্তির দিশারী নজরুল অবশেষে ফিরে এসেছেন ইসলামের কাছে। এই ইসলামের আদর্শই নজরুলকে করেছে প্রকৃত প্রেম এবং দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত। ইসলামের জাগরণী মন্ত্রেই তিনি হয়েছেন মাথা নত না করা "চির-উন্নত শির"। এ সম্পর্কে নজরুল ইসলাম তাঁর এক অভিভাষণে লিখেছেন— ইসলামের কাছেই তিনি প্রকৃত সাম্য, শান্তি, এবং মুক্তির মন্ত্র পেয়েছেন। নজরুলের প্রেম সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রবন্ধিক সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন— "নজরুল একদিকে বিদ্রোহী অন্যদিকে প্রেমিক। এই দুই মিলেই সমগ্র নজরুল। তাঁর দ্রোহ ও প্রেম কোন জীব বিচ্যুৎ ব্যাপার ছিলো-না, তা ছিল জীবনেরই অঙ্গীভূত। তাই নজরুল যত বড় বিদ্রোহী ততোবড় প্রেমিকও।" [বাংলাদেশ নজরুলকে যা দিয়েছে -বিবেচনা—পূনর্বিবেচনা— আবদুল মান্নান সৈয়দ]

প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর এই উক্তির সংগে আমিও একমত, তবে আমি এই দ্রোহ এবং বিদ্রোহী শব্দের পরিবর্তে বলতে চাই দেশপ্রেম এবং দেশপ্রেমিক। মূলত

www.pathagar.com

নজরুলের দ্রোহ ছিল দেশপ্রেম। আর তাঁর দেশ প্রেমিকের সত্তাই তাঁকে করেছে বিদ্রোহী। আসলে এই দেশপ্রেমই ছিল নজরুলের উদ্দীপনার মূলমন্ত্র। এই দেশপ্রেমই কবিকে দিয়ে শিকল ভাঙার গান লিখিয়েছে।

নজরুলের গল্পগ্রন্থ ব্যথার দানেও আমরা তাঁর এই প্রেম এবং দেশপ্রেমের দ্বৈতরূপ দেখতে পাই। এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্পে যেমন আছে প্রেম, তেমনি রয়েছে দেশপ্রেম। মূলত প্রেমকে আশ্রয় করেই প্রতিটি গল্পে দেশপ্রেমের বহি:প্রকাশ ঘটেছে। এ গ্রন্থের নাম গল্পে আমরা দেখি কখনো দেশকে তিনি মা, আবার কখনো প্রেমিকারূপে দেখেছেন। 'ব্যথার দান' গল্পের শুরুতেই তিনি লিখেছেন–"গোলেস্তান! অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি! আ! মাটির মা আমার কত ঠাণ্ডা তোমার কোল।"

আবার একটু পরে লিখেছেন– "হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার– এই বড় মা— দেশটাকে চিনতে দেয়নি।" গল্পের এই উক্তিগুলো থেকে সহজেই বুঝতে পারি যে, একদিকে তাঁর মায়ের প্রতি ভালোবাসা অন্যদিকে দেশমাতার প্রতিপ্রেম। আবার দেখা যায় যে— এগল্পে তিনি তাঁর জন্মভূমির মাটিতে প্রেমিকা বেদৌরার স্পর্শ খুঁজে পেয়েছেন— "আবার সেই গুলিস্তানে ফিরে এলুম! যেখানে আমার মাটির কুঁড়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে, কিন্তু তারই আর্দ্র বুকে যে তোমার ঐ পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে---- তাই আমায় জানিয়ে দিল যে, তুমি এখানে আমার খুঁজতে এসে না পেয়ে শুধু কেঁদে ফিরেছো।" এই উক্তিতে প্রিয়ার প্রেম এবং দেশের প্রেম একাকার। প্রিয়ার স্পর্শকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন জন্মভূমির আর্দ্র মাটিতে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প হেনাতেও বীর সৈনিক সোহ্‌রাবের দেশপ্রেম এবং হেনার প্রতি মানবীয় রূপকে দেখতে পাই। যুদ্ধের ময়দান থেকে সৈনিক সোহ্‌রাব কখনো কখনো প্রেমিক সোহ্‌রাব হয়ে যায়। যুদ্ধের তাঁবু থেকে মনে পড়ে প্রেমিকা হেনার কথা। সোহ্‌রাব লেখে— "হেনা, আমি যাচ্ছি মুক্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যার ভিতরে আগুন, আমি চাই তাঁর বাইরেও আগুন জ্বলুক। আর হয়তো আসবো না। তবে আমার সম্বল কি?" এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সোহ্‌রাবের সম্বল হেনার প্রেম।

গ্রন্থের তৃতীয় গল্প "বাদল বরিষণে" পাঠকদের কাছে একটি নিটোল প্রেমের গল্প মনে হলেও তাতে সত্যিকার অর্থে জড়িয়ে আছে দেশপ্রেম। কেননা কাজরীকে না পেয়ে গল্পের নায়ক ব্যথাতুর হৃদয়ে কাজরীর রূপ দেখেছেন এই দেশ ও প্রকৃতির কাছে "ঐ ঘননীল মেঘের বুকে, এই সবুজকচি দুর্বায়, ভেজা ধানের গাছের রঙে তোমায় পেয়েছি। ওগো শ্যামলী! তোমার এ শ্যাম শোভা লুকাবে কোথায়?"

এই যে ভাবনা এর মধ্যে স্পষ্ট যে নায়ক তার প্রিয়াকে দেখছেন তার দেশের অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে। এখানেও প্রেম এবং দেশপ্রেম একাকার হয়ে প্রস্ফুটিত—এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে নজরুলের এ গল্পগুলোতে প্রেম এবং দেশপ্রেম অঙ্গাঅঙ্গি মিশে আছে। গ্রন্থের চতুর্থ গল্প "ঘুমের ঘোরে"তেও আজহার এবং পরীর প্রেমে বাধা হয়ে দেখা

www.pathagar.com

দিল দেশপ্রেম। অর্থাৎ প্রেম আজহারকে নিয়ে গেল যুদ্ধে, তাইতো পরী বলছে— "আমার ভালোবাসাই হয়তো তাঁর কর্তব্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাঁর সুখের জন্য, তাঁর তৃপ্তির জন্য, আমি কেন তবে সে পথ হতে সরে দাঁড়াই না?" আজহারের দেশপ্রেমের কাছে পরীর প্রেম ও এখানে সমান্তরাল।

পঞ্চম গল্প "অতৃপ্ত কামনা", এতেও মোতির প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নায়ক চলে যায় যুদ্ধে। অর্থাৎ এ গল্পেও নায়ক নারীর প্রেমকে ভুলতে দেশকে ভালবাসে। আর দেশকে ভালবেসে যে তার হৃদয়ের প্রেমকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করে। এ গল্পেও দেশপ্রেম এবং হৃদয়ের প্রেম একাকার— "এই কথা কয়টি ভাবতে গিয়ে আমার বুক কান্নায় ভরে এল, আমার যে বাইরে দীনতা তাই মনে পড়ে, তখন আমাকে আমার অন্তরের সত্য প্রেমের গৌরবের জোরে খাড়া হতে হল।" এ থেকে বোঝা যায়— এখানে নারীর প্রেমই নায়ককে দীপ্ত এবং সাহসী করে তুলে। অর্থাৎ প্রেমিকার প্রেমের জন্যেই সে আরো গভীরভাবে দেশকে ভালবাসতে পারে। গ্রন্থের শেষ গল্প রাজবন্দীর চিঠি। গল্পের নাম পড়েই বোঝা যায়—এর বিষয়বস্তু। এ গল্পে এক বন্দী সৈনিকের হৃদয়ের, ব্যথা-বেদনা বর্ণিত হয়েছে তার প্রেমিকার কাছে। দেশপ্রেমের টানে, দেশকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে, প্রেমিকাকে ছেড়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দী হওয়ার পর প্রেমিকাকে লেখা চিঠি এ গল্পের বিষয়বস্তু। এ গল্পেও দেশপ্রেম আর নারীপ্রেম অসাধারণ নান্দনিকতায় প্রস্ফুটিত।

অতএব, দেখা যায় যে নজরুলের এই গল্পগ্রন্থে মানবতাই প্রধান বিষয়। যাকে বলা যায়— প্রেম এবং দেশপ্রেমের সমন্বয়। কেননা মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকলেই কেবল দেশকে ভালবাসা যায়। দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা, লাঞ্ছনা, যখন ব্যথিত করে তখনই মানুষ এর প্রতিরোধের জন্যে প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদের ভাষাকে আমরা মনে করি বিদ্রোহ। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহের চেতনা জাগ্রত হয় দেশপ্রেম থেকে।

নজরুল ইসলাম দেশের মানুষকে ভালবাসতেন। তাইতো তাদের দু:খ দুর্দশা ও লাঞ্ছনায়, ব্যথিত হয়ে, তাদেরকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করতে হাতে তুলে নিয়েছিলেন লেখনী। আর সে লেখনী দিয়ে ঝরণা ধারার মত অবিরাম ঝরেছে বিদ্রোহের অর্থাৎ দেশপ্রেমের বাণী। যা প্রেম এবং দেশপ্রেমের সম্মিলিত রূপ।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

স্মৃতিকথা

নজরুল-স্মৃতি
ইবরাহীম খাঁ

ঢাকায় নজরুল
আবদুল কাদির

আগুনের ফুল্‌কি
কাজী আবুল কাসেম

ভুলি কেমনে . . . .
মোহাম্মদ মোদাব্বের

কুড়িগ্রামে কবি নজরুল
মাহফুজুর রহমান খান

www.pathagar.com

১৯২৯ সালে রাজশাহীর মুসলিম ছাত্রাবাসে (চৌধুরীর দালান) নজরুল

www.pathagar.com

নজরুল-স্মৃতি
ইবরাহীম খাঁ

১. নজরুল ইসলামের আবির্ভাব

এই সময় ধূমকেতুর সমস্ত জ্বালা, সমস্ত প্রদিপ্ত, সমস্ত বিস্ময় নিয়ে বাংলার সাহিত্য-আকাশে অকস্মাৎ উদিত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর 'শাতিল আরব' পড়ে বাংলার সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমান উল্লাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল; যেন তাদের কণ্ঠ হতে অলক্ষ্যে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল :

এসেছে রে এসেছে!

কে এসেছে? যার প্রতীক্ষায় তারা এতদিন ছিল, সেই এসেছে। বহুকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান লেখকই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চেয়েছেন তিনিই সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা লিখেছেন যেন সে ভাষা পড়ে হিন্দু সমঝদারেরা বলতে পারেন: 'বাঃ মুসলমানেও তবে বাংলা লিখতে পারে।'

আমরা ছোটবেলায় কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা অনুকরণ করেছি তা নয়। শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক ও ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবের গদ্যেরও অনুসরণ করেছি। তারপর শুরু হল প্রতিক্রিয়া। ইসলাম গণতান্ত্রিক ধর্ম। মুসলমান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে লালিত। তারা অল্পকাল মধ্যেই অনুভব করল, যে ভাষা বারো আনা মানুষে বোঝে না, সে ভাষায় লেখা বই সেই অনুপাতেই ব্যর্থ। কেবল তাই নয়; যে ভাষায় ঈশ্বরের বেশে ছাড়া স্বয়ং আল্লার প্রবেশ নিষিদ্ধ, প্রেরিত পুরুষের পরিচয় ছাড়া যে ভাষায় রসূলুল্লার স্থান নাই, সে ভাষা মুসলমানের ভাষা কি করে হতে পারে? অতএব মুসলমানের জন্য ভাষার স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গী চাই। সেই নতুন ভাষার অভাব সকল শিক্ষিত মুসলমানই অনুভব করছিলেন; কিন্তু কেউ আবিষ্কার করতে পারছিলেন না। ইসলামীয়া কলেজের অধ্যাপক আবদুল মজিদ সাহেব নতুন বাংলা স্টাইল চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু দেখা গেল, তা অজানা আরবী, ফারসী শব্দে এমন কন্টকিত যে তা পড়া যায়, বোঝা যায় না।

www.pathagar.com

এমন সময় এলেন নজরুল ইসলাম তাঁর 'শাতিল আরব' নিয়ে। সবাই পড়ে বলল— তাই তো রে! এত নতুন শব্দ অথচ এত সুন্দর! লেখক : হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। তবে সিপাই তার রাইফেল ছেড়ে কলম ধরেছে? 'নজরুল ইসলাম' এ নামটাও তো সহজপ্রাপ্য নয়! তারপর কবিতার প্রথম দুই লাইন :

.শাতিল আরব! শাতিল আরব!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর;
শহীদের লহু দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।

কই? শাতিল আরব, শহীদ, লহু, দিলীর, খুন এতগুলি 'মুসলমানি' শব্দের এমন সুন্দর প্রয়োগ আর তো কেউ কখনো করতে পারে নাই!
বাঃ।

আবার—

শমশের হাতে আঁসু আঁখে হেথা মূর্তি হেরেছি
বীর নারীর।

মুসলমানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার সেই অতীত দিনের গৌরবের ছবি যেদিন বীরাঙ্গনা আরব নারীর আক্রমণে বিভ্রান্ত রোমক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়েছে স্ত্রীয়াকের তীরে।

ঢাকা নওয়াব বাড়ির একটি মহিলার আঁকা ছবি কাগজে উঠল। 'মামুলি ছবি'। 'নদী—নদীর বুকে একটি পাল তোলা নৌকা— ঝড়ে নৌকা বুঝা যায়।' কিন্তু তবু তো মুসলমান মহিলার হাতের ছবি। নজরুল ইসলামের চোখে সে ছবি পড়ল। তিনি তারই উপর কবিতা লিখলেন: 'খেয়া-পারের তরণী'।

সে ছবির কথা কেউ জানে, কেউ জানে না; কিন্তু সকলেই জানে সে কবিতার সেই অনুপম দুটি লাইন :

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারি গান— 'লা-শরীক আল্লাহ।'

'মুসলমানী' শব্দের এমন মনোজ্ঞ ব্যবহার হতে পারে, এ যেন আগে কেউ কল্পনাই করতে পারে নাই।

মৌলভী তরিকুল আলম ভালো বিদ্বান–সুন্দর চেহারা–সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন পরম ভদ্রজন। তিনি কাগজে এক প্রবন্ধ লিখে যা বললেন তার মর্ম এই যে, কোরবাণীতে অকারণে পশু হত্যা করা হয়; এমন ভয়াবহ রক্তপাতের কোনো মানে নেই। নজরুল ইসলাম অমনি তার জওয়াবে লিখলেন 'কোরবাণী' কবিতা। তাতে তিনি বললেন :

www.pathagar.com

ওরে, হত্যা নয়, এ-সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন,
দুর্বল ভীরু চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন।

এই দিনই মীনা ময়দানে পুত্র স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ,
ছি, ছি, কেঁপ না ক্ষুদ্র মন।

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কলকাতা থেকে যে আসে তাকেই জিজ্ঞাসা করি নজরুল ইসলামের কথা; সাহিত্যিক বন্ধুদের পত্র লিখে বারবার বিরক্ত করি তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করে।

তখন নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে যা যা কানে এল তার মর্ম এই: মা নাই, বাপ নাই, দুনিয়াতে কেউ নাই, একান্ত সৃষ্টিছাড়া জীব; অথচ সমস্ত সৃষ্টি যেন আজ তাঁর একান্ত আপন। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য, পেশীপুষ্ট সবল শরীর। হাসে, গান গায়, গল্প করে, তাঁর হাসির ধমকে বাতাস কাঁপে, ঘরের ছাদ দুলে ওঠে। তাঁর গান কেবল তাঁর কণ্ঠে নয়, তাঁর চোখে, তাঁর ললাটে, তাঁর চুল দোলায়, তাঁর লীলায়িত আঙ্গুলের আগায়, তাঁর উচ্ছ্বসিত দেহের কানায় কানায়। তাঁর গল্পে মজলিস স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, খাওয়া, নাওয়া ঘুম সমস্ত বন্ধ করে আরো—আরো শুনতে চায়।

আরো শুনলাম নজরুল ইসলামের পেছনে দিনরাত ঝাঁক লেগে আছে। সবাই তাঁকে চায়, হয়তো জোর করে ধরে নিয়ে যায়— গান শোনার জন্য, গল্প শোনার জন্য, হাসবার আর হাসাবার জন্য। কিন্তু কেউই ডেকে বলে না, 'কবি এখানে দু'দণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে বস, কিছু লেখ।' কবি যা লেখেন, সে তাঁর এই অনবসর জীবনের ফাঁকে ফাঁকে— রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দেখেশুনে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'কবি, এ-কি করছ তুমি? তলোয়ার দিয়ে গোঁফ চাঁচ?'

আমি ভাবলাম, এত বড়ো একটা প্রতিভা যদি শুধু তরল-আনন্দ-বিলাসীদের ক্ষণিক ক্ষুধা মিটাতে ক্ষয় হয়ে যায়, তবে সে হবে জাতির এক চরম ক্ষতি। আমি চাঁদ মিয়া সাহেবের কাছে গেলাম। সমস্ত অবস্থা জানিয়ে বললাম, 'যদি অনুমতি দেন, তবে আমি কবিকে করটিয়া নিয়ে আসি। এখানে নিরালায় বসে তিনি লিখবেন। ফেরদৌসীকে দরবারে স্থান দিয়ে সুলতান মাহমুদের গজনী যেমন অমর হয়েছে, কাজীকে এখানে রেখে করটিয়াও তেমনি অমর হবে।'

চাঁদ মিয়া সাহেব সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সানন্দে রাজি হলেন। আমি তখনই 'সওগাত'-সম্পাদক নাসিরউদ্দিন সাহেবকে পত্র লিখে দিলাম। তিনি উত্তরে লিখলেন, 'বেশ, এসে নিয়ে যান।'

কবিকে আনতে কলকাতা গেলাম। গিয়ে শুনি, তিনি কুমিল্লা কান্দিরপাড় আছেন। তিন-চার দিন অপেক্ষা করলাম; কিন্তু তাঁর ফিরবার কোনো লক্ষণ বোঝা গেল না। নাসিরউদ্দিন সাহেবকে বললাম— 'আমি যাই; কবি এলে আমাকে খবর দেবেন।'

www.pathagar.com

কিছুদিন পর নাসিরউদ্দিনের পত্র পেলাম: 'কাজীর সাথে এক হিন্দু মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে; কাজী আপাতত সেই স্বপ্নে বিভোর। তা'ছাড়া এই উপলক্ষে তাঁর যে সব হিতৈষী জুটেছেন, তাতে কাজী এখন নাগালের বার। তাকে করটিয়া ধরে রাখতে পারবেন না।'

অবস্থাগতিকে আমারও তাই মনে হল। কাজেই কাজীকে করটিয়া আনার আকাঙ্খা ব্যথিতচিত্তে ছেড়ে দিলাম। আজ কবির গুণগ্রাহীরা তাঁকে য়ুরোপ ঘুরিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন; কোনো চিকিৎসাতেই তাঁর ফায়দা হল না। মনে হয়, তাঁর চিকিৎসার জন্য টাকা তুলতে যত মানুষকে খোশামুদী করলাম, তার অর্ধেক মানুষকে খোশামুদী করে তাদের মারফত যদি তাঁকে ধরে করটিয়া এনে রাখতে পারতাম, তবে তাঁর পরবর্তী জীবনের ইতিহাস, হয়তো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বুঝি আজ অন্য রকম হতো।

২ নজরুলের সঙ্গে পত্রালাপ

ময়মনসিংহে যখন ওকালতী করি, সেই সময় নজরুল ইসলামকে একখানা পত্র লিখেছিলাম। লম্বা পত্র। যা বলেছিলাম সংক্ষেপে তা এই: 'বাংলার বহুদিনের ধ্যানের স্বপ্ন সফল করতে তুমি এসেছ। অপূর্ব তোমার শক্তি, অদ্ভুত তোমার প্রকাশ ক্ষমতা। তোমায় নিয়ে দেশময় আলোড়ন উঠেছে। তুমি মুসলমান সমাজের দিকে আরো সদরদ নজর দাও, তারা তন মন উভয়েই গরীব, সাহায্য তাদেরই বেশি দরকার, তাদের দিকে আরো এগিয়ে এস।'

তিন বছর পর তিনি একটা উত্তর দিলেন। সে উত্তর সোজা আমার কাছে ডাকে পাঠালেন না, আমার তাঁর উভয় পত্র তিনি মাসিক কাগজে ছাপিয়ে দিলেন। পত্র দুটি নিয়ে বেশ খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি হল।

কেউ কেউ মনে করেন, পত্র দুটি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে। আমি জানি, আমার পত্র যদি বেঁচে থাকে তবে নজরুল ইসলামের পত্রকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকবে। কিন্তু, তাঁর পত্র বেঁচে থাকবার সঙ্গত কারণ আছে। তাঁর পত্রের প্রথম দিকে একটু উষ্মার আভাস আছে। আমি তার কারণ বুঝি। আমার পত্রে ছিল তাঁর প্রতি একটা এগিয়ে আসার আবেদন। কেন এগিয়ে আসতে আহ্বান করছি; তার হেতু দেখাতে গিয়ে যা বলেছিলোম তাতে অলক্ষ্যে ছিল একটা উপদেশের ইঙ্গিত। আর বেশির ভাগ স্থলেই উপদেশের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় খানিকটা প্রতিবাদ— সে প্রতিবাদ সবাকই হোক আর নির্বাকই হোক। এই প্রথম উষ্মার পরই ফিরে এসেছে তাঁর স্বাভাবিক সরল ঔদার্য। তিনি অকপটে বলে গিয়েছেন তাঁর মনের কথা। বলেছেন, 'আমি ইসলামকে একান্ত ভালোবাসি, আর এই একান্তভাবে ভালবাসি বলেই তার সাম্যের গান, তার গৌরবের গান, তার মহত্ত্বের গান লিখছি আর চারণের মত শহরে মফস্বলে তা গেয়ে ফিরছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যি বুঝি আমি এ সমাজকে বাঁচাতে এসেছি। কিন্তু এও ভাবি, সেই শক্তি লাভ করতে হলে আমাকে করতে হবে কঠিন তপস্যা। সেই তপস্যার জন্য মন তৈরি হচ্ছে।'
পরবর্তীকালে এই তপস্যার আকাঙ্খা তাঁর মনে অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল। নজরুল একবার নিরালায় আমার সঙ্গে নিবিড়ভাবে তাঁর এই তপস্যার কথা বলেছিলেন। ধ্যানে বসে তিনি দেখতেন আকাশে হঠাৎ জ্বলে উঠছে তারা, সে তারারা সত্যি জ্যোতিষ্ক

www.pathagar.com

নয়, ওরা অতীতের সেই মহাপ্রাণ যাঁরা ধর্মের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য; আমরণ কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করে গেছেন।

তাঁর কথা শুনে আমি বিস্ময় বোধ করতাম। বুঝতাম, এ মানুষটি কি গভীর দরদ, কি অটুট ঈমান নিয়ে মানুষের খেদমতের জন্য তৈরি হচ্ছেন। তবু আমার মনে ভয় হতো। এ সম্বন্ধে আমি কাগজে একবার কিছু লিখেছিলাম, তারই খানিকটা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সম্যক সুযোগ ঘটে নাই। তবে তাঁর যতটুকু সঙ্গলাভ করেছিলাম তা ঐশ্বর্য। আমার জীবনের পরম সম্পদের অন্যতম হয়ে আছে।

এক হিসাবে নজরুল ইসলামের সমগ্র কর্মজীবনই তপস্যা দেদীপ্যমান। কাব্যের তপস্যা, সঙ্গীতের তপস্যা, সুরের তপস্যা, শক্তির তপস্যা। অবশেষে তাঁর জীবনে শুরু হল সুন্দরের তপস্যা। এই শেষের তপস্যা সম্বন্ধেই দু'একটি কথা এখানে বলব।

তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়। একবার তাঁর কলকাতার বাসায় দু'ঘন্টা আলাপ—কেবল তাঁর তপস্যার কথা। মাঝে মাঝে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পর্দায় কি কি অভূতপূর্ব দৃশ্য ভেসে ওঠে, তার বর্ণনা, তাঁর গুরুর কথা, চাটগাঁয়ের এক মাজারের পাশে তিনি কি দেখেছিলেন আর শুনেছিলেন তাঁর অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গিতে সবই যেন আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে জেগে উঠছিল। কিন্তু তবু আমি স্বস্তিবোধ করতে পারছিলাম না, আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে বা কি করতে গিয়ে কি হয়; বহু বহুদিন পরে পাওয়া কাঙালের ধন এ,—আমরা বা একে হারিয়ে বসি।

তার কয়েক বছর পরে— তাঁর বর্তমান অসুখের হয়ত বছরখানেক আগে হবে, তাঁর সঙ্গে আবার তাঁর সেই বাড়িতে দেখা— আবার দীর্ঘকাল পর্যন্ত আলাপ—বিষয় সেই আধ্যাত্মিক কথা। এবার দেখলাম আধ্যাত্মিক আলোচনা ও চিন্তায় তিনি মশগুল। আমার ফের ভয় হল। আমি খুলে বলে ফেললাম :

আমি— কাজীসাব, আপনাকে নিয়ে আমার বিষম ভয়—পাছে বা আপনাকে আমরা হারাই।

কাজী— কেন হারাবেন?

আমি— গান্ধীজীকে আমরা পাচ্ছি, অরবিন্দকে হারিয়েছি আমরা।

কাজী— না-না-না, অরবিন্দুকে আমরা হারাই নাই; গান্ধীজীর চেয়েও অন্তরঙ্গভাবে তাঁকে আমরা পাচ্ছি।

আমি— কিন্তু অরবিন্দের এ শ্রেষ্ঠত্ব আমরা স্বীকার করব কেন?

কাজী— শুধু এইটুকু মনে রাখুন, এই যে গান্ধীজীর বারেবারে ভুল—'সময়তুল্য ভুল' বলে যা তিনি নিজে স্বীকার করছেন, এ ভুল অরবিন্দের হতো না।

আমি— কিন্তু নির্ভুল মন নিয়ে অরবিন্দের মতো সমাজ ছেড়ে যদি দুর্গম গুহায় গিয়ে বসে পড়েন, তবে তাতে আমাদের ফায়দা কি? কিংবা যদি আল্লার ইশ্‌কের মায়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন?

কাজী— সে ভয় করবেন না, খাঁ সা'ব। আমার শ্রেষ্ঠতম গুরু যিনি, সেই হজরত

www.pathagar.com

মুহম্মদের কথা মনে করুন— তিনি মেরাজে গেলেন, কিন্তু ধরাকে ভুললেন না, ফিরে এলেন। কত অলি, দরবেশ, গাউস-কুতুব ঋষি-পয়গম্বর সে মহান সুন্দরের আকর্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে বিলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমার রসূল সে আকর্ষণের চুম্বক খণ্ডকে বুকের তলে পুরে নিয়ে ফিরে এসেছেন তাঁর সঙ্গে আর সবাইকে সে সুন্দর পথে ডেকে নিয়ে যেতে। আমিও তাই করতে চাই।

আমি— তবে আপনার এ সুন্দরের সাধনা দেশ ও সমাজের খেদমতের জন্য।

কাজী— নিশ্চয়! আমাদের এই যে দেশ আর সমাজ, এ একদা মরুভূমি হয়ে পড়েছে। ঘড়ায় ঘড়ায় পানি এনে অনেক সেঁচে দেখলাম তাতে এ মরুর কিছুই করা গেল না। তাই এবার সাগরের পানে চলো-দেখি, মেঘ হয়ে ফিরে এসে ঢল হয়ে ঝ'রে পড়ে একে সুজলা সুফলা করতে পারি কি না।

আবেশে, উৎসাহে, আনন্দে কাজী সাহেবের দেহ রোমাঞ্চিত, কণ্ঠ কম্পিত, বদন প্রোজ্জ্বল, দৃষ্টি অপূর্ব দীপ্তিতে সহসা জ্বলে উঠে পরক্ষণে কোন সুদূর ভবিষ্যতের রঙিন গর্ভে হারিয়ে গেছে। আমি স্তব্ধ, মুগ্ধ, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঝলকে আমারও দেহে পুলক শিহরণ।

সেই বিরাট উদার, মহান স্বপ্নের পূজারী কাজী সা'ব এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু আহা!

মেঘ হয়ে ফিরে আসার সময় হয়তো আর কাজী সাহেবের হবে না। কিন্তু যে আগুন–ঝরা নির্মেঘ আকাশের নির্দয় দৃশ্য অনুদিন তাঁর অন্তরকে পীড়া দিয়েছে, যে আকাশে আজ তাঁর মন্ত্রশিষ্যরা তিলে-তিলে মেঘ সঞ্চারে রত, একদিন তাঁরা অন্তত ঢল হয়ে ভেঙে পড়ে এ মরুভূমির বুক স্নিগ্ধ করবে— এই ভেবে আজ কিঞ্চিৎ সান্ত্বনাবোধ করছি।

৩.

তাঁর [হুমায়ুন কবিরের] সাথে আর একবার দেখা হল তাঁদের ফরিদপুরের বাড়িতে। তাঁরই দাওয়াতে আমি আর কাজী নজরুল ইসলাম ফরিদপুরে সভা করতে গেলাম। সকালে নাস্তা পানি খেলাম। কাজী সাহেবকে দেখবার জন্য ছেলের দল ভেঙে পড়ল। দুপুরে গোসলের সময় কাজী সাহেব পুকুরে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলেন। বললেন, 'অনেকদিন পর একটু সুযোগ পেয়ে ছাড়তে পারি না।' খাওয়ার পর সভায় যাব, এমন সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে ১৪৪ ধারার এক নিষেধাজ্ঞা এসে হাজির। মোহন মিয়া অপর পক্ষে ছিলেন। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরে এই কর্ম করেছেন। আমাদের দলের ছেলেরা ক্ষেপে উঠল, আস্তিন গুটিয়ে কাপড় কেচে তখনই নিষেধাজ্ঞা ভেঙে সভা করতে ছোটে আর কি? কাজী সাহেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি কি বলেন?' বললাম, 'এই সভা, এরই জন্য এসে আপনি জেলে যাবেন, এ আমার ভাল লাগে না।' তখন কাজীর যৌবনের প্রচণ্ড উত্তাপ কমে এসেছে। তিনি বললেন, 'তাই, জেলে গেলে আরো বড়ো জিনিস সামনে ধরে যেতে হয়।' হুমায়ুন কবির শসহেব একমত হলেন। আমরা সভার বদলে কবির সাহেবের বাড়িতে মজলিস করলাম।

www.pathagar.com

ঢাকায় নজরুল

আবদুল কাদির

আমি 'ধূমকেতু'-যুগের নজরুলকে দেখিনি, প্রথম দেখেছি 'লাঙল'-যুগের নজরুলকে। সারথি নজরুলের অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রথম উদিত হয়েছিল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট মুতাবিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৭শে শ্রাবণ। আমি সে-সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্নদা হাই ইংলিশ স্কুলের ছাত্র। আমার বন্ধু চৌধুরী শামসুর রহমান কলকাতা থেকে ডাকযোগে একটা প্যাকেটে কয়েক সংখ্যা 'ধূমকেতু' পাঠিয়েছিল; তাতেই আমি প্রথম পড়ি নজরুলের 'বিদ্রোহী', 'জাগরণী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'মোহররম', 'কামাল পাশা' প্রভৃতি কবিতা। যতদূর মনে পড়ে, প্রথম সংখ্যা 'ধূমকেতু'-তে 'বিদ্রোহী' পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর মুতাবিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই ভাদ্র তারিখের ৭ম সংখ্যক 'ধূমকেতু' বিশেষ মোহররমসংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়; তাতে নজরুলের 'মোহররম' কবিতাটি ১৩২৭ আশ্বিনের 'মোসলেম ভারত' থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তী সংখ্যক 'ধূমকেতু' "ছাপা হচ্ছে, এমন সময় খবর এলো তুর্কীরা 'স্মার্ণা' দখল করেছে।" সুতরাং তাতে তাঁর 'কামাল পাশা' কবিতাটি ১৩২৮ কার্তিকের 'মোসলেম ভারত' থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়।

কলকাতা থেকে 'ধূমকেতু'র প্যাকেটটি পাওয়ার কিছুদিন পরই ভৈরববাজারের সন্নিকটস্থ চণ্ডীবেড় গ্রামের মরহুম চাঁদ মিঞা সওদাগরের কাছে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা দেখতে পাই। ১৩২৮ কার্তিকের মোসলেম-ভারতের ১৯৪-১৯৯ পৃষ্ঠায় 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছিল; ১৯৪ ও ১৯৫ পৃষ্ঠাদ্বয়ের মাঝে আর্ট কাগজে পরিবেশিত হয়েছিল সৈনিক কবির যুদ্ধের পোষাক পরা রঙিন ছবি : তাতে 'চিত্র পরিচয়' (caption) ছিল : 'হাবিলদার কবি নজরুল ইসলাম'। তার নীচে মুদ্রিত ছিল 'বিদ্রোহী' থেকে এই তিনটি চরণ—

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা ;
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!

www.pathagar.com

'ধূমকেতু'র নানা লেখা এবং 'মোসলেম ভারতে'র এই ছবি আমার মানস-চক্ষে বিদ্রোহী কবির যে-মূর্তি ফুটিয়ে তোলে, তার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। সেই আকর্ষণ আমার জীবনের গতিধারা দিল বদলে— আমার সাহিত্যিক হবার সাধ হলো দূরীভূত। সংকল্প নিলুম : জীবনে আর কিছু কামনা করবো না; অর্থ সম্পদ নয়, পদমর্যাদা নয়, একমাত্র কাম্য হবে সাহিত্যের সেবায় সার্থকতার আনন্দ লাভ।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর মুতাবিক ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ নজরুলের পরিচালনায় ৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। আমি তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আই. এস. সি শ্রেণীর ছাত্র। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখের ১৫শ সংখ্যা বের হয়ে 'লাঙল' বন্ধ হয়ে যায়।

'লাঙল'-এর আদর্শ ছিল পাক-ভারতের শোষিত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সর্বাঙ্গীন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু তখন আমার মনে হয় যে, স্বাধীনভাবে চিন্তাচর্চার পরিবেশ না পেলে বাঙালী মুসলমানের স্বাভাবিক জীবন বিকাশ সম্ভবপর নয়। এই চিন্তা থেকেই প্রধানত আমারই উদ্যোগে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সালেই ১১ই ও ১৩ই মার্চ তারিখে, 'লাঙল' বন্ধ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে নিখিল বঙ্গীয় আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হয়েছিল; তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন পরলোকগত হেমন্তকুমার সরকার এম. এ. এম. এল্. সি, এবং নজরুল 'জেলেদের গান' গেয়ে করেছিলেন উদ্বোধন। তৎকালে ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে) সদস্য ছিলেন স্বরাজ্য-দলের মনোনীত পরলোকগত চাঁদনীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাশ। 'লাঙল' বন্ধ হওয়ার পর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে হেমন্ত বাবুকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ঢাকা সফরে আসেন এবং মোহিনী বাবুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

নজরুলের ঢাকা আগমনের খবর পেয়ে বন্ধুবর মোহাম্মদ কাসেম ও আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে যাই। মোহিনী বাবু থাকতেন ঢাকা কাছারীর কাছে একটা বাড়ীতে। কবি ও হেমন্ত বাবু আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। কবির সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা। তিনি আমাদের মুসলিম সাহিত্য সমাজের কথা আগেই শুনেছিলেন; জিজ্ঞাসা করলেন কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের কথা। সাহিত্য-সমাজের প্রগতিশীল চিন্তাধারার কথা শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেই আনন্দ প্রকাশের মধ্যে তখন কবির স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতা বেশী দেখতে পেলাম না। আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝতে পারলাম, সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেভাবে বাড়ছে তার পরিণাম চিন্তাই কবির মনের স্বতোৎসারিত উল্লাস অনেকখানি হরণ করেছে। মাত্র এক মাস আগে, ২২শে ও ২৩শে মে তারিখে, কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের

www.pathagar.com

উদ্বোধন করেছিলেন কবি তাঁর রচিত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি গেয়ে। কিন্তু সেই হুঁশিয়ারী হয়েছে ব্যর্থ– প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস কর্মি-সংঘের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের তৎপরতায় দেশবন্ধু, সি. আর. দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট গেছে বাতিল হয়ে; সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন উস্কিয়ে দেওয়া হচ্ছে সর্বত্র। কবি এজন্য দুঃখ ক'রে বললেন প্রগতিপন্থী তরুণদের এগিয়ে আসতে। শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নয়, হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির যুগ সম্মত সমন্বয় সাধন মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান কর্মীদের বিশেষ ভাবনার বিষয়, আমার মুখে কথা শুনে কবি ও হেমন্ত বাবু আগ্রহ প্রকাশ করলেন সাহিত্য সমাজের এক বৈঠকে মিলিত হতে।

অতঃপর কবির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন রবিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বৈঠক আহুত হয়। বৈঠকে হেমন্ত বাবু 'সাহিত্যে সৃষ্টি' বিষয়ে বলেন :

> "আমাদের সাহিত্যে প্রাণের অভাব ঘটেছে, সেজন্য কোনো নবসৃষ্টি হচ্ছে না। আমাদের ছোট ঘরের দুস্থ জীবন আজ সাহিত্যে আঁকতে হবে।*

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের উক্ত বৈঠকে নজরুল ইসলাম একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' 'আমরা ছাত্রদল' 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি জনজাগরণমূলক কয়েকটি গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দান করেন। নজরুল মধুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু সুকণ্ঠ ছিলেন; তিনি সুরে এমন অলঙ্করণ ও আন্তরিক আবেগ দিয়ে তাঁর বাণীর বিস্তার করতেন যে, তার প্রভাবে সহজেই শ্রোতার চিত্ত হতো অভিভূত। সেদিন নজরুলের কণ্ঠে জাগরণী গানগুলি কথার অতীত অর্থে শ্রোতাদের প্রাণের অতল করে উদ্দীপিত। সেই উদ্দীপনার একটা দুঃসাহসিক প্রকাশ পরলোকগত কথাশিল্পী মোহাম্মদ কাসেমের সম্পাদিত মাসিক 'অভিযান'। নজরুলই করেন পত্রিকাটির এই নামকরণ এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখে নারায়ণগঞ্জে বসে লিখে দেন তার জন্যে আশীর্বাণী—

নতুন যুগের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান,
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ
মানুষ মহীয়ান।

ইত্যাদি।

নজরুলের আশীর্বচন বুকে নিয়ে ১৩৩৩ ভাদ্রে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক 'অভিযান' আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 'অভিযান' বেরিয়েছিল মাত্র দু'সংখ্যা; সমাজের রক্ষণশীল অংশের প্রবল প্রতিকূলতায় তার প্রচার হয় ব্যাহত।

---

* হেমন্ত বাবুর বক্তৃতার অনুলিপি 'সাহিত্যে সৃষ্টি' শিরোনামে মরহুম দিদারুল আলম-সম্পাদিত ১৩৩৩ চৈত্রের 'যুগের আলো'তে প্রকাশিত হয় । (–লেখক)

www.pathagar.com

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট মুতাবিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৭শে শ্রাবণ নজরুলের 'লাঙল' পত্রিকার নাম পরিবর্তিত ও তার সাথে একীভূত হ'য়ে সাপ্তাহিক 'গণবাণী' প্রকাশিত হয়। ১২ই অক্টোবর তারিখের 'গণবাণী'তে "নির্বাচন দ্বন্দ্বে কবি" শিরোনামীয় এক সংবাদে বলা হয় :

> বাংলার বরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা বিভাগের মুসলমান কেন্দ্র হতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ প্রার্থী হয়েছেন।

তার কয়েক দিন পরেই ঢাকা নগরীর বুকে নজরুলের পুনরাগমন ঘটে। এবার তিনি এসে আস্তানা নিলেন ৫২ নং বেচারাম দেউড়ির ঠিকানায়— হযরত সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ ইউসুফ কাদেরী (রা:) সাহেবের বাড়ীর সন্নিহিত মসজিদের সংলগ্ন দালানের একটি কক্ষে। উক্ত শাহ্ সাহেব স্থানীয় জনসমাজে 'কাশ্মীরী শাহ্' নামে অভিহিত হতেন। মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর শ্বশুর মৌলভী এ. এম. আবদুল্লাহ্। মসজিদের সংলগ্ন ওয়াক্ফ্ জমিতে আছে তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র দালান; তারই এক কক্ষে নজরুল নিলেন আশ্রয়। নজরুলের খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা বিষয়ে প্রত্যহ তদারক করতেন শাহ্ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ হুসেনুর রহমান কাদেরী মরহুম। তাঁর অন্য পুত্র সৈয়দ আতাউর রহমান কাদেরী ছিলেন রাগ-সঙ্গীতের ভক্ত; ফলে কবির প্রতি তাঁর অনুরক্তি ছিল স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য যে, কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য-পদে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা কল্লেই কবি সেখানে আস্তানা পেতেছিলেন।

তখন সমগ্র ঢাকা বিভাগ থেকে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় মুসলমানদের জন্যে দু'টি আসন সংরক্ষিত ছিল। ভোটদাতাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৮,১১৬ জন। প্রত্যেক ভোটদাতা দু'টি ক'রে ভোট দিতে পারতেন। দু'টি আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন পাঁচজন : ১. বরিশালের জমিদার জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, ২.ময়মনসিংহ দেলদুয়ারের জমিদার জনাব (পরে স্যার) আবদুল হালিম গজনভী, ৩. ঢাকা নবাব পরিবারের খাজা আবদুল করিম, ৪. কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ৫. জনাব মফিজউদ্দীন আহমদ। প্রথমোক্ত দু'জন ছিলেন স্যার আবদুর রহিমের দলের মনোনীত প্রার্থী, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ জন ছিলেন স্বরাজ্য দলের মনোনীত প্রার্থী। সুতরাং খাজা আবদুল করিম ও কাজী নজরুল ইসলাম নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতরণের জন্য যথারীতি জোটবদ্ধ হন। খাজা আবদুল করিমের পক্ষে তাঁর ছোট ভাই খাজা হাফেজ রহিম ও নজরুল ইসলামের পক্ষে মরহুম আবুল হাসানাৎ ওরফে শাহজাদা মিয়াঁ স্বেচ্ছা-সেবক দল গঠনের উদ্যোগ করেন। শাহজাদা মিঁয়ার কর্মীদলের মহড়া ও কর্মতৎপরতা দেখবার জন্যে আমি, আবুল ফজল, মোহাম্মদ কাসেম, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, নবাবজাদা সৈয়দ ফজলে রাব্বি প্রভৃতি প্রায় প্রত্যহ বেচারাম দেউড়ী যেতাম। কিন্তু গিয়ে দেখতাম কবি তাঁর কোনো কবিতা আবৃত্তি করছেন, কিম্বা কোনো নবীন কবি যশঃপ্রার্থীর কবিতার খাতায় চোখ বুলোচ্ছেন। নির্বাচনের কথা উঠলে কবি উষ্মা প্রকাশ করে বলতেন "ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ২৮শে অক্টোবর আমাকে মাত্র

www.pathagar.com

আড়াই শ' টাকা দেন, এবং আবশ্যক টাকা পরে মনিঅর্ডার ক'রে পাঠাবার কথা; কিন্তু আমার অনেক তাগাদা সত্বেও আজ অবধি একটি টাকাও পাঠালেন না!" একদিন গিয়ে শুনলাম কবি জয়বেদপুর যাবেন। সেদিনই ফরিদপুর থেকে আসেন মরহুম মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ওরফে লাল মিঞা। কবি সন্ধ্যায় রওয়ানা হলেন জয়দেবপুর। লাল মিঞা ঢাকা রেল ষ্টেশনে এসে গাড়ীতে ব'সে কবির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। কবি প্রসঙ্গত বললেন : তিনি শীঘ্রই নির্বাচনের প্রচার কার্যে জয়দেবপুর পর্যন্ত যেতে নারাজ! অগত্যা আমাকেই কবির সঙ্গে যেতে হলো।

রেলগাড়ীর ইন্টার ক্লাশের ছোট কামরা। সেই কামরায় আমরা দু'জন মাত্র আরোহী। জ্যোৎস্না রাত্রি, সমস্ত আকাশ গেছে জ্যোছনা কৌমুদীতে ভ'রে, সারা দিগ্‌দেশ যেন তারি আনন্দে উদ্বেল। কবি জয়দেবপুর চলেছেন নির্বাচনের তদবির করতে; কিন্তু তাঁর মনের অঙ্গন থেকে তখন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে বাস্তব সংসারের সকল দ্বন্দ্ব-দ্বেষ সংক্ষোভ সংঘর্ষ—শুধু বাজছে দিগন্তপ্লাবী সৌন্দর্যের একটানা সুর-মূর্ছনা। সেই সৌন্দর্যের সূত্রে তিনি গেঁথে চললেন শ্লোকের পর শ্লোক। রচিত হলো একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা। 'জয়দেবপুরের পথে' এই কবিতাটিই পরবর্তীকালে স্থানে স্থানে পরিমার্জিত ও ছয় পংক্তি পরিবর্জিত হ'য়ে তার 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যে 'চাঁদনী রাতে' শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। তাতে যে ছয় পংক্তি পরিত্যক্ত হয়েছে, তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

ছুটিতেছে গাড়ী, ছায়াবাজি সম কত কথা ওঠে মনে,
দিশাহারা-সম ছোটে ক্ষ্যাপা মন জলে থলে নভে বনে।
এলাকেশে মোর জড়ায়ে চরণ কোন্ বিরহিনী কাঁদে,
যত প্রিয়াহারা আমারে কেন গো বাহু-বন্ধনে বাঁধে!
নিখিল বিরহী ফরিয়াদ করে আমার বুকের মাঝে,
আকাশে-বাতাসে তাদেরি মিলন তাদেরি বিরহ বাজে।

সেই চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত রজনীতে রেলগাড়ীর একটি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ কক্ষে ব'সে ক্ষ্যাপা কবির মনে পড়ে নিখিল বিরহী-বিরহিনীর মর্মব্যথা—তাদের মিলনের আনন্দ আর বিরহের বিষাদ। জাগতিক জীবনের অভাব অভিযোগ আঘাত সংঘাত সম্বন্ধে এরূপ নিরাসক্তিই তাঁর মন থেকে তখন নিঃশেষে মুছে দিয়েছিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। তাঁর এই প্রসন্ন কবি-মনের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার জীবনে বহুবার হয়েছে।

পরদিনই আমরা ঢাকা ফিরে এলাম। কবি তাঁর নূতন রচিত কবিতাটি সমবেত ভক্তদের আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। মোহাম্মদ কাসেমের আগ্রহে তাঁর 'অভিযান' তৃতীয় সংখ্যার জন্য কবি তাঁর এই কবিতাটি দিয়েছিলেন; কিন্তু 'অভিযান' আর বের হয়নি। ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে আমি কলকাতা থেকে 'জয়তী' বের করি; তার প্রথম সংখ্যার প্রথমেই শোভিত হয় এই কবিতাটি। নজরুলের হাতের লেখা থেকেই আমি তার মূল পাঠ

www.pathagar.com

নিয়েছিলাম। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি আমি এতদিন সযত্নে রক্ষা করেছি দেখে কবি তখন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এবং খুশী হয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন নজরুলকে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে স্বরাজ্য-দলের তৎকালীন পাণ্ডারা কবির প্রতি অবিচারই করেছিলেন। তাঁরা অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। ফলে নির্বাচনের দিন কর্পদকহীন আমরা দল বেঁধে বৃথাই ঢাকা নগরীর প্রতি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে দিলাম ধর্ণা। নির্বাচনে কবি শুধু বিফল হলেন না— তাঁর জামানতের টাকাও বাজেয়াফ্ত হয়ে গেল।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল মিলনায়তনে। সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে নজরুল রচনা করেন 'খোশ্ আমদেদ'। ঢাকা আসবার পথে পদ্মানদীতে স্টীমারে ব'সে রচনা করেন "বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কে গো উদাসিনী" গজলটি। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন নজরুল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :

> আজ আমি এই মজলিসে আনন্দ-বার্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয়েছে। আজ আমি দেখ্‌ছি মুসলমানের নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা ক'রে বেড়াবো।.....

সে-বার কবি ঢাকায় মাত্র তিন দিন ছিলেন। যাবার দিন (১লা মার্চ ১৯২৭) আমি তাঁকে মরহুম দিদারুল আলমের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সম্মিলনী' ও মাসিক 'যুগের আলো' কয়েক কপি দেখ্‌তে দিই। তিনি 'যুগের আলো' প'ড়ে খুশী হন এবং তখনই এই আট পংক্তি প্রশস্তি লিখে দেন :

> নিদ্রাদেবীর মিনার চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুন্‌ছি আরাব,
> পান ক'রে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব!
> ঊষায় যা'রা চম্‌কে গেল তরুণ রবির রক্তবাগে,
> যুগের আলো! তাদের বলো, প্রথম উদয় এমনি লাগে।
> সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
> তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষাধারা।
> যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন ফুলের আগুন-শিখা,
> সীমন্তে লাল সিঁদুর প'রে আসছে হেসে জয়ন্তিকা।

১৩৩৩ ফাল্গুন ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক 'যুগের আলো'তে এই প্রশস্তি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাতে কোনো শিরোনাম ছিল না।

পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নজরুল তাঁর 'চল্ চল্ চল্' গানটি গেয়ে। তিনি সেবারও উঠেছিলেন মরহুম আবুল হুসেন সাহেবের বাসায়; সেখানে ব'সেই রচনা করেছিলেন এই

www.pathagar.com

গানটি। সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁর থাকার জায়গা ক'রে দেওয়া হয় বর্ধমান হাউসের একটি কক্ষে; সেখানে তিনি অনেক দিন অবস্থান করেছিলেন।

আমরা তখন প্রায় প্রত্যহ বর্ধমান হাউসে কবি-সন্দর্শনে যেতাম। একদিন আমার সঙ্গে গেলেন সৈয়দ জাহিদুল হক চৌধুরী। তাঁর পরিকল্পিত সাপ্তাহিক 'দরদী' পত্রিকার জন্য কবি তখনই লিখে দিলেন এই ছয় পংক্তি প্রশস্তি :

> দরদ দিয়ে দেখ্‌ল না কেউ যাদের জীবন যাদের হিয়া
> তাদের তরে ঝড়ের রথে আয় রে পাগল দরদিয়া!
> শূন্য তোদের কোলাকুলি, তারি তোরা দর্প নিয়ে
> দর্পীদের ঐ প্রাসাদ চূড়ে, রক্তনিশান যা টাঙিয়ে।
> মৃত্যু তোদের হাতের মুঠোয়, সেই তো তোদের পরশ-মণি,
> রবির আলোক ঢের সয়েছি, এবার তোরা আয়রে শনি।

সে-সময় একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রমনা লেকের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে ব'সে রচনা করেন "নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরান পিয়া" গজলটি। ১৩৩৪ চৈত্রের 'প্রগতি'তে এই গজলটি কবি-কৃত স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত হয়।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মিস্ ফজিলতন্-নেসা এম. এ. "নারী-জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাতে বলেন—

> আধুনিক শিক্ষা নারীকে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে, তাকে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের রস গ্রহণ করতে শিখিয়েছে; তাই এর আস্বাদ আমাদের কাছে বড় মধুর।... আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ নারী-জীবনে যে জাগরণের সাড়া এনে দিয়েছে, সেজন্যই আমি তাকে বরনীয় ব'লে কাম্য ব'লে আহ্বান করি।

সে-সময়ে ফজিলতন্-নেসার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। ফজিলতন্-নেসা তখন তাঁর ছোট বোন শফিকুন্নেসা সহ ৯২ নং দেওয়ান বাজার রোডে থাকতেন, নজরুল সে বাড়ীতে মাত্র তিন দিন গিয়েছিলেন। সেই তিন দিনের পরিচয় কবির মনে কতখানি প্রবল ও গভীর অনুভূতি জাগ্রত করে, তার উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তি ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত "নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়" নামক পত্র-সংকলনে স্পষ্ট দেখা যায়।

সে-সময় বর্ধমান হাউসের ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন। বর্ধমান হাউসের উত্তর-পশ্চিম পাশে অবস্থিত একটা বাংলো প্যাটার্ণের চৌচালা ঘরে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। সুদীর্ঘ "একাদশ বর্ষ পরে" কাজী সাহেবের দাড়ি-কর্তন উপলক্ষে' সে-সময় কবি 'দাড়ি বিলাপ' নামে একটি কৌতুক কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি ঢাকার মাসিক 'শান্তি'তে প্রকাশিত হয়। কাজী সাহেবের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতা যে কোন স্তরে পৌঁছেছিল, তার মধুর নিদর্শন উপরোক্ত পত্র সংকলনের অনেক ছত্রও

www.pathagar.com

উপভোগ্য রূপ লাভ করেছে। ঢাকা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীসুরেশচন্দ্রনাথ মৈত্রের বাংলোয় দাবা খেলার আড্ডা নজরুলের শিল্পী মনে কিরূপ আকর্ষণের সৃষ্টি করেছিল, তার মনোরম ছবি আছে তার 'শিউলি মালা' গল্পে। অধ্যক্ষ মৈত্রের গৌরী কন্যা উমা মৈত্র ওরফে 'নোটন' এই গল্পের নায়িকা শিউলির চরিত্রে ফেলেছে কিছু ছায়া।

সে-বার ঢাকার ফজিলতন্-নেসা ও উমা মৈত্র ছাড়া যে মহিলার সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ হয়, তিনি শ্রীমতি প্রতিভা সোম ওরফে রাণু সোম। কবি তখন প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বনগ্রামে যেতেন এবং রাণু সোমকে গান শেখাতেন। তাঁর সংকল্প ছিল, রাণুকে তাঁর গান শিখিয়ে সেই গান রেকর্ড করাবেন। তিনি রাণু সোমের খাতায় "বসন্ত মুখর আজি", "এলো বরষা শ্যাম সরসা প্রিয় দরশা" প্রভৃতি গান লিখে দিয়েছিলেন। সে-সময়কার কথা স্বরণ ক'রে শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

> সে-বারে ঢাকায় সুধীজনের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, জনসাধারণ তাঁর গান শুনে আত্মহারা, কেবল কতিপয় দুর্জন দুষমনের পক্ষে তাঁর প্রতিপত্তি এত দুঃসহ হলো যে তা'রা শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর গায়ের জোরে গুণ্ডামি ক'রে ঢাকার ইতিহাসে এক সঙ্গে অনেকটা কালি ঢেলে দিলে।
>
> [কবিতা : নজরুল-সংখ্যা : কার্ত্তিক-পৌষ : ১৩৫১]

যে দুর্জনেরা রাত্রির অন্ধকারে বনগ্রামের এক গলি পথে কবির "উপর গায়ের জোরের গুণ্ডামি করে", তাদের সম্বন্ধে পরিত্যক্তা প্রথমা পত্নীকে ১.৭.৩৭ তারিখের এক পত্রে লেখেন :

> তোমাদেরই ঢাকার কুকুর একবার আমায় কামড়েছিল আমার অসাবধানতায়, কিন্তু শক্তি থাকতেও আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি— তাদের প্রতি আঘাত করিনি। সেই কুকুরদের ভয়ে ঢাকায় যেতে আমার সাহসের অভাবের উল্লেখ করেছ, এতে হাসি পেল। তুমি জান, ছেলেরা (যুবকেরা) আমার কত ভালবাসে। আমারই অনুরোধে আমার ভক্তরা তাদের ক্ষমা করেছিল। নৈলে তাদের চিহ্নও থাকত না এ পৃথিবীতে।
>
> (নজরুল-রচনা-সম্ভার : পরিশিষ্ট, ৪৩৭ পৃ:]

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি কলকাতায় গিয়ে 'গণবাণী' অফিসের আবদুল হালিমের মুখে শুনি যে, সাপ্তাহিক 'ভোটরঙ্গ' এই কাপুরুষোচিত 'গুণ্ডামি' নিয়ে একটি কুরুচিকর কৌতুক নাট্য পরিবেশন করে।

বনগ্রামের 'গুণ্ডামি'র কয়েক দিন আগে আমি কলকাতা থেকে 'গণবাণী' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মুজফফর আহমদের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পাই। তাতে বলা হয় যে নজরুলের স্ত্রী অসুস্থা, সুতরাং নজরুল যেন সত্বর কৃষ্ণনগরে ফিরেন। আমি বনগ্রামে গিয়ে এই

www.pathagar.com

টেলিগ্রাম নজরুলকে দেখাই। কিন্তু কবি বলেন যে, এখানে অসুস্থতার অর্থ হচ্ছে অর্থাভাব। তিনি আমাকে পরদিন বৈকালে আবার যেতে বললেন। পরদিনই সকালে মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের একখানি দীর্ঘ পত্র পেলাম; তাতে তিনি আমাকে লেখেন যে, নজরুলের শাশুড়ীর এক জরুরী চিঠি পেয়ে আবদুল হালিমকে কৃষ্ণনগরে পাঠানো হয়েছিল, নজরুলের পরিবার অভুক্ত দেখে হালিম যৎসামান্য চাউল ডাল কিনে দিয়ে এসেছে, নজরুলের বর্তমান ঠিকানা তাঁরা কেউই জানেন না— তাই আমার সহায়তা আবশ্যক হয়েছে। সেই পত্রখানি নিয়ে অপরাহ্নে নজরুলের কাছে গেলাম। নজরুল বললেন : "খান বাহাদুর কাজী আবদুর রশীদ সাহেব আজ চার শত টাকা দেবেন, সেই টাকাটা পেলেই কাল সকালে তার থেকে দুই শত টাকা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার যোগে কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।" পরে শুনেছি, নজরুল দুই শত টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন কবি এই চার শত টাকা নিয়েছিলেন ব'লেই সেই দেনা পরিশোধ করতে পরবর্তীকালে 'মরু-ভাস্কর' প্রথম সংস্করণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল কি না; তা ওয়াকেফহাল ব্যক্তিরাই সঠিক বলতে পারেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে নজরুল ঢাকায় এসে সে-বার প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ছিলেন। তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পূর্বাহ্নে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৮শে মার্চ ১৯২৮ তারিখের এক পত্রে নজরুল প্রস্তাব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর 'সঞ্চিতা' বিদুষী ফজিলতন্‌-নেসার নামে 'উৎসর্গ' ক'রে 'ধন্য' হতে চান। কিন্তু এই প্রস্তাবে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পূর্বোক্ত 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' নামক পত্র-সংকলনে "আমি ঢাকা যেতে রাজি আছি", "তারপর ঢাকা যাত্রার আয়োজন" এ-সব কথা আছে। কিন্তু তিনি প্রায় চার মাস পরে একদিন অকস্মাৎ কলকাতার খেলার মাঠ থেকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 'কল্লোল' দলের চার পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় চ'লে আসেন। ৭ আষাঢ় ১৩৩৫ তারিখে বনগ্রামে ব'সে শ্রীমতী প্রতিভা সোমের খাতায় লিখে দেন এই কবিতাটি—

শ্রীমতী রাণু সোম
কল্যাণীয়াসু—

মাটীর উর্ধ্বে গান গেয়ে ফেরে
স্বরগের যত পাখী
তোমার কণ্ঠে গিয়াছে তাহারা
তাদের কণ্ঠ রাখি'।
যে গন্ধর্ব লোকের স্বপন
হেরি মোরা নিশিদিন
তুমি আনিয়াছ কণ্ঠ ভরিয়া
তাদের মুরলি বীণ।

www.pathagar.com

তুমি আনিয়াছ শুধু সুরে সুরে
ভাষাহীন আবেদন,
যে সুর মায়ায় বিকশিয়া ওঠে
শশী তারা অগণন।
যে সুরে স্বরগে স্তব-গান গাহে
সুন্দর সুরধুনী
অসুন্দর এই ধরায় তোমার
কণ্ঠে সে গান শুনি ॥

১৩৩৬ অগ্রহায়ণে নজরুলের দ্বিতীয় গীতিগ্রন্থ 'চোখের চাতক' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার উৎসর্গ পত্র :

কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী
শ্রীমতী প্রতিভা সোম
জয়যুক্তাসু—

তার প্রায় ১১ বছর পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নজরুল শেষ বারের জন্য ঢাকা এসেছিলেন। ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে কলিকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ক'রে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর মুতাবিক ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৬ই পৌষ তারিখের এক পত্রে লেখেন—

আমি আপনাদের দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তা ছাড়া, ঢাকা থেকে ফিরে এসে শরীরও সুস্থ নয়।

[নজরুল-রচনা-সম্ভার : দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩৯২ পৃ:]

তখন তাঁর দেহযন্ত্রে ধরেছে ভাঙন, মনে লেগেছে যোগ সাধনার নিগূঢ় আমেজ। ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে ছাত্র সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে তিনি যে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন, তাতে তাঁর তৎকালীন ধ্যান-ধারণার বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তার কয়েকদিন আগে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের আমন্ত্রণে একদল শিল্পীর সঙ্গে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। (ঢাকা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৩৩৯ সালে) সে সময় কবি একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে সকাল ১০টায় এসে বেলা ১২টা পর্যন্ত ছাত্রদের মজলিসে গান করেন। সেখান থেকে সোজা ফজলুল হক হলে গিয়ে অপরাহ্ন ৩টা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের চাহিদা অনুসারে গানের পর গান ও কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। জসীমউদ্দীন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক; তিনি সেদিনের ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন :

www.pathagar.com

.... সে-বার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করিবার সময়...এক জায়গায় কবি বলিয়া ফেলিলেন : 'আমি আল্লাহকে দেখেছি। কিন্তু সে-সব কথা বলবার সময় এখনও আসে নাই। সে-সব কথা বলবার অনুমতি যেদিন পাব, সেদিন আবার আপনাদের সামনে আসব'।

নজরুলের সে-সময়কার অনেক কবিতায় ও ভাষণে তাঁর এ ধরনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা দেখতে পাওয়া যায়। নজরুলের এ সব গূহ্য কথা তাঁর কোনো কোনো অনুরক্তের কাছে মনে হয়েছে 'প্রলাপোক্তি' ও অন্যপক্ষে তাঁর অনেক ভক্ত ও বন্ধু আশা করেছেন যে, নজরুল তাঁর যোগী-জীবনের পরিণতিতে হয়ত "সমৃদ্ধতর চিত্ত ও তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিয়ে নূতন ক'রে জীবনে ও সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারেন।" (শাশ্বত বঙ্গ, ৯০ পৃষ্ঠা) কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হয়েছে। এর মাত্র দেড় বছর পরে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে অকস্মাৎ ষ্ট্রোক হ'য়ে নজরুল মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা রোগে আক্রান্ত হন। সেই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি অকালে ঘটিয়েছে তাঁর কবি-জীবনের অবসান।

নজরুল আজ সম্বিতহারা ও বাক্‌শক্তি বিরহিত। কিন্তু তিনি আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন যে বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও সুরসম্পদ, তার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য বহুদিন আমাদের জীবন রাখবে সঞ্জীবিত, আমদের কণ্ঠ রাখবে মুখর।

ত্রিশাল নামাপাড়া বিচুতিয়া বেপারীর বাড়ির এই বৈঠকখানায় নজরুল থাকতেন।

www.pathagar.com

লন্ডনে নজরুল, ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার জন্য

www.pathagar.com

আগুনের ফুল্‌কি

কাজী আবুল কাসেম

আমার মানস-পটে কবি নজরুল ইসলামের যে ছবি আঁকা রয়েছে তা সত্যিই অনবদ্য এবং অবিস্মরণীয়। কবিকে তাঁর যৌবনে ও যৌবনোত্তরকালে যে কয়টি বার দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যে ক'বার তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমি পেয়েছি, সেই আনন্দঘন মুহূর্তে তাঁকে শুধু বিস্ময়ের সাথে অবলোকন করেছি। মানুষ যে চোখে হিমালয়কে দেখে বা মহাসমুদ্র দেখে, এ দেখার তুলনা বোধ করি অনেকটা সেই পর্যায়ের। তাঁকে দেখে সম্ভ্রম, সংকোচ ও অননুভূত আনন্দে দুরু দুরু করে উঠেছে বুক।

শৈশবকালে যখন পাঠশালায় পড়ি তখন এক হিন্দু শিক্ষকের মুখে প্রথম শুনতে পাই কাজী নজরুল ইসলামের নাম। একজন মুসলিম কবি এবং কলকাতার কোনো বিখ্যাত পত্রিকায় নাকি তাঁর লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে। কিন্তু এসব কথা বুঝবার মত বয়স তখনো আমার হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, হেমচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ কবিদের কবিতা মুখস্থ করতে অমনিতেই গলদঘর্ম। তারপর একজন মুসলিম কবি, যাঁর কবিতা তখনো আমাদের পাঠ্যবই ভারাক্রান্ত করে তোলেনি,—তাঁকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাবো তা ছিল বুদ্ধির অগোচরে। তবুও মুসলিম ছাত্র আমরা, আমাদের মনে একটা পুলক ও গর্ববোধ জেগেছিল বৈ কি!

তখন ১৯২৬ সনের দিকে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা ডেকেছে দেশে। ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দর। স্বদেশী গানের মহড়া চলছে বাড়ীতে বাড়ীতে, সভা-সমিতিতে। হিন্দু-মুসলিম জাগরণের সে এক যুগসন্ধিক্ষণ।—এক আত্মীয় বাড়ীতে গিয়েছিলাম বিয়ের দাওয়াত খেতে। সেখানে বিবাহ-মজলিসে হাতে এলো একটা বই। বইটির নাম 'অগ্নি-বীণা'। একটু লম্বা গড়নের বইটা। তার আগে ওই ধরনের বই আমি আর দেখিনি। কবিতার আর কিই বা বুঝি তখন,—তাও আবার যুগ-স্রষ্টা নজরুলের নব্যধারার কবিতা। কিন্তু বইটার গোড়ার দিকে একটা ছবি আমার মনটাকে আটকে ফেললো। ছোটকাল থেকেই আমি ছবির ভক্ত। ছবি আঁকার চেষ্টাও আমার তখন থেকেই। তাই ওই ছবিটার বৈশিষ্ট্য আমাকে

www.pathagar.com

বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ছবি থেকে চোখ যেন আর তুলতে পারিনে। ছবিটা কাজী নজরুলের একটা পূর্ণাঙ্গ ফটোগ্রাফ। কিন্তু তেমন মামুলি ধরনের ফটো ওটা নয়। এ ছবিতে রয়েছে এক মুক্ত প্রকৃতি। উন্মুক্ত আকাশ আর পৃথিবী। মাটিতে একটা বিরাট কামান। সেই কামানের উপর হেলান দিয়ে এক মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান কবি। তাঁর সুঠাম দেহভঙ্গী ও স্বল্প পোশাকের পারিপাট্য এমন মনোমুগ্ধকর তা আগে ভাবতেও পারিনি। আমি তন্ময় হয়ে রইলাম ছবিটির দিকে। কী সুন্দর চেহারা! ভাস্বর ললাট, ঘনকৃষ্ণ ঢেউ খেলানো চুল, আয়ত আঁখি, সুগঠিত চোয়াল ও চিবুক। সর্বোপরি তলোয়ারের মত ধারালো এক জোড়া গোঁফ। সব মিলে অপূর্ব সুন্দর। বিয়ের মজলিশে বইটি অন্য হাতে চলে গেল। কিন্তু ছবিটা আমার চোখেই ধরা থাকলো। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম,—'অগ্নি-বীণা'র কবি।

এর কয়েক বছর পরের কথা। তখন আমি ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। স্কুল ফাংশানে কাজী নজরুলের গানের প্রাবল্য। 'কে বিদেশী, বন-উদাসী,' 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে' ইত্যাদি গান গেয়ে ছাত্র-বন্ধুরা অজস্র হাতে তালি পায়। স্কুল ফাংশনে আমি নিজেও গান করতাম। একবার নজরুলের 'কে বিদেশী বন- উদাসী' গানটা যতটুকু জানা ছিল ঠিক ততটুকুই গেয়েছিলাম। বলতে লজ্জা হয়, সেই গানের জন্য হাততালি ও প্রাইজ দু'টোই পেয়ে গেলাম। নানা কারণেই বালিয়াকান্দি স্কুলের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন হেমচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি। বয়সেও চিন্তাধারায় তারুণ্যের ধারক ও বাহক। আর একজন ছিলেন, তারাপদ লাহিড়ী। তিনি গোঁড়া কংগ্রেসী, বাগ্মী ও দেশকর্মী। বালিয়াকান্দিতেই থাকেন। সুতরাং স্কুলের সভা-সমিতির ব্যাপারে তিনিই সর্বঘটেষু। একদিন স্কুলের ফাস্ট পিরিয়ডে তিনি ঘোষণা করলেন, টিফিন আওয়ারের পরে সভা হবে। সেই সভায় কাজী নজরুলের আবৃত্তির রেকর্ড বাজানো হবে। ছাত্রদের কী আনন্দ! কাজী নজরুলের কণ্ঠে শুনতে পাবো তাঁরই কবিতার আবৃত্তি। যথাসময়ে সভা আরম্ভ হলো। আমরা সেই সভায় গ্রামোফোন যন্ত্রে শুনতে পেলাম কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠস্বর। 'নারী' কবিতার আবৃত্তি। কবির উদাত্ত কণ্ঠ রেকর্ডের মাধ্যমে আন্দোলিত হয়ে অদ্ভুত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করলো আমাদের মনে।

ইতিমধ্যে কবি নজরুলের আরো কয়েকটি ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার অগ্রজ কাজী আবুল হোসেন ছিলেন কবির এক গোঁড়া ভক্ত। তিনি মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে কবির নব প্রকাশিত বইপত্র ডাকযোগে আনিয়ে নিতেন। সেসব বইতে কাজী নজরুল ইসলামের যে-সব ফটো মুদ্রিত থাকতো সেগুলো দেখে আমি প্রচুর আনন্দ পেতাম। যে-পল্লী পরিবেশে তখন বাস করতাম, সেখান থেকে কবিকে স্বচক্ষে দেখার কল্পনা ছিল নিতান্ত অবাস্তব। ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কবি নজরুল ছিলেন আমার ধারণার বস্তু। অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে রঙীন বুদ্বুদের মত একটা কল্পনাই শুধু দানা বেঁধে উঠেছিল আমার মনে।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে জীবিকার অন্বেষণে যখন কলকাতায় যাই তখন সৌভাগ্যক্রমে 'সওগাত' সম্পাদক জনাব নাসিরউদ্দীন সাহেবের সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ হয়। তাঁর 'সওগাত' সেকালে বিশেষ আকর্ষণীয় পত্রিকা ছিল। প্রতি মাসেই 'সওগাতের' প্রথম পৃষ্ঠায় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বা গজল একটা কিছু অবশ্যই ছাপা হতো। নাসিরউদ্দীন সাহেব ছিলেন প্রকৃতই গুণগ্রাহী সম্পাদক। আমার কাঁচা হাতের আঁকা কিছু কিছু লাইন স্কেচ তিনি সযত্নে ছেপেছিলেন সওগাতের পৃষ্ঠায়। বলা যায়, সেই আমার ছবির প্রথম রিপ্রোডাকশন। এইভাবে তাঁর কাছ থেকে আমি ছবি আঁকার ব্যাপারে একটা নতুনতর প্রেরণা লাভ করেছিলাম। 'সওগাত' অফিস ছিল ওয়েলেসলি স্ট্রীটে। বিরাট দোতলা বাড়ী। নিচের তলায় প্রেস ও উপরে অফিস ও সওগাত-সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেবের বাসভবন। সওগাতের সম্পাদকীয় বিভাগে মরহুম ওয়াজেদ আলী ও আরো দু'জন হিন্দু সাহিত্যিক কাজ করতেন। আমি তখন হ্যারিসন রোডের একটা স্টুডিওতে কাজ শিখতাম এবং সময় পেলেই সওগাত অফিসে যেতাম। হিন্দু মুসলিম অনেক সাহিত্যিক-শিল্পীরা তখন সওগাতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। সেদিন মিশরের জননেতা জগলুল পাশার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতায়। সওগাত অফিসে গিয়ে দেখতে পেলাম সেখানেও সম্পাদকীয় বিভাগে কয়েকজন সাংবাদিকের মধ্যে সেই বিষয়ে চলেছে আলোচনা। সেই আলোচনার মধ্যে হঠাৎ নাসিরউদ্দীন সাহেব এসে বললেন, কাজী এসেছে। এবং বলতে না বলতেই দুমদাম করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলেন যিনি, তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। মুহূর্তে একটা সাড়া পড়ে গেল। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে কোথায় আসন দেবেন কবিকে, কিভাবে আপ্যায়ন করবেন তাকে, তাই নিয়ে ব্যস্ত। কবি নির্বিকারভাবে একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে তার উপর ধুপ করে বসে পড়লেন। বসেই সবার দিকে একবার নজরটা বুলিয়ে নিলেন। মুখে পান ও স্মিত হাসি। কৌতুকভরা দু'টো ডাগর চোখ। মাথায় ঢেউ খেলানো বাবরি চুলের বাহার। সবাই কবিকে ঘিরে কথাবার্তায় মশগুল, আমি শুধু চুপ করে দেখছি কবিকে। আমার ছবির কবি ও জীবন্ত কবিকে মিলিয়ে নিচ্ছি মনে মনে। অফিসের একপাশে পার্টিশন ঘেরা সাজানো গোছানো একটা কামরা ছিল। সেটাই সম্পাদকের অর্থাৎ নাসিরউদ্দীন সাহেবের খাশ কামরা। নাসিরউদ্দীন সাহেব কবিকে সেই কামরায় নিয়ে বসালেন। কবির জন্য চা ও পানের ব্যবস্থা হলো। প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে কবি একটি কবিতা রচনা করে নাসিরউদ্দীন সাহেবকে পড়ে শুনালেন :

প্রাচীর দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির রাতে,
মেসেরের শের শির শমশের সব গেছে এক সাথে।

মিশর-সূর্য জগলুল পাশার তিরোধানে যে দীর্ঘ কবিতাটি রচিত হয়েছিল, তার ইতিহাস এই। কবিতা পড়া শেষ হলে কবি নজরুল যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিলেন তেমনি ছুটে বেরিয়ে পড়লেন সওগাত অফিস থেকে। তারপর সওগাতের পরবর্তী সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় সেই কবিতাটি ছাপার হরফে প্রকাশিত হলো।

www.pathagar.com

১৯৩৪ সন। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ২ নং সার্কাস রোডে কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের বাসায় তখন থাকি। কবি সাহেব তখন 'সাহারা' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ্ প্রকাশের উদ্যোগ করছেন। তাঁর ইচ্ছা, বইটি সুচিত্রিত হয়ে অভিনব সাজে আত্মপ্রকাশ করে। 'সাহারা'র চিত্রাংকনের ভার আমার উপর। সুতরাং তার প্রচ্ছদ আঁকতেই মশগুল আমি। কবি সাহেবের পারিবারিক পরিবেশে আমি ভালোভাবেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। একদিন আকস্মিকভাবেই কবি নজরুলের আবির্ভাব ঘটলো কবি গোলাম মোস্তফার বাসায়। কবি নজরুল তাঁর নিজের গাড়ীতে করেই শ্যামবাজার থেকে বেড়াতে এসেছেন পার্ক সার্কাসে আর এক কবির বাসায়। তাঁর আগমনে মোস্তফা সাহেবের বাসায় যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর স্বভাবসুলভ হৃদ্যতা দিয়ে কবি নজরুলকে খোশ আমদেদ জানালেন। পারস্পরিক কুশল বিনিময়, চা ও পান পর্ব ইত্যাদি শেষ হলো। আমি থাকতাম অন্য একটা ঘরে সেখান থেকেই সব কিছু দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কবির সামনে যেতে রীতিমত কুণ্ঠাবোধ করছি। অতবড় প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে যেতে আমার মন যেন একান্তই নারাজ। কিন্তু কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়! তাই শেষ পর্যন্ত রেহাই পাওয়া গেল না। গোলাম মোস্তফা সাহেব আমাকে একপ্রকার জোর করেই ধরে নিয়ে হাজির করলেন কাজী নজরুল ইসলামের সামনে। আমার আঁকা 'সাহারা'র ছবি দেখালেন তাঁকে। ছবিগুলো দেখা শেষ হলে কবি প্রশংসা-ভরা ডাগর চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বা'!' কবির মুখের এই ছোট্ট শব্দটুকুর ওজন যে আমার কাছে কতখানি মনে হয়েছিল তা সত্যিই বলা শক্ত। ভিতরে ভিতরে খুব খুশী কিন্তু লজ্জাও কিছু কম নয়। কবি জানতে চাইলেন, আমি কোথায় কার কাছে থেকে আঁকা শিখেছি। যখন শুনলেন যে আমি নিজের চেষ্টাতেই এঁকে থাকি তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, "আরে, আল্লাহ্ যাকে দ্যান, তাকে ছপ্পর ফুঁড়েই দিয়ে থাকেন।' কবির কথায় সত্যিই আমি কুণ্ঠিত ও বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। তখন আমার বয়স আঠারো থেকে বিশ বছরের মধ্যে। সেই তুলনায় কি-ই বা এমন আঁকতে শিখেছি আমি। যা কিছু আঁকতে চাই তা যেন ঠিক মনের মত হয়ে ওঠে না। তাছাড়া জীবিকার জন্যই যাকে ছবি আঁকতে হয়, আল্লাহ্ ছপ্পর ফুঁড়ে আর কতখানিই বা জোগাবেন তাকে। যাহোক, কবি নজরুলকে সওগাত অফিসের পর সেই আবার দ্বিতীয় বার আমি দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে প্রচুর উৎসাহ ও শুভকামনা জানিয়ে কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

যতদিন তাঁকে চাক্ষুস দেখিনি, ততদিন আমি কল্পনাই করতে পারিনি কাজী নজরুল একটা সুন্দর ছবিই শুধু নয় বরং একটা প্রখর ব্যক্তিত্ব। তাঁর সান্নিধ্যের আলোকে এসেই সেটা ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়।

সে সময় কবি নজরুলের গজল গানে বাংলার আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেছে। কলকাতায় মেসে বা বাসা-বাড়ীতে নজরুলের গান একটা নতুন ধারার সূচনা করেছে। হবু কবি সাহিত্যিকদের মাথায় নজরুলের মত বাবরী গজিয়ে উঠছে। পোশাক-পরিচ্ছদ বা হাবভাবে

www.pathagar.com

একটা 'নজরুলিয়ানা' ঢং-এর প্রবর্তনা শুরু হয়েছে। এমন-কি কোনো কোনো সাহিত্যিক নজরুলের হস্তাক্ষর মকশো করতেও বদ্ধপরিকর। সেকালে কলকাতার সাংস্কৃতিক আসরগুলো জমতো ভালো কলেজ স্ট্রীটের আলবার্ট হলে। কয়েকবার গেলাম আলবার্ট হলের গানের জলসায় কবির গান শুনতে। একবার খুব জাঁকজমক করে কবির সংবর্ধনা সভা হলো আলবার্ট হলে। অনেক নামকরা লোক এলেন সেই সভায়। সভাপতি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মনে পড়ে, সেদিন বিরাট আলবার্ট হলে লোকের ভিড়ে যেন তিল ধারনের স্থান ছিল না। কবি যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হলো। চতুর্দিকে করতালির ধুম পড়ে গেল। কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে অনেক দিকপাল সাহিত্যিক ও বক্তাগণ অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা করলেন। তারপর কবিকে মানপত্রের সহিত সোনার দোয়াত-কলম উপহার দেয়া হলো। কবি উঠে দাঁড়িয়ে উদাত্তকণ্ঠে তাঁর সংবর্ধনার জবাব পাঠ করলেন। হল ভর্তি লোক রুদ্ধশ্বাস নীরবতায় কবির কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শুনলো। এই সংবর্ধনা সভাতেও কবি নিজেই গান গেয়ে শুনালেন সবাইকে :

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।

এই প্রসংগে আলবার্ট হলের আর একটি সংগীত অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে। অনেক গুণী শিল্পীর সমাগম হয়েছিল সেই সভায়। বিস্তৃত মঞ্চের তিনপাশ ঘিরে দর্শক ও শ্রোতাদের আসন। মধ্যস্থলে ফরাস বিছানো ডায়াসের উপর কবি নজরুলকে মধ্যমণি করে শোভা পাচ্ছে শিল্পীদের একটা দল। তখনকার দিনের রেকর্ড গাইয়েরা প্রায় সবাই এসেছেন কবির সঙ্গে। এসেছেন বিখ্যাত সংগীত শিল্পী দিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমার রবীন্দ্র-পূর্ব কবি পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। সংগীতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ প্রতিভাবান শিল্পী। চারুদর্শন ছিমছাম চেহারা। কবি নজরুল সমাগত দর্শকদের সামনে দিলীপ বাবুর পরিচয় দিয়ে বললেন : এবার ইনি গান গাইবেন। কলগুঞ্জরিত সভাস্থল মুহূর্তে নিস্তব্ধভাব ধারণ করলো। দিলীপ বাবু যে গানখানি পরিবেশন করলেন তা হচ্ছে সেই প্রিয় গানখানি—

কে বিদেশী বন-উদাসী
বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে ॥

তখনকার দিনে মাইকের প্রচলন ছিল না। গায়ক রীতিমত রাসভকণ্ঠের অধিকারী না হলে দূরের শ্রোতাদের ভাগ্যে গায়কের মুখব্যাদন ছাড়া আর কিছুই জুটতো না। আমরা বসেছি ডায়াসের সামনের দিকটায়। দিলীপ বাবুর কণ্ঠ-সৌকর্য পুরোপুরি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু

www.pathagar.com

পিছনের শ্রোতারা ক্রমেই আসনের দিকে ভিড় করে এগিয়ে আসছে। দিলীপ রায়ের কণ্ঠে কাজী নজরুলের গজল শোনার আগ্রহে যেন অধীর হয়ে উঠেছে সবাই। তিনি নজরুল ইসলামের খান তিনেক গান অতি চমৎকারভাবে পরিবেশন করলেন। তারপর শুরু হল অন্যান্য শিল্পীদের গান। বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন সুরের গানে সভাস্থল যেন সুরময় হয়ে উঠলো। প্রায় সব শিল্পীর কণ্ঠেই নজরুল-গীতি শুনে সঙ্গীতরসিক শ্রোতারা মুগ্ধ ও চমৎকৃত হলেন। সব শেষে শ্রোতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কবি নিজেই হারমোনিয়াম হাতে নিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি নতুন গান তিনি গেয়ে শুনালেন। তাদের মধ্যে দু'টো গান আজও আমার মনে আছে। একটি গান —

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে আজি সমাধিতে মোর ?

আর একটি গান :

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধূলায়
জাগিও না উহারে ঘুমাইতে দাও—

দুঃখ ও বিষাদের সুর অনুরণিত হয়ে উঠলো এই গান দু'টির প্রতি ছত্রে। কবি পূর্বেই এই গানের ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন, প্রিয় পুত্র বুলবুলের অকাল মৃত্যুতে তিনি এই শোক গাথা রচনা করেছেন। সত্যিই সেদিন কবির চেহারায় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর সমুন্নত চেহারা যেন অনেকখানি পোড় খেয়ে গেছে, আগের মত সেই দীপ্তি আর যেন নেই। বিদ্রোহী কবিরূপে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ও পরে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে তাঁর পরিবর্তনের নেপথ্য পটে হয়ত এমন কিছু ছিল, যা আমাদের নজরে কখনো ধরা পড়েনি। 'শাত-ইল-আরব' ও 'কোরবানীর'র মত কাব্য যাঁর রচনা, যিনি লিখলেন, 'মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লেআলা' বা 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে'র মত অসংখ্য ইসলামী গান তিনি মুসলিম সমাজের গণ্ডী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে হিন্দু-পল্লীর অন্তরালে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। মুক্ত, উচ্ছল জীবনের দুর্বার গতিধারাকে সংকুচিত করে বেঁধে ফেললেন হিজ মাস্টার ভয়েসের রেকর্ডিং স্টুডিওর গণ্ডীর মধ্যে। এমন দিন ছিল যখন নানা সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে কবি আনন্দের সাথেই যোগ দিতেন। কিন্তু আবার এমন দিনও দেখা গেল, যখন কোনো সভা সমিতির জন্যে কবিকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। এমনি কোন এক দিনে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের কোনো একটা রাজসিক ব্যাপারে কবির উপস্থিতিকে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় তাঁর খোঁজ পড়েছিল। জনৈক কবি-বন্ধু আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কবির বাসায়। কিন্তু কবির বাসায় গিয়ে তাঁকে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর কবিকে পাওয়া গেল বিডন স্ট্রীটের কোনো এক থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। দিন-দুপুরে একটা থিয়েটারের ফাঁকা গ্যালারি ডিঙিয়ে আবছা অন্ধকারে মঞ্চের উপর হাজির হলাম আমরা সেখানে। সতরঞ্চি বিছিয়ে হারমোনিয়াম সহযোগে

www.pathagar.com

কয়েকজন অভিনেত্রীকে গান শেখাচ্ছিলেন তিনি। কবি আমাদের দেখতে পেয়ে হারমোনিয়াম বন্ধ করলেন এবং আমরা যে তাঁকে এক সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি সেই কথা শুনে হো- হো করে হেসে উঠলেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন তাঁর সময়ের স্বল্পতার জন্য কোনো অনুষ্ঠান বা সভাসমিতিতে যোগদান করা একেবারেই অসম্ভব। যাহোক আমাদেরকে তিনি চা পানে আপ্যায়িত করে বিদায় দিলেন। অগত্যা কবির কাছ থেকে ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে আসতে হলো আমাদের।

প্রায় সমসাময়িককালে নিউ থিয়েটার্স-এর সবাক চিত্রের প্রথম মহড়ায় কবিকে আমরা দেখতে গেলাম রূপালি পর্দার উপর। একটা গান ও আবৃত্তি তাঁর মুখে শুনতে পেয়ে দর্শকরা যেন উল্লাসে ফেটে পড়ছিল সেদিন। রূপালি পর্দায় এর আগে ছবিতে বাংলা কথা বলতে কেউ শুনিনি আমরা। আরো কিছু কিছু শিল্পী ও অভিনেতার কলানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছিল সিনেমার পর্দায়। মূলত ব্যাপারটা ছিল সিনেমা কোম্পানীর একটা পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী। তবুও সেই প্রদর্শনীতে কবি নজরুল বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন, এটা অবশ্যই গৌরবের বিষয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কবি নজরুলের গানের ভক্ত চিরদিনই ছিলাম। এমনকি বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা রেকর্ডকৃত নজরুল-গীতি আমি যথাসাধ্য কপি করার চেষ্টা করতাম। গীতিকার হিসেবে কবি নজরুলের দান যে অপরিমেয় সে কথা সুধীমাত্রেই স্বীকার করবেন। এই গীতিকার জীবনের পশ্চাদভূমিতে তাঁর জীবনে ছিল এক দুর্বার সাধনা। তিনি ঠুংরী সম্রাট ওস্তাদ জমীর খাঁ সাহেবের নিকট সুর সাধনা করেছেন। উচ্চাংগ রাগ সংগীতে বুৎপত্তি লাভ করেছেন। তদুপরি বহু রাগ রাগিনী তাঁর গানে সার্থকভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। কখনও বা বিভিন্ন রাগ রাগিনীর সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে গান রচনা করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, শোনা যায় বিদেশী গানের রেকর্ড বাজিয়ে তার থেকেও সুর আহরণ করে তাঁর গানে সুন্দরভাবে আরোপ করেছেন তিনি। তাই আমার মনে হয়, নজরুলের গান পরিবেশন করা বেশ শক্ত কাজ। তাঁর অধিকাংশ গানেই রয়েছে ঠুংরীর সুক্ষ্ম কারুকাজ। সেইসব কারুকার্য ফুটিয়ে তোলায় যারা রীতিমত ক্লাসিক্যাল গানের চর্চা করেননি সেসব শিল্পীর পক্ষে নজরুল-গীতি গাওয়া দুরূহতম ব্যাপার।

যাহোক দেশের আযাদী লাভের বছর ছয়েক আগে যখন আবার কবিকে দেখার ভাগ্য হলো তখন তাঁকে আর এক নতুন চেহারায় দেখতে পেলাম। তিনি বরাবর খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী ও চাদর পরতেন। সেটা অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু মাথায় উঠেছে খদ্দরের একটা সাদা টুপী আর চোখে একজোড়া চশমা। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কোনো এক রাজনৈতিক সভায় তাঁকে সেই বেশে প্রথম দেখতে পেলাম। তারপর শ্যামা-হক মন্ত্রিত্বের আমলে ফজলুল হক সাহেবের নবযুগ পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে আবার তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেলাম। সে সময় এই পত্রিকায় ছোটদের আসরের 'ফুল্‌কি'র জন্য ছবি আঁকার ভার পড়েছিল আমার উপর। যাহোক কতকাল পরে কবিকে আবার চাক্ষুস দেখতে পেয়ে

www.pathagar.com

খুব খুশী হয়ে উঠলাম। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? কবির চেহারায় এসেছে দারুণ পরিবর্তন। টুপী চাপা থাকলেও বুঝতে কষ্ট হলোনা, তাঁর মাথায় সেই সুন্দর চুলের শোভা আর নেই। বরং সেখানে টাক বিরাজ করছে। চোখ-মুখের দীপ্তি হয়েছে নিষ্প্রভ এবং সর্বাঙ্গে নেমেছে একটা ক্লান্তির ছায়া। কারো সাথে আগের মত তেমন প্রাণ খুলে কথা বলেন না। শুধু হুঁ-হাঁ করেই কাটিয়ে দেন। এ-নজরুল যেন অন্য কেউ। লোকপরম্পরায় শুনতে পেলাম তাঁর স্বাস্থ্য নাকি ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

সে-সময় কবি মাঝে মাঝে জুলফিকার হায়দর সাহেবের বাসায় বেড়াতে যেতেন। পার্ক সার্কাস ঝাউতলা রোডে হায়দর সাহেবের বাসায় আমিও যেতাম। হায়দর সাহেব ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই কাব্য ও শিল্পকলার বিশেষ অনুরাগী; এমন একদিনে আমি হায়দর সাহেবের বাসায় উপস্থিত হয়ে ড্রইংরুমে কবিকে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। তাঁকে সেদিন খুবই বিমর্ষ মনে হলো। কিন্তু কবিকে এই নিরিবিলি পরিবেশে পেয়ে তাঁর একটা স্কেচ্ আঁকার জন্য ভারী লোভ হলো আমার। হায়দর সাহেবকে বলতে তিনি আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন এবং কবিও যখন শুনলেন যে আমি তাঁর ছবি আঁকতে চাই তখন মনে হলো তিনি কিছুটা খুশী হয়েছেন। এমন চুপ চাপ হয়ে বসলেন যাতে আমি নির্বিঘ্নে তাঁর ছবিটা আঁকতে পারি। আমার স্কেচ-বুক-এর উপর ক্রেয়ন পেনসিল দিয়ে শংকা দুরু দুরু চিত্তে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাঁর একটা আবক্ষ ছবি রেখা-চিত্রের আকারে দাঁড় করালাম। হায়দর সাহেব তাঁর সহধর্মিণী ও আর এক ভদ্রমহিলা ছবিটি দেখে কবির হাতে দিলেন। কবি আমার আঁকা স্কেচখানি হাতে নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর ছবিটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ 'জানো, তোমার স্থান কোথায়?' কবির এই প্রশ্ন শুনে আমি তো অবাক! কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন ঃ 'হাবিয়ায়-হাবিয়ায়!'—বলতে বলতে তাঁর চোখ দু'টো যেন বিস্ফোরিত হয়ে উঠলো।

তিনি বলেই চলেছেন ঃ 'এই যে তুমি ছবি আঁকো আর আমি গাই গান, আমাদের জায়গা সেই হাবিয়ায়। সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন আর আগুন! কিন্তু আমরা কি হাবিয়ায় গিয়ে শুধু পুড়েই মরবো? না কক্ষনো না। হাবিয়ার আগুনে এমনি করে মারবো লাথি'—বলেই মেঝের উপর দুম্ করে পা ঠুকলেন তিনি। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলে উঠলেন, 'আর আগুনের ফুল্কি ছড়িয়ে পড়বে ফুল হয়ে, ফুল হয়ে।'

কবির সাথে সেই আমার শেষ দেখা।

www.pathagar.com

ভুলি কেমনে...

মোহাম্মদ মোদাব্বের

"অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল" : তাঁর কবিতার দুটি শব্দ মাত্র নয়, এটাই ছিল নজরুলের বৈশিষ্ট্য। তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা আর অনিয়মানুবর্তিতা তাঁর ভক্ত ও বন্ধুদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক সময়, কিন্তু তাতে বন্ধুরা বিক্ষুব্ধ হলেও বিতৃষ্ণ হয়নি কোনোদিন। এ যেন রবির প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত হলেও তার আলোকের পিয়াসী না হয়ে মানুষ পারে না, এমনি বিপজ্জনক মধুর স্বভাব ছিল কবি নজরুলের।

একদিনের ঘটনা বলছি, যা এখনো মনে হলে হৃদকম্প শুরু হয়। সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। ১৯৩০-৩১ সালের কথা। বহরমপুরে কবি বিজয়লাল চ্যাটার্জি এক যুব-সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। কবি নজরুল সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন ঠিক হয়েছে। সকাল সাতটায় আমি ও বিজয়লাল কবির মধুরায় লেনের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে রওয়ানা হব। আগে থেকেই এই বন্দোবস্ত করা ছিল। কবি আমাদের হাঁকডাকে বিছানা ছেড়ে উঠলেন, তৈরীও হতে লাগলেন। আমরাও তাড়া দিতে লাগলাম যাতে তাড়াতাড়ি রওয়ানা হতে পারি। কারণ তাঁকে বের না করা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। যদি অন্য কেউ এসে পড়ে আর কবি তার সঙ্গে জমে যান, তা হলে আমাদের সব অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যাবে।

কবি দোতলা থেকে চীৎকার করতে করতে নেমে এলেন, 'চল চল্ বড্ড দেরী হয়ে গ্যাছে, ট্রেন পাবো তো,-যেন কত দায়িত্বশীল ব্যক্তি! বিজয় তার পোঁটলাপুঁটলি ট্যাক্সিতে চাপাচ্ছে, এমন সময় পাতলা দোহারা এক ভদ্রলোক বগলদাবায় একটা ছোট পুঁটলি নিয়ে হাজির হলেন।

কাজীদা হাঁই পাঁই করে চীৎকার করে তাকে জড়িয়ে ধরে পরম অন্তরঙ্গতায় তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বিজয় এবার যেনো বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলো। আমার কানে কানে বললো, বিপদের কালো মেঘ উঠেছে রে, আর রক্ষে নেই।

www.pathagar.com

আমি তখন লোকটাকে চিনতাম না। বিজয় বললো, উনি ঢাকার একজন অধ্যাপক নামকরা দাবাড়ে। দেখছিস না, ওর বগলদাবায় দাবার যন্ত্রপাতি!

কবি ঢাকাই অধ্যাপককে বাড়ীতে থাকতে বলে আমাদের সঙ্গে রওয়ানা হতে যাচ্ছেন, কিন্তু অতিথি ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কাজীদার একখানি হাত ধরে অনুনয় করলেন, তিনি মাত্র একদান খেলতে চান।

কবি অগত্যা বসে গেলেন। আমরা প্রমাদ গণলাম। কবি আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, তোমরা এই ট্রেনে চলে যাও, আমি ১১ টার ট্রেনে রওনা হয়ে ঠিক সময়েই সভায় পৌঁছে যাবো। এমনভাবে তিনি কথাগুলো বললেন যে, আমরা বিশ্বাস না করে পারলাম না।

বিজয়লালের কিন্তু মুখ কালো হয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমাকে নিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশনে উপস্থিত হল। কাজীদার ট্রেনের টিকিটটা সে কাজীদার হাতেই দিয়ে দিল।

বহরমপুর ষ্টেশনে নেমে দেখি সে এক এলাহী কাণ্ডকারখানা। কবি নজরুল আসবেন বলে যেন সারা মুল্লুকের লোক ভেঙে পড়েছে বহরমপুর শহরে। কত নেতা ও উপনেতারা কবিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ষ্টেশনে হাজির। কিন্তু কবি কোথায়!

বিজয়লাল ট্রেন থেকে নেমে জানিয়ে দিল যে কবি পরের ট্রেনে আসছেন। কথাটা শুনে জনতা বিরক্ত হলেও আশাহত হয়নি। সভাস্থলে জনসমুদ্র দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। পরের ট্রেনে আসার সময় হল। বহুলোকের সঙ্গে বিজয় ও আমিও ষ্টেশনে গেলাম। ট্রেন এল, কিন্তু কবি কোথায়! ট্রেনের সকল কামরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কবির পাত্তা পাওয়া গেল না। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, বিজয়লাল প্লাটফরমের মেঝেতে ধপ করে বসে পড়লো। নৈরাশ্যের ধাক্কা একটু সামলিয়ে নিয়ে সে স্থানীয় নেতা ও কর্মীদের নিকট সব অবস্থা বর্ণনা করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতাগামী একখানি ট্রেনে উঠে পড়লো।

গাড়ী চলতে শুরু করলে পর বিজয়ের মুখ দিয়ে কথা ফুটলো : "ইস, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারছি এই ঢের। সভাস্থলে থাকলে আমার মাথাটা আর কাঁধের উপর থাকতো না। একটু দম নিয়ে সে বললো, "যাই কলকাতায় আগে, তারপর দেখাব, কাজীর একদিন না আমার একদিন।"

রাত প্রায় সাড়ে এগারটায় আমাদের ট্যাক্সি কবির দরজায় থামলো। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই কানে এল বাজখাই আওয়াজ : "এবার তোমার রাজা সামলাও বন্ধু! এই-এ"

আমাদের দেখে হঠাৎ কবির চীৎকার ও উল্লাস থেমে গেল। বিজয়লালের চোখের পানে তাকিয়ে কবি যেন সন্ত্রস্ত হলেন। তারপর ছাদ ফাটানো হাসিতে ফেটে পড়ে বিজয়কে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কিছু মনে করিসনে, ভাই, বড্ড বিপদে পড়েছিলাম, ও তিন তিন বার আমার কিস্তি মাৎ করে দিয়েছে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছিলাম আজ।

www.pathagar.com

এমন সময় ভাবী অর্থাৎ প্রমীলা নজরুল ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন, "আজ ওরা খেতে ওঠেনি পর্যন্ত। তারপর তোমাদের ভাগ্যে কিছু জুটেছে নাকি?

"কি জুটবে? আমরা জিজ্ঞাসা করি।

" কেন, জনতার প্রহার।

"না, সে সুযোগ দেইনি, পালিয়ে বেঁচেছি।

বিজয়লাল কিন্তু এরপর অনেককাল আর বহরমপুর-মুখো হয়নি।

এই ঘটনার পরও কি কবিকে আমরা ত্যাগ করতে পেরেছি। না, বরং আরো বেশী করে ভালোবেসেছি।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

এমনি হার
পরতে গেলে লাগে
ছাড়তে গেলে বাজে —

নজরুলের বেলায় কথাটা বেশ খাটতো। তাঁকে পাওয়া যেমন দু:সাধ্য, পেলেও তেমনি অনেক সময় বিপদের মুখোমুখী হতে হত। এমনি এক মজার ঘটনা বলছি।

কলকাতার তালতলা অঞ্চলে আমরা কয়েকজন মিলে গরীব কলেজ ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস খুলেছিলাম। সেখানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন দরিদ্র ছাত্রের বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ছাত্ররা একদিন আবদার ধরলো যে ওদের ছাত্রাবাসে কবিকে একদিন আনতে হবে। কবিকে আনার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপানো হল। আমি কবির নিকট সর্বহারা মানুষের দোহাই দিয়ে তাঁর করুণা প্রার্থনা করলাম। কবি বিনা দ্বিধায় রাজী হলেন। এক রবিবারের দুপুরে আমি কবিকে নিয়ে ছাত্রাবাসে হাজির হলাম। ছাত্রদের পেয়ে কবি যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। ছাত্ররা তাঁর কাছে পল্টন জীবনের গল্প শুনলো, জেল-জীবনের গল্প শুনলো, তারপর শুরু হল আবৃত্তি ও গান। মনে হল, আজকের এই মজলিসের বুঝি শেষ নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, ছাত্রাবাসের চারিদিক ঘিরে হাজার মানুষের ভীড়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গিয়ে সন্ধ্যে, তারপর রাত ঘনিয়ে এল।

এমন সময় হৈ চৈ করতে করতে পাঁচ ছয় জন যুবক ঘরে ঢুকে মজলিসের রসভঙ্গ করে দিল। তারা রক্তচক্ষু, উগ্রমূর্তি। আমাদের উপর তর্জন-গর্জন শুরু হল : কি রকম ভদ্রলোক আপনারা! কবির সম্বর্ধনা সভা হচ্ছে রামমোহন লাইব্রেরীতে, সময় ছিল সন্ধ্যা সাতটায় অথচ কবিকে আপনারা এখানে আটকে রেখেছেন! মারমুখো যুবকদের অতিকষ্টে বুঝালাম যে এসব খবর ত আমরা জানিনে, জানলে নিশ্চয়ই যথাসময়ে তাঁকে পৌছিয়ে দিতাম।

কবি কিন্তু নির্বিকারভাবে হাসতে হাসতে বললেন, তাই তো, বড্ড ভুল হয়ে গ্যাছে। যাক্ চল্, তোরাও চল্ সভায়। এই কথা বলে তিনি আমাদের অনেককে সঙ্গে নিয়ে রামমোহন লাইব্রেরীর দিকে ট্যাক্সিতে রওয়ানা হলেন।

www.pathagar.com

কবি নজরুলের জীবনের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, কাউকে তিনি পর মনে করতেন না। সবাইকে আপন মনে করে নেওয়ার যাদুমন্ত্র তিনি জানতেন হয়ত।

১৯৩৪ সালের ঘটনা। একদিন সকালে কবি এসেছেন ক্রিমাটোরিয়ার স্ট্রীটে বাহার সাহেবের বাসায়। সেখানে তিনি বাহার সাহেবের কাছে শুনেছেন যে আমি কাছেই বেনেপাড়া লেনে সস্ত্রীক বাস করি। আমার স্ত্রী তখন সবেমাত্র কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আমিও তার কয়েকদিন আগে দিল্লী জেল থেকে মুক্তিলাভ করে কলকাতায় ফিরেছি। উনি আমাদের খবর পেয়ে বাহার সাহেবের বাড়ী থেকে ছুটতে ছুটতে আমার বাসায় এলেন।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক-ডাক শুরু করলেন। আমি বাইরে গিয়ে দেখলাম, দেখে অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ছোট একখানি কামরায় কোনমতে মাথা গুঁজে থাকি, কবিকে বসাবো কোথায়? কিন্তু আমার ভাববার অবসর না দিয়ে কবি সোজাসুজি আমার কামরায় ঢুকে হাঁকাহাঁকি শুরু করলেন, 'কইরে, আমার বেটি কোথায়? আমার স্ত্রী তখন রান্নাঘরে হাতা-বেড়ী নিয়ে রান্না করছিলেন। কবি একেবারে রান্নাঘরে ছুটলেন। গৃহিনী তখন বেড়ী ফেলে কবিকে কদমবুছী করলেন। কবি সস্নেহ তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, 'বেটি আমার পায়ের বেড়ী ছিঁড়েছে কিন্তু হাতের বেড়ী ছাড়েনি।'

তারপর কবির কথার গল্পের প্রস্রবণ চলতে থাকলো। আমার স্ত্রী জেলখানায় বসে যেসব লিখেছেন, তা আদ্যোপান্ত পড়তে শুরু করলেন। এরমধ্যে কবি হঠাৎ আমাদের বিস্মিত করে দিয়ে জানালেন যে তিনি হোসনে আরার হাতের রান্না খেয়ে তবে যাবেন।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। সদ্য জেল ফেরত আমরা, দারুণ কষ্টে দিন চলছে, কবিকে খাওয়াবো কি! গিন্নী ইশারা ইঙ্গিতে আমায় বাজারে কিছু ভাল খাবার আনবার জন্য পাঠাতে চাচ্ছেন, কবি তা বুঝতে পেরে বললেন, 'না না, ওসব ষড়যন্ত্র চলবে না। যা রান্না হয়েছে তাই আমরা তিনজন ভাগ করে খাবো।' শেষ পর্যন্ত খেলামও তাই। কবি দুঃখীর ঘরের অন্ন ভাগ করে খেয়ে যে এত পরিতৃপ্ত হতে পারেন, তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবেন না।

আমার স্ত্রীকে কবি বেটি বলতেন, কারণ ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কবির প্রথম কবি-জীবনের বন্ধু ও ভাই। কাজেই ডক্টর সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী বলে গ্রহণ করে ছিলেন। খাওয়ার টেবিলে বসে কবি গল্প শুরু করলেন : "বুঝলি বেটি, মীর্জাপুর রোডে তোর চাচার সঙ্গে আমি, মুজাফফর আহমদ আফজালুল হক প্রমুখ থাকতাম। একদিন ঠিক করলাম, সিঁদুরিয়াপট্টির কাবাব পরোটা খেতে হবে। কিন্তু তখন পয়সার খুব ঘাটতি। কিন্তু শহীদুল্লাহর কাছে কিছু পয়সা আছে জানতে পেরেছি। কাজেই আফজালকে লাগিয়ে দিলাম পয়সা আদায় করবার ফিকিরে। আফজালটা ছিল একটা বাস্তুঘুঘু। সে শহীদুল্লাহর কাছে গিয়ে বললো ঃ আজ সন্ধ্যায় যদি তুমি আমাদের কাবার পরোটা না খাওয়াও তাহলে কাজী-রাত্রে তুমি যখন ঘুমাবে তখন-তোমার দাড়ি কেটে দেবে বলেছে। তার এই ধাপ্পায়

www.pathagar.com

কাজ হল। বেচারা মোল্লা মানুষ, দাড়ীর বিরহের আশঙ্কায় নগদ পঞ্চমুদ্রা কোরবানী দিল।

গল্পটা বলা শেষ করেই কবি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়ে সেদিন কবিকে পেলাম অতি আপনজন হিসাবে। এই দিনটির কথা যখন মনে হয় তখন যেমন আনন্দে মন ভরে ওঠে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অজানতে বুকের মধ্যে এক আকুল আর্তনাদ ধ্বনিত হয়। কেবলই মনে হয়, সে আছে কিন্তু সে নেই, সে মন, সে আত্মা নেই। এটাই আমাদের পরম বেদনার কারণ হয়ে থাকলো।

আকাশের উদারতার কথা বলা হয় মহত্তম ঔদার্যের তুলনা দিতে গিয়ে; কিন্তু আকাশ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মানুষের উদারতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কবি নজরুলের মহত্ত্ব ও ঔদার্য হয়ত আকাশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর মহত্ত্বের একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

কবি তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য হরদম গান লিখে চলেছেন, সব রকম গান। কাব্য-গীতি, গজল, হামদ ও নাত, শ্যামা-সঙ্গীত পর্যন্ত। খাতার পর খাতা পূর্ণ হচ্ছে গানে। এই সময় তাঁর দু'খানা গানের খাতা চুরি যায়। কবি প্রথম প্রথম বেশ উতলা হলেন। তারপর চুপচাপ। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে এক বিখ্যাত কবি ও গীতিকারের বাড়ীতে সেই দুখানা খাতা দেখতে পাই। কবিকে খবরটা দিতে একটুও বিলম্ব করিনি। কিন্তু কবি নির্বিকারভাবে বললেন, "চেপে যা, যেন আর কাউকে বলিসনে।

"কি বলছেন আপনি! এতগুলো গান চুরি করলো, আর আপনি কিছু বলবেন না?" বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললাম আমি!

কবি হাসতে হাসতে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন "সাগর থেকে দুকলস জল নিলে সাগরের জল কি আর কমে যায় রে পাগল!

আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না।

www.pathagar.com

কুড়িগ্রামে কবি নজরুল

মাহফুজুর রহমান খান

আমি তখন কুড়িগ্রাম হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। ইংরেজী ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ের কথা। তখন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন বাবু ইন্দুভূষণ রায়। তাঁহার বাড়ী ছিল বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত ভেড়ামারা রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী ভজনঘাট গ্রামে।

তিনি শুধু আমাদের শিক্ষাগুরুই ছিলেন না। ছাত্র জীবনে তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি অফুরন্ত পিতৃ-স্নেহ এবং বন্ধু-সুলভ প্রীতি ও ভালবাসা। ছাত্রদের শিক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত। তাঁহার সময়ে স্কুল ছিল আদর্শ স্থানীয়।

প্রতি বৎসর হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হইত স্কুল প্রাঙ্গণে আর মুসলমান ছাত্রদের বাৎসরিক মিলাদ অনুষ্ঠান হইত বোর্ডিং-এর নিকটবর্তী কাচারী সংলগ্ন জুমা মসজিদে। এ পূজার সময় হেড মাষ্টার মহাশয় নিমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে স্কুলের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিতেন। মিলাদ মহফিলে মুসলমান ছাত্রদের তরফ হইতে পৃথক বাৎসরিক বিবরণী পাঠ হইত। তাহাতে থাকিত তাহাদের ভাল-মন্দ ও অভাব-অভিযোগের খতিয়ান। মাষ্টার মহাশয়ই এই প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁহার আরও নির্দেশ ছিল যে স্কুলের সরস্বতী পূজার পরের রবিবার দিন মুসলমান ছাত্রদের মিলাদ করিতে হইবে, যাহাতে এই দুইটি পর্ব উপলক্ষ করিয়া ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত না ঘটে। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই এই দুই পর্বের উদ্যোগ আয়োজন চলিত।

তিনি স্কুলে আরও নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে প্রতি বৎসর ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতিনিধি ও একজন শিক্ষক লইয়া মোট নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি পূজা-কমিটি ও একটি মিলাদ-কমিটি গঠন করিতে হইবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র উক্ত কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে না। কারণ পরবর্তী ইংরেজী বৎসরের প্রথম দিকেই তাহাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা।

www.pathagar.com

তখন প্রথা ছিল, মিলাদের দাওয়াত-পত্রে ছাত্রদের কবিতা লিখিতে হইবে। আমাদের পূর্ববর্তী ছাত্রগণ কখন হইতে কি কারণে কবিতায় দাওয়াত-পত্র লিখিবার পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই। তবে আমার ধারণা, খুব সম্ভব ছেলেদের মধ্যে কবিতা লেখার স্পৃহা জাগাইয়া তোলাই ছিল ইহার অন্যতম কারণ।

প্রতিবৎসর দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অথবা ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন আলেমকে মিলাদ সভায় প্রধান অতিথি রূপে ভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করা হইত।। ইহাই ছিল তৎকালীন সময়ে স্কুলের মিলাদ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ!

১৯২৪ সালের পূর্বের বৎসর-সমূহে যথাক্রমে ঢাকার মরহুম ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, যশোহর গারোডোবের মরহুম পাদ্রী জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, কৃষ্ণনগরের মরহুম স্যার আজিজুল হক, পাবনা সিরাজগঞ্জের মরহুম ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবান ছাত্রদের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া কুড়িগ্রাম হাইস্কুলের মিলাদ মহ্ফিলে যোগদান পূর্বক মহফিলের গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়াছিলেন।

আমার ছাত্র জীবনে দেখিয়াছি, ছাত্রদের প্রায় সব হট্টগোলেই কেমন করিয়া যেন জড়াইয়া যাইতাম নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অবশ্য তৎকালীন যুগের ছাত্রদল আর বর্তমান যুগের ছাত্রদলের প্রভেদ অনেকখানি।

স্কুল জীবনের প্রথম হইতেই আমি 'অনুশীলন'* সমিতির সভ্য ছিলাম । উক্ত সমিতির কর্তাস্থানীয়দের নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহামনীষী ও বীর পুরুষদের জীবনসম্বলিত নানাপ্রকার উন্নত ধরনের পুস্তক এবং বিশেষ ধরনের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা পাঠ করিতে হইত। তন্মধ্যে তৎকালীন আন্দামান ফেরত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিজলী' অন্যতম। এই 'বিজলী'*

---

* বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক দিয়া, 'অনুশীলন সমিতি' নামে যে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী দল গঠিত হয়, ভারত-বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা পুলিনবিহারী দাস ও তাঁহার সহকর্মী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) ছিলেন এই দলের প্রধান সংগঠক। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোন প্রকারে হউক ব্রিটিশের কবল হইতে ভারতকে মুক্ত করা। কর্মপদ্ধতি ছিল খুব জটিল ও ভয়াবহ। সমিতির সদস্যদের প্রধান কর্তব্য ছিল জীবন বিপন্ন করিয়াও সমিতির কর্তৃপক্ষের হুকুম বিনা শর্তে তামিল করা। বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষভাবে সমিতির সভ্যভুক্ত করা হইত।

* কলিকাতার বিখ্যাত বোমা-মামলার আসামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আন্দামান-বন্দীশালা হইতে দীর্ঘ কাল কারা ভোগের পর বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া 'বিজলী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই 'বিজলী' কাগজে বিপ্লব যুগের বহু অকথিত ইতিহাস ও বিপ্লবীদের জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত। প্রথমে এই পত্রিকা সিঙ্গল ডিমাই বার্লি কাগজে আট পৃষ্ঠা করিয়া ছাপা হইত। অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ উভয়ে ছিলেন 'যুগান্তর' দলের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক। পরে অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীতে অধ্যাত্মবাদ ও যৌগিক সাধনা আরম্ভ করেন। 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' উভয় প্রতিষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য ছিল: ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। কর্মপদ্ধতিতে কেবল সামান্য পার্থক্য ছিল। নজরুল ইসলাম এই 'যুগান্তর' দলের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। তৎকালীন যুগের দ্বি মাসিক 'প্রবর্তক' ছিল যুগান্তর দলের মুখপত্র। চন্দননগর হইতে 'প্রবর্তক' প্রকাশিত হইত।

www.pathagar.com

কাগজেই একদিন নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা ও 'কামাল পাশা' কবিতার কত অংশ, কৃষ্ণনগরের মরহুম আফজালুল হক সাহেবের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'মোসলেম ভারত' নামক মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়া প্রকাশিত হয়। দুইটি কবিতার দুই প্রকার ছন্দ। বিষয়বস্তুও ভিন্ন রকমের। তুর্কীদের গ্রীসের বিরুদ্ধে স্মার্ণা বিজয় উপলক্ষ করিয়াই 'কামাল পাশা' লিখিত। পড়িতে পড়িতে মনে হইত যে রণ-দামামার তালে তালে যুদ্ধের ময়দানে মার্চ করিয়া চলিয়াছি।

"বিদ্রোহী" পাঠে তখন মনে হইত যেন বাংলার কোমল মাটিতে প্রবল শক্তিধর এক বিদ্রোহী পুরুষের অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটিয়াছে। চিরতরে সমস্ত প্রকার অত্যাচার ও অবিচারের

ধ্বংস সাধন না করিয়া এবং জরাজীর্ণ পুরাতনের উপর নূতনের মজবুত ভিত্তি স্থাপন না করা পর্যন্ত তাঁহার চলার বিরাম নাই। দিকে দিকে তাঁহার বিদ্রোহের ধ্বজা মাথা তুলিয়া দুলিতেছে। সেই সময় হইতেই কবি নজরুলকে জানিবার এবং তাঁহার আর সব লেখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার জন্য আমরা কৌতূহলী হইয়া উঠি। এই কবিতা দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের মধ্যে 'নজরুল-ভক্ত' একটি কচি সংসদ গড়িয়া উঠে। ক্রমে সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তবু সংখ্যায় ছিলাম আমরা সীমাবদ্ধ। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কবির লেখার মধ্য দিয়া কবির আদর্শকে যতটা সম্ভব বাস্তবে রূপায়িত করা, যদিও তখন আমরা সাহিত্য বা কাব্য সমালোচনা করিবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবর্জিত, বিশেষ করিয়া নজরুলের কবিতার। এই দুটি কবিতার বিদেশী শব্দের উচ্চারণ করিতে না পারিলেও এবং সব শব্দের অর্থ না বুঝিলেও, আবৃত্তি করিবার সময় এক অপূর্ব নওজোয়ানীর জোশে আমাদের শরীর মন শিহরিত হইয়া উঠিত। দুর্বোধ্যকে বোঝার জন্য এক আকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠিত আমাদের হৃদয় ও মনে। আলোচনা চলিতে লাগিল। আমাদের তরফ হইতে নজরুলের নাম উল্লেখ করা মাত্র সব ছাত্রই সমস্বরে হাততালি বাজাইয়া উঠিল। আর কোন কথা নাই। নজরুলকে আনাই স্থির হইয়া গেল। সে কী উন্মাদনা! তিন চার দিনের মধ্যেই শহরময় প্রচার হইয়া গেল যে এবার কুড়িগ্রাম স্কুলের মিলাদ উপলক্ষে কবি নজরুল ইসলাম প্রধান অতিথি রূপে আসিবেন।

কুড়িগ্রামের কেহই আমরা তখন পর্যন্ত নজরুলকে চাক্ষুস দেখি নাই। তাঁহার লেখার মারফতই আমাদের সঙ্গে তাঁহার যেটুকু পরিচয়। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কবির 'ব্যথার দান', 'অগ্নি-বীণা' ছাড়া তাঁহার আর কোন পুস্তক আমাদের হস্তগত হয় নাই। তখনও নজরুল গানের আসরে জাঁকাইয়া নামেন নাই। কবি কোথায় থাকেন এবং তাঁহার ঠিকানা কি, তাহাও জানি না। এই বিষয়ে কোন চিন্তাও করি নাই। শুধু ধারণা যে, তিনি কলিকাতায় থাকেন। তখন পর্যন্ত আমি কলিকাতাও দেখি নাই। মিলাদ মুহফিলে তাঁহার যোগদানের সম্মতি ব্যতিরেকেই সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল --কবি আসিতেছেন। এক অদ্ভুত কাণ্ড!

কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যত সোজা, তাহা বাস্তবে রূপায়িত করা তত সহজ নয়। কবিকে আনার সু-ব্যবস্থা করার জন্য কমিটি-বৈঠক বসিল। বৈঠকে কবির সহিত চিঠি-

www.pathagar.com

পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা ও তাঁহাকে কুড়িগ্রামে আনার যাবতীয় ব্যবস্থার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল। বিপদে পড়িলাম। আমার দ্বারা ইহা কিভাবে সম্ভব হইবে? 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার আমি তখন গ্রাহক হইয়াছি। উক্ত পত্রিকায় তখন কবির লেখা বাহির হইতেছিল নিয়মিতরূপে। বহু গবেষণার পর 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আফজালুল হক সাহেবের শ্মরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার মারফত ডাকযোগে কবির ঠিকানা সংগ্রহ করিলাম। নজরুল তখন হুগলিতে থাকিতেন। হুগলির টিকানায় কবিকে পত্র দিলাম --স্কুলের মিলাদ মাহফিলে নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক মেহেরবানী করিয়া যোগ দিবার জন্য। বেশ কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পরও তাঁহার নিকট হইতে প্রতি-উত্তর না পাইয়া, আমরা হতাশ হইয়া গেলাম। আরও কয়েকখানা চিঠি দিবার পর অবশেষে প্রায় সতের আঠার দিন পরে কবির চিঠি পাইলাম। তিনি ঐ সময়ে বাঁকুড়ায় ছিলেন বলিয়া আমাদের চিঠির উত্তর দিতে দেরী হওয়ায় দু:খ প্রকাশ করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন তিনি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। কবির সম্মতিসূচক পত্র পাইয়া আমাদের কি আনন্দ! এখানকার সব বিষয় বিশদরূপে জানাইয়া পুনারায় কবিকে পত্র দিলাম এবং টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করিয়া পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইয়া দিলাম। পথের খরচ বাবদ টাকা পাইয়া তিনি লিখিলেন যে, 'আমি উত্তর বঙ্গে কোন দিন যাই নি। পার্বতীপুর ষ্টেশন পর্যন্ত তোমরা কেউ এসে আমাকে নিয়ে যেয়ো।'

পরবর্তী সমস্যা হইল মৌলুদের দাওয়াত-পত্র। কবি নজরুল আসিতেছেন কুড়িগ্রামে, এবার প্রধান অতিথি রূপে। মামুলী প্রথা বাদ দিয়া এবারকার দাওয়াত-পত্রে কিছু নতুনত্ব দেখাইতে হইবে। এই দাওয়াত-পত্র কে লিখিবে? সকলেই নারাজ্। আবার উক্ত মিলাদ কমিটির সভায় আমাকে হাজির হইতে হইল। কমিটির শিক্ষক সদস্য ও সভাপতি জনাব মৌলবী আবদুল কাইউম সাহেব নির্দেশ করিয়া দিলেন যে, দেখিয়া শুনিয়া আমাকেই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কি করা যায়? কবিতার একটি লাইন পর্যন্ত লিখিতে পারি না। হঠাৎ মনে হইল কবির 'খেয়া পারের তরণী' শীর্ষক কবিতাটির কথা। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে তৎকালীন সময় পর্যন্ত ইহাই ছিল তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা। এই কবিতাটি 'অগ্নি-বীণা'র প্রথম সংস্করণের শেষ কবিতা। ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া, হুবহু কবিতাটি দিয়া চিঠির কাজ সমাপন করিলাম। অবশ্য শেষের দুই লাইন কোন প্রকারে গোঁজামিল দিয়া মিলাদের তারিখ ও সময় উল্লেখ করত মিলাইয়া দিলাম। চিঠি ছাপা হইল। চিঠি দেখিয়া কমিটি আনন্দে আত্মহারা। কবি সাহেবকে হুগলীর ঠিকানায় একখানা ছাপান চিঠি পাঠাইয়া দিলাম।

মিলাদের তারিখ সন্নিকটবর্তী। কবি সাহেবকে আনিতে কে যাইবে পার্বতীপুর ষ্টেশনে? স্থির হইল আমাকেই যাইতে হইবে। অথচ আমি কিন্তু কোন দিন কবিকে দেখি নাই এবং চিনিও না।

www.pathagar.com

কলিকাতা হইতে দার্জিলিং মেল ঠিক সময়মত রাত্রি তিনটার সময় পার্বতিপুর ষ্টেশনে Water crane সংলগ্ন হইয়া থামিল। এই মেল গাড়ী প্রত্যহ এই স্থানেই থামে। ফলে দুইটি বগী সহ ইঞ্জিন প্ল্যাট ফরমের বাহিরে থাকে। ইঞ্জিন Water crane হইতে পানি ভরে। এই মেল যোগেই তৎকালে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলার ডাক সরবরাহ হইত। গাড়ী এখানে এক ঘন্টা থামিত।

গাড়ী থামিলে নানা প্রকার কল-কোলাহল, বিচিত্র তাড়া-হুড়া ও উৎকণ্ঠার সহিত যাত্রীরা বিভিন্ন লাইনের গাড়ীতে উঠা-নামা করিতে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমিও আমার সঙ্গী খেজমতউল্লা প্ল্যাটফরমের চলমান জনসমুদ্র ভেদ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কবিকে খুঁজিতে লাগিলাম। আমাদের ধারণা ছিল তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিবেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান মিলিল না। উৎকণ্ঠার সহিত তিন চারবার প্ল্যাটফরমের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত খুঁজিয়া তাঁকে না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় তিনি আসেন নাই। বহু আকাঙ্খিত ব্যক্তি, যাঁহাকে দেখিবার জন্য ও যাঁহার মুখনিসৃত বাণী শ্রবণ করিবার জন্য কুড়িগ্রামের সমস্ত জনগণ উদ্‌গ্রীব যিনি আগামীকাল স্কুলের বাৎসরিক মিলাদ মহফিলে প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দিবেন তিনিই আসেন নাই। কবিকে মিলাদ উপলক্ষে কুড়িগ্রামে আনার জন্য আমিই প্রধান উৎসাহক। আমি সকলের নিকট কি জবাব দিব। মর্মাহত হইয়া পড়িলাম। খেজমতউল্লা বলিল, 'আপনি তো কবি সাহেবকে কোন দিন দেখেন নাই। হয়তো তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া রংপুরের গাড়ীতে উঠিয়াছেন।'

তাহার কথা উপেক্ষা করিয়া তবুও বিষণ্ন মনে প্ল্যাট ফরম হইতে নামিয়া শেষ বারের মত তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে ইঞ্জিন সংলগ্ন বগির খুব ছোট একটি ইন্টার ক্লাশ কামরার কাছাকাছি যাইয়া উপরের দিকে তাকাইয়া দেখি কবি সাহেব গাড়ীর দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার আয়ত উদাস চক্ষু চলমান জনসমুদ্রের মধ্যে কাহাকে যেন খুঁজিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই চিনিতে পারিলাম —ইনিই কি কবি নজরুল ইস্‌লাম! আমার জীবনে সে এক অপূর্ব মুহূর্ত!

স্টেশনের বহু বৈদ্যুতিক আলোর সোনালী আভায়, বিচিত্র ভঙ্গিমায় কবির মোহনীয় সাম্য মূর্তি জীবনে সর্বপ্রথম অবলোকন করিলাম। আমাদের ইপ্সিত ব্যক্তিই আমার সম্মুখে গাড়ীর দরওজায় দন্ডায়মান। পরনে খদ্দরের সাদা ধুতি, গায়ে কাঠালী চাঁপা রংয়ের খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবী। নিজের গায়ের রং এবং বিজলী বাতির আলোর একত্র সমন্বয়ে, মাথায় উস্ক খুস্ক ঝাঁকড়া চুল সমেত তাঁহার মুখমণ্ডলে কি যে এক অপরূপ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত।

আনন্দের আতিশয্যে আমার মনে প্রাণে সর্বশরীরে এক অপূর্ব আনন্দ শিহরণ খেলিয়া গেল। প্রায় এক মিনিট পর্যন্ত নির্বাক প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবির দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার পরবর্তী জীবনে হুগলী ও কলিকাতায় বহুদিন, বহুস্থানে বিভিন্ন পরিবেশে কবির সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি কিন্তু কবির সেই মোহনীয় মূর্তি আর দেখি নাই।

www.pathagar.com

খেজমতউল্লা তখন খুবই ছেলে মানুষ, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। কবিকে না পাইয়া তাহারও মন ভাঙিয়া গিয়াছিল। আমাকে অমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমার গায়ে হাত রাখিয়া বলিল, 'আর এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি হইবে? চলুন আমরা আমাদের গাড়ীতে যাই'। আমি তাহাকে ইশারায় জানাইলাম, ঐ যে গাড়ীর দরওয়াজায়। কবিকে দেখিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল।

গাড়ীর দরওয়াজার সম্মুখে যাইয়া কবিকে সালাম দিলাম। আমরা নীচে আর তিনি উপরে। আমরা যে তাঁহাকেই খুঁজিতেছি এবং তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া আছি, যাত্রী ও কুলিদের ভীড়ের মধ্যে তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি একটু চমকিত হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া সালাম গ্রহণ করিলেন এবং মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, 'আমাকে আপনারা চিন্‌লেন কি করে?'

এর মধ্যেই আমরা দুইজন গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। প্রতি-উত্তরে আমি বলিলাম, 'আপনার 'ব্যথার দান' পুস্তকে আপনার ফটো দেখিয়াছি।'

'আচ্ছা!' বলিয়া প্রাণ-খোলা হাসিতে মুখরিত হইয়া উঠিলেন কবি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আপনি আমাদিগকে 'আপনি' করে সম্বোধন করিবেন না। আমরা স্কুলের ছাত্র, সব দিক দিয়েই আপনি আমাদের বড়।'

আবার উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, তাই হবে।'

আমি বলিলাম, 'এই গাড়ী থেকে নেমে পূর্ব দিকে মিটার গেজের গাড়ীতে উঠতে হবে।' তিনি খুব ক্ষিপ্রতার সহিত বিছানা ও আসবাব পত্র গুটাইতে প্রয়াস পাইলে আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া নীচে নামিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমাকে কিছুই করতে দেবে না!'

তাড়াতাড়ি আমরা দুইজনে তাঁহার বিছানা ও আসবাব-পত্র গুটাইয়া লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। তাঁহার আসবাব-পত্রের মধ্যে একটি বেতের সুটকেস, বেতের একটি ছোট ব্যাগ, একটি সতরঞ্জি, একটি খদ্দরের চাদর, একটি বালিশ ও একটি বিচিত্র রংয়ের ডোরাকাটা পশমী কাশ্মীরী মোটা কম্বল।

রেললাইন পার হইবার সময় তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তোমরা আমাকে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেছ।' আমি বলিলাম, 'তাতে কি? আপনার জন্য এই ষ্টেশন নূতন। প্রতিদিনই এই সময় দার্জিলিং মেল পৌছুলে এই রকম যাত্রীর ভিড় হয়।'

পার্বতীপুর হইতে কুচবিহারগামী মিটার গেজের গাড়ীতে রংপুর হইয়া তিস্তা জংশনে গাড়ী বদল করিয়া আমাদিগকে কুড়িগ্রামের তৎকালীন ন্যারোগেজের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য, কোন গাড়ীতেই জায়গা নাই। বদ্ধ দরওয়াজা বিশিষ্ট খুব ছোট একটি ইন্টার ক্লাশ কামরা; উঠিতে চাহিলে ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল 'জায়গা নেই।' কবি সাহেব বলিলেন, 'আমরা কোন মতে নীচে বসেই যাব।'

www.pathagar.com

জানালা দিয়া বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথাকার মাল-পত্র সরাইয়া দরওয়াজা খুলিলে কবি-সহেব ভিতরে প্রবশ করিয়া মধ্যস্থ যাত্রীদের প্রতি একবার চক্ষু বুলাইয়া লইলেন। জিনিস পত্রে ছোট কামরা ভরপুর। ব্যাঙ্কের উপরে মাল-পত্রের অপরিসর জায়গায় খাকি পোশাক পরিহিত দুইজন বাঙ্গালী উঁচুস্তরের মিলিটারী অফিসার কাত হইয়া আছেন। পরে জানিয়াছিলাম তাঁহারা বকসার কোর্টের অফিসার। খাকি জামার উপর ক্রস্‌বেল্ট ও নানা প্রকার তকমা লাগান। তাহারা কবি সাহেবকে দেখিয়া আমার নিকট হইতে তাঁহার পরিচয় নিলেন। নীচে ক্ষুদ্র বেঞ্চে তিন জন লোক উপবিষ্ট। তাহাদের মধ্যে একজন বেশ বিত্তশালী মধ্যবিত্ত গোছের। বয়স অনুমান চল্লিশ। হোল্ডঅলের এক অংশ খুলিয়া তাহার উপর বসিয়াছেন। পরণে খুব মিহি বিলাতী ধুতি, গায়ে কাল আলপাকার কেপ্‌কলারের কোট, পশমী শাল, পায়ে মোজা। পরিচয়ে জানলাম তিনি কুচবিহারের একজন উকিল। তিনিও আমার নিকট হইতে কবির পরিচয় জানিয়া নিলেন। উকিল-বাবুর পায়ের কাছে মেঝের উপর কোন মতে একটুকু জায়গা করিয়া শতরঞ্জি পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। বাঁশি বাজাইয়া আমাদের গাড়ী রওয়ানা হইল। কবি-সাহেব আমার নিকট হইতে কুড়িগ্রামের অনেক তথ্য জানিয়া লইলেন। পরে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের নিমন্ত্রণ-পত্রে আমার কবিতা ছেপেছ। কার নির্দেশ মত এ কাজ করেছ?' তাহার কথা শনিয়া শরমে সংকুচিত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার বিনা অনুমতিতে তাঁহার কবিতা দিয়া আমাদের স্কুলের মিলাদের দাওয়াত পাত্র ছাপাইয়াছি। নিশ্চয়ই অন্যায় করিয়াছি। সরলভাবে জবাব দিলাম: 'এবার আপনি আমাদের মিলাদ উপলক্ষে আসবেন বলে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, গতানুগতিক প্রথায় না হয়ে এবারকার মিলাদের দাওয়াত-পত্রে কিছু বিশেষত্ব থাকতে হবে। শেষকালে আমার উপরই এ দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। কবিতা লিখতে আমি কোন দিনই জানি না। আপনার 'অগ্নি-বীণা' আমার পড়া ছিল। সেই বইয়ের 'খেয়া পারের তরণী' আমার খুব ভাল লেগেছে। মনে করলাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণ-গান বিষয়ক এই কবিতাটিই এই পরিবেশে ঠিক হবে। এই জন্য আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার কবিতা দিয়েই আমাদের মিলাদের দাওয়াত-পত্র ছাপিয়েছি। অবশ্য শেষের দুই লাইন কোন মতে গোঁজামিল দিয়ে নিজেই লিখেছি। এর জন্য আর কেউ দায়ী নয়।'

তিনি খুশীতে উদ্ভাসিত হইয়া বলিলেন, 'তোমাদের এ সৎসাহস ও কবিতা নির্বাচনের অপূর্ব পদ্ধতি দেখে সত্যিই তোমাদের কর্ম-প্রেরণায় মুগ্ধ হয়েছি। তোমাদের জ্ঞানের শিখা আরও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক কামনা করি।'

কবির কথা শুনিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ও মনে মনে আনন্দ অনুভব করিলাম। মনে করিয়াছিলাম তিনি আমাদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তারপর আরম্ভ হইল কংগ্রেসী আন্দোলন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের কথা। ইতিমধ্যে দুই তিনটি ষ্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ী রংপুরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। উপরের দিকে তাকাইয়া

www.pathagar.com

দেখি মিলিটারী অফিসারদ্বয় কবির দিকে চাহিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কবির বক্তব্য শুনিতেছেন। আমরা সবাই শ্রোতা। তিনি বলিলেন, 'নিজের দেশের জিনিস থাক্‌তে পরদেশী দ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল। দেশের নেতৃবৃন্দ স্বদেশী আন্দোলন করতে যেয়ে সরকার কর্তৃক কত প্রকারেই না লাঞ্ছনা ভোগ করছেন। এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়া দরকার।'

মোটের উপর তাঁহার আসল বক্তব্য হইল বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ। রাত্রিকাল বলিয়া আমরা যার যার গরম জামা কাপড় লইয়া আসিয়াছি। আমাদের গায়ে কোন খদ্দর জাতীয় জামা কাপড় ছিল না। এতক্ষণে ভোর হইয়া গিয়াছে এবং গাড়ী রংপুর ষ্টেশনে আসিয়া গিয়াছে। গাড়ী ছাড়িলে কতক্ষণ পর উকিল-বাবু মুখ খুলিলেন। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিহিত বিলাতী কাপড়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াই কবি বিলাতী দ্রব্যের প্রতি অতটা ঘৃণার উদ্রেক করিতেছেন। উকিলবাবু বলিলেন, 'আপনার পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। আপনার সব কথাই খুব ভাল লাগল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি যে আপনার দরদ আছে তাও উপলব্ধি করলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কথা সবই মনোযোগ সহকারে শুনেছি। কিন্তু এটা তো আপনি জানেন যে, এক ভাঁড় দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গো-চোনা ফেলিলে ভাঁড়ের সমস্ত দুধই নষ্ট হয়ে যায়। আপনার জামা কাপড় ও আসবাব পত্র সবই আমাদের দেশের তৈরী এর মধ্যে যদি বিদেশী কম্বলটি না থাকত, তা হলে ভাল হত।' উকিল-বাবুর কথা শুনিয়া আমরা অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তিনি কবিকে এই কথা কয়টি বলিয়া খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া কবি সাহেব হাসিলেন। পরে সহজ ও সরলভাবে একটু সংযত হইয়া বলিলেন, "দেখুন, কম্বলটি আমাদেরই দেশের মাল-মশলায় তৈরী। এটা আমার পরলোকগত দাদা সাহেব ব্যবহার করতেন। দাদার মৃত্যুর পর আমার বাবা ব্যবহার করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর ব্যবহার করছি আমি নিজে। এটা অনেক দিনের আগের কাশ্মীরের তৈরী মূল্যবান পশমী কম্বল। আপনি যে ইটালিয়ান রাগের উপর বসা আছেন, এটা ঐ জাতীয় ইটালিয়ান কম্বল নয়। এটা নিছক স্বদেশী, এর মধ্যে কোন বিদেশীয় ভেজাল নেই। এই বিচিত্র রংয়ের ডোরা-কাটা বস্তুটির প্রতি আমাদের অনেকখানি দরদ জড়িত আছে। দাদা ও বাবার স্মৃতির প্রতীক হিসেবেও এটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, মমতা আছে। এটা বিদেশী হ'লে সাথে আনতুম না, এ জ্ঞান আমার আছে। আর বিদেশী হলেও স্বীকার করতুম। আমার কিছু থাক আর না থাক, সত্য কথা বলার মত মনের জোর আল্লাহ্‌ আমাকে দিয়েছেন। কারো ভয়ে মিথ্যে বলতুম না। আমি সত্য কথা বলতে জানি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতেন। জানেন পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ থেকে আজ আমাদের নিজেদের দেশের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য কৃষ্টি ও শৌর্য-বীর্যের কথা সবই ভুলে গেছি।"

এবার উকিল বাবুর মুখের চেহারার পরিবর্তন ঘটিল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমরাও নির্বাক। হাসিমুখে পূর্ব কথার জের টানিয়া কবি-সাহেব একটু পরে আবার

www.pathagar.com

আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখো, উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচু করে মুক্ত মনে তাকাবার শক্তি ও সাহস কারো নেই। নীল সরোবরে পদ্মবনে পদ্মফুল ফোটে। রাজহাঁস সরোবরের স্বচ্ছ জলে সাঁতার কেটে পদ্মবনে পদ্মফুল খুঁজে বেড়ায়। আর বক্ একই সরোবরের পাড়ে গুগ্‌লী, শামুক, কেঁচো ও চুনোমাছ খুঁজে বেড়ায়। প্রভেদ এজায়গায় বক আর রাজহাঁসে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মনোবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধি হয়েছে বকের মত। যত দিন না আমদের এই হীন মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটবে, ততদিন আমাদের দেশের কল্যাণ নেই। স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি সমস্ত প্রচেষ্টাই হবে বৃথা।'

সেই সময কবির মুখমণ্ডল এক তেজো-দৃপ্ত রক্তিম আভায় ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন কি অঘটন ঘটিয়া গেল। কবি ক্রোধে ও উত্তেজনায় ফুলিয়া উঠিলেন। আমরা হতবাক। ইহার পর তিনি স্থির দৃষ্টিতে উকিল বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনার মনোবৃত্তি ঠিক বকের মত। আমি এতগুলো স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করতে পেরেছি বলে আমাকে উৎসাহিত করা ছিল আপনার কর্তব্য। - কম্বলটি বিদেশের হ'তো যদি তবুও। তার পরিবর্তে আপনি অন্যায় অভিযোগ করেছেন যে এই কম্বলটি আমার সমস্ত স্বদেশী দ্রব্য সমূহকে ক'রে দিয়েছে অপবিত্র। আমার সর্বপ্রকার স্বদেশ-প্রীতি ও সাধনা ক'রে দিয়েছে পন্ড। যদি শীতের রাতে, অতিবড় প্রয়োজনের তাগিদে, একটি বিদেশী কম্বল সাথে এনেই থাকি, যার গঠন প্রণালী সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই তা'নিয়ে আমাকে অমন ভাবে দোষারোপ করা আপনার ঠিক হয় নি। আজ স্বদেশী ব্রতে যারা ব্রতী, তারা জেনে শুনে কখনও বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ করতে পারে না। দেশে আপনার মত শিক্ষিত লোক যাঁরা তাঁরা যদি কিছু কিছুও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করতেন, দেশ কত এগিয়ে যেতো।'

এই বলিয়া তিনি থামিলেন। আরও কি ঘটিয়া যায় ভাবিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। উপরের দিকে চাহিয়া দেখি মিলিটারী অফিসার দু'জন হাস্যোজ্জ্বল চোখে কবির দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমাদের গাড়ী তখন কাউনিয়া জংসন ছাড়াইয়া তিস্তা ব্রিজের উপর। ব্রিজ পার হইলেই তিস্তা ষ্টেশন। আমি কবি সাহেবকে খুব সঙ্কোচের সহিত জানাইলাম যে, এখানেই আমাদিগকে নামিতে হইবে। গাড়ীও ষ্টেশনে থামিয়া গেল।

আমরা গাড়ী হইতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কবির মুখমণ্ডল পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। গাড়ীতে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে মোলায়েম স্বরে উকিল বাবুকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'দেখুন, মনে কিছু করবেন না। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ। কথাস্থলে অনেক কিছু বলে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন।'

উকিলবাবু নিজের অসংযত কথা পূর্বেই জ্ঞাত হইয়া গিয়াছিলেন। এবার কবির কথায় আরো সংকুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া কবিকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া বারংবার কবির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

কবি-সাহেব উচ্চস্বরে হাসিতে হাসিতে গাড়ীর সকলকে অভিবাদন জানাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
দেশ বিদেশে নজরুল

নজরুলের সিরাজগঞ্জ সফর
আবদুল মান্নান সৈয়দ

বাংলাদেশে নজরুল চর্চা : মুখোশ ও বাস্তবতা
আবদুল হাই শিকদার

তরুণ রাশিয়ার চোখে নজরুল
বিশ্বজিৎ রায়

জাপানে নজরুল চর্চা
কিওকো নিওয়া

উত্তর আমেরিকায় নজরুল চর্চা
সাজেদ কামাল

www.pathagar.com

ইসলাম- সে-তো পরশ মানিক
তারে কে পেয়েছে খুঁজি'।

পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা
তাদেরই মোরা বুঝি।
- কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

নজরুলের সিরাজগঞ্জ সফর

আবদুল মান্নান সৈয়দ

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের আরম্ভেই সিরাজগঞ্জে শুরু হয়ে যায় 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলন'-এর আয়োজন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন এম সিরাজুল হক। তিনি কলিকাতায় নজরুল ইসলামকে পত্র লিখেন। ৩০ আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে নজরুল তাঁর পত্রোত্তর দেন। পত্রটি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয় 'অনাগতের আগমনী গাহিতে চলিয়াছি' শিরোনামে। পত্রটি এই :

> **অনাগতের আগমনী গাহিতে চলিয়াছি**
> আপনারা আমাকে অন্য জগতের আগমনী গাইতে আমন্ত্রণ করেছেন। আমি অযোগ্য, তবু আহ্বান করেছেন সেজন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ব জুড়ে আজ মহাজাগরণ। শিক্ষা ও ধর্মের নব নব স্ফূরণ। অভ্যুত্থানের বজ্রবিষাণ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত। বিশ্বব্যাপী মহাজাগরণের এই প্রদীপ্ত প্রভাতে বাংলার মুসলমান তরুণেরা কি মহানিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয়েই থাকবে? ধর্ম-অধর্মের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহাসংঘর্ষের এই মহাসন্ধিক্ষণে তৌহিদের শান্তি-সাম্য ঐক্যমন্ত্রে সে কি ক্লান্ত-শ্রান্ত ভ্রান্ত মানবচিত্তের অবসন্নতা বিদূরিত করবে না? জাতি ও কওমকে ধর্ম পথে সেরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত ও সংঘবদ্ধ করতে প্রচেষ্টা ও প্রয়াস পাবে না? তরুণ বন্ধুরা কি মহা কোরআনের মহাবাণী 'কুম-বে ইজ্ নিল্লাহ'-ওঠো জাগো-এ বাণী ভুলে গিয়েছে? আমি তো দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি ঐ স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমাদের কীর্তিমান পূর্ব-পুরুষগণ আকুল পানে আমাদের কর্মের প্রতি চেয়ে রয়েছেন। তরুণদের মন-মন্দিরে তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্জ্বলিত হউক। বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, সালাহউদ্দীন, খালিদ, তারিক, মুসা, হাঞ্জেলা, ওকবা'র সাধনা তাদের কর্মে রূপলাভ করুক। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, প্রাচীন প্রাচীর চূর্ণ করত: বঙ্গীয় মুসলিম তরুণবৃন্দ জ্ঞান, চরিত্র, নীতি, সখ্য ও মনুষ্যত্বের পথে কাতারবন্দী হউক— এই আশা অন্তরে পোষণ করেই আপনাদের নির্ধারিত দিনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি।

www.pathagar.com

আপনাদের চেষ্টায় যুবকেরা নব জিন্দেগীর পথে অগ্রসর হোক-সকলের সাধনায় জয়যাত্রা সাফল্য লাভ করুক এই কামনা।[১]

এরপর সম্মেলনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী (১৯০৬-৭১) কলিকাতায় নজরুলের সঙ্গে দেখা করেন। আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-৫৯) লিখেছেন, 'কাজীদা আর আমাকে সেই সভায় নিয়ে আসবার জন্য সৈয়দ আসাদউদৌলা সিরাজী এলো কলকাতায়। কাজীদা বললেন : 'তোমার এ আহ্বান কি উপেক্ষা করতে পারি? জানো আব্বাস, সিরাজী হবে বাংলার তরুণদের নকীব। তুমি, আমি, শিরাজী এই তিনজনে বাংলাদেশ জয় করতে পারি।'[২] সিরাজগঞ্জে যাবার দু'দিন আগে নজরুল আরেকটি চিঠি পাঠান এম সিরাজুল হককে। চিঠির বয়ান এই :

কলিকাতা
২ নভেম্বর, ১৯৩২
জনাব সম্পাদক সাহেব,

তসলিম। আপনাদের নেতা আসাদউদ্দৌলা সিরাজীর মারফত আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ পেলাম। যে সময় সারা বাংলাদেশ আমার বিরুদ্ধে, সেই সময় এই বিদ্রোহীকে আপনারা তরুণদের পথ প্রদর্শনের জন্য ডেকেছেন। ধন্য আপনাদের সাহস। ধূমকেতুর সারথী রূপে নয়—যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের নিপষ বর্দার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আযাদি অনাগত—তারই আগমনী গাওয়া বা হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্যপথ ধরে যাত্রা করুন কোন বিঘ্নই সে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামীর জিঞ্জির হতে মুক্ত হোক! মুক্ত প্রাণে মুক্ত বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারবো, সেইদিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জনকয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছে—এজন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারিদিকে বিপ্লব বিভীষিকা-অনাদর, অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে—তবুও পিছপা হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন সমাজ দেবেই। আব্বাসউদ্দীনও আপনাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছেন। ইনশাআল্লাহ ৫ই নভেম্বর ভোরের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে পৌঁছব।

৪ঠা নভেম্বর রাতে ট্রেনে শিয়ালদহ থেকে সিরাজগঞ্জের রওনা হলেন নজরুল ইসলাম, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, গিয়াসউদ্দীন আহমদ (প্রাক্তন মন্ত্রী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য) ও সূফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭)। সূফী জুলফিকার হায়দার অনেক বছর দেশের বাইরে ঘুরে ঐ ১৯৩২ সালেই কলিকাতায় স্থিত হয়েছেন এবং নজরুলের সঙ্গে একটি সশ্রদ্ধ বন্ধুতায় মিলিত হয়েছেন।

৫ই নভেম্বর ভোর বেলা ট্রেন সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে পৌঁছল। স্টেশনে আগে থেকেই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-যুবক কবিকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা 'আল্লাহু

www.pathagar.com

আকবর', 'কবি নজরুল ইসলাম জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে। 'সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে মিছিল এসে থামল জামলাপাড়াস্থ মৌ: আফজাল আলী খাঁ সাহেবের বাসভবনে। খাঁ সাহেব হলেন সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার ও জননেতা এবং তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। এখানেই কবির চা-নাশতা ও মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।' (ইজাব উদ্দীন আহমদ) তার আগে কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১) মাজার জিয়ারত করেন। সিরাজীর প্রতি নজরুল ছিলেন চিরকাল সশ্রদ্ধ। 'বাণীকুঞ্জে' কবি তার শ্রদ্ধাঞ্জলি পেশ করলেন।

বেলা তিনটার সময় 'নাট্যভবনে' (বর্তমানে পৌর মিলনায়তন) অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে নজরুল যখন শ্রোতা-দর্শকদের মধ্য দিয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলেন তখন দর্শকমণ্ডলী 'আল্লাহ আকবার', 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। ওপরের দোতলা থেকে মহিলা মহল পুষ্পবৃষ্টি করেন। মঞ্চে আসন গ্রহণ করার পর কবি ও অন্যান্যদের মাল্য ভূষিত করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ইজাবউদ্দীন আহম্মদ (১৯১৮-৭৭) লিখেছেন— 'অভিনন্দন পাঠ শুরু হল। সর্বশেষ অভিনন্দন পাঠ করলেন দোতলায় মহিলাদের পক্ষ থেকে শঙ্করীবালা চক্রবর্তী। কবি মঞ্চ থেকে হাত বাড়িয়ে মেয়েদের অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করলেন। মেয়েরা কবিকে আবার মাল্যভূষিত করলেন। এইবার কবি প্রথম মুখ খুললেন। তিনি বললেন : "আপনারা আমাকে যেসব অভিনন্দন দিয়েছেন তার জবাব দেবো পরে। প্রথমে জবাব দেবো মহিলাদের তরফ থেকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছে তার।" এই বলেই কবি আবৃত্তি করতে লাগলেন 'নারী' (সাম্যবাদী) কবিতা। তাঁর আবৃত্তির সেই বলিষ্ঠ ভঙ্গি ও মধুর ঝংকারে সমস্ত সভাগৃহ স্তব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেছিলেন সৈয়দ আকবর আলী (দেশ বিভাগের পরে বার্মার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত), ইজ্জত আলী পেশকার, আফজল আলী খাঁ, আসাদউদ্দৌলা শিরাজী, গিয়াসউদ্দীন আহমদ ও সূফী জুলফিকার হায়দার। সূফী সাহেবের আলোচনার বিষয় ছিলো, 'অবরোধ বনাম স্বাসবোধ'। অনুষ্ঠানে নজরুল গেয়ে শোনান, 'চল্ চল্ /ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' (সন্ধ্যা) গানটি। আব্বাসউদ্দীন গান 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' (জুলফিকার) ও 'দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠিছে' (জুলফিকার) গান দু'টি।

আব্বাসউদ্দীনের দ্বিতীয় গানটি গাওয়ার আগে দর্শকদের সারি থেকে একজন মৌলভী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতির কাছে কিছু বলবার অনুমতি চান। সভাপতি তাঁকে মঞ্চে আহ্বান করলে তিনি তাঁর আসনে দাঁড়িয়েই বলতে থাকেন, 'আপনারা সবাই হয়তো জানেন, এই সম্মেলন যাতে না হতে পারে তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা-তদবির করা হয়েছে। এই কনফারেন্স সম্পর্কে মওলানা-মৌলভী সাহেবদের তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, এই সভায় গান-বাজনা জায়েজ করা হবে, সুদকে হালাল করা হবে এবং পর্দাপ্রথা তুলে দেয়া হবে। এসব বে-শরা কাজের প্রতিবাদ করার জন্যই আমি এই সভায় যোগদান

www.pathagar.com

করেছি। এই সভায় কবি সাহেব যে কাসিদা গাইলেন এবং আব্বাসউদ্দীন সাহেব যে নাত-এ রসূল শোনালেন, এমন মধুর গানকে না-জায়েজ বলি কেমন করে? আমি আব্বাস ভাইকে আরো একখানা গজল গাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। —এই কথা শুনে নজরুলের চোখ-মুখ-আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি তখন আব্বাসউদ্দীনকে নির্দেশ দিলে আব্বাসউদ্দীন 'দিকে দিকে পুন জ্বালিয়া উঠিছে' গানটি গেয়ে শোনান। তারপরই নজরুল তাঁর সভাপতির অভিভাষণ দেন।

নজরুল ইসলামের এই অভিভাষণটি 'যৌবনের ডাক' শিরোনামে 'সওগাত' পত্রিকার কার্তিক ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাধুভাষায় রচিত এই দীর্ঘ অভিভাষণটি কলিকাতা থেকেই কবি লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে অনায়াসে অনুমান করা চলে। অভিভাষণটি কয়েকটি উপ-শিরোনামে বিভক্ত 'বার্ধক্য ও যৌবন', 'গোঁড়ামি ও কুসংস্কার', 'অবরোধ ও স্ত্রীশিক্ষা', 'সংঘ একনিষ্ঠতা', 'সংগীতপিঞ্জ', 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও শেষ কথা'। জানি না কেন এই অভিভাষণটি 'তরুণের সাধনা' নামে উপ-শিরোনাম বর্জিতভাবে এমনকি 'হিন্দুমুসলমান ঐক্য' অংশটি সম্পূর্ণ বর্জিতভবে নজরুল রচনাবলীতে (চতুর্থ খণ্ড ১৯৯৩) গৃহীত হয়েছে। আমরা এখানে শুধু বর্জিত অংশটি সংকলন করে দিলাম :

হিন্দু মুসলমান ঐক্য

যৌবনের ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তাহার প্রসার বিশাল, তাহার গতিবেগ বিপুল। ধর্মের গণ্ডী বা প্রাচীরে যৌবন অবরুদ্ধ থাকতে পারে না। যে ধর্মে সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় তাহার প্রসারতা। এইখানেই যৌবনের গর্ব, মহত্ব। নদী পর্বতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সে কি পর্বতের চারিপার্শ্বেই জলধারার অর্ঘ্য বহিয়া চলিবে? সে কি পর্বত-নিম্নের সমতলভূমি করুণা-সিঞ্চিত করিয়া সাগর অভিযানে যাইবে না। যে না যায়, সে নদী নয়, সে খাল, ডোবা কিম্বা খুব জোর ঝর্ণা। আমার ধর্মের শিখর হইতে নামিয়া আমার প্রাণধারা যদি আমারই দেশের উপত্যকা ফুল-ফসলে ভরিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে আমার ধর্ম ক্ষুদ্র, আমার প্রাণ স্বল্পপরিসর। ধর্ম লইয়া বৃদ্ধেরা, পৌঢ়েরা কলহ করে করুক, আমরা যেন এই কুৎসিৎ কলহে লিপ্ত না হই। আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে।

এক দেশের জলে-বায়ুতে ফলে-ফসলে, এক মায়ের স্তন্যে পুষ্ট হিন্দু মুসলমানে যে কদর্য বিরোধের সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সভ্য জগতে আমাদের সভ্য বলিয়া পরিচয় দিবার আর মুখ নাই। জননায়ক হইবার নেশায় হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ আজ জনসাধারণকে কেবলই ধর্মের নামে উগ্র মদ পান করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। এই অশিক্ষিত হতভাগ্যদের জীবন হইয়া উঠিয়াছে ইহাদের হাতের ক্রীড়নক। ইহাদের অশিক্ষা ও ধর্মান্ধতাই হইয়াছে ঐসব সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতের অস্ত্র। যখন যেমন ইচ্ছা তখন তেমনি করিয়া ইহাদের ক্ষেপাইতেছেন। আমার মনে হয়, কাউন্সিল এসেমব্লি প্রভৃতি বালাই না থাকিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের এমন ভীষণ কদর্যমূর্তি দেখিতাম না। আজ দেখি তিনিই হিন্দুদের নেতা যিনি স-

www.pathagar.com

কাবাব কারণ সলিল পান না করিয়া মায়ের নাম লইতে পারেন না। মুসলমানদের আজ তিনিই হঠাৎ নেতা হইয়া উঠিয়েছেন—যিনি স-হ্যাম হুইস্কি পান না করিয়া ইসলামের মঙ্গল চিন্তা করিতে পারেন না। ইহাদের অর্থ আছে, তাই যথেষ্ট ভাড়াটিয়া মোল্লা, মৌলবী, পণ্ডিত, পুরুষ যোগাড় করিয়া কাগজে কাগজে ডঙ্কা পিটাইয়া স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য ওকালতি করিতে পারেন। খোদার বা ভগবানের তো কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই না। যখন মড়ক আসে, হিন্দু-মুসলমান সমানে মরিতে থাকে, আবার যখন তাঁহার আশীষধারা বৃষ্টিরূপে ঝরিতে থাকে, তখন হিন্দু-মুসলমান সকলের ঘরে সকলের মাঠে সমান ধারে বর্ষিত হয়। আমরা কেন তবে খোদার উপর খোদকারী করিতে যাই? খোদার রাজ্য খোদা চালাইবেন, তিনি যদি ইচ্ছা না করিবেন তাহা হইলে অমুসলমান কেহ একদিনও বাঁচিতে পারিত না। সব বুঝি, সব জানি, তবু ধর্মের মুখোশ পরিয়া স্বার্থের দৈত্য যখন মাতলামি আরম্ভ করে তখন আমরাও সেই দলে ভিড়িয়া যাই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নির্মল-বুদ্ধি মহাপুরুষদের মস্তিষ্কও তখন মায়াচ্ছন্ন হইয়া যায় দেখিয়াছি। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই কুৎসিৎ সংগ্রামে লিপ্ত হয় বৃদ্ধের প্ররোচনায় তরুণেরা। আপনারা এই কদর্যতার বহু উর্ধ্বে, আপনাদের বুদ্ধি সংকীর্ণতা মুক্ত, ইহাই হউক আপনাদের ধ্যান-মন্ত্র। ইসলাম ধর্ম কোন অন্য ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করিতে আদেশ দেয় নাই। ইসলামের মূলনীতি সহনশীলতা (Passive Resistance) ইমাম হাসান ও হোসেন তাহার চরম দৃষ্টান্ত। আজ আমাদের পরমত সহনশীলতার অভাবে, আমাদের অশিক্ষিত প্রচারকদের প্রভাবে আমাদের ধর্ম বিকৃতির চরমসীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, আমাদের তরুণদের ঔদর্যে, ক্ষমায় আমাদের সেই পূর্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে। মানুষকে মানুষের সম্মান-হোক সে যে কোন জাতি, যে কোন ধর্ম, যে কোন সম্প্রদায়ের-দিতে যদি না পারেন, তবে বৃথাই আপনি মুসলিম বলিয়া, তরুণ বলিয়া ফখর করেন।[৩]

'যৌবনের ডাক' অভিভাষণ সম্পর্কে সেদিন 'জাগরণ' (১৯৩২) পত্রিকা যে মন্তব্য করেছিলো তা ভবিষ্যৎদর্শী ঃ 'সেদিন বিশাল জনতার সম্মুখে নজরুল যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, মনে হয় সেটি ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিভাষণ। এই একটি মাত্র অভিভাষণে নজরুলের সমগ্র জীবনাদর্শ বিধৃত হয়ে আছে।

'মোয়াজ্জিন' পত্রিকায় 'সিরাজগঞ্জে বঙ্গের বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের শুভাগমনে অভিনন্দন' নামে রইস উদ্দীন আহমদের একটি প্রশস্তিমূলক কবিতা ঐ সময়েই প্রকাশিত হয়।[৫]

তথ্য সূত্র :

১. উদ্ধৃত। 'কবিদাকে যেমন দেখেছি' : ইজাবউদ্দীন আহমদ। 'বেতার বাংলা', অক্টোবর ১৯৭৬, দ্বিতীয় পক্ষ।

২. 'আমার শিল্পীজীবনের কথা' : আব্বাসউদ্দীন আহমদ।

৩. 'যৌবনের ডাক' : কাজী নজরুল ইসলাম। 'সওগাত', কার্তিক ১৩৩৯।

৪. 'জাগরণ' ১৯৩২। উদ্ধৃত। 'সমকালে নজরুল ইসলাম' : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। ১৯৮৩।

৫. 'সিরাজগঞ্জে বঙ্গের বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের শুভাগমনে অভিনন্দন' : রইস উদ্দীন আহমদ। 'মোয়াজ্জিন' মাঘ, ১৩৩৯।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের মে মাসে ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কবি কাজী নজরুল, তাঁর বাম পাশে কবি জসীমউদ্দীন

www.pathagar.com

বাংলাদেশে নজরুল চর্চা : মুখোশ ও বাস্তবতা

আবদুল হাই শিকদার

ক.

বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং কাজী নজরুল ইসলাম সত্যিকার অর্থেই এক এবং অবিভাজ্য সত্তা। একই সাথে একথাও বলা বাহুল্য, তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত শুধু যে বাংলা সাহিত্য বা সঙ্গীতেরই চিরস্থায়ী সম্পদ তাই নয়, বিশ্বসাহিত্য এবং সঙ্গীতেরও অনন্য পাথেয়। প্রতিবাদী গণমুখী, মানবতাবাদী, আপসহীন, নান্দনিক বৈচিত্রমণ্ডিত সাহিত্যের যে ধারা নজরুল প্রবর্তন করেছেন, তার সাথে তুলনীয় কোন কবি শুধু বাংলাভাষায় কেন, তাবত পৃথিবীতে আজও খুব বেশি নেই। ইংরেজী সাহিত্যের শেলী, বায়রন, হুইটম্যান; রুশ সাহিত্যের মায়কোভস্কি, ম্যাকসিম গোর্কী, বলকান কবি রিস্তো বোতেভ, রুমানিয়ার জাতীয় কবি মিহাই এমিনেস্কু কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার পাবলো নেরুদা, আরনেস্তো কার্দেনাল, তুরস্কের নাজিম হিকমত, প্রমুখের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে আসতে পারে। কিন্তু কাজী নজরুলের বহুমাত্রিক বর্ণাঢ্য, গভীরগ্রাহী বিশাল বিস্তারের পাশে তাদের অবস্থান সূর্যের পাশে মঙ্গল, বুধ বা বড় জোর বৃহস্পতির মতো মনে হয়। সেজন্যই নজরুল আমাদের জাতীয় কবি হয়েও সারা দুনিয়ার সকল কালের সকল মানুষের কবি।

তিনি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিরও প্রধান রূপকার। আমাদের সংস্কৃতির বর্তমান অবয়বটিরও নির্মাতা কাজী নজরুল ইসলাম। তার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আমরা জানতাম না আমাদের করণীয়। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ছিলো না পরিষ্কার ধারণা। ফলে অভিভাবকহীন পথ নির্দেশনাহীন একটি জাতি পুরোপুরি নিমজ্জিত ছিলো হতাশায়। আর ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শসক এবং তাদের অনুগত কলকাতার বাবু বুদ্ধিজীবী ও জমিদারদের দ্বারা হয়েছি উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত। এই প্রেক্ষাপটে নজরুল ইসলাম আগমন করলেন সম্রাটের মতো। তিনি ভাষাহীন স্বজাতির মুখে জোগালেন ভাষা। আশাহীনকে দিলেন আশা। দিলেন যথার্থ প্রাণপঙ্ক। আর ওমনি প্রাণ ফিরে এলো পাষাণপুরীতে।

www.pathagar.com

আর সেজন্য কাজী নজরুল ইসলামের চর্চা আমাদের করতে হয় শুধু সাহিত্যের জন্য নয়, সঙ্গীতের জন্য নয়, আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেও। কারণ আমরা যতো বেশি কাজী নজরুলকে জানবো, ততো বেশি শক্তিশালী হবো।

খ.

প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল চর্চা সম্পর্কে 'কবি কাম সাংবাদিক কাম আমলা' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ'র মতে নজরুল চর্চার সূচনাকাল বিশের দশক এবং ত্রিশের দশক। তাঁর মতে, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা কবি এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নবজাগরণের বাণী বাহক, বিদ্রোহী চেতনার অনন্য সাধারণ রূপকার কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামশীল বর্ণাঢ্য জীবন, তার সাহিত্য, সঙ্গীত ও সামাজিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা, আলোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন এবং নজরুল প্রতিভার স্বরূপ সন্ধানের কাজ গত অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরে চলে আসছে। চলতি শতকের বিশের দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যেই নজরুলের মৌলিক কবি প্রতিভা এবং তার রচনার স্বাতন্ত্র ও শক্তি সমকালীন পাঠক ও সমালোচক মহলের বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 'বিদ্রোহী' কবিতার আত্মপ্রকাশের আগেই, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি ও প্রাজ্ঞ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল প্রতিভার স্বাতন্ত্রধর্মী স্বরূপ এবং তার অসাধারণ সৃজন ক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরে, এই নবীন কবিকে বাংলার সারস্বত সমাজের পক্ষ থেকে সাহিত্য অঙ্গনে স্বাগত জানান। এর অব্যবহিত পরেই সেকালের অন্যতম অগ্রণী ও সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্য সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সমগ্র বাংলা কাব্যের পটভূমিকায় নজরুল কবি প্রতিভার স্বরূপ, স্বাতন্ত্র ও শক্তি এবং অসাধারণ মৌলিকতা তুলে ধরে তাকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম 'যুগ প্রবর্তক কবি' হিসাবে অভিহিত করেন এবং নজরুল যে ভবিষ্যতে তার প্রাপ্য সাহিত্য সিংহাসনে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিষিক্ত হবেন, তিনি যে বাংলার জাতীয় কবি এই সত্য এবং প্রত্যয়ও দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ এবং অন্যদের এই বক্তব্য সত্য। তবে আংশিক সত্য। বাংলাদেশে নজরুল চর্চার সত্যিকার সূচনাকাল ১৯১৪। অর্থাৎ উনিশের দশকে। আসানসোল থেকে দারোগা রফিজুল্লাহ সাহেব যেদিন কাজী নজরুলকে বাংলাদেশের মাটিতে, ত্রিশালের কাজীর শিমলায় নিয়ে এসেছিলেন, সেই দিন থেকে বাংলাদেশের নজরুল চর্চা শুরু। সে হিসাবে আমাদের নজরুল চর্চার আদি পিতা কাজী রফিজুল্লাহ। আমি আজ এই লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি জানাচ্ছি আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতা এবং কামনা করছি তাঁর রূহের মাগফেরাত।

এরপরই আসে মোহিতলাল বা আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কথা। এখানে লক্ষণীয়, যে লেখাটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে নজরুল চর্চার লিখিত প্রয়াস আরম্ভ হয় এবং মেধা, মননে, বিচারে বিচক্ষণতায়, নান্দনিক মানদণ্ডে, দূরদর্শীতায় আজও অবিকল্প হয়ে রয়েছে,

www.pathagar.com

সেই লেখাটি যিনি লিখেছেন, সেই আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বাড়িও ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে। কাজীর শিমলার দারোগা সাহেবের বাড়ি এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বাড়ির মধ্যে দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। মজার ব্যাপার দরিরামপুর হাই স্কুলেও তারা একই সময়ে পড়তেন।

যা হোক, বাংলাদেশে নজরুল চর্চা হয়েছে দুভাবে। ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতায়। প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতায় নজরুল চর্চার সর্বাধিক এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার দাবীদার কবি আবদুল কাদির। তাঁরই প্রাণপাত করা শ্রম ও মেধার ফসল নজরুল রচনাবলী। যা আজ আমাদের পরম গৌরবের সম্পদ হয়ে আছে। তিনি না থাকলে এই অসাধ্য সাধনে আমাদের আরও কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হতো, অন্য একজন আবদুল কাদিরের জন্যই। কারণ আজ পর্যন্ত তাঁর চাইতে দক্ষতা নিয়ে আর কেউই নজরুল চর্চায় এগিয়ে আসেননি।

এখানে বলে রাখা ভাল। আমাদের আজকের অনিষ্ট কেবল বাংলাদেশ। অন্য কোথাও নয়। সে জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক মরহুম শেখ মজিবুর রহমান ও শহীদ জিয়াউর রহমানের নাম স্মরণ করা। কারণ এদের একজন ১৯৭২ সালে কবিকে কলকাতার গোয়াল থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। অন্যজন ১৯৭৬ সালে কবিকে প্রদান করেন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব। এবং এই মানুষটির জন্যই আমাদের জাতীয় কবি শুয়ে আছেন বাংলাদেশের মাটিতে। সত্যিকার অর্থেই মসজিদের পাশে। এবং আজকের সরকারী নজরুল ইনস্টিটিউটেরও শুরু তার হাত দিয়ে 'নজরুল ভবন' নামে।

আরও একটা কথা বলা দরকার, নজরুল ইসলামের সৃষ্টি সম্ভারের মতো তাঁর চর্চারও আছে নানা মাত্রা। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, সাংবাদিকতা গণসংগঠন প্রভৃতি নানাভাবে নজরুল বিভক্ত। এই বিভাজিত অংশ প্রতিটি এক একটি সাম্রাজ্য। সঙ্গত কারণেই এই সব অংশের এক একটি নিয়েই আলাদা আলাদা পর্যালোচনা করা দরকার। যদিও নজরুলের চলচ্চিত্র, নাটক, উপনাস, ও সাংবাদিকতার চর্চা আমাদের মধ্যে নেই। আসাদুল হক যদি চলচ্চিত্রের আঙ্গিনায় নজরুল না লিখতেন তাহলে ওদিকটি থাকতো পুরোপুরি অন্ধকার। যেমন আরিফুল হকের কল্যাণে অতি সম্প্রতি আমরা জেনেছি নজরুলের নাটকের সংখ্যা ৮০ টিরও বেশি। যার গুণগত মান অনস্বীকার্য। অথচ আজ ঢাকার নাট্য পাড়ার প্রায় পুরোটাই ভূত প্রেত আর দৈত্য দানবের দখলে।

আমাদের মাঝে নজরুল সঙ্গীতের চর্চা শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে। এই চর্চার ক্ষেত্রে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর ভূমিকা অগ্রণীয়। যেমন বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম এবং ব্যাপকভাবে নজরুল জন্ম বার্ষিকী উদযাপনের কৃতিত্ব তৎকালিন তমুদ্দুন মজলিসের। প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও তমদ্দুন মজলিসই ১৯৪৯ সালে কবির জন্ম বার্ষিকী পালন করার মধ্য দিযে ক্রমাগত তা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করান।

www.pathagar.com

আর একজন মানুষ আমির হোসেন চৌধুরী Voice of Nazrul লিখে যিনি সে সময় হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে প্রথম, যিনি এককভাবে নজরুলের নামে প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন। তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির নাম ছিল 'নজরুল ফোরাম', এটা পঞ্চাশের দশকের কথা। অবশ্য নজরুল ও ইকবালের নামে এর আগে 'ইকবাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মীযানুর রহমান। আদি প্রতিষ্ঠান নজরুল ফোরামের সাথে আমির হোসেন চৌধুরী ছাড়া আরও দুজন মানুষ জড়িত ছিলেন, কবি খান মুহাম্মদ মইনুদ্দীন ও শাহাবুদ্দীন আহমদ।

কাজী নজরুলের নামে সর্বাধিক সুনাম অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমী। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পর। যথার্থ অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল চর্চার শুরু হলো। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যাদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁরা হলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন, বিচারপতি আবদুল মওদুদ, এ, কে, এম নুরুল ইসলাম, ইব্রাহীম খাঁ, সুফিয়া কামাল, মইনুদ্দীন, সিরাজউদ্দিন হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবুল কাশেম, জাহানারা আরজু, মাফরুহা চৌধুরী, আনসার আলী, আবদুর রহমান, মহিউদ্দিন, আবদুল হাই, মোসলেম আহমদ, জিয়াউর রহমান, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ড: হাসান জামান, কাজী দীন মোহম্মদ, মজিবর রহমান খাঁ এবং কবি তালিম হোসেন। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তালিম হোসেন এবং নজরুল চর্চা—একাকার হয়ে রইল। প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল চর্চার ইতিহাসে তালিম হোসেন নিশ্চয়ই একটা বড় আসন পাবেন। যদিও একথা ভুলে গেলে চলবে না প্রতিষ্ঠান হিসাবে নজরুল একাডেমীর সফলতা এবং ব্যর্থতা দুটোর দায়িত্বও তাঁরই কাঁধে বর্তায়।

তথ্য হিসাবে বলে রাখি বাংলাদেশে প্রথম একক নজরুল সাহিত্য সম্মেলন হয় সিলেটে ১৯৬১ তে, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে।

এরপর আসে সরকারী নজরুল চর্চার প্রসঙ্গে। বেসরকারী উদ্যোগে যে প্রাণ থাকে, সরকারী উদ্যোগে তা সাধারণত থাকে না। ফলে আমাদের জাতীয় কবির নাম ভাঙ্গিয়ে যে সরকারী উদ্যোগ, সেখানে লাভের গুড় পিঁপড়েয় যাচ্ছে খেয়ে।

বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী এবং নজরুল ইনষ্টিটিউট এই পর্যায়ে পড়ে। এর সাথে আছে হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সাহেবের জামানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ব্যবস্থাপনায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল চেয়ার প্রবর্তন ও নজরুল অধ্যাপক পদ সৃষ্টির ঘটনা। নজরুল ইনষ্টিটিউট অধ্যাদেশ ১২ই জুন ১৯৮৪ অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবির স্মৃতিবাহী 'কবি ভবনে' নজরুল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ.

নজরুল চর্চার অংশ হিসাবে সরকারী নজরুল ইনষ্টিটিউটে বই, বুকলেট, স্যুভেনীর, পত্রিকা ইত্যাদি জোড়াতালি দিয়ে আশিটির মত প্রকাশনা রয়েছে। এ সঙ্গে হয়তো এখন

www.pathagar.com

আরো একটি বেড়েছে। বেসরকারী নজরুল একাডেমীর প্রকাশনার সংখ্যা ৩৬, সরকারী বাংলা একাডেমী ৩২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২, সরকারী ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৮ এবং অন্যান্য ৭৭টি। অর্থাৎ আমাদের সকলের সম্মিলিত নজরুল চর্চার ৫০ বছরের ফসল মাত্র ২৪৮টি গ্রন্থ। যা শুধু মাত্র পশ্চিম বঙ্গে রবীন্দ্র চর্চার ৫১ গুণ কম বা ক্ষুদ্র।

ঘ.

দারোগা কাজী রফিজুল্লাহ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পাশে আমাদের নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে আরও দুইটি নাম না নিলেই নয়। এরা হলেন আলী আকবর খান এবং বিরজা সুন্দরী দেবী। এরা দুজনই নজরুলকে বৈবাহিকভাবে বাংলাদেশের সাথে চিরকালের মতো যুক্ত করে দেন। একই সঙ্গে সঙ্গীতসম্রাট আব্বাসউদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, কাজী আবদুল ওদুদ, সুফী জুলফিকার হায়দারের কথাও মনে রাখতে হবে।

ঙ.

আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা মুদ্রার এক পিঠ। এবার অন্য পিঠ নিয়ে একটু নাড়া চাড়া করা যাক। সে পিঠ সম্পর্কে বলা যায়, বাংলাদেশে নজরুল চর্চার ভাবগতিক খুব সুবিধার নয়। বেশির ভাগটাই লোক দেখানো। ক্ষেত্র-বিশেষে মতলববাজি। অন্ত:সারশূন্য আবেগ দখল করে আছে বিরাট এলাকা। চারদিকে উড়ছে সুবিধাবাদের ঝাণ্ডা। ফলে 'চোয়াল সর্বস্ব নজরুল ব্যবসায়ী' যতো জন্মেছে ততো জন্মায়নি মেধাবী কিংবা পরিশ্রমী গবেষক। আবার শাসক এবং তাদের পণ্ডিতমন্য আমলাদের কল্যাণে এই হাতেগোণা 'বৈষয়িকদের' একটি অংশ পেয়েছে বীরের তকমা। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে অনুল্লেখ্য। আর উপেক্ষিত হয়েছে সম্ভাবনাময় তারুণ্য। সে জন্য তারা যে নজরুল চর্চায় এগিয়ে আসবে, তার জো নেই।

আমাদের ক্ষমতাসীনরা নজরুলের নাম শুনলেই গদ গদ হয়ে পড়েন। অত:পর ভুল বাংলায় অশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল বজ্রগর্ভ শব্দোৎসার 'জাতীয় কবি,' 'বিদ্রোহী কবি', 'নজরুল আমাদের হেন', 'নজরুল আমাদের তেন' ইত্যাদি। প্রচুর হাততালি পড়ে এসব শুনে। কিন্তু নজরুলের উপর আজ অবধি কোন জাতীয় নীতি কারো কাছ থেকে পাইনি আমরা।

ঘটা করে দরিরামপুর, কুমিল্লায় নজরুল জন্মোৎসব হলো ক'বছর। যদিও এটুকুও ছিলো জনগণের চোখকে ধুলো দেয়ার কায়েমী স্বার্থের অতি পরিচিত কৌশল। কিন্তু তারপরও দৌলতপুর, চট্টগ্রাম পতিতই রয়ে গেলো। নজরুলের স্মৃতি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ কোথাও নেই। উল্টো, কাজীর শিমলায় নজরুলের থাকার ঘরটি পরিণত হয়েছে গোয়ালে। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে নির্মিত হয়নি স্মারক স্তম্ভ।

www.pathagar.com

ফরিদপুরের কবির নির্বাচনী এলাকায় কেউ আজ আর মনে করতে পারে না, কত জনসভায় কবি ভাষণ দিয়েছেন। সিলেট, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ এবং রাজধানী ঢাকা, কবির কতো কথা, কতো স্মৃতি —সব বইয়ের পাতায় ঠেলে দেয়া হয়েছে। চাক্ষুস জানবার সকল দুয়ার রুদ্ধ। কুমিল্লার দৌলতপুরে নজরুল স্মৃতি রক্ষার কাজে নেমে, স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের রোষানলে পড়ে জেলখানায় পচেছেন উদ্যোক্তা বুলবুল ইসলাম। তারপর সামগ্রিকভাবে সর্বশান্ত হয়ে হারিয়ে গেছেন চিরতরে। এতোটা অনাদর! অথচ পৃথিবীর সব দেশে, সব কালে নিজ নিজ জাতীয় কবিদের সকল কিছু সংরক্ষিত হয়। যেমন নিজেদের জন্য, তেমনি পর্যটকদের জন্য। এটাই নিয়ম। এটাই হয়ে এসেছে।

শৈশবেই নজরুল-প্রীতির বীজ অংকুরিত হয় বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের বুকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়তে এসে, বাংলা সাহিত্যের যে কোন ছাত্র ব্যথিত বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্য করে, নজরুলের স্থান পাঠ্য তালিকায় এতোটাই কম যে, তাকে না পড়েও বাংলা সাহিত্যে এম, এ পাস করা সম্ভব। নজরুলের নামে আলাদা কোন পত্র তো নেই-ই; বরং অন্য দশজন সাধারণ কবির সঙ্গে কোন রকমে বাংলা সাহিত্যের সিলেবাসের এক কোণায় সামান্য একটু ঠাঁই পেয়েছেন তিনি। এ নিয়ে ১৯৯৪-৯৫ তে দেশের একটি অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠন নজরুল মাজারে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে, সেমিনার করেছে। মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। তারপরও আবশ্যিক সিলেবাসে নজরুলের ঠাঁই হয়নি।

নজরুলকে পড়ানো হচ্ছে না। পড়তে দেয় হচ্ছে না। অথচ কতো ঢাক ঢাক গুড় গুড় তার নামে। সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'নজরুল চেয়ার। রয়েছেন একজন করে নজরুল অধ্যাপক। যথেষ্ট সম্মানীও তাঁদের দেয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে একটি করে নজরুল গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার। আশ্চর্য, দেশের মানুষ নজরুল চর্চার বান ডেকেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। অথচ বাস্তবে ঘটেছে উল্টোটি, এই প্রহসন কি জন্য? কেন এই ধাপ্পাবাজী?

আবার এক শ্রেণীর কাণ্ডজ্ঞানহীন স্টাণ্ডবাজ শিক্ষক আছেন, যারা গণমানুষের জন্য এন্তার আহা উহু করেন। অথচ গণমানুষের কবি নজরুলকে তাচ্ছিল্য করাই হলো তাদের জীবনের ব্রত। এই বৈপরিত্যের কারণে, যে ছেলেটিকে পাঠানো হচ্ছে নিজ দেশের সাহিত্য পড়তে, সে ছেলেটি নিজ দেশের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কবির প্রতি অবজ্ঞা দেখানোর অসুখ বুকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হলো, বহু দিনের আকাংখা ছিলো এদেশের মানুষের। কিছু কাজ যে সেখান থেকে হয়নি, তা নয়। কিন্তু তা প্রত্যাশার তুলনায় সামান্য। এই সামান্যের মধ্যেও রয়েছে ফাঁকি। নজরুলের নিজের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে কোথায় যেন একটা বিমুখতা এর কর্মকর্তাদের। এই কর্মকর্তাদের সিংহভাগ আবার নজরুল সম্পর্কে সারা জীবনে ২০ পাতাও লিখেছেন কি-না সন্দেহ। এরা নজরুলের উপর লেখা অন্যদের

www.pathagar.com

বই প্রকাশের বিষয়ের অধিক উৎসাহী। আরও যেটা অবাক হওয়ার, তা হলো,নজরুল ইনষ্টিটিউট থেকে নজরুলের উপর লেখা বইয়ের ভূমিকা লিখতে, এই প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের কেউ কেউ সচতুরভাবে কবিকে খাটো করার কাজটি ভালোই চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহই জানেন এর অন্তর্নিহিত রহস্য।

বাংলা একাডেমীর কল্যাণে নজরুল রচনাবলী দীর্ঘদিন ছিলো পাঠকের নাগালের বাইরে। নজরুল গবেষণার ক্ষেত্রেও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিতে নানা গড়িমসি। এখন সে দূরত্ব কিছুটা কমলেও রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ না থাকার ফলে পাঠক যে তিমিরে ছিলো, সেখানেই পড়ে আছেন। অথচ লক্ষ লক্ষ নজরুল রচনাবলী দেশময় বিতরণ করা উচিৎ ছিলো তাদের।

নজরুল স্মৃতি উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বাংলা একাডেমীর বর্ধমান হাউজের দোতলায় বেশ কিছু উজ্জ্বল সময় কাটিয়ে গেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ভাষা শহীদের রক্তে গড়া বাংলা একাডেমী, বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর একাডেমী চত্বরে বসে দেশের বৃহত্তম বইমেলা। সব মিলিয়ে দেশ-দেশান্তর থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর এখানে আসেন। অথচ এতোবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে স্বাধীনতা লাভের ২৫ বছর পরও তারা রয়ে গেলেন বঞ্চিত। তারা বাংলা একাডেমীতে আসেন, এই আসাটা আরো তাৎপর্যমণ্ডিত করার জন্য, বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ নজরুল কক্ষটিকে 'নজরুল স্মৃতি কক্ষ' নাম দিয়ে একটা ছোট-খাটো মিউজিয়াম করতে পারতেন। যা হতে পারতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির পরম শ্লাঘার বিষয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনে এই বিষয়টির উপর পর পর দুইটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। সে সময়কার মহাপরিচালক বিষয়টিকে পাত্তাই দিতে চাননি। পরবর্তী মহাপরিচালকের সময় অবশ্য একটা টিনের পাতে কক্ষটির দরোজায় লেখা দেখেছিলাম 'নজরুল স্মৃতি কক্ষ'। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

বাংলা ভাষাভাষী কবি-লেখকদের মধ্যে [মুসলমানদের মধ্যে তো বটেই] সার্বিক অর্থে প্রথম চলচ্চিত্রকার কাজী নজরুল ইসলাম। চলচ্চিত্রের প্রায় প্রতিটি শাখায়ই তিনি রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার অম্লান ছাপ। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারী চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার কোথাও তার ন্যূনতম স্বীকৃতিটুকুও নেই। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের তালিকায় 'দাদা সাহেব ফালকে'র মতো করে প্রবর্তিত হয়নি সম্মান সূচক 'নজরুল পুরস্কার'।

জাতীয় প্রেসক্লাবের হলরুমে, সংবাদপত্র শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন, এমন দেশবরেণ্য সাংবাদিক ব্যক্তিত্বের ছবি টানানো আছে। তাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর জন্য। এঁদের মধ্যে এমন অনেকের ছবি আছে, যাঁরা নজরুলের হাত ধরে সাংবাদিকতা শিখেছেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার, মানবকল্যাণধর্মী রাজনৈতিক সাংবাদিকতার জনক, সংবাদপত্রের পাতায় অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক, সাংবাদিকতার জন্য কারাবরণকারী প্রথম বাংলাভাষী সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব কাজী নজরুল ইসলামের ছবি সেই কাতারে নেই।

www.pathagar.com

মহানগরী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের চত্বরে জাতীয় কবির মাজার। কিন্তু সদর রাস্তা থেকে মাজারে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এক যুগ হলো। মাজারের প্রবেশ মুখে নির্মিত হয়নি কোন তোরণ। নেই কোন পরিচিতিমূলক নাম ফলক। কবরের উপর প্রস্তাবিত স্মৃতিসৌধের কোন খবর নেই। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ঢাকা শহরের দর্শনীয় স্থানের তালিকায় নজরুলের কবরের স্থান হয়নি। ফলে দেশের বাইরে থেকে যারা আসছেন তারা জানতেও পারছেন না— কোথায় নজরুল ইসলাম।

রেডিও টেলিভিশনে নজরুল সঙ্গীতের অবস্থা এখন সঙ্গীন। দায়সারাভাবে আজও নজরুল সঙ্গীত প্রচার হয় বটে, কিন্তু তাতে কোন প্রাণ নেই। মমতার ছোঁয়া নেই। যেন-তেন প্রকার দায়িত্ব পালন চলছে। টিভি নাটকে নজরুল সঙ্গীত অস্পৃশ্য। আগে রেডিওতে সকাল ৭টায় এবং ৯টার খবরের পর নিয়মিত নজরুল সঙ্গীত প্রচার হতো। এখন গুরুত্বপূর্ণ সকল সময় থেকে নজরুল নির্বাসিত। টিভিতে নজরুলের নিজের নাটক প্রচার না করে, তাঁর গল্প থেকে কদাকারভাবে নাট্যরূপ দিয়ে অনুগ্রহভাজন লোকদের দিয়ে রেকর্ড করে অত:পর প্রচার করা হয়।

আমরা বার বার ভুলে যাই আমাদের কর্তব্যের কথা। আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব। এজন্যই আমাদের ভুলের ফাঁক ফোকর দিয়ে বার বার ঢুকে পড়ে দূষণ। আমরা হয়ে পড়ি শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন। হয়ে পড়ি বিভ্রান্ত। নিজ বাসভূম তখন আমাদের জন্য পরবাস হয়ে পড়ে। অথচ ইংরেজরা পৃথিবীর যে প্রান্তে গিয়েছে, সেখানেই নিয়ে গেছে শেক্সপিয়ারকে। জার্মানরা গ্যাটেকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বময়। রুশরা গোটা দুনিয়ায় ফেরী করে ফিরেছে পুশকিন, টলস্টয় আর গোর্কীদের। চীনারা মাওবাদের পাশে পাশে ধারণ করেছে লু স্যুনকে, যেভাবে ইরানীরা বয়ে বেড়ায় ফেরদৌসী. হাফিজ আর রুমির উত্তরাধিকার। ভারতের কথাও বলা যেতে পারে, পৃথিবীর যেখানে যতটি দূতাবাস তাদের আছে, ততোগুণ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তারা দাঁড় করিয়েছে সেখানে। শুধু আমাদের দূতাবাস আমাদের জাতীয় কবির ব্যাপারে নীরব নি:শব্দ। জাপান, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য তথা বিশ্বের যেখানেই গিয়েছি, দেখেছি, জাতীয় কবির রচনাবলী, ছবি তারা অন্যদের বিতরণ করবে কোত্থেকে–দূতাবাসের নিজস্ব সংগ্রহেই নজরুলের অস্তিত্ব নেই। কদিন আগে তুরস্কের কবি ইয়েমিন আগাউলু এসেছিলেন বাংলাদেশে। তিনি একজন কবি হয়েও আজ অবধি জানেনা না, তাদের আতাতুর্কের নামে মানবরচিত ভাষায় সবচেয়ে মূল্যবান সুন্দরতম কবিতাটির জনক বাংলাদেশের কাজী নজরুল ইসলাম। আমার ফরাসী সাংবাদিক বন্ধু অঁদ্রে নাইজেল প্যারিসের পথে হাঁটতে হাঁটতে বার বার আমাকে বলেছে, তুমি যে কবির কথা আমাকে শোনালে, তার কবিতা অনুবাদ করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দাও না কেন? তোমাদের দূতাবাসগুলো করে কি? তারা নজরুল জন্মবার্ষিকী পালনের মাধ্যমেও তো আমাদের জানাতে পারে তাঁর কথা।

www.pathagar.com

এতোক্ষণ যা বললাম এর সব কিছু নিয়ে আমার পরিকল্পিত ও উপস্থাপিত, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'কথামালায়' ৫টি অনুষ্ঠান প্রচার করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাসে নজরুল নিয়ে করেছি দু'টি অনুষ্ঠান। ওই সব অনুষ্ঠানে 'নজরুল অধ্যাপক' থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত অনেকেই অংশ নিয়েছেন। নজরুলের মাজারের বাইরে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছি বিভিন্ন বয়সী পথচারীদের। পাশেই মাজার থাকা সত্ত্বেও এদের অধিকাংশ বলতে পারেননি, এটা কার মাজার। এটা ওই সব পথচারীদের দোষ নয়। দোষ অন্যদের। যারা জাতিকে জানতে দেয়নি।

অনেক ক্ষোভ, দু:খ এবং প্রতারণার অজানা কাহিনী আমরা পৌঁছে দিয়েছি এদেশের মানুষের ঘরে ঘরে। সে-সব অনুষ্ঠান দেখে শত শত দর্শক-শ্রোতা চোখের পানি ফেলেছেন। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। অনেকে জানিয়েছেন প্রাণকাড়া অভিনন্দন। বলেছেন, এই সব অদ্ভুত অসঙ্গতির কারণ কি? কবে হবে অবিমৃশ্যকারিতার অবসান? কবে হবে কেউ জানে না। কিন্তু লাভ কি হলো? যারা এগিয়ে এলে সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটতো, তারা তো এলেন না।

সব কিছু দেখে শুনে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, নজরুলকে নিয়ে আগাগোড়াই একটা গভীর ষড়যন্ত্র এদেশে আছে। আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় অগ্রগতি এবং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদের পক্ষ নিয়ে, দেশের অভ্যন্তরে যে চক্রটি কাজ করছে, তারা যে নজরুলের সংস্পর্শ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাচ্ছে, সে তো বুঝি। কিন্তু নজরুল চর্চার জন্য যাদের পাঠানো হচ্ছে তারা কেন 'বাঘ' হয়ে ঢুকে 'বিড়াল' হয়ে বেরিয়ে আসছেন? এর অন্তর্নিহিত কারণটুকু আজও অজানাই রয়ে গেলো। আর সে জন্যই ১২ কোটি মানুষের এতো আগ্রহ, এতো ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও পাঠক পাচ্ছে না তাঁর বই। হাতে গোণা কয়েকটি অতি বিখ্যাত কবিতার বাইরে পুরো নজরুল থেকে যাচ্ছেন অপাঠ্য। যে স্মৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারতো নয়নাভিরাম সৌধ, হতে পারতো অনন্যসাধারণ তীর্থ, যে সমুদ্রে অবগাহন করে আমরা হতে পারতাম সত্যিকার অর্থেই আত্মস্থ এবং পরিপূর্ণ মানুষ। —সেখানে এখন ঝোপ আর জঙ্গল। আর অবাঞ্ছিত পরিত্যক্ত ভিটেমাটিতে জঙ্গল সরিয়ে জ্বলে উঠছে 'প্রদীপ'।

কবে এই জটিলতা ভেদ করে মুক্ত চোখে আকাশ দেখবো আমরা, জানি না।

www.pathagar.com

তরুণ রাশিয়ার চোখে নজরুল

বিশ্বজিৎ রায়

মস্কোর যানবাহনের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে মেট্রো। ভূগর্ভস্থ রেলগাড়ির এই নামটি ফরাসী দেশ থেকে আমদানী, কারণ ফরাসীরাই উক্ত বস্তুর আবিষ্কারক। এ-ক্ষেত্রে গুরুর চেয়ে শিষ্য দড়। প্যারিসের তুলনায় মস্কোর মেট্রো অনেক বেশী পরিষ্কার, নয়নাভিরাম, আরামপ্রদ। বাংলা ভাষায় যাকে বলে আপিস-টাইম, সেই সময়ে প্রায় প্রতিমিনিটে একটি করে ঝকঝকে বৈদ্যুতিক ট্রেন এসে দাঁড়ায় স্টেশনে। আর স্টেশনও মস্কোর প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলের জন্যেই নির্মিত। সুতরাং পানের আসরে ভোদকার মতো, তরকারির বেলায় বাঁধাকপি আর আলুর মতো, যানবাহনের ক্ষেত্রেই মেট্রোই হচ্ছে মস্কোবাসীদের প্রধান অবলম্বন। এই মেট্রোর গাড়ীতে উঠলে প্রথম যে দৃশ্যটি চোখে পড়বে তা হচ্ছে গাড়ীর এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পড়ুয়ার দল। চলন্ত গাড়ীর আওয়াজের মধ্যে আলাপ তেমন সুবিধের নয়, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে গাড়ী থেকে দেখবার মতো বহির্দৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব, গাড়ীর ভেতরে পুরু রুমালের ঘোমটা কিংবা কান ঢাকা টুপি এবং ওভারকোটের পেছনে লুপ্ত নর এবং বিশেষত নারীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপের দ্বারা অবসর বিনোদনের চেষ্টাও নিরর্থক। সুতরাং একমাত্র উপায় হচ্ছে বই-পড়া।

হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের সীটের মেয়েটির হাতে কবিতার বই। তিরস্কৃত অথবা পুরস্কৃত কোন কবি তরুণীটির মনোযোগের বস্তু, সে কৌতূহল নিরসনের বাসনা দুর্বার হয়ে উঠলো। এ-দেশে অপরিচয়কে বাধা বলে গণ্য করা হয় না, বিশেষত বিদেশী সম্পর্কে। উপরন্ত আমি শুধু বিদেশী নই, ভারতীয়। সুতরাং 'মাপ করবেন' বলে আলাপ করে কবিতার বইটি হস্তগত করতে বিলম্ব হয় না। না, লেখক তিরস্কৃত-গোত্রের নন, বরঞ্চ উল্টো পক্ষের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ কবিতার বইটি আর কারো নয়- স্বয়ং নজরুল ইসলামের। আধুনিক বিদেশী কাব্য সিরিজের ছোট একটি চটি বই, ইয়েভগেনি চেলিশেভ্ লিখিত ভূমিকা সহ প্রায় আশি পাতা হবে। বই-এর শেষে আবার শব্দটিকাও

www.pathagar.com

দেওয়া আছে। কালো জমির উপরে টকটকে লাল আর কড়া গেরুয়া রঙের অগ্নিশিখার নক্‌শা। ডানপাশে সাদা হরফে লেখা নজরুল ইসলামের নির্বাচিত কবিতা সঙ্কলিত। এ সঙ্কলনে গীতিকবি নজরুলের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না, দেখা মেলে কোন বিদ্রোহী কবির। প্রথম কবিতাটিই হচ্ছে 'বিদ্রোহী' তারপর 'সত্যকবি' 'আমার কৈফিয়ৎ, যৌবন জলতরঙ্গ', 'ছাত্রদলের গান', 'কুলি-মজুর', 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ', 'অগ্রপথিক', 'মানুষ', 'ফরিয়াদ', 'পাপ', 'নারী', 'বারাঙ্গনা', এবং 'অনামিকা'। তা ছাড়া দু'টি সুপরিচিত নজরুল গীতি 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' আর 'চল, চল্ চল্' এর অন্তর্গত। অনুবাদক: মিখাইল কুর্‌গানৎমিয়েভ এবং সম্পাদক: পাভেল ঝিয়েলিয়েজনোভ্। একটি নাম কিন্তু উল্লিখিত হয়নি, যদিও তাঁর ভূমিকা সম্ভবত সবচেয়ে প্রধান। নামটি হচ্ছে বরিস পোলিয়ানস্কি। এর ভূমিকা বোঝা যাবে বিদেশী কাব্যের রুশভাষায় অনুবাদের প্রচলিত পদ্ধতিটি জানলে।

কবি হিসেবে যিনি সিদ্ধহস্ত তাঁকে সব সময় কাব্যানুবাদে ব্যাপৃত হতে দেখা যায় না। কারণ বোধ হয় বাঙ্গালী কবিদের বাদ দিলে সাধারণত নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য দেশের ভাষার অনুশীলন কবিরা বড় একটা করেন না। অথচ কবিতার অনুবাদ সুদক্ষ কবি ছাড়া আর কে করবেন? এই সমস্যার সমাধান সোভিয়েট দেশে করা হয়ে থাকে যেভাবে তা এই রকম:

বাংলা কোন কবিতার অনুবাদের সময় বাংলা ভাষাভিজ্ঞ কোন রুশ বাংলা থেকে কবিতাটির রুশ ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির মিল এবং ছন্দের গঠনটি বর্ণনা করে দেন। তারপর ঐ উপাদান থেকে রুশভাষায় কবিতা রচনার ভার পড়ে কোন কবির উপরে। তিনি বাংলা কবিতাটির মিল ছন্দ প্রভৃতি রূপগত গঠন এবং অর্থের যথার্থ বজায় রেখে কবিতাটিকে রুশ কবিতা হিসাবে পূর্ণ সৃষ্টির চেষ্ট করেন। এই পদ্ধতি অনেক সময় বেশ ভাল ফল দেয়। কিন্তু অর্থগত অনুবাদের ক্রটির জন্যেই হোক বা কবিতার রূপগত গঠনের বোঝার মধ্যে ফাঁক থেকে যাওয়ার জন্যেই হোক, অথবা কবির নৈপুণ্যের অভাবজনিত কারণেও, মাঝে মাঝে অনুবাদে ভরাডুবিও হয়ে থাকে। সে যাই হোক, নজরুলের কবিতা ক'টির নির্বাচন এবং তাদের অর্থগত অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বরিস পোলিয়ানস্কি। তারপর কাব্যানুবাদ করেছেন পূর্বোক্ত মিখাইল কুরগানৎমিয়েভ নামে এক নাতিপরিচিত কবি। পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ ভূমিকাতে ইয়েভগানি চেলিশেভ অপ্রত্যাশিত কিছু লেখেননি। তিনি সোভিয়েট পাঠকদের কাছে নজরুলের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে:

ভারতের শোষিত জনগণ উপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে যখন মুক্তির জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল তখন তাদের সংগ্রামে স্বদেশ প্রেমাত্মক কবিতা আর গান পরিণত হয়ে উঠেছিল 'বোমা আর পতাকায়' —এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের ভূমিকা। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের আবির্ভাবের সময় ছিল বাংলা সাহিত্যের দ্রুত সমৃদ্ধির যুগ।

www.pathagar.com

কিন্তু নজরুলের স্বকীয়তা তাঁকে প্রথম থেকেই বিশিষ্ট করেছিল। তাঁর কাব্যের নানা অগ্নিবর্ষী অংশ শোনা যেত বিভিন্ন জনসভায়। শোষণ ও অনাচাররের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহের আহ্বান এবং জীবনের আর মানুষের জয়গান নজরুলের কাব্যকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ কবি ওমর খৈয়াম, হাফিজ, মহম্মদ ইকবাল এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন বন্দনা আশাবাদ এবং মানবতাবাদের ধারায় পুষ্ট। তাঁদের সার্থক উত্তরসূরী হচ্ছেন রোমান্টিক গীতিকবি নজরুল ইসলাম। রুশ পাঠক নজরুলকে চেনে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে জানে, তাই রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কতটা স্নেহ করতেন সে বিষয়টি চেলিশেভ্ উত্থাপন করেছেন ভূমিকার শেষে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় চেলিশেভ যখন ভারতে ছিলেন তখন একদা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের মুখে রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনামূলক বসন্তের গান শুনতে শুনতে তিনি এক বাঙ্গালী লেখকের কাছ থেকে জানতে পারেন যে উক্ত গানগুলি রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলামকেই উৎসর্গ করেছিলেন। সবশেষে চেলিশেভ কলকাতায় তাঁর নজরুল দর্শনের অভিজ্ঞতার সহৃদয় বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কাজী অনিরুদ্ধর বাংলা সংগীত জগতে খ্যাতির কথাও উল্লেখ করেছেন। চেলিশেভ্ দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, নজরুল আজ জানতেও পারছেন না যে ভারত ও পাকিস্তান কত এগিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের মুক্তি সংগ্রাম কত জয়যুক্ত হচ্ছে।

বইটির শেষে কিছু শব্দের টিকা দেওয়া হয়েছে। তার অধিকাংশই হচ্ছে দেবদেবীদের নাম সম্পর্কে। যেমন শিবকে বোঝানো হয়েছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তিন প্রধান দেবতার অন্যতম বলে। সিঁদুর, যবন, কাফের শব্দগুলিরও টিকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতি শনিবারই চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি, হাঁড়ি চাঁচা'।" —এই পংক্তির মধ্যে যে পত্রিকার কথা ও বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন তা অনুবাদকের কাছে বোধ করি সুস্পষ্ট ছিল না। তাই এর অনুবাদ করা হয়েছে 'আমার প্রিয়া আমাকে চিঠি লিখে গাল দেন।' ভুল হয়েছে 'সত্য কবি' অনুবাদেও। এটি যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে লিখিত তার কোন উল্লেখ টীকাতে করা হয়নি এবং অনুবাদে বিষয়টি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। নজরুলের এই চটি বইয়ের প্রশংসনীয় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে যে সব ত্রুটি জড়িত থাকতে দেখা গেল তাতে ভয় হয় তাঁর সাহিত্যকর্মের বিপুল পরিধির অনুবাদ হলে তার কি ফল দাঁড়াবে।

জনমত কী বইটি সম্বন্ধে? আবার সেই মেত্রোর তরুণীটির কাছে ফিরে আসা যাক। আমি নজরুল ইসলামের দেশবাসী শুনে এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে নিজের মত তিনি সানন্দে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর অভিমত মোটামুটি এইঃ

এই রকম বিপ্লবী ভারতীয় কবি এই প্রথম পড়লাম। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা জানি, এই আন্দোলনের দর্শনের বিষয়েও পড়েছি। কিন্তু বিপ্লবী ভারতীয় কবিতা এই প্রথম। বইটির পরিধি বড় নয়, কিন্তু এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে পরাধীনতার গ্লানি আর স্বাধীনতার আকাঙ্খায় অতি পরিচিত ছবি। সে যুগের ভারতীয়দের নাড়ি স্পন্দন অনুভব করা যায়। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, অসম অবস্থার

www.pathagar.com

প্রতি প্রতিক্রিয়া সব দেশে একই রকম হয়। আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি আর বিশেষত ম্যাক্সিম গোর্কির কথা মনে পড়ছে এই কবিতাগুলি পড়তে পড়তে। গোর্কি মানুষকে এই রকম সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। গোর্কির 'পেস্‌নি সোকলের' (স্বাধীনতাকামী পাখীর গান) আর 'পেস্‌নি বোরিয়েভেজ্‌নিকের' (ঝড়ের সঙ্কেতকারী সামুদ্রিক পাখীর গান) সঙ্গে এই কবিতাগুলো তুলনীয়। অবশ্য গোর্কির লেখা গদ্যে। তার সে গদ্য ছন্দময়, রোমান্টিক।
পাকাচুলের রঙ্গের ফেনিল ঢেউ বিরাট সমুদ্রের বুকে। ঝড়ের সঙেকতবহ হাওয়া কালো মেঘকে দিচ্ছে হটিয়ে। এই হাওয়া আর ঢেউয়ের মাঝখানে উড়ছে গর্বিত বোরিয়েভেজনিকের। লেখক বলছেন ঝড় আসুক। পাখীর ডাকে সবাই আগামী দিনের আনন্দধ্বনি যেন শুনতে পান। গোর্কি এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জেগে ওঠা আর বিপ্লবকে এগিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর এসব লেখা ১৯০৩-১৯০৫ এর সময়ের; মানুষ কথাটি যে মহাগর্বের বস্তু সে বোধ হয় এই রচনায় প্রকাশিত। নজরুলের কবিতা মায়াকোভস্কি আর গোর্কির কথা মনে করিয়ে দেয় কেন এবার তা বোধ হয় বোঝা যাবে। এই বইয়ের লিরিক বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা কম। অধিকাংশই বিপ্লবাত্মক কবিতা। প্রথম কবিতাটি:

গভারী চেলোভেক্
স্ গর্‌দো পদিয়াতেই গলভোই।

'বল বীর, চির উন্নত মম শির।' এ যেনো মানুষ সম্বন্ধে স্তোত্র। আমাদের ইতিহাস থেকে আমরাও জেনেছি যে, বিপ্লবী-কাল বিপ্লব সম্বন্ধে লেখার প্রেরণা দেয় কবিদের। কিন্তু বিপ্লবের অনুপ্রেরণা ছাড়াও কবির নিজস্ব প্রতিভা না থাকলে কাব্য সার্থক হয় না। কী বললেন, নজরুল সম্বন্ধে কিছু বাঙ্গালী সমালোচকের ধারণা কবিতা লেখা সম্বন্ধে নজরুল knows no rule ? তাতো মনে হয় না। কাব্যের রূপগত উৎকর্ষের দিক দিয়েও তো নজরুলকে খুব ভালই লাগলো। অবশ্য অনুবাদে এসব পারদর্শিতা অনেকটাই হারিয়ে যায়। তবুও অনুবাদককে বাহবা দিতে হয়। কেননা, এই কাব্যের অন্তর্নিহিত ভারতীয় চরিত্রটি বেশ ফুটে উঠেছে। এই প্রথম কবিতাটির 'বল বীর' এই Lait motif টা যেন একটা গানের মত শোনায়। 'যৌবন জলতরঙ্গ' কবিতাটি চিত্ররূপময় অথচ বিপ্লবাত্মক। এর মধ্যে কত যে ছবি। প্রতীকীরূপের ছাপ আছে মনে হয়। 'ছাত্রদল' কবিতাটিতে কবি যদিও বলেছেন ভারতের যুবকদের কথা কিন্তু এ-যেন নির্যাতিত সব জাতির যুবকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। আজকের দিনেও এ কবিতার প্রয়োজন ফুরোয়নি। 'চল্ চল্ চল্' –এ নিশ্চয়ই গান। আমাদের দেশেও এ রকম গান আছে। কিন্তু এর উপমা আর চিত্রকল্প এ ধরনের গানের পক্ষে আশ্চর্যজনক। নজরুল যে মানুষকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন এবং সাম্যের লড়াইয়ে সবাইকে ডাক দিয়েছেন– এই দুটি গুণ তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য 'নারী' আমার পছন্দসই লেখা। ছোট বই, অতএব বিরুদ্ধে বলার

www.pathagar.com

মতো বিশেষ কিছু খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের পরিবেশে এই এক নতুন সুর শুনলাম। ভারতের কিছু প্রেমের এবং প্রধানত ধর্মমূলক দার্শনিক কবিতাই পড়েছি। কিন্তু এর ধরনটাই আলাদা। আর স্বাদও আলাদা। এ রকম বিপ্লবাত্মক বা সামাজিক কবিতার আবেদন আজকাল আমাদের দেশের আধুনিক সমাজে কীরকম? আমাদের যেসব কবিতা আজকাল জনপ্রিয় তার মধ্যে যুবকদের প্রতি আহ্বানমূলক কবিতাও আছে, আবার একেবারে খাস লিরিকও আছে। আধুনিক কবিরা কেন সামাজিক কবিতা লিখতে চাইবেন না? রবেৎ রজদেস্তভেনস্কি তো এই ধরনের একজন আধুনিক কবি। কিন্তু তিনি তো লিখছেন 'ত্রিশ শতাব্দীর চিঠি' বলে সামাজিক কবিতা। তাঁর মতো আরেকজন ভজনিসিয়েনস্কি 'লেনিন, বিপ্লব ও আমি' নামে যে কবিতাটি লিখছেন তার সম্বন্ধে মন্তব্য তো এখন থেকেই বেরোতে শুরু করেছে। আর উপরোক্ত কবিদ্বয় যার সঙ্গে একত্রে পার্টি কর্তৃক নিন্দিত হবার জন্য পশ্চিমে খ্যাতি অর্জন করেছেন সেই ইয়েবগেনি ইয়েভতুশেঙ্কোও তো এখন যে বিষয় নিয়ে কবিতা লিখছেন তা হচ্ছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। নজরুল অবশ্য এদের তুলনায় অনাধুনিক। কিন্তু এ বই আমার মত অনেককেই মুগ্ধ করবে। অন্তত হাজার পনেরো কপি নিশ্চয়ই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সব তো উজাড়।

মাথরুন নবীন চন্দ্র উচ্চ ইংরেজী স্কুল বা ইন্সটিটিউট। নজরুল ১৯১১-১২ সালে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন

www.pathagar.com

জাপানে নজরুলচর্চা

কিওকো নিওয়া

জাপানে নজরুলচর্চা এখন শুরু হয়েছে বা এখনও শুরু হয় নি বললেও চলে। নজরুলচর্চা সম্পর্কে কিছু কথা বলার আগে জাপানে বাংলা সাহিত্যচর্চা নিয়ে কিছু বলা যাক।

জাপানে এখনও সাধারণ লোকের মধ্যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই জানা আছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেই জাপানে তাঁর পরিচয় শুরু হয়। গত ১০০ বছর ধরে জাপান সব সময় পশ্চিমমুখী ছিল বলতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু হয়েছে। তার কারণ তিনি পশ্চিমা দেশে শ্রেষ্ঠ কবি রূপে সমাদৃত। তখন জাপানে এমন কেউ ছিল না বাংলা ভাষা বুঝতে পারে এবং অনুবাদ করতে পারে। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের সব রচনার অনুবাদ করা হয়েছিল ইংরেজী থেকে। এখন সেই প্রথম পরিচয়ের আশি বছরের পরে জাপানে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বেরিয়েছে আর তার বেশীর ভাগ বাংলা ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু জাপানে রবীন্দ্রচর্চা বা গবেষণা চলছে কি না বলা মুশকিল। আমাদের দেশে বাংলা সাহিত্যের গবেষক খুব কম, আর শুধুমাত্র ভাষার দিক থেকেও আরও অনেক কিছু করার আছে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জাপানে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় শুধুমাত্র চার. পাঁচ বছরের আগে থেকে শুরু হয়েছে। সব চেয়ে প্রথমে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র অনুবাদ করা হয়। তারপর মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুচ্ছ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুচ্ছ আর জীবনানন্দ দাশের "রূপসী বাংলা"-র অনুবাদ বেরিয়েছে। এগুলো সব বাংলা ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে আর অনুবাদের ভাষা বা মান মোটামুটি ভাল বলা যায়।

অবশেষে নজরুল। নজরুলের অনুবাদ আমি নিজেই করেছি আর দু'এক মাসের মধ্যেই বইটা প্রকাশিত হবে।* অনুবাদ করতে করতে আমি চেষ্টা করেছি, নানা জায়গায়

---

* এতদিনে বইটি সম্ভবত: প্রকাশ হ'য়ে থাকবে। আমরা এ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর পাই নি। —স

www.pathagar.com

নজরুলের পরিচয় দিতে। কারণ জাপানে সাধারণ পাঠক বা সম্পাদকেরা নজরুলের নামটা আগে শোনে নি আর গবেষকদের মধ্যেই মাত্র নজরুলের নামও জানা ছিল।

আমি আগেই বলেছি যে অনেক দিন ধরে জাপানে বাংলা সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ছিল। জাপানের পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যরূপে অভ্যস্ত। তাদের ধারণায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য বা বাংলা কাব্য নিবেদিত চিত্র এবং পেলব। তাই তারা নজরুলের রচনায় একদম আলাদা সুর দেখে আশ্চর্য হয়েছে।

অন্যদিকে ভারতের নানা বিষয়ের গবেষকেরাও নজরুলের জীবন-কাহিনী অথবা নজরুল রচনার ঐতিহাসিক ভূমিকায় বেশ কৌতূহল দেখিয়েছেন। যেমন ধরুন, "আমার কৈফিয়ৎ" পড়লে তখনকার নজরুলের সাহিত্যিক জীবন বা তিনি সাহিত্যিক সমাজে কি ধরনের সমস্যায় পড়েছিলেন, তা বোঝা যায়। অথবা "সাম্যবাদী" কাব্যসংগ্রহ বা "লাঙল" পত্রিকা দিয়ে নজরুলের রাজনীতিক ধারণাও জানতে পারে। "বিদ্রোহী" ও বেশির ভাগ কবিতাই রাজনীতিক দিক দিয়ে পড়া হয়। তার ফলে "বিদ্রোহী" কবিতাকে ইংরেজ শাসনের বিরোধী কবিতা হিসেবে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে।

কিন্তু আপনারা সবাই ভালভাবে জানেন যে বিদ্রোহী কবিতার মূল্য শুধুমাত্র সেই কারণে যে, তা নয়। 'বিদ্রোহী'র ঐতিহাসিক মূল্য আছে বটে, কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতার আবেগ এখনও জীবিত। "বিদ্রোহী"-তে নজরুল শুধু সেই সময়ের এক ব্যক্তির চিন্তা ধারণা প্রকাশ করেননি, "বিদ্রোহী"-তে তিনি সব যুগের—অতীতের বা ভবিষ্যতের, সব মানুষের গৌরব বা মহিমার কথা ঘোষণা করেন। তাই এই বিখ্যাত কবিতা এখনও শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা বা ভূমিকা না জানলেও আমাদের পাঠকেরা নজরুলের এই আবেগ বুঝতে পারবে। নানা জায়গায় বার বার "বিদ্রোহী"র জাপানী অনুবাদ আবৃত্তি করতে করতে আমি বিশ্বাস করে ফেলেছি যে নজরুলের সৃষ্টির দেশের সীমা, ভাষার সীমা অথবা সময়ের সীমাও পার হওয়ার শক্তি রয়েছে। আর সেই শক্তি একজন কবির, একজন ব্যক্তি নজরুলেরই।

আরও দৃষ্টান্ত দিই। "বিদ্রোহী", "সাম্যবাদী", "বারাঙ্গনা"-র মতন কবিতাতে নানা দেব-দেবী, পৌরাণিক কাহিনী থেকে উদ্ধৃত করা চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্যই এ সব কবিতায় হিন্দু দেব-দেবীর নাম নজরুল ব্যক্ত করায় তখন অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু নজরুলের পক্ষে সেগুলো শুধু নিজের কাব্য প্রকাশের প্রতীক মাত্র ছিল। তাই একটু ব্যাখ্যা দিলে সে সব পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্র না জানলেও জাপানী পাঠকেরাও সহজেই বুঝতে পারে যে নজরুল কি বলতে চাইছিলেন।

নজরুল তাঁর রচনায় মানুষের কথা বলেছেন। তিনি শুধু বাঙালীর সুখ দুঃখ, জীবনের বেদনা ও সমস্যা অথবা বাংলা সমাজের অসাম্যতা ব্যক্ত করতে চাইছিলেন, তা নয়। নজরুল ব্যক্ত করেছেন সাধারণ মানুষের সুখ এবং দুঃখ যা সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে দেখা যায়। তার মানে নজরুল সত্যিকারের আন্তর্জাতিক কবি ছিলেন আর সেই জন্যে আমি বিশেষ

www.pathagar.com

করে নজরুলের জাপানী সাহিত্যপ্রেমীর সামনে পেশ করতে চাই। নজরুল বিশ্বের সব মানুষের উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন, কিন্তু নজরুলের কবিতায় আমি তীক্ষ্ণ "আমি"-র চেতনায়ও অভিভূত হই। "বিদ্রোহী" ঠিক এই কারণেও তখনকার সাহিত্য সমাজে আদৃত হয়েছে মনে হয়। বিশ্ব-সাহিত্যের দিক থেকেও নজরুলের এই চেতনা খুব আধুনিক আর সেই জন্যে এই কবিতা পড়তে পড়তে আমাদের মধ্যেও আগ্রহ জাগে। নজরুলের এই বৈশিষ্ট্য আর ব্যক্তিত্ব তখনকার অন্য কোনো কবির রচনাতে আমি লক্ষ্য করি নি।

আমি এ পর্যন্ত নজরুলের আন্তর্জাতিকতা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে নজরুলের অন্তরে যা রয়েছে সেই ঐতিহ্যের দিকও ভুলে গেলে চলবে না। এখানে ঐতিহ্য মানে বাংলা সাহিত্যের ভাবনা-ধারা যে গত ১০০০ বছর ধরে চলে এসেছে। আমার মনে হয় যে এই বাংলা সাহিত্যের কাব্যধারা নজরুলের প্রেম- কবিতায় বেশী দেখা যায়। এইবার আমি কলকাতায় বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু কিছু অংশ পড়েছি আর সেই সময় নজরুলের প্রেম-কবিতা বার বার মনে পড়েছে। "চৈতী হাওয়া" বা "তুমি আমায় ভুলিয়াছ" ইত্যাদি প্রেম কবিতাতে নজরুল যে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য চেতনার অনেক মিল দেখা যায়। শুধু সৌন্দর্যের বর্ণনা কেন, আমার ধারণায় বৈষ্ণব কবিদের কবিতার আবেগ নজরুলের হৃদয়ের ভিতরেও ছিল।

আমি নিজে ফারসী পড়ি না, কিন্তু যতদূর অনুবাদে নানা বিখ্যাত ফারসী কবিদের রচনা পড়ি, নজরুলের কবিতায় সেই ফারসী কাব্যের চিন্তা-ধারাও পাওয়া যায় মনে হয়। যদিও নজরুল আন্তর্জাতিক কবি, তাহলেও তিনি বাঙালী কবিও ছিলেন। তাই এই দেশে এত বেশী লোক নজরুলকে ভালবাসে। সত্যি বলতে কি শুধু নজরুলগবেষণার মধ্যেই বিদেশী সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের অনেক উপাদান দেখতে পাবেন। আর নজরুলচর্চা এই দুই দিক, নজরুলের ব্যক্তিত্ব এবং বাঙালীত্ব, দু'দিক দিয়েই করা উচিত হবে। প্রথমে আমি বলেছি নজরুলচর্চা জাপানে এখনও শুরু হয়নি। আমরা অনেক দেরি করেই নজরুলের সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছি। সেই নজরুলের ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা সাহিত্যের কাব্যধারা যে নজরুলের রচনার মধ্যে বহন করা হয়েছে, তা এখনও জীবিত এবং মূল্যবান। তাই আমরা এই কাজে হাত দিয়েছি এবং ভবিষ্যতে আরও চর্চা করবো আশা করি।

www.pathagar.com

১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্টে কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর মরদেহের পাশে কোরআন শরীফ পাঠ করছেন কবিবন্ধু কাজী মোতাহার হোসেন

www.pathagar.com

উত্তর আমেরিকায় নজরুল চর্চা

সাজেদ কামাল

উত্তর আমেরিকায় নজরুল চর্চা প্রসঙ্গে যা প্রথমেই বলা যায়— আনন্দের সাথেই বলা যায়— তা হল উত্তর আমেরিকায় নজরুল-চর্চা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে চারটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই। সময়ের স্বল্পতার কারণে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গিয়ে কিছু কথা বা নাম অবশ্যই বাদ পড়বে— আশা করি সেটা আপনারা ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখবেন।

প্রথম ক্ষেত্র : আমি গত ৩১ বছর ধরে আমেরিকায় আছি। এ সময়কালে বাংলা কৃষ্টি-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপলক্ষে অনুষ্ঠান, সভা, সম্মেলন ইত্যাদির সংখ্যা অনেকগুণে বেড়েছে এবং এগুলোতে নজরুলের গান, কবিতা, নৃত্যনাট্য, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির সংখ্যাও বেড়েছে। এতে এটুকু ধরে নেওয়া যায় যে নজরুল আমাদের চিন্তাধারা, কর্মকাণ্ড, সুখ-দু:খের অনুভূতির সাথে কেবল দু'-এক সময়েই নয়, বরঞ্চ সারা বছরই জড়িত আছেন, চর্চা ও অনুপ্রেরণার উৎস এবং সূত্র হয়ে আছেন এবং যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র : নজরুলকে উপলক্ষ করে সভা, আসর, জয়ন্তী, মৃত্যুদিবস উদযাপন ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং যার সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েছে। যাদের প্রতি নজরুলের অফুরন্ত ভালবাসা ছিল— শিশুরাও এসব অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে যোগ দিচ্ছে।

তৃতীয় ক্ষেত্র : নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিদর্শন হল নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স, সংক্ষেপে-নজরুল সম্মেলন। প্রথম নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে নিউ জার্সিতে, 'সৌখিন' বলে একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। ১৯৯২ সালে বস্টনে দুদিন ধরে দুটি নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটির উদ্যোক্তা ছিল 'তরঙ্গ' বলে একটি প্রতিষ্ঠান এবং অপরটির, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যাণ্ড। ১৯৯৪ সালের, মে মাসে দুদিন ধরে নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যাণ্ড-এর ক্যাম্পাসে। এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ

www.pathagar.com

এসোসিয়েশন অব আমেরিকা।

সম্মেলনগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল উত্তর আমেরিকায় নজরুল-চর্চার প্রসার এবং নজরুলের বহুমুখী প্রতিভার সাথে বাঙালী-অবাঙালী সর্বক্ষেত্রের জনসাধারণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাতে বহুরকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তা সত্ত্বেও নি:সন্দেহে বলা চলে— মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্মেলনগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচিতে নজরুলের কবিতা, গান, তাঁর গান ভিত্তিক নাচ, নৃত্যনাট্য, প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি ছিল। তাতে অংশ নিয়েছিলেন আমেরিকায় বসবাসকারী কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, অনুরাগী ও গবেষক মহল। শুনতে এবং দেখতে এসেছেন বহু স্টেট থেকে উৎসাহী অতিথিবৃন্দ। এ ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকেও এসেছেন অনেকে সম্মেলনের আমন্ত্রণে। বাংলাদেশ থেকে যারা গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. রফিকুল ইসলাম, ড. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, ড. এনামুল হক, ড. আনিসুজ্জামান, কবি মোহাম্মদ রফিক, ডালিয়া নওশিন, নিয়াজ মোহাম্মদ, শবনম মুশতারী ও ফাতেমাতুজ-জোহরা। আমেরিকায় বসে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে শ্রদ্ধেয়া ফিরোজা বেগম-এর মুখে নজরুল গীতি শোনার।

১৯৯২ সালে 'তরঙ্গ' আয়োজিত সম্মেলন শেষে নজরুল সম্মেলনের উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি স্থায়ী North America Nazrul Committee গঠন করা হয়। কমিটির প্রধান কর্মসূচীতে আছে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে নজরুল সম্মেলন, নজরুল বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদিতে সহযোগিতা করা। প্রতি দুই বছর অন্তর নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ১৯৯৯ সালে নজরুলের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন করার সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ ক্ষেত্র : ব্যক্তিগত পর্যায়ে নজরুলের বহুমুখী প্রতিভার চর্চা চলছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এটার নিদর্শন পাই সম্মেলন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এবং কিছু পত্র-পত্রিকা, কনফারেন্স Commemorative Volume ইত্যাদির মাধ্যমে। নজরুলের কবিতা, আবৃত্তি, তাঁর গান, দর্শন, জীবন, তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখার অনুবাদ— প্রতিটিই চর্চার এক বিশাল ক্ষেত্র। চর্চা চলছে; এবং দেশ-বিদেশে সবদেশে—আমাদের প্রচেষ্টায় এবং একে অন্যের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে। আমরা আশা করি সেই চর্চা আরো সুষ্ঠুভাবে প্রসার লাভ করবে। আমাদের সবার সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমি আশা করি কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা আরও পরিপূর্ণভাবে সম্মান দেখাতে সক্ষম হব এবং বিশ্বক্ষেত্রে তাঁর যে মহান ভূমিকা ও অবদান রয়েছে— সেগুলোকে আমরা সুন্দরভাবে, আরো দায়িত্বপূর্ণ এবং সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব।

সম্প্রতি আমি নজরুল ইসলামের কিছু সংখ্যক কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করেছি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গেছে। আশা করি কিছু দিনের মধ্যে আমেরিকায় বইটি প্রকাশিত হবে। উল্লেখ্য একটি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল আমার বক্তব্যের সাথে

www.pathagar.com

কয়েকটি অনুবাদ পড়তে। আমি তিনটি কবিতার অনুবাদ পড়েছিলাম। অনুবাদসমূহ এখানে দেয়া। হলো নিম্নের কবিতাগুলি আমার অনুবাদ যথাক্রমে সাম্যবাদী- (Ising of Equality), কবি রাণী- (The Poet's Queen) এবং বিদ্রোহী- (The Rebel)।

২৭শে আগস্ট ১৯৯৪- কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

বস্টন নিবাসী কবি, শিল্পী, শিক্ষক, সৌরশক্তি বিশেষজ্ঞ, সাইকোথেরাপিস্ট ও অনুবাদক ডক্টর সাজেদ কামালের- The Rebel Within Us: Selected Poems of Kazi Nazrul Islam. থেকে সংকলিত।

I Sing of Equality

I sing of equality
in which dissolves
all the barriers and estrangements,
in which is united
Hindus, Buddhists, Muslims, Christians.
I Sing of equality.

Who are you?— A Parsee? A Jain? A Jew?
A Santal, a Bheel or a Garo?
A Confucian? A disciple of Charbak?
Go on— tell me what else!
Whoever you are, my friend,
whatever holy books or scriptures
you stomach or carry on your shoulder
or stuff your brains with— the Quran, the Puranas,
the Vedas, the Bible, the Tripitaka, the Zend-Avesta,
the Grantha Saheb-why do you waste your labor?
Why inject all this into your brain?
Why all this-like petty bargaining in a shop
when the roads are adorned with blossoming flowers?
Open your heart-within you lie
all the scriptures,
all the wisdom of all ages.
Within you lie all the religions,
all the prophets- your heart

www.pathagar.com

is the universal temple
of all the gods and goddesses.
Why do you search for God in Vain
within the skeletons of dead scriptures
when he smilingly resides in the privacy
of your immortal heart
I'm not lying to you, my friend.
Before this heart?
all the crowns and royalties surrender.
This heart is Neelachal, Kashi, Mathura,
Brindaban, Budh-Gaya, Jerusalem, Medina, Ka'aba.
This heart is the mosque, the temple, the church.
This is where Isiah and Moses found the truth.
in this battle field
the young flute player sang the divine Geeta.
In this pasture
the shepherds became prophets.
In this meditation chamber
Shakya Muni heard the call of the suffering humanity
and decried his throne.
In this voice
the Darling of Arabia heard his call,
from here he sang the Quran's message of equality.
What I've heard, my friend, is not a lie:
there's no temple or Ka'aba
greater than this heart!

The Poet's Queen

Your love
has made me a poet!
The beauty that you see in me
is the picture of your love for me!

The sky, the wind, the light of dawn,
the evening star, the morning sun-
they all greet me as their own.

www.pathagar.com

They too love me
because of your love for me!

In your love
my own self was hidden.
In your sudden arrival
my hope blossomed forth.
It's you within me
who plays the flute-music on my sword!
All my preparations for worship
are but offerings of your heart for me!

My messages, my laurels of victory, O my Queen—
It's all because of you!
It's your love
that has made me a poet!
The beauty that you see in me
is the picture of your love for me!

The Rebel

Proclaim, Hero,
proclaim: I raise my head high!
Before me bows down the Himalayan peaks!

Proclaim, Hero,
proclaim: Tearing through the sky,
surpassing the moon, the sun,
the planets, the stars,
piercing through the earth,
the heavens, the cosmos
and the Almighty's throne,
have I risen-I, the eternal wonder
of the Creator of the universe.
The furious Shiva shines on my forehead
like a royal medallion of victory!

Proclaim, Hero,
proclaim: My head is ever held high!

www.pathagar.com

I'm ever indomitable, arrogant and cruel,
I'm the Dance-king of the Day of the Doom,
I'm the cyclone, the destruction!
I'm the great terror, I'm the curse of the world.
I'm unstoppable,
I smash everything into pieces!
I'm unruly and lawless.
I crush under my feet
all the bonds, rules and disciplines!
I don't obey any laws.
I sink cargo-laden boats-I'm the torpedo,
I'm the dreadful floating mine.
I'm the destructive Dhurjati,
the sudden tempest of the summer.
I'm the Rebel, the Rebel son
of the Creator of the universe!

Proclaim, Hero,
proclaim: My head is ever held high!

I'm the tempest, I'm the cyclone,
I destroy everything I find in my path.
I'm the dance-loving rhythm,
I dance to my own beats.
I'm the delight of a life of freedom.
I'm Hambeer, Chhayanat, Hindol.
I move like a flash of lighting
with turns and twists.
I swing, I leap and frolic!
I do whatever my heart desires.
I embrace my enemy and wrestle with death.
I'm untamed, I'm the tempest!
I'm pestilence, dread of the earth,
I'm the terminator of all reigns of terror,
I'm ever full of burning restlessness.

Proclaim, Hero,
proclaim: My head is ever held high!

www.pathagar.com

I'm ever uncontrollable, irrepressible.
My cup of elixir is always full.
I'm the sacrificial fire,
I'm Yamadagni, the keeper
of the sacrificial fire.
I'm the sacrifice, I'm the priest,
I'm the fire itself.
I'm creation, I'm destruction,
I'm habitation, I'm the cremation ground.
I'm the end, the end of night.
I'm the son of Indrani,
with the moon in my hand and the sun on my forehead.
In one hand I hold the bamboo flute,
in the other, a trumpet of war.
I'm Shiva's blued-hued throat
from drinking poison from the ocean of pain.
I'm Byomkesh, the Ganges flows freely through my locks.

Proclaim, Hero,
proclaim: My head is ever held high!

I'm the ascetic, the minstrel,
I'm the prince, my royal garb embarasses
even the most ostentatious.
I'm Bedouin, I'm Chenghis,
I salute none but myself!
I'm thunder,
I'm the OM sound of Ishan's horn.
I'm the mighty call of Israfil's trumpet.
I'm Pinakapani's hourglass drum, trident.
the sceptre of the Lord of Justice.
I'm the Chakra and the Great Conch,
I'm the primordial sound of the Gong!
I'm the furious Durbasha, the disciple of viswamitra.
I'm the fury of fire, to burn this earth to ashes.
I'm the ecstatic laughter, terrifying the creation.
I'm the eclipse of the twelve suns

www.pathagar.com

on the Day of the Doom.
Sometimes calm, sometimes wild,
I'm the youth of new blood—
I humble even the fate's pride!
I'm the violent gust of a wind storm,
the roar of the ocean.
I'm bright, effulgent.
I'm the murmur of over-flowing water,
Hindol dance of rolling waves!

I'm the unbridled hair of a maiden,
the fire in her eyes.
I'm the budding romance of a girl of sixteen—
I'm the state of bliss!
I'm the madness of the recluse,
I'm the sigh of grief of a widow,
I'm the anguish of the dejected,
I'm the suffering of the homeless,
I'm the pain of the humiliated,
I'm the afflicted heart of the lovesick.
I'm the trembling passion of the first kiss,
the fleeting glance of the secret lover.
I'm the love of a restless girl,
the jingling music of her bangles!
I'm the eternal child, the eternal adolescent,
I'm the bashfulness of a village girl's budding youth.
I'm the northern breeze, the southern breeze,
the callous eastwind.
I'm the ministrel's song.
the music of his flute and lyre.
I'm the unquenched summer thirst,
the scorching rays of the sun.
I'm the softl flowing desert spring
and the green oasis!
In ecstatic joy, in madness,
I've suddenly realized myself—
all the barriers have crumbled away!

www.pathagar.com

I'm the rise, I'm the fall,
I'm the consciousness in the unconscious mind.
I'm the flag of triumph at the gate of the universe—
the triumph of humanity!
Like a tempest
I traverse the heaven and earth
riding Uchchaisraba and the mighty Borrak.
I'm the burning volcano in the bosom of the earth,
the wildest commotion of the subterranean ocean
of fire.

I ride on lightning
and panic the world with earthquakes!
I clasp the hood of the Snake-king
and the fiery wing of the angel Gabriel.
I'm the child-divine-restless and defiant.
With my teeth I tear apart
the skirt of Mother Earth!

I'm Orpheus' flute.
I calm the restless ocean
and bring sleep to the fevered world
with a kiss of my melody.
I'm the flute in the hands of Shyam.
When I fly into a rage and traverse the vast sky,
the fires of Seven Hells tremble in fear and die.
I'm the messenger of revolt
across the earth and the sky.

I'm the mightly flood.
Sometimes I bring blessings to the earth,
at other times, cause colossal damage.
I wrestle away the twin daughters
from Vishnu's bosom!
I'm injustice, I'm a meteor, I'm Saturn,
I'm a blazing comet, a venomous cobra!
I'm the headless Chandi,
I'm the warlord Ranada.
Sitting amidst the fire of hell
I smile like an innocent flower!

www.pathagar.com

I'm made of clay, I'm the embodiment of the Soul.
I'm imperishable, inexhaustible, immortal.
I intimidate the humans, demons and gods.
I'm ever-unconquerable.
I'm the God of goods, the supreme humanity,
traversing the heaven and earth!
and bring peace.
I'm mad, I'm mad!
I have realized myself,
all the barriers have crumbled away!!

I'm Parashuram's merciless axe.
I'll rid the world of all the war mongers

I'm the plough on Balaram's shoulders.
I'll uproot this subjugated world
in the joy of recreating it.
Weary of battles, I, the Great Rebel,
shall rest in peace only when
the anguished cry of the oppressed
shall no longer reverberate in the sky and the air,
and the tyrant's bloody sword
will no longer rattle in battlefields.
Only then shall I, the Rebel,
rest in peace.

I'm the Rebel Bhrigu,
I'll stamp my footprints on the chest of god
sleeping away indifferently, whimisically,
while the creation is suffering.
I'm the Rebel Bhrigu,
I'll stamp my footprints—
I'll tear apart the chest of the whimsical god!

I'm the eternal Rebel,
I have risen beyond this world, alone,
with my head ever held high!

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

নজরুল-সঙ্গীত

নজরুল সঙ্গীতে মহানবী : বিচিত্র অনুভবে
লাল মোহাম্মদ দিদার

সঙ্গীতস্রষ্ঠা নজরুল
আবু হেনা মোস্তফা কামাল

নজরুলের একটি গান : একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা
আসাদুল হক

নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত
খালিদ হোসেন

কাজী নজরুলের গজল গান
নারায়ণ চৌধুরী

নজরুলের গান
সাজ্জাদ হোসাইন খান

উর্দু ভাষায় নজরুল সঙ্গীত
আবদুল ওয়াহিদ

www.pathagar.com

সঙ্গীত সম্রাট নজরুল

www.pathagar.com

নজরুল-সঙ্গীতে মহানবী : বিচিত্র অনুভবে

লাল মোহাম্মদ দিদার

পদ্মা-মেঘনা–যমুনা বিধৌত ও পলাশ মৃত্তিকা পুষ্ট এই বাংলাদেশ। ষড় ঋতুর লীলা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এবং ধান-গান-নিসর্গ সৌন্দর্য এদেশ ও এদেশের মানুষের প্রাণের সম্পদ– একসূত্রে গাঁথা। দুঃখ-বেদনা-আনন্দ ভালোবাসার ছায়ায় ও ছোঁয়ায় পুষ্ট প্রতিটি মানুষের হৃদয়সত্তা গান তার উপলব্ধির প্রকাশ-সুষমা। হাজার বছর আগের চর্যাপদ থেকে শুরু করে শাস্ত্র সঙ্গীত ও বৈষ্ণব-সাহিত্য পদাবলী কীর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙলার মানুষের আবহমানকালের মানস কমলের পরিচয় বিধৃত। পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল ইসলামে এসে এই সাঙ্গীতিক ধারাটি যেন একটি অতলস্পর্শী সীমাহীন প্রশান্ত সমুদ্রের রূপ নিয়েছে। কবিতার ধারাটির পাশাপাশি সঙ্গীতের স্বত:স্ফূর্ত এই ধারাটি থেকেও সুদীর্ঘকাল গৌড়জন 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী গানগুলির মধ্যে হাম্‌দ ও নাতে- রসূল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্রষ্টার ধ্যানমগ্ন হৃদয়ের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিই এসব গান। চলতি শতকের গোড়ার দিকে ঘুমন্ত বাঙালী মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য নজরুল ইসলামের এসব গান রাজনৈতিক বক্তৃতামালার চেয়েও সহস্রগুণ শক্তিশালী ছিল। ইসলামের ইতিহাস ও মিথ ঐতিহ্য সম্বলিত গানগুলি মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ করে সমকালীন তরুণ সমাজের কাছে ছিল সঞ্জীবনী সুধার মত। তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতা ও কবির নামের পেছনে অনিবার্যভাবে ব্যবহৃত ঐ বিশেষণের শিরোপাই অন্যতম ছিলো না। জাগরণমূলক ও ঐতিহ্যপুষ্ট অজস্র গানই তাঁকে বাঙলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে পরিচিত করে তুলেছিল। শিক্ষিত সমাজ তার দ্রোহমূলক কবিতা, গান কিংবা প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়,অভিভাষণ ইত্যাদি নিয়ে মেতে উঠলেও সাধারণ মানুষ তাঁকে তার গানের মাধ্যমেই বেশি করে চেনে ও জানে। তাই মুসলিম সমাজের সেই সুদীর্ঘকালের লালিত সংস্কারের অচলায়তন ভাঙতে যিনি সর্বাগ্রে ইসলামী গানের মাধ্যমে আগ্রহ ও আকুলতা

www.pathagar.com

প্রকাশ করেছিলেন তাঁকে আজকের দিনে কী ধর্মীয়, কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক, কী-ঐতিহাসিক সকল দিক থেকেই স্মরণ না করে উপায় নেই। সেদিনের সেই গোঁড়া অন্ত:সারশূন্য ও রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে যেখানে গান-বাজনা রীতিমত হারাম ছিল, কাঠমোল্লাদের ফতোয়ার প্রভাবে ও অত্যাচারে জনজীবন ছিলো অতিষ্ঠ, সেই দু:সময়ে তিনি যে দুঃসাহসীকের ভূমিকা পালন করেছিলেন ইতিহাস আজ তাঁকে সম্ভবত: ভুলতে বসেছে।

এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী, এককালের সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তীর নায়ক আব্বাসউদ্দীন আহমদই সর্বপ্রথম ইসলামী গান, হাম্‌দ, নাতে-রসূল, ছাত্রদলের গান, মুসলমানদের নানা ধর্মীয় উৎসব পার্বণের গান প্রচারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁকেও কম বেগ পেতে হয়নি। তাঁর নিজের কথাতেই সেদিনের ইসলামী গান প্রচারের আগে-পরের প্রেক্ষিতের পরিচয় শোনা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :

'একদিন কাজীদাকে বললাম, 'কাজিদা, একটা কথা মনে হয়। এই যে পিয়ারু কাওয়াল কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গায়, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রী হয়, এই ধরনের বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? তারপর আপনি তো জানেন, কিভাবে কাফের কুফর ইত্যাদি বলে বাংলায় মুসলমান সমাজের কাছে আপনাকে অপাংক্তেয় করে রাখার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে একদল ধর্মান্ধ। আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান।'

কথাটা তাঁর মনে লাগল। তিনি বললেন, "আব্বাস তুমি ভগবতী বাবুকে বলে তাঁর মত নাও; আমি ঠিক বলতে পারব না।" আমি ভগবতী অর্থাৎ গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল-ইন-চার্জকে বললাম। তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'না-না-না ওসব গান চলবে না। ও হতে পারে না।'[১]

প্রায় ছয়মাস পরে বৃদ্ধ আশ্চর্যময়ী ও ভগবতী বাবুর আলাপের এক বিশেষ আনন্দঘন মুহূর্তের সুযোগে শিল্পী আব্বাসউদ্দীন পূর্বের প্রসঙ্গটি ভগবতী বাবুকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি অগত্যা সম্মতি দেন। পরের ঘটনা, শিল্পী লিখেছেন :

শুনলাম পাশের ঘরে কাজিদা আছেন। আমি কাজিদাকে বললাম যে ভগবতী বাবু রাজী হয়েছেন। তখন সেখানে ইন্দুবালা কাজিদার কাছে গান শিখছিলেন। কাজিদা বলে উঠলেন, "ইন্দু তুমি বাড়ী যাও আব্বাসের সাথে কথা আছে।" ইন্দুবালা চলে গেলেন। এক ঠোঙ্গা পান আর চা আনতে বললাম দশরথকে। তারপর দরজা বন্ধ করে আধঘন্টার ভিতরই লিখে ফেললেন, "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।" তখুনি সুর সংযোগ করে শিখিয়ে দিলেন। পরের দিন ঠিক এই সময় আসতে বললেন। পরের দিন লিখলেন, "ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।" গান দুখানা লেখার ঠিক চারদিন পরেই রেকর্ড করা হল। কাজিদার আর ধৈর্য মানছিল না। তাঁর চোখে মুখে কী আনন্দই যে খেলে যাচ্ছিল।..... এই হল আমার প্রথম ইসলামী রেকর্ড।"[২]

www.pathagar.com

ইসলামী গান প্রচার ও রেকর্ডিং এর প্রতিকূল অবস্থার কথা এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল সত্য কিন্তু যাদের জন্য, যে সমাজের মানুষের জন্য গীতিকার সুরকার ও শিল্পীর এই বিরাট আত্মত্যাগ সেই সমাজে এর প্রতিক্রিয়ার চিত্রটি শিল্পী নিজেই উল্লেখ করেছেন এভাবে :

"এর পর কাজিদা লিখে চললেন ইসলামী গান। আল্লা-রসূলের গান গেয়ে বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগল এক নব উন্মাদনা যারা গান শুনলে কানে আঙুল দিত তাদের কানে গেল, "আল্লাহ্ নামের বীজ বুনেছি,"; "নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল।" কান থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনল এ গান। আরো শুনল, "আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়।" মোহররমে শুনল মর্সিয়া, শুনল "ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়।" ঈদে নতুন করে শুনল, "এল আবার ঈদ ফিরে এলো আবার ঈদ, চল ঈদগাহে।" ঘরে ঘরে এল গ্রামোফোন রেকর্ড, গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আল্লা-রসূলের নাম। কাজিদাকে বললাম, কাজিদা, মুসলমান তো একটু মিউজিক-মাইণ্ডেড হয়েছে। এবার তরুণ ছাত্রদের জাগাবার জন্য লিখুন। তিনি লিখে চললেন, "দিকে দিকে পুন : জ্বলিয়া উঠিছে, শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী, আজ কোথায় তখতে তাউস, কোথায় সে বাদশাহী।"[৩]

ইসলামী গান লিখিয়ে নেওয়া ও তার প্রচারের ব্যাপারে এই জনদরদী শিল্পীর অবদান আজো যথাযথ মূল্যায়িত হয়নি। তাঁর প্রচেষ্টায় গ্রামোফোন কোম্পানী রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠেছে সত্য কিন্তু মুসলিম বাঙলায় ইসলামী গানের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে অধপতিত মুসলিমমানসে একটা ব্যাপক পরিবর্তনও যে এসেছিলো তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ গানের চাহিদার জন্য এ সময়ে অনেক হিন্দু শিল্পীও মুসলমান সেজে ইসলামী গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ধীরেন দাস [গনি মিঞা], চিত্তরায়, [দেলোয়ার হোসেন], আশ্চর্যময়ী [সকিনা বেগম], হরিমতি [আমিনা বেগম], গিরীশ চক্রবর্তী [সোনা মিঞা] অন্যতম।[৪]

নানা নামের লেবেল আঁটা গ্রামেফোন কোম্পানী থেকে ইসলামী গানের রেকর্ড বের হয়ে বাঙালী মুসলমানদের ঘরে ঘরে প্রচারিত হলেও কলকাতা রেডিও থেকে এ সব গান প্রচারে তখনো যথেষ্ট বাধা ছিলো। সেখানেও আব্বাসউদ্দীন আহমদই সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে কলকাতা রেডিও থেকে ইসলামী গান প্রচারের ব্যবস্থা করে বাঙালী মুসলমান সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। ইসলাম ধর্মের কথা, মহানবীর আবির্ভাব-তিরোভাব, কারবালার যুদ্ধ, ইমাম হাসান-হোসেনের শোকাবহ ঘটনার বর্ণনা, শবেবরাত, শবেকদর, মুহররম, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ইত্যাদির জন্য বেতার প্রোগ্রামের সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল গোঁড়া মুসলিম সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। সমকালীন শিক্ষার অভাব মূলতঃ এ জন্য দায়ী। তৎকালীন কলকাতা রেডিও স্টেশন ডিরেক্টর নৃপেন মজুমদার আব্বাসউদ্দীন আহমদের কথা বলেছিলেন, "না আব্বাস এ ধরনের প্রোগ্রাম এই প্রথম; মুসলমানরা যা গোঁড়া, আমার রেডিও অফিস উড়িয়ে দিবে।

www.pathagar.com

আচ্ছা, তুমি যদি মাওলানা আকরম খাঁর কাছ থেকে 'আপত্তি নেই' বলে এই স্ক্রীপ্টের ওপর তাঁর সই নিয়ে আসতে পার আমি ব্রডকাস্ট করব।"[৫]

মাওলানা আকরম খাঁ অবশ্য সেদিন আব্বাসউদ্দীন আহমদের হাতের স্ক্রীপ্টে সানন্দে লিখে দিয়েছিলেন যে, "এই ধরনের জীবন্তিকা যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।" মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারে এরপর থেকে বেতারে আর কোনো বাধাই রইলো না। পরে রমজান মাসে রেডিওতে আজান দেওয়ার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছিল।

কবি শুধু এসব গান রচনা করেই দায়িত্ব শেষ করেননি সুরারোপ করেছেন, পরে নিজ তত্ত্বাবধানে তা রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থাও করেছেন। আব্বাসউদ্দিন জানিয়েছেন যে প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ ইসলামী গানের সুর কবির নিজস্ব। দুচারটি গানে সুর-সংযোজনার দায়িত্ব তিনি কমল দাশগুপ্ত ও চিত্তরায়কে দিয়েছিলেন মাত্র।[৭] গান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাসের কথা তাঁর অন্তরঙ্গ ও রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফফর আহমদের কথাতেই জানা যায়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"নজরুল আসলে শুরু থেকেই সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আমার মতো তার অরসিক বন্ধুরা তা বুঝতে পারত না। আমরা না বুঝে তাকে অনেক সময় আঘাত দিতাম। আমার মনে আছে, একদিন শ্রীভূপতি মজুমদার বলেছিলেন, "নজরুল, কী তুমি এত ভালো গান গাও যে গান পেলেই মেতে ওঠ।" সেদিন নজরুল খুব আহত হয়েছিল। সে বলেছিল, "ভূপতি দা আমার কবিতার যত খুশি সমালোচনা করুন, কিন্তু আমার গান সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।" "পরে বুঝলাম নিজের ওপরে তার অনেক প্রত্যয় ছিল বলেই সে শ্রীমজুমদারকে ওই রকম বলতে পেরেছিল।"[৮] গান সম্পর্কে কবির আরো উক্তি অন্যত্র ছড়িয়ে আছে– যার মর্মকথা মূলত : একই। এ নিরিখে গানের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও দুর্বলতা এবং বিশ্বাস ছিলো অসাধারণ।

ইসলামী গানগুলি ছিলো তাঁর কলিজার টুকরো। কী বাণীর সারল্যে ও বৈভবে, কী সুরের মোহন যাদু ও অতলস্পর্শী আবেদনে—বাঙলা সঙ্গীতে এ সম্পদ তুলনা-বিরল। সর্ব সংস্কারমুক্ত উদারহৃদয়-সুরজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই নজরুল ইসলামের এসব গানের সুরের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করবেন বলে মনে হয়। কেননা, কখনো কখনো বাণীর অপূর্ণতাকে সুরের ছোঁয়ায় এবং সুরের অপূর্ণতাকে শব্দ সম্ভারের কারুকার্যে, বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে তিনি গরীয়ান করে তুলেছেন। তাই হাম্‌দ ও নাতে-রসুল জাতীয় গানগুলিতে তিনি একক সম্রাটের মর্যাদায় সমাসীন। তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে আজ পর্যন্ত তেমন কোনো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেনি এবং এ বিষয়ে তাঁকে অতিক্রম করাও খুব সহজ কথা নয়। তাছাড়া গান সম্পর্কে গীতিকার ও সুরকার নজরুল ইসলামের নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাসের কথা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'নাতে-রসূল' পর্যায়ে কবির যে সব গানের সন্ধান পাওয়া গেছে তা মোটামুটি শ'খানেকের উপরে হবে। এসব গান 'জুলফিকার' ১ম খণ্ড ও 'বনগীতি'র সংযোজন অংশে যা নজরুল

www.pathagar.com

রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। 'গুলবাগিচা' গীতিগ্রন্থের 'ইসলামী গান' অধ্যায় ও সংযোজন অংশে কিছু 'নাতে রসূল' পাওয়া যায়। এটিও তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। নজরুল রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে নবরাগমালিকা, গীতিগ্রন্থে অল্প কয়েকটি 'নাতে রসূল' সংকলিত হয়েছে। 'মরুভাস্কর' নামক জীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থটিতে মোট আঠারোটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। নজরুল জীবনে হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর উপরে রচিত তাঁর কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় তাহলে 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের দুটি ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম [আবির্ভাব] ও 'ফাতেহা-ই দোয়াজ-দহম [তিরোভাব] কবিতাসহ মোট কুড়িটি। বিশ্বনবীর উপরে তার জীবনীকারদের গদ্যে রচিত রচনা ছাড়া আর কোনো বাঙ্গালী মুসলিম কবির হাতে এ শতকে খুব সম্ভব এমন সার্থকভাবে এত গান ও কবিতা লেখা হয়নি। এ সংখ্যা নিঃসন্দেহে গৌরবসূচক। তবে নিরূপিত এ সংখ্যাই যে চূড়ান্ত তা বলা বোধ করি অসঙ্গত হবে। আরো ব্যাপক অনুসন্ধানী তৎপরতার সাহায্যে এ সংখ্যা হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি পেতে পারে।

তবু সঙ্গত কারণেই আজ একথা বলতে হচ্ছে যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-কালী-দুর্গা-সরস্বতী ইত্যাদি হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য দেব-দেবীর মাহাত্ম ও গুণকীর্তন নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতে যেমন সংখ্যায় পুষ্ট—সে তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর প্রগাঢ় অধিকার ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম ও তার ইতিহাসখ্যাত অনুগামীদের প্রশংসা-কীর্তন অনেক কম।

'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'চিরঞ্জীব', 'ওমর ফারুক', 'খালিদ', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'খেয়াপারের তরণী' ইত্যাদির কথা মনে রেখেই একথা বলছি। এ ত্রুটি কিংবা অপূর্ণতা কবির নিজের না প্রতিকূল রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক পরিবেশের? না বাঙালী মুসলিম সমাজের নজরুলকে ধারণ করতে না-পারার অক্ষমতার ?[৯] ভবিষ্যতে কালই এর মীমাংসা-সূত্র নির্ণয় করবে।

মহানবী সম্পর্কিত প্রশস্তিমূলক বা গুণকীর্তনসূচক এ সকল গানে তাঁকে বিচিত্রভাবে দেখবার ও দেখাবার অনুভব করার বা উপলব্ধির গভীর আন্তরিক চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়েছে। বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে মহানবীর বিচিত্র জীবন, উপদেশ-নির্দেশ, কখনো তাঁর চেহারা মোবারক, শরীর, চোখ, হাসি, পদযুগল, স্কন্ধের মুহর, মস্তকের চাদর, কেশগুচ্ছ এবং সবশেষে তাঁর নামের অনিঃশেষ মাহাত্ম্য এসব ভক্তিভাবের রচনায় অজস্রবার হার্দিকভাবে প্রকীর্তিত হয়েছে। মহানবীর জীবন ও রূপৈশ্বর্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে কবি প্রায়ই জ্যোতিঃ সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, তারকারাজি, নিসর্গ-প্রকৃতি, মরুভূমি [বিশেষ করে গোবি ও সাহারা] পশু [উট, মেষ] পাহাড়, [বিশেষভাবে কোহ-ই-তুর ও হেরা] পর্বত নদ-নদী [দজলা-ফোরাত], সমুদ্র [বিশেষভাবে লোহিত সাগর], বায়ু [লু' হাওয়া], পাখি [বিশেষ করে বুলবুল], ফুল [বসরার গোলাপ], ধূলি [মক্কা-মদীনার], বন্যা ইত্যাদির ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে উপমা, রূপক, প্রতীক ও সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহার এবং ভাব-ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্যে কবি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। আবির্ভাবসূচক একটি গানে কবি বলেন:

www.pathagar.com

খোদার হাবিব হলেন নাজেল খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে
ঝুঁকে পড়ে আর্শ-কুর্শী, চাঁদ সুরুয তায় দেখতে আসে ॥
ভেঙে পড়ে পুরুত মন্দির, 'লাত-মানাত্' শয়তানী তখ্ত্,
"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র উঠিছে তকবির আকাশে ॥
খুশীর মউজ তুফান তোরা দেখে যা মরুভূমে,
কোহ্-ই তূরের পাথরে আজ বেহেশ্তী ফুল ফুটে হাসে ॥
সূর্য ওঠে, উঠেরে চাঁদ, মনের আঁধার যায় না তায়।
হৃদ-গগণ যে করল রওশন, সেই মোহাম্মদ ঐ রে হাসে ॥[১০]

উপরের গানটিতে মহানবীর জন্মলগ্নে তৎকালীন কাবাগৃহের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এবং এই খুশীর মুহূর্তে চন্দ্র-সূর্যসহ স্বর্গ-মর্তের আনন্দ উচ্ছাসের প্রকাশ ঘটেছে এ গানে। হজরত মোহাম্মদ [সা]-কে এখানে 'বেহেশ্তী ফুল' হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এতদিনের পৌত্তলিকদের 'শয়তানী তখ্ত্' 'পুরুত মন্দির' ভেঙে পড়েছে। মানব মনের কালিমা দূর করার মানষে হৃদয়কে অধিকতর উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করার জন্য মোহাম্মদ [সা] এর আবির্ভাব ঘটেছে—যাঁর মুখে রয়েছে পবিত্র 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু'।

মহানবীর প্রশংসিত ও গৌরবসূচক ব্যঞ্জনাধর্মী নাম কত বিচিত্র অর্থে ও অভিধায় কবি দেখেছেন ও তার ব্যাখ্যা করেছেন– তা রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। উদাহরণ :

ক. মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল- আরবী
বাদশারও বাদশাহ্ নবীদের রাজা নবী ॥[১১]

খ. মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লে আঁলা
তুমি বাদশারও বাদশাহ, কম্লিওয়ালা ॥
পাপে-তাপে পূর্ণ আঁধার দুনিয়া
হ'ল পুণ্য বেহেশ্তী নূরে উজালা ॥[১২]

গ. সৈয়দে মক্কী মদনী আমার নবী মোহাম্মদ।
করুণা সিন্ধু খোদার বন্ধু নিখিল মানব প্রেমাস্পদ ॥[১৩]

ঘ. দেখে যা রে দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী।....
বুকে খোদার ইশ্ক্, নিয়ে নওশা ঐ আল-আরবী ॥[১৪]

ঙ. মদিনার শাহানশাহ কোহ-ই-তূর-বিহারী।
মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী- ॥.......
মেরাজের দুল্হা— আল্লার আর্শচারী ॥[১৫]

চ. হে আমিনা লালা, হে মোর কমলীওয়ালা।[১৬]

www.pathagar.com

ছ. এ কোন মধুর শারাব দিলে আল-আরাবী সাকী।[১৭]

জ. হে মদিনার নাইয়া/ভবনদীর তুফান ভারি কর কর পার।[১৮]

ঝ. প্রিয় মুহরে-নবুয়তধারী হে হজরত,
তরিতে উম্মতে এলে ধরায়
মোহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মুজতবা।
নাম জপিতে নয়নে আঁসু ঝরায় ॥[১৯]

ঞ. আমার প্রিয় হজরত নবী কমলিওয়ালা।
যাঁহার রওশনীতে দ্বীন-দুনিয়া উজালা ॥[২০]

ট. লহ সালাম লহ, দ্বীনের বাদশাহ/ জয় আখেরী নবী।
পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে/হে নবীকুলে রবি ॥[২১]

উদ্ধৃতি দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। উপরে মহানবীর গরিমাদীপ্ত যে সব প্রশংসাসূচক ও ব্যঞ্জনাধর্মী নাম ও নামের সঙ্গে গুণবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তা তাঁকে বুঝবার জন্য সামান্যই। তবে স্বয়ং আল্লাহও পবিত্র কোরআনে যে সব বিচিত্র সম্বোধনে তাঁর প্রিয় হাবীবকে সম্মানিত করেছেন তার মধ্যে হাবিব, দোস্ত, রসূল, মুহম্মদ, আহমদ এবং বিশেষ করে কম্বলধারী [কম্‌লিওয়ালা?] বা বস্ত্রাবৃত ব্যক্তিই উল্লেখযোগ্য। 'মোদাচ্ছের' শব্দটির ব্যবহার কোথাও আমার চোখে পড়েনি। একই কবিতায় কিংবা গানে এমনি প্রয়োগে বৈচিত্র্য-প্রত্যাশী কবি, শব্দভাণ্ডারী নজরুল যেন অকৃপণ হস্তে আরবী-ফারসী-সংস্কৃত শব্দকোষ ও ঐতিহ্য উজাড় করে মহানবীর অনি:শেষ মধুময় জীবনের সুকুমার গুণাবলীর সকলস্তর বিনয়ে ও ভক্তিভরে স্পর্শ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

মহানবীর পবিত্র নাম 'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' এবং অনুষঙ্গ হিসেবে দোয়েল, কোকিল, ভ্রমর, সূর্য, চন্দ্র, বুলবুল, গোবি, সাহারা ইত্যাদি এসেছে অসংখ্য গানে। উপমায় ভাবে ও ভাষায় এবং অতলস্পর্শী ভাবানুভূতি সমন্বিত চিত্রকল্পে প্রায় অধিকাংশ গানই অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম বলে মনে হয়। এমন একটি গান :

হে মদিনার বুলবুলি গো/ গাইলে তুমি কোন গজল;
মরুর বুকে উঠল ফুটে'/ প্রেমের রঙীন গোলাপ দল ॥
সাহারার দগ্ধ বুকে রচলে তুমি গুলিস্তান,
সেথা আসহাব সব ভ্রমর হয়ে শাহাদতের গাইল গান ॥
দোয়েল কোকিল দলে দলে/ আল্লা রসূল উঠল বলে',
আল্‌-কোরানের পাতার কোলে/খোদার নামের বইল ঢল ॥[২২]

এ গানটিতে হজরত মোহাম্মদ [সা] কে পারস্যের অতি প্রিয় পাখী বুলবুলির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইরানী কবি হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের দীওয়ান ও রুবাই-তে শারাব সাকীর

www.pathagar.com

সঙ্গে পাখী হিসেবে বুলবুলির একটি বিশিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। উক্ত দুজন বিশ্ব-বিখ্যাত কবি বাঙালী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর গানে-গজলে ঐ দুজন কবির অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বিখ্যাত বস্‌রার গোলাপও তিনি বহু বিখ্যাত গানে অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আসলে বুলবুল পাখীর প্রতি নজরুল ইসলামের আবাল্য একটি দুর্বার আকর্ষণ ও দুর্বলতা ছিলো। এগারো বারো বছর বয়সের সময় আরবী-ফারসী-উর্দুমিশ্রিত কবির একটি গানেও এই বুলবুল পাখীর উল্লেখ পাওয়া যায়।২৩ এতদসত্ত্বেও কবি তাঁর মধ্যম পুত্রের নাম রেখেছিলেন বুলবুল—যার নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ'। কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিগ্রন্থের নামও 'বুলবুল'। অতএব হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের কবিতা তাঁকে যেমন তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল তেমনি তাঁদের কবিতার অনুষঙ্গ হিসেবে শারাব-সাকী-বুলবুলিকেও তিনি তাঁর জীবনের সর্বস্তরে যথেষ্ট গুরুত্বও দিয়েছেন। ইরানের এই বিশিষ্ট পাখী বুলবুলির উদ্দেশ্যে দশ পংক্তির স্বতন্ত্র একটি গানও তিনি রচনা করেছেন।২৪ হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে আলোচ্য গানে গানের পাখী বুলবুলি হিসেবে দেখা, অনুগামীদের ভ্রমর কল্পনা করার এবং 'সাহারার দগ্ধ বুকে' গুলিস্তান রচনার চিত্রকল্প এক অতুলনীয় সজীবতা ও স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে।

দাদা আবদুল মোত্তালিবের ও জননী আমেনা খাতুনের দেওয়া নাম যথাক্রমে 'মুহম্মদ' ও 'আহমদ'-কে কবি নজরুল ইসলাম অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছেন। বিচিত্রভাবের ঐশ্বর্যে এ দুটি নাম প্রকীর্তিত হয়েছে কবির অসংখ্য গানে। এ সমস্ত গানেও 'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' ছাড়াও মহানবীর কদম মোবারক, সেই গোলাপ, বুলবুলি, সেই জ্যোতি:, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি যেমন এসেছে তেমনি প্রকৃতির স্নেহ-কোমল কমনীয় রূপ ও আকাশ-মণ্ডলী শ্রদ্ধায় ও ভক্তিভারে সতত অবনমিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়েও মহানবীর নামের মাহাত্ম্যই এখানে মুখ্য। কয়েকটি উদাহরণ :

ক. মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে।
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে॥
ওরে গোলাব নিরিবিলি
বুঝি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি
তাই তাঁর কদমের খোশ্‌বু আজও তোর আতরে জাগে।
মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে'/ তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে'
ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে॥

ওরে ভ্রমর তুই কি প্রথম/চুমেছিলি নবীর কদম,
আজো গুনগুনিয়ে সেই খুশী কি জানাস রে গুলবাগে॥২৫

খ. মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে॥

www.pathagar.com

ও নাম প্রাণের প্রিয়তম,/ ও নাম জপি মজনু সম,
ও নামে পাপিয়া গাহে/ প্রাণের গোলাব বাগে ॥[২৬]

গ. মোহাম্মদ মোর নয়ন-মনি/মোহাম্মদ মোর জপমালা।
ঐ নামে মিটাই পিপাসা/ ও নাম কওসরের পিয়ালা ॥
মোহাম্মদ নাম শিরে ধরি/ মোহাম্মদ নাম গলায় পরি,
ঐ নামেরই রওশনীতে/ আঁধার এমন রয় উজালা ॥.....
ও নাম আমার অশ্রু চোখের/ ব্যথার সাথী শান্তি শোকের,
চাইনা বেহেশ্‌ত্‌, যদি ও নাম/ বলতে সদাই পাই নিরালা ॥[২৭]

ঘ. নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল।
যে নাম নিয়ে চাঁদ-সেতারা আসমানে খায় দোল ॥
পাতায় ফুলে যে নাম আঁকা,/ ত্রিভুবনে যে নাম মাখা,
যে নাম নিতে হাসীন্‌ ঊষার/রাঙে রে কপোল ॥
যে নাম গেয়ে ধায় রে নদী,/ যে নাম সদা গায় জলধি,
যে নামে বহে নিরবধি পবন-হিল্লোল ॥
যে নাম বাজে মরু সাহারায়,/যে নাম বাজে শ্রাবণ-ধারায়,
যে নাম চাহে কাবার মসজিদ,/মা আমিনার কোল ॥[২৮]

ঙ. আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়,
খোদার সাথে হয়েছে তার গোপন পরিচয় ॥

ঐ নামে যে ডুবে আছে/ নাই দু:খ শোক তাহার কাছে,
ঐ নামের প্রেমে দুনিয়াকে/সে দেখে প্রেমময়।[২৯]

চ. তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।
ঐ নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদাই কালাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥

ঐ নামেরই রশি ধরে যাই আল্লার পথে,
ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥[৩০]

ছ. হে প্রিয় নবী, রসূল আমার।
পরেছি আভরণ নামেরই তোমার ॥
নয়নের কাজলে তব নাম,/ ললাটের টিপে জ্বলে তব নাম;

www.pathagar.com

গাঁথা মোর কুন্তলে আহমদ/বাঁধা মোর অঞ্চলে তব নাম।
দুলিছে গলে মোর তব নাম,/ মনিহার ॥
তাবিজ অঙ্গুরী তব নাম/বাজু ও পৈঁচী চুড়ি তব নাম;
ভয়ে ভয়ে পথে পথে ঘুরি যে/পাছে কেউ করে চুরি তব নাম,
ঐ নাম রূপ মোর ঐ নাম আঁখিধার ॥
বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম,/ প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম;
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি/প্রেম ও ভক্তি মাখা তব নাম।
প্রিয় নাম আহমদ জপি আমি অনিবার ॥[৩১]

জ. তোমার নামে এ কি নেশা হে প্রিয় হজরত!
যত ডাকি তত কাঁদি মেটেনা হস্‌রত ॥.......
মোর অন্তরেরই হেরা গুহায়
আজও তোমার ডাক শোনা যায়,
জাগে আমার প্রেমের 'কাবা'-ঘরে/ তোমারই সুরত ॥[৩২]

ঝ. হজরতের নাম তস্‌বি করে, যাব যে মিশ্‌কিন বেশে,
ইসলামেরই দ্বীন-ই-ডঙ্কা বাজল প্রথম যে দেশে ॥[৩৩]

উদ্ধৃত গানগুলির কোনো কোনোটিতে সুফীতত্ত্ব ও গূঢ় আধ্যাত্মিক ধর্মভাব ও চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। নামের ঐ মাহাত্ম্য কেবল সাধকরাই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। বিচিত্র অনুভবের ভক্তিরস ও চিত্তের নিবেদনের সুরই এই গানগুলিকে স্বল্প অবয়বে অসামান্যতা দান করেছে। মহানবীর নামের গুরুত্ব, গৌরব-গরিমা ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বাঙলা নাতে-রসূলমূলক সঙ্গীতে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে মাত্র বারোটি পংক্তির আর একটি ছোট, অথচ অনন্যসাধারণ গানে যে ভাবে দেখা হয়েছে ও দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে কবি রচিত অসমাপ্ত জীবনীগ্রন্থ 'মরু ভাস্করে'র 'অবতরণিকা,[৩৪]-এর অনাগত'[৩৫] ও 'নওকাবা'[৩৬] কবিতা তিনটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তথাপি স্বল্প পরিসরে কবির সুরারোপিত ও শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদের কণ্ঠে গীত এই দুরূহ শিল্প কর্মটি যাঁরা সঙ্গীতাকারে রেকর্ডে শুনেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন গানটির বাণীর সারল্য, উপমা ও আদিগন্ত ত্রিভুবনস্পর্শী সচল-জ্যোতির্দীপ্ত চিত্রকল্প এবং এর ভাব সম্পদ ও আন্তরিক আবেদন-আকুলতার ব্যাপ্তি ও গভীরতার তাৎপর্য। এখানে বারোটি চরণের ঐ গানটিতে হজরত মোহাম্মদ (সা) কে সাহারার 'রঙিন গুলে-লালা' হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এ গানেও সুফীবাদ ও আধ্যাত্মিকতার তত্ত্বরস ঘনীভূত হয়ে এক অলৌকিক সাধন ও ভক্তি মার্গের জন্ম দিয়েছে। সেই অসাধারণ গরিমাদীপ্ত গানটি এই—

www.pathagar.com

সাহারাতে ফুটলো রে রঙ্গিন গুলে- লালা।
সেই ফুলেরই খোশবোতে আজ দুনিয়া মতোয়ালা ॥
সে ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি চাঁদ-সুরুয-গ্রহ-তারায়,
ঝুঁকে পড়ে চুমে সে ফুল নীল গগন নিরালা ॥
সেই ফুলেরই রওশনীতে আরশকুর্শী রওশান,
সেই ফুলেরই রঙ লেগে আজ ত্রিভুবন উজালা ॥
সেই ফুলেরই গুলিস্তানে আসে লাখো পাখী
সেই ফুলেরই ধরতে বুকে দোলে রে ডাল-পালা ॥
চাহে সে ফুল জিন ও ইনসান হুরপরী ফেরেশতায়,
ফকির দরবেশ বাদশাহ্ চাহে করতে গলে মালা ॥
চেনে রসিক ভোম্‌রা বুলবুল সেই ফুলের ঠিকানা
কেউ বলে হজরত মোহাম্মদ কেউ বা কম্‌লীওয়ালা ॥৩৭

'জুলফিকার' ১ম খণ্ড গীতিগ্রন্থের অন্য একটি গানে মহানবীকে আরব তথা বিশ্ববণিকদের (রূপকার্থে সকল নবী-রসুলের মধ্যে) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এই 'বণিক'- অভিধা নিশ্চয়ই সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য নয়। আবহমান কাল পৃথিবীতে যত নবী ও রসুল এসেছেন এবং যাঁরা আল্লাহর পবিত্রবাণী ও উপদেশ-নির্দেশ মানুষের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন বিশেষ অর্থে এ গানে সেই তত্ত্বকথাই উচ্চারিত হয়েছে। খুব সম্ভব হজরত খাদিজার ব্যবসার তদারকিতে মুহাম্মদ (সা) যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন এ গান রচনার পরোক্ষ পরিপ্রেক্ষিত সেই ব্যবসার ঘটনা বলেই মনে হয়। রূপকার্থে এ গানে কোরআনকে সম্পদ বোঝাই জাহাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং বিনিময় মাধ্যম রূপে গুরুত্ব পেয়েছে ইসলাম ধর্মের শাশ্বত আদি বাণী কলেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ' অর্থাৎ 'সেই আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই যাঁহার রসূল হইতেছেন মুহম্মাদ।' পাপী-তাপী, বদ-নসীব, গুনাহ্গার দুনিয়ার এ বাণিজ্য কেন্দ্রের খরিদ্দার। মহানবীকে এ বিশ্ব-বিপনীর নবীন সওদাগর, বণিক, ব্যাপারী ইত্যাদি রূপে অঙ্কিত করে কবি বস্তুজগতের সঙ্গে অপার্থিব জগতের এক অসাধারণ সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। কবি-কল্পনায় বণিক-সওদাগর মহানবী,

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর
বদ্-নসীব আয়, আয় গুনাহ্গার, নতুন ক'রে সওদা কর।....
কোরানের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে
লুটে'নে রে লুটে নে সব ভ'রে তোল তোর শূন্য ঘর ॥
কলেমার ঐ কানাকড়ির বদলে দেয় এই বণিক
সাফায়াতের সাত রাজার ধন, কে নিবি আয় ত্বরা কর ॥

www.pathagar.com

কেয়ামতে বাজারে ভাই মুনাফা যে তাও বহুৎ,
এই ব্যাপারীর হও খরীদার, লও রে ইহার সীল মোহর ॥
আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদীনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি আল্লাহু আকবর ॥[৩৮]

উদ্ধৃত গানটিতে আরো একটি অসাধারণ তত্ত্বকথা ব্যক্ত হয়েছে। মদিনা শহরের এই নবীন বণিক-সওদাগরের নাম মোবারক (শুভ/মঙ্গল) মোহাম্মদ। তাঁর ধন-সম্পদ বা পুঁজি একমাত্র 'আল্লাহু আকবর'। কিন্তু ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র কলেমার সাহায্যেই শুধু এই বণিকপ্রবরের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। যাঁরা মোহাম্মদ (সা)-প্রচারিত ধর্ম ও তার মূলমন্ত্রে অর্থাৎ কলেমাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন শুধু তাঁরাই "সাফায়াতের সাত রাজার ধন" লাভে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে পারেন। কেননা, পার্থিব জগতের ক্ষণস্থায়ী লাভ লোকসানের চেয়েও, 'কেয়ামতের বাজারে', এই কলেমার মুনাফা অনেক বেশি। উপরন্তু জগৎ-সংসারে অসংখ্য বণিকের অর্থাৎ ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে এবং তাঁদের অনেকেই ছিলেন প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত। পূর্ববর্তী নবী-রসূল ও বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকরা তাঁদের উপাস্য ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা সময়ে নানা কথার অবতারণা করেছেন। সাধারণ মানুষের এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কথা। এক সময় পারসিকরা দু'জন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব কল্পনা করতেন— এদের একজন মঙ্গল ও অপরজন অমঙ্গলের। খৃষ্টানদের God the Holy Father, God the Holy Son ও God the Holy Ghost রয়েছে। আবার God এর বহুবচন Gods এবং এর স্ত্রীলিঙ্গ Godess-ও আছে। এ-ধারণা হিন্দুদের মধ্যেও প্রবলভাবে বিদ্যমান সেখানে ব্রাহ্ম এবং তার পুত্র-কন্যা স্ত্রীতো আছেই— সেই সঙ্গে নারায়ণের নারায়ণী, ভগবানের ভগবতী, এবং ঈশ্বরের ঈশ্বরী-ও রয়েছেন।[৩৯] অতএব এত কিছুর মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য না থাকলে ভালো-মন্দ কিংবা সত্য অসত্য, আসল-নকল বা মেকী নির্ণয় করা একরূপ দু:সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমার সঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সা) এর নামটাও যুক্ত করে স্বাতন্ত্র্যের লেবেল এঁটে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, অসংখ্য মত ও পথের মধ্যে নিরীহ, সরল ও সত্যানুসন্ধানী মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয়। মূল কলেমা তাই দাঁড়িয়েছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ"। কবি এই 'মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ'-কেই আলোচ্য গানে বলেছেন 'সীলমোহর'। এই সীলমোহরাঙ্কিত কলেমায় যারা বিশ্বাস স্থাপন করবেন পারলৌকিক জীবনে তারাই না ঠকে অশেষ পুণ্য ও পূর্ণ সত্যজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবেন।

এই অসাধারণ গরিমাদীপ্ত রূপক গানটির ভাবার্থর গদ্যরূপ পরবর্তীকালে রচিত কবি গোলাম মোস্তফার বিখ্যাত রচনা 'বিশ্বনবী'-তে পাওয়া যায়। কলেমার বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাখ্যা হিসেবে তিনিও লিখেছেন :

"মানুষের কারসাজিতে জগৎময় মেকী আল্লাহ্‌র বাজার বসিয়াছে।.... আল্লাহ তাই বাধ্য হইয়াই নিজের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিবার জন্য আপন নামের শেষে একটি সিলমোহর

www.pathagar.com

মারিয়া দিয়াছেন। ঠিক যেন একটি ট্রেড মার্ক। সেই সিলমোহরটি কি? সে হইতেছে মুহম্মদের নাম সেটি হইতেছে মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ"। আল্লাহ তাই ব্যবসায়ের ভঙ্গিতেই মুহম্মদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ মুহম্মদ হইতেছে–'খাতামান্নাবী' অর্থাৎ নবীদের মধ্যে তিনি (আমার) সিলমোহর বা ট্রেড মার্ক। তিনি তাই সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন : সত্য বা খাঁটি আল্লাহকে যদি চাও, তবে মুহম্মদের সিল-দেওয়া আল্লাহকে চিনিও; নতুবা ঠকিবে।"[৪০] উদ্ধৃত গদ্যাংশটির উপরে উক্ত গানটির গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য। এবং এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নজরুল ইসলামের নাতে-রসূলের প্রভাবেই গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'র নবী চরিত্রের ভাবাত্মক দিকটি গভীরভাবে প্রভাবিত।

হজরত মোহাম্মদ (সা) শেষ নবী বা আখেরী নবী হলেও সকল নবী রসুলের মধ্যে তিনিই যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা তাঁর জীবনীকাররা এবং ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন।[৪১] কাজী নজরুল ইসলাম 'মরুভাস্কর' গ্রন্থের 'অনাগত' কবিতায় আল্লাহ্‌র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কৌতূহল বা মনের আকুলতা এবং আদি মানব আদমের সঙ্গে কথোপকথন ছলে এ রহস্যময়তার উল্লেখ করেছেন।[৪২]

আসলে "সৃষ্টির আদিতেই ছিল মুহম্মদের পরিকল্পনা। কেননা, মুহম্মদই ছিলেন সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বা মূল লক্ষ্য। কাজেই সর্ব প্রথমেই সে জ্যোতির্মূর্তি আল্লাহর ধ্যানে জন্মলাভ করিবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই অর্থেই বলা যায় যে, মুহম্মদ তাঁহার জন্মের আগেই জন্মিয়াছিলেন। শিল্পী যেমন তাহার মনের সেই চৈতন্য-চিত্রটিকে ধীরে ধীরে রূপ দেয়, বিশ্ব-শিল্পী আল্লাহ্ ঠিক তেমনি করিয়া তাঁহার প্রধান পরিকল্পনাটিকে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন।.... মুহম্মদকে প্রকাশ করিবার জন্যই অন্যান্য সবকিছুকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। মুহম্মদই হইতেছেন, সৃষ্টি-নাট্যের প্রধান চরিত্র।..... স্বয়ং আল্লাহই এ কথা বলিতেছেন, "তুমি না হইলে আমরা আকাশ-মণ্ডলী (গ্রহ-নক্ষত্র) সৃষ্টি করিতাম না।"[৪৩]

হজরত মোহাম্মদ (সা) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও খোদার আপন নূরের গরিমা ও তেজোদীপ্ত রূপ নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এ-গানেও যে সূফীতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিককতার স্পর্শ লেগেছে সচেতন পাঠক আশা করি তা মেনে নেবেন। কবি বলেন :

আদম নূহ্ ইব্রাহিম দাউদ সোলেমান মুসা আর ঈসা,
সাক্ষ্য দিল আমার নবীর, তাদের কালাম হল রদ ॥
যাঁহার মাঝে দেখল জগৎ ইশারা খোদার নূরের,
পাপ দুনিয়ায় আসল যে রে পূণ্য বেহেশ্‌তী সনদ ॥....
হায় জুলেখা মজ্‌ল বৃথাই ইউসোফের ঐ রূপ দেখে,
দেখলে আমার নবীর সুরত যোগীন্ হত ভস্‌ম্ মেখে'।
শুনলে নবীর শিরীন্ জবান, দাউদ মাগিত মদদ্ ॥

www.pathagar.com

ছিল নবীর নূর পেশানীতে, তাই ডুবল না কিশ্‌তী নূহের,
পুড়ল না আগুনে হজরত ইব্রাহিম সে নমরুদের,
বাঁচল ইউনোস মাছের পেটে স্মরণ করে নবীর পদ;
দোজখ আমার হারাম হ'ল, পিয়ে কোরানের শিরীন সহদ।[৪৪]

আল্লাহর ধ্যানের জ্যোতির্মূর্তিই 'নূরে মুহম্মদী'। মুহম্মদ (সা)-এর নূরকেই আল্লাহ্ সর্বাগ্রে সৃষ্টি করেছিলেন। হাদিসে উক্ত আছে, "আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরী" অর্থাৎ (হজরত মোহাম্মদ বলিতেছেন) "সর্বপ্রথমেই আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করেন তাহা আমার নূর।"[৪৫]

কাজেই আল্লাহ্‌র কথাই তাঁর প্রিয় হাবিবের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে সমস্ত সৃষ্টি শুধু তাঁরই জন্য। তাই আদম থেকে শেষ নবীর পূর্ব পর্যন্ত সকলেই মুহম্মদ (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। উদ্ধৃত গানটির তাৎপর্য তাই নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

শুষ্ক মরুভূমি প্রভাবিত আরবজাহানের মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশে হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবে যে পরিবর্তন এলো তার সার্থক চিত্রকল্প এঁকেছেন অসংখ্য গানে। যিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হিশেবে অভিনন্দিত হবেন—তাঁর আগমনে সর্বত্রই একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যে ছোঁওয়া বা ছায়া পড়বে এমন কল্পনা অসঙ্গত নয়। বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তাই কবির সানন্দ আহবান :

সাহারাতে ডেকেছে আজ বান, দেখে যা।
মরুভূমি হ'ল গুলিস্তান, দেখে যা ॥
সেই বানেরই ছোঁওয়ায় আবার আবাদ হল দুনিয়া,
শুকনো গাছে মুঞ্জরিল প্রাণ, দেখে যা ॥
বিরান মুলুক আবার হ'ল গুলে গুলে গুলজার
মক্কাতে আজ চাঁদের বাথান, দেখে যা ॥[৪৬]

উল্লেখ্য যে, সাহারা- মরুভূমি, শুকনো গাছ, বিরান মুলুক উল্লেখের পাশাপাশি বান, গুলিস্তান, ছোঁওয়ায়, আবাদ, মুঞ্জরিল, প্রাণ, গুল, গুলজার এবং একটি অত্যাশ্চর্য প্রয়োগ 'মক্কাতে আজ চাঁদের বাথান' নিঃসন্দেহে নব-জীবনের পরিচয়বাহী। আরব ভূমির পরিবেশে কবির গানে এ সব প্রসঙ্গ বিচিত্র বিশ্বাসে ও বিন্যাসে কল্পচিত্রে, ভাবে ও ভাষার সারল্যে, অর্থ-দ্যোতনায় এবং এক পরিচ্ছন্ন রূপ-মাধুর্যে বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এরূপ আরো দু'একটি গানের উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। যেমন :

নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া
কে এল মক্কায় আমিনার কোলে।
ফাগুন-পূর্ণিমা নিশীথে যেমন
আসমানের কোলে রাঙা চাঁদ দোলে ॥

www.pathagar.com

কে এলো কে এলো গাহে কোয়েলিয়া,
পাপিয়া বুলবুল উঠিল মাতিয়া,
গ্রহ-তারা ঝুঁকে করিছে কুর্ণিশ
হুর পরী হেসে পড়িছে ঢলে ॥

জিন্নাতের আজ-খোলা দরওয়াজা পেয়ে
ফেরেশতা আম্বিয়া এসেছে ধেয়ে,
তহরীমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে
দুনিয়া টলমল, খোদার আরশ টলে ॥
এল রে চির-চাওয়া, এল আখেরী নবী,
সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবী,
নাজেল হয়ে সে যে ইয়াকুত রাঙা ঠোঁটে
শাহাদাতের বাণী আধো আধো বোলে ॥[৪৭]

একটি প্রচলিত ধারণা 'খোদার নূরে নবী পয়দা' কবির গানের প্রথম চরণে এক আশ্চর্য ভাবের ইঙ্গিত বহন করে। সমগ্র 'বিশ্ব যখন তিমির মগন' তখন সেই ঘনীভূত অন্ধকারকে দূর করার জন্য তিমির-বিনাশী জ্যোতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। সেই জ্যোতিস্নাত পুরুষকে কবি তুলনা করেছেন 'ফাগুন-পূর্ণিমা নিশীথে যেমন আসমানের কোলে রাঙা চাঁদ দোলে'। হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে এ গানে পবিত্র নূর বা জ্যোতি : বা আলোক প্রাপ্তহিশেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই সুবিখ্যাত গানটির সঙ্গে নজরুল ইসলামের আরা একটি মহৎ সৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান। ঐ বিখ্যাত গানটি—

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু-পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে,
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে ॥

কুল-মাখলুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এল ঐ,
কলেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে, কে এল ঐ,
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ,
আকাশে গ্রহ-তারা প'ড়ে লুটে, কে এল ঐ,
পড়ে দরূদ ফেরেশ্‌তা, বেহেশতে সব দুয়ার খোলে ॥

মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন,
"এক আল্লাহ্‌ ছাড়া প্রভু নাই", —কহিল যে জন,
মানুষের লাগি, চির-দীন বেশ নিল যে জন,
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন,

www.pathagar.com

এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি   মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি-কলরোলে ॥[৪৮]

উপর্যুক্ত দুটি গানের মধ্যে প্রথমটির অস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের সঙ্গে ভাবের সাদৃশ্যে ও বাণীর সাযুজ্যে দ্বিতীয় গানটি আশ্চর্যরকম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। স্বর্গ-মর্ত্য-মথিত গানটির উপমা, রূপকার্য, চিত্রকলা, ভাবের গভীরতা ও কথামালার সারল্য মুহূর্তেই পাঠক চিত্তকে এক অপার্থিব আনন্দে অভিভূত করে তোলে। এ গান দু'টিতে হজরত মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে দুটি অসাধারণ উক্তি করা হয়েছে– যা উচ্চ ভাব, মহৎ কবি-কল্পনা ও সার্থক শিল্পকর্মের মর্যাদা লাভ করেছে। জগতের মহৎ কবিদের কিংবা চিন্তাশীল ও ভাবুকদের সৃষ্টি-প্রাচুর্যের মধ্যে এমন দু'একটি 'হীরকের টুকরো' সদৃশ বাণী পাওয়া যায়। যেমন, চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই', স্বামী বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', 'রবীন্দ্রনাথের কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল/ এ তাজমহল', 'কিংবা, পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', ইংরেজ কবি কীটসের সেই জগদ্বিখ্যাত চরণটি "A thing of beauty is a joy for ever, কিংবা Beauty is truth , truth is beauty" ইত্যাদি। নজরুল সঙ্গীতে বিশেষ করে নাতে রসূলের মধ্যে এই গানটিকে সেই অর্থে অনবদ্য বললে খুব বেশি বলা হয় না। বিশেষ করে এর শেষ স্তবক অর্থাৎ আভোগের শেষাংশটি 'এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী/ ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি' চরণটি পরশমণি তুল্য। হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রাদর্শ এবং সমগ্র কর্মজীবন নির্যাতিত ব্যথিত মানবমণ্ডলীর জন্য যেন এক মহাকাব্যিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে এবং ছোট চরণটির মাত্র চারটি সরল ও শিল্পশ্রীমণ্ডিত ভাবাত্মক শব্দগুচ্ছ। মহৎ কবি কল্পনা ও ভাবের এমন নিরাভরণ ঐশ্বর্য ও চিত্তের বিত্ত-বৈভবের ঋদ্ধি বাঙলা সাহিত্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।
আবির্ভাব অঙ্গের অসংখ্য গানে কবি-কল্পনার স্ফূর্তি ঘটেছে সবচেয়ে নির্ভার। এমন একটি গান—

....
মরু সাহারা আজি মতোয়ারা।
হলেন নাজেল তাহার দেশে খোদার রসুল
যাঁহার নামে যাঁহার ধ্যানে
সারা দুনিয়া দীওয়ানা প্রেমে মশগুল ॥

যাঁহার আসার আশাতে অনুরাগে
নীরস খর্জুর তরুতে রস জাগে,
শুষ্ক মরুপরে খোদার রহম ঝরে,
হাসে আকাশ পরিয়া চাঁদের ফুল ॥

www.pathagar.com

ছিল ত্রিভুবন যাঁহার পথ চাহি ;
এল রে সে নবী 'ইয়া উম্মতি গাহি'
যতেক গুমরাহে নিতে খোদার রাহে
এল ফোটাতে দুনিয়াতে ইসলামী গুল ॥[৪৯]

পূর্বের উদ্ধৃত গান দুটির ভাবের বাণী-চিত্র এ গানেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়— বিশেষ করে 'যাঁহার নামে যাঁহার ধ্যানে/ সারা দুনিয়া দীওয়ানা প্রেমে মশগুল' কিংবা ছিল 'ত্রিভুবন যাঁহার পথ চাহি' ইত্যাদি পংক্তিতে। তবে এ গানের এই চিত্রকল্পের দুটি অন্যতম উৎস উপমার একটি 'হাসে আকাশ পরিয়া চাঁদের ফুল' এবং অন্যটি 'এল ফোটাতে দুনিয়াতে ইসলামী গুল'। সৃষ্টির সকল কিছুর মূলেই সেই মহান আল্লাহ্‌র অশেষ করুণাধারা নিয়ত বহমান এবং তারই ইশারা আকাশে চাঁদের কিরণ ও কাননের ফুল। চন্দ্র-করোজ্জল রাতের পৃথিবী যেমন মানব- নেত্রে অনিন্দ্যসুন্দর বলে মনে হয় এবং কাননের পুষ্প যেমন তার সুগন্ধ ও সৌন্দর্যে চিত্তকে আনন্দিত করে তোলে হজরত মোহাম্মদ (সা)-ও আঁধার মগ্ন পৃথিবীতে তেমনি এক অনি:শেষ রহমত হিশেবে কল্পিত হয়েছেন— যাঁর জন্য সারা দুনিয়া দীওয়ানা প্রেমে মশগুল। চাঁদকে আকাশের ফুল ও ইসলামকে 'গুল' হিশেবে দেখার শুষ্ক মরুভূমি নীরস খর্জুর তরু আকাশ, চাঁদ ও ফুলের চিত্রকল্পের আন্তর-সৌন্দর্য সহস্রগুণ বেড়েছে— তাতে সন্দেহ নেই। সব মিলিয়ে মহানবীর আবির্ভাবে মরু সাহারায় আনন্দের প্রতিক্রিয়া এ-গানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাকে এক কথায় অসাধারণ বলা যায়।

হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব বিষয়ক কী কবিতায়, কী গানে, সর্বত্রই কবি জগৎ-জীবন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আকাশ-মণ্ডলী থেকে উপমা, প্রতীক রূপক কিংবা সাদৃশ্য কল্পনা ও সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে মহানবীর আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়াকে আরে বেশি সচল, দৃষ্টিগ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য ও অর্থবোধক করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবে প্রথম দিকের রচিত কবিতায় ও গানে ব্যবহৃত এসব অলঙ্কার পরবর্তী কালে ঘুরে ফিরে এলেও নতুন কোনো চিত্রকল্প আর খুব বেশি সংযোজিত হয়নি। আবির্ভাব পর্যায়ের আর একটি গান :

বাহিরে হেরিনু আমি : বেহেশ্‌তী রৌশ্‌নীতে রে,
ছেয়েছে জমিন ও আসমান;
আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশতা হুর গেলেমান—
এল কে, কে এল ভূলোকে।
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে ॥

কিংবা—

তাপীর বন্ধু, পাপীর ত্রাতা,
ভয়ভীত পীড়িতের কারণ দাতা,

www.pathagar.com

মূকের ভাষা, নিরাশার আশা,
ব্যথার শান্তি, সান্ত্বনা শোকে
এল কে ভোরের আলোকে ॥

অথবা—

চন্দ্র সূর্য তারকা সবে
ঝুঁকে প'ড়ে কুর্ণিশ করে নীরবে,
হেরে আমিনার কোলে
খোদার সাথী দোলে-দোলে রে।[৫০]

উদ্ধৃত গানটির প্রথম স্তবকে হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে বেহেশতের রৌশনী, নূর বা জ্যোতি হিশেবে অঙ্কিত করা হয়েছে– যাঁর আগমনে আসমান-জমিন আলোকিত হয়ে উঠেছে, ফেরেশ্‌তা ও হুর গেলেমান সহ সমগ্র দুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে 'দুলিয়া' ওঠার চিত্রে মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব, অসাধারণত্ব ও মাহাত্ম্যই ফুটে উঠেছে। মধ্যম স্তবকে রসূলুল্লাহ, 'তাপীর বন্ধু", পাপীর ত্রাতা', ভীত-সন্ত্রস্ত পীড়িতের আশ্রয়দাতা, দুর্বলের মুখে অন্যায়ের প্রতিবাদের ভাষাস্বরূপ, হতাশের আশা, ব্যথাতুরের শান্তি ও শোকাহত মানুষের শোকের সান্ত্বনা' বাণীর মধ্যে বিশ্বনবীর অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানবিক গুণাবলী মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠেছে। শেষ স্তবকে তাঁকে খোদার সাথী হিশেবে দেখানো হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর 'আহমদ' নামটি নিয়ে যত রকমের তত্ত্বকথা এ পর্যন্ত শোনা গেছে 'মুহম্মদ' নিয়ে ততটা নয়। 'মুহম্মদ' নামটি হজরতের দাদা 'আবদুল মোত্তালিব' রেখেছিলেন। আরবী অভিধানে এ শব্দটি থাকলেও নাম হিশেবে এতদিন কোন গোত্র বা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য তালিকাভুক্ত করেনি। আবদুল মোত্তালিবই সর্ব প্রথমে আরবের তৎকালীন প্রথাবদ্ধ রীতিকে অগ্রাহ্য করে দৌহিত্রের নাম রাখেন মুহাম্মদ অর্থাৎ চিরপ্রশংসিত বা উচ্চ প্রশংসিত। জননী আমেনা খাতুন নাম রেখেছিলেন 'আহমদ'। 'আহমদ' নামটি তিনি স্বর্গীয় ফেরেশতাদের নিকট থেকে স্বপ্ন যোগে পেয়েছিলেন।[৫১] কিন্তু সমগ্র বিশ্বে হজরত মোহাম্মদ (সা) 'মুহম্মদ' হিশেবেই সমধিক খ্যাত। যৌবনে তিনি আরব বিশ্বে আর একটি নাম বা খেতাব অর্জন করেছিলেন— যা তাঁর জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে—সেটি হলো 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসীদের নেতা বা সত্যবাদী- 'সাদিক'। তথাপি 'আল্লাহর পবিত্র কালেমার শেষে 'মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ' যুক্ত হওয়ায় সর্বগুণে গুণান্বিত হয়ে উঠেছে এই অসাধারণ নাম 'মুহম্মাদ'। ফেরেশ্‌তারা 'আহমদ'-এর কথা বললেও মহান আল্লাহ্‌ জনগণের রায় বা সুপারিশকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। 'আহাদ' নামটি সম্ভবত এ কারণেই অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। তবুও সূফী তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিকতাবাদীরা 'আল্লাহ্‌ ও আহমদ'এর মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন যুগে যুগে। তত্ত্ববাদীদের ধারণা আসলে 'আহমদ' (চরম প্রশংসাকারী) 'আহমদ' এরই অংশ বিশেষ। আল্লাহর নিরানব্বইটি বিশিষ্টতাজ্ঞাপক

www.pathagar.com

ও আত্মপরিচয়সূচক নামের মধ্যে 'আল-আহাদ' অন্যতম— যার অর্থ এক বা অদ্বিতীয়।[৫২] কবির কোনো কোনো গানে এই তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে। দু একটি উদাহরণ :

'আহমদ' নাম সম্পর্কে

মিম হরফ না থাকলে যে আহাদ,
নামে মাখা যার শিরিন শহদ,
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ
ত্রিভুবন উজালা ॥[৫৩]

অনুরূপ আর একটি গানে :

আহমদের ঐ মিমের পর্দা উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন হেরে গুণীজন ॥...
ঐ রূপ দেখে রে পাগল হ'ল মন্‌সুর হল্লাজ
সে 'আনাল হক' 'আনাল হক' বলে ত্যজিল জীবন ॥[৫৪]

উপরে উদ্ধৃত দু'টি গানেই গূঢ় সূফীতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে সত্য কিন্তু 'লা-শরীক আল্লাহ'র স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সা)এর স্বরূপের উৎসেরও তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিকটি মনশ্চক্ষে মুহূর্তেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সম্ভবত: একারণেই নূর জ্যোতি: সূর্য চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি এ পর্যায়ের গানে খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। কেননা, সমগ্র বিশ্ব জগৎ তো আল্লাহর নূরের তরঙ্গে নিয়ত দোদুল্যমান বলে সূফীসাধকরা মনে করেন। কবি-কল্পনায় সেই তত্ত্বদর্শনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

সূফীতত্ত্বের উচ্চস্তরে আপন সাধনাবলে যাঁরা আরোহণ করতে পারেন, তাঁরাই কেবল আল্লাহর ঐ অসীম নূরের তরঙ্গ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। উপর্যুক্ত দুটি গানে 'আহাদ' ও 'আহমদ'-এর মধ্যে কবি শুধু 'মিম' হরফটি অতিরিক্ত বিবেচনা করেছেন। তিনি মহানবীকে আল্লাহ্‌র অসীম নূরের একটি অংশ হিসেবে দেখেছেন। যে সাধন-মার্গে বিচরণ করতে গিয়ে সূফী সাধক মন্‌সুর হল্লাজ আল্লাহ্‌র ঐ রূপ বা অসীম উজ্জ্বল নূরের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং দেখে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন—প্রকৃত অবস্থা তারও চেয়ে দু'ধাপ ওপরে বলে সতর্ক সূফীবাদীরা অনেকেই মনে করে থাকেন।

সূফীবাদের অন্যতম প্রবক্তা মনসুর হল্লাজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে শেষ গানটিতে। এই তত্ত্ব বা মতবাদটি ইসলামের মূল লক্ষ্যে যে আঘাত হেনেছে— প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক ও ধর্মসচেতন ব্যক্তিমাত্রেই তা স্বীকার করেন। কেউ কেউ মনে করেন :

'গ্রীক, পারসিক এবং ভারতীয় দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানরাও নিজেদের বলিষ্ঠ আদর্শ হইতে বিচ্যুৎ হইল; তাহাদের মধ্যেও গ্রীক মায়াবাদ ও ভারতীয় অদ্বৈতবাদ বাসা বাঁধিল। একদল মুসলিম সাধক সূফীমতবাদ প্রচার করিলেন। প্লেটো ও শঙ্করের ন্যায়

www.pathagar.com

তাঁহারা বলিলেন ঃ এই জগৎ মিথ্যা, একমাত্র আল্লাহই সত্য; সুতরাং তাঁহারা দুনিয়াদারী ত্যাগ করিয়া শুধু আল্লাহ্‌র ধ্যানে তন্ময় হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও তাঁহারা বলিলেন, জগতের সব কিছুই আল্লাহময়। শঙ্কর যেমন বলিলেন ঃ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম); সূফী মন্‌সুর হল্লাজও তেমনি বলিলেন ঃ 'আনাল হক' (আমিই আল্লাহ্)। কাজেই দেখা যাইতেছে, অদ্বৈতবাদ ও সূফীবাদে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেন দেশীয় ইবনে আরাবী এই সূফীবাদকে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দেন। তিনি ইহার নাম দেন 'ওয়াহিদাতুল অজুদ' (অদ্বৈতবাদ) ইংরাজীতে ইহাকে Sufistic Pantheism বা Pantheistic Sufism বলা হয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আল্‌ফসানি এই 'ওয়াহিদাতুল অ্জুদ' মতবাদের খণ্ডন করেন। তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, খালিক মখলুকের অভিন্নতা ও একাত্মবোধ সাধন মার্গের একটা স্তর বিশেষ, উহা চরম সত্য নহে। আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইলে এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া সাধক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়—যেখানে মনে হয় স্রষ্টা এবং সৃষ্টিতে কোনই পার্থক্য নাই। সর্বভূতে সে শুধু আল্লাহকেই দেখিতে পায়। এই উপলব্ধির ফলেই সে বলিয়া উঠে 'আনাল হক'। কিন্তু এখানে আসিয়া স্তব্ধ বা সম্মোহিত হইয়া গেলে চলিবে না। এই স্তরের উপরে আর এক স্তর আছে : তাহাদের নাম 'জিল্লিয়াৎ ও 'আবদিয়াৎ'। 'ওয়াহিদাতুল অজুদ' স্তরকে অতিক্রম করিলে দেখা যাইবে সারা সৃষ্টি আল্লাহর নূরের তরঙ্গে দোল খাইয়া ফিরিতেছে। ইহাই 'জিল্লিয়াতে'র অবস্থা। সর্বশেষে আসিবে 'আবাদিয়াতে'র স্তর। এই স্তরে আসিলেই সাধক বুঝিতে পারিবে আল্লাহ মহত্তোমহীয়ান চিরগরীয়ান।'৫৫

উক্ত সূফীতত্ত্ব মিশ্রিত দু'টি গানেই কবির আধ্যাত্মিক, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর নাম যে কেন এত মর্যাদার এবং স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর নামের সঙ্গে কেন তাঁর নাম (লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্) বিজড়িত সে সম্পর্কে উক্ত গানে তার সমর্থন মেলে। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতেও উপর্যুক্ত বক্তব্যের প্রতিপোষণ পাওয়া যায়। গানটি এই—

মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবী।
বাদশারও বাদ্‌শাহ নবীদের রাজা নবী ॥
ছিলে মিশে আহাদে, আসিলে আহমদ হয়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার এলে খোদার সনদ লয়ে;
মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত সয়ে,
মলিন দুনিয়ায় আনিলে তুমি সে বেহেশ্‌তী ছবি ॥
পাপের জেহাদ রণে দাঁড়াইলে তুমি একা;
নিশান ছিল হাতে 'লা-শরীক আল্লাহ্" লেখা;
গেল দুনিয়া হতে ধুয়ে' মুছে' পাপের রেখা,
বহিল খুশীর তুফান, উদিল পুণ্যের রবি ॥

www.pathagar.com

এ গানেও মহানবীর বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামানবের আদর্শ যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্যও ব্যক্ত হয়েছে। এখানেও 'আহাদ'এরই বিশেষ অংশ যে 'আহমদ'-তাও বিশেষভাবে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

দশ-বারো-চৌদ্দ কিংবা ষোল পংক্তির স্বল্পায়তন বিশিষ্ট রসুলপ্রশস্তিমূলক গানে মহানবীর স্বত:স্ফূর্ত জ্যোতির আভা যেন সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। এসব গানে বিচিত্র ও প্রাণবন্ত এবং গতিশীল ও দ্যুতিমান উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারের জন্য আবদুল মান্নান সৈয়দ নজরুল ইসলামকে যে 'চিত্রকল্পের সম্রাট' বলেছেন তা আদৌ অত্যুক্তি নয়।[৫৭] নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে চন্দ্র সূর্য আসমান তারা ধূলি গোলাব বুলবুলি'র অনুষঙ্গে মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব :

ওরে ও চাঁদ উদয় হলি কোন্ জোছনা দিতে
দেয় অনেক বেশী আলো আমার নবীর পেশানীতে ॥
ওরে রবি! আলোক দিস যত তুই দগ্ধ করিস তত,
আমার নবী স্নিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মত,
সে নাশ করেছে মনের আঁধার ঈষৎ হাসিতে ॥
ওরে আসমান! তুই সুনীল হলি জানি কেমন ক'রে,
আমার নবীর কালো চোখের একটুকু নীল হ'রে।
ওরে তারা! তোরা জ্যোতি পেলি নবীর চাউনিতে ॥
ওরে বসরা গোলাব! অনেক বেশী খোশ্‌বু তোদের চেয়ে
সেই ধূলিতে মোর নবীজি যেতেন যে পথ বেয়ে'।
সেই বারতা ফুলকে শোনায় বুলবুলি সঙ্গীতে।[৫৮]

হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্যের সঙ্গেই বিশেষভাবে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তি মানসকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে তার উজ্জ্বলতা, স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তাকে যে অসাধারণ মর্যাদায় ও গৌরবে বিভূষিত করে তোলা হয়েছে তা নি:সন্দেহে অনুপম। আসলে মহানবীর উপমা তিনি নিজেই। বরং যে সব পার্থিব-অপার্থিব দৃষ্টিগ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু-দৃশ্য ও রূপের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়েছে— সে সব ক্ষেত্রে উপমেয়র চেয়ে উপমানের ধর্ম ও অর্থগৌরব ও ভাবসুষমাই সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, উপমেয় স্বয়ং সর্বগৌরবে ও আন্তর-ধর্মে গৌরবান্বিত ও গুণান্বিত। চাঁদের অনুষঙ্গে আরো কিছু তুলনীয় গান :

ও কে সোনার চাঁদ কাঁদে রে হেরা গিরির' পরে।
শিরে তাঁহার লক্ষ কোটি চাঁদের আলো ঝরে।
কী অপরূপ জ্যোতির ধারা নীল আসমান হতে'
নামে বিপুল স্রোতে,
হেরা পাহাড় বেয়ে বহে সাহারা মরুর পথে,—
সেই জ্যোতিতে দুনিয়া আজি ঝলমল করে ॥[৫৯]

www.pathagar.com

পবিত্র ঈদের চাঁদের অনুষঙ্গে,—

আমার প্রিয় হজরত নবী কম্‌লিয়ালা।
যাঁহার রওশনীতে দ্বীন-দুনিয়া উজালা ॥
যাঁরে খুঁজে ফেরে কোটি গ্রহ-তারা,
ঈদের চাঁদে যাঁহার নামের ইশারা;
বাগিচায় গোলাব গুল গাঁথে যাঁর মালা ॥[৬০]

উপরে উদ্ধৃত প্রথম গানটিতে মহানবীকে সোনার চাঁদ হিসেবে দেখানো হয়েছে যিনি মানুষের দুর্গত অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য মক্কার অনতিদূরে নির্জন হের পর্বতের গুহায় সাধনায় ক্রন্দনরত। এবং 'শিরে তাহার লক্ষ কোটি চাঁদের আলো ঝরে।' এ গানে লক্ষ কোটি চন্দ্রের 'অপরূপ জ্যোতিধারা' ও মহানবী অভিন্ন কল্পিত হয়েছে। এবং তাঁর অত্যুজ্জ্বল আলোক-রশ্মিতে অন্ধকার পৃথিবী বিচিত্র শোভায় দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। অসাধারণ এই কল্পচিত্র।

উদ্ধৃত দ্বিতীয় গানটিতে ভক্তের ভক্তি-উচ্ছ্বাসের অন্তরাবেগের সুগভীর আন্তরিকতা লক্ষ্য করার বিষয়। মহানবীকে এখানে কম্‌লিওয়ালা বা কম্বলধারী হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। ঈদের চাঁদের পবিত্রতা, প্রশংসা ও রহমতের সঙ্গে মহানবীর নামের মাহাত্ম্য এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র এ গানেও অভিন্ন কল্পিত হয়েছে। বিশেষ করে 'ঈদের চাঁদে যাহার নামের ঈশারা' এই পংক্তির মধ্যেই যেন হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর বিশিষ্টতা 'যাঁহার রওশনীতে দ্বীন-দুনিয়া উজালা।' মহানবীর উদ্দেশ্যে বাগিচার গোলাপ ফুলের মাল্য রচনের মধ্য দিয়ে তার আত্মনিবেদনে যে পরম প্রাপ্তির আনন্দ তা কি বিস্ময়কর নয়?

হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে নীচের গানটিতেও পবিত্র ঈদের চাঁদের অনুষঙ্গে অনুরূপভাবে অন্য নিরিখে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে তাঁর বাহ্যিক রূপ ও আন্তর-সৌন্দর্যে মুগ্ধ এক ভক্তিমতীর দৃষ্টিতে মহানবী :

ও কি ঈদের চাঁদ গো!
ওকি ঈদের চাঁদ চলে মদিনারই পথে
যেন হাসীন্ য়ুসোফ ফিরে এলো ফেরদৌস হ'তে ॥...
তার সাদা কবুতরের মত চরণ দু'টি ছুঁয়ে'
গোলাপ চাঁপা উঠছে ফুটে' ধুলিমাখা ভূঁয়ে।
সেই চাঁদের মুখে জ্যোৎস্না-সম খোদার কালাম ঝরে,
তার রূপ দেখে তার গুণ শুনে মোর মন রহে না ঘরে!
আমি উন্মাদিনী সেই মদ্যনী নবীর মোহব্বতে।[৬১]

মদিনাবাসী নবীর মহব্বতে উন্মাদিনী ভক্তিমতীর চোখে মহানবীকে অসাধারণ সুন্দর হিসেবে এ গানে চিত্রিত করা হয়েছে। সুন্দর-শ্রেষ্ঠ ইউসুফ নবীর দৈহিক রূপ-লাবণ্যের এবং ঈদের

www.pathagar.com

চাঁদের উজ্জ্বলতার অনুষঙ্গে তাঁর সৌন্দর্য আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। বাগানের ধূলিমলিন গোলাপ-চাঁপা ফুল পর্যন্ত মহানবীর 'সাদা কবুতরের মত চরণ দু'টি ছুঁয়ে জীবন সার্থক করেছে এবং রূপবান, মনোহর 'সেই চাঁদের মুখে জ্যোৎস্নাসম খোদার কালাম ঝরে'। শেষ পংক্তিটি নি:সন্দেহে গরিমাদীপ্ত ও দ্যুতিময়। এ গানে বিশেষ করে চাঁদ ও বিকীর্ণমান জ্যোৎস্না এবং মহানবী তুলনা, উপমা ও সাদৃশ্য কল্পনার গুণে ও গৌরবে, প্রয়োগ নৈপুণ্যে যেমন অভিন্ন অর্থে, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় শিখরস্পর্শী হয়েছে ভক্তিমতীর তীব্র আকর্ষণ, আর্তি-আকুলতা, গুরুত্ব ও মহিমা তেমনি হয়েছে চিত্তজ ও হৃদয়গ্রাহী।

হেরার গিরিগুহা থেকে গৃহে প্রত্যাগমনকারী মহানবীর চলার পথে তাঁকে যে চিত্রকল্পে গরীয়ান করে তোলা হয়েছে তা বিস্ময়কর। প্রিয় নবী কেমন কবির দৃষ্টিতে,—

হেরা হতে হেলে' দুলে' নূরানী তনু ও কে আসে, হায়।
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা খুলে' খুলে' যায়,'
সে যে আমার কম্‌লিওয়ালা কম্‌লিওয়ালা ॥

তার ভাবেবিভোল রাঙা পায়ের তলে
পর্বত জঙ্গম টলমল টলে,
খোরমা খেজুর বাদাম জাফরানী ফুল ঝরে' ঝরে' যায় ॥

আসমানে মেঘ চলে ছায়া দিতে,
পাহাড়ের আঁসু গলে ঝরনার পানিতে;
বিজুলি চায় মালা হ'তে
পূর্ণিমা চাঁদ তাঁর মুকুট হ'তে চায়।[৬২]

হেরা পর্বতের গুহায় প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহানবীর প্রাথমিক মুহূর্তটিকে উদ্ধৃত গানে কী চমৎকারভাবেই না ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ গানের অসাধারণ ভাব ও গৌরবদীপ্ত পংক্তিটি হলো, সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা খুলে' খুলে' যায়'। ঝরণার পানিকে কঠিন হৃদয় পাহাড়ের আনন্দাশ্রুরূপে, বিজুলিকে মহানবীর কণ্ঠের মালা এবং পূর্ণিমা চাঁদকে তাঁর মাথার মুকুট হতে চাওয়ার চিত্রকল্পের মধ্যে যে আনন্দের স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তা তুলনাবিরল। সমগ্র বিশ্ব যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ঠিক তখনই হযরত মোহাম্মদ (সা) ধূলির ধরায় অবতীর্ণ হলেন দু:খী ও আর্ত মানুষের জন্য অশেষ কল্যাণ, অফুরন্ত ক্ষমা-দয়া-মায়া, দরদ ও অনি:শেষ প্রদীপ্ত আলোর দিশারীরূপে। 'হেরেম' অর্থাৎ অন্ধকারের বন্দীজীবন থেকে উদ্ধার করে মানুষকে তিনি আহ্বান জানালেন এ অসীম আলোর জগতে। অতএব অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর সর্বত্র সেদিন যে উজ্জ্বল আলোর জ্যোতির্ময়ীরূপ বিচ্ছুরিত হলো—তার প্রভায় শুধু মক্কা-মদিনা নয়—সমগ্র ইউরোপ-আফ্রিকা-এশিয়া উদ্ভাসিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল।

www.pathagar.com

মহানবীকে কত বিচিত্র অনুষঙ্গে ও অনুভবে নজরুল ইসলাম দেখেছেন ও প্রকাশ-সৌন্দর্যে অনিন্দ্য করে তুলেছেন তা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। গজল অঙ্গের নিম্নোদ্ধৃত এ গানটিতে মহানবী কল্পিত হয়েছেন সাকীরূপে। অসাধারণ গানটি,—

এ কোন মধুর শারাব দিলে আল্-আরবী সাকী।
নেশায় হলাম দীওয়ানা যে, রঙীন হ'ল আঁখি ॥
তৌহিদের শিরাজী নিয়ে
ডাকলে সবায় : 'যা রে পি'য়ে।'
নিখিল জগৎ ছুটে' এল,/ রইলো না কেউ বাকী ॥
বসলো তোমার মহ্ফিল দূর মক্কা-মদিনাতে,
আল-কোরানের গাইলে গজল শবেকদর রাতে।
নরনারী বাদশা ফকির/ তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজ্‌রানা দিল/ রাঙা পায়ে রাখি ॥

তোমার কাসেদ খবর নিয়ে ছুটলো দিকে দিকে,
তোমার বিজয়-বার্তা গেল দেশে দেশে লিখে'।
'লা-শরীকে'র জলসাতে তাই/ শরীক হ'ল এসে' সবাই;
তোমার আজান গান শুনালো/ হাজার বেলাল ডাকি।[৬৩]

এ গানটিরও বাণীর সারল্য ও ভাবের বৈভব যেমন মনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে তেমনি এর আরব-পারস্যের ঐতিহ্যের বিমিশ্রণও উল্লেখযোগ্য। ইরানী কবি হাফিজ ও খৈয়ামের সেই ভাবোন্মত্ততার শোকে কবি এখানে হজরত মোহাম্মদ (সা) কে 'সাকী'[৬৪] হিসেবে কল্পনা করেছেন। তিনি স্বয়ং আর সকলের মতোই হজরতের প্রেম দীওয়ানা। কেননা, তৌহিদজপী সিরাজী তো সাকী সেজে তিনিই বিশ্বমানবের দরবারে পরিবেশন করেছেন। বিশ্বাস করা হয় পবিত্র রমজান মাসের সাতাশ তারিখের রাতে 'আল কোরান' বিশ্ববাসীর অশেষ নেয়ামতরূপে নাজেল হয়। কোরানের এই পবিত্র বাণীই প্রথমে তিনি মক্কার জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন।

নবদীক্ষিত মুসলমানদের নামাজে আহ্বান করার জন্য অন্যান্য ধর্মে যেমন ঘন্টাধ্বনি করা, আগুন জ্বালানো কিংবা শিঙায় ফুঁ দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে, ইসলামে তেমনি আজান বা আহবানের প্রচলন হয়। হজরত জিব্রাইল (আ)-ই এই আজানের বাণী ও নিয়ম-কানুন আল্লাহর নির্দেশে হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্বের প্রথম মোয়াজ্জিন হজরত বেলাল ছিলেন অতিশয় সুললিত ও মধুর কণ্ঠের অধিকারী। মক্কা-মদীনার নও-মুসলিমদের নামাজের জামাতে শামিল করার উদ্দেশ্যেই মহানবীর নির্দেশে তিনি উচ্চ কণ্ঠে সকলকে কোরানের ভাষায় আহবান জানাতেন। এই আজানে আল্লাহর মহত্ত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব আছে, আছে তাঁর প্রিয়তম রসূলের স্বীকৃতি ও তাঁর পবিত্র নামের পাশে

www.pathagar.com

মহিমোজ্জ্বল সহ-অবস্থান। তাছাড়া আছে উপাসনার জন্য প্রস্তুতির তাগিদ এবং জগৎ-কল্যাণ ও তার সাফল্যের ইঙ্গিতও আজান ধ্বনির মধ্যে নিহিত।

পরিচর্যা, পরিশীলিত কণ্ঠের মাধুর্য নি:সৃত সঙ্গীত যেমন শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়কে মুহূর্তেই মোহাবিষ্ট করে তোলে-হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর কণ্ঠে "আল-কোরানের গজল" ও তেমনি অন্ধকারে নিপতিত আরব জাতিকে সেদিন নব-জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। হজরত বেলালের সুরেলা-দারাজ কণ্ঠের "লা-শরীকের" আজান গান' সেদিনের মক্কা-মদিনার আকাশ-বাতাসকে করে তুলেছিল মুখরিত। এই ভাবটিই গানটিতে মুখ্য। নজরুল ইসলামের এ গানটিও একটি অনবদ্য সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।[৬৫]

আবির্ভাব অঙ্গের আর একটি অতিশয় জনপ্রিয় গানের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। এ গানটিতে শিশু নবীকে 'শিশু-ইসলাম' হিসেবে দেখানো হয়েছে। মাত্র ষোল পংক্তির গানটির ভাবার্থ ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আকাশ-ছাপানো অভিব্যক্তির প্রকাশ-সারল্য এবং শেষে চরণের অন্তমিলে আরবী শব্দ, যোজনার অভিনবত্ব হৃদয়কে মুহূর্তেই বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকের অনাস্বাদিতপূর্ব মনোরম অনুভূতির দোলায় মানস জগৎকে একটি বিশিষ্ট পরিমণ্ডলে স্থিত করে। সেই গানটি,—

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়।
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।
ধূলির ধরা বেহেশ্‌তে আজ
জয় করিল, দিল রে লাজ;
আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায় ॥
দেখ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে,
কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায় ॥...
নিখিল দরুদ পড়ে ল'য়ে ও নাম
'সাল্লাল্লাহু আলায় হি অ-সাল্লাম;'
জীন্ পরী ফেরেশতা সালাম
জানায় নবীর পা'য় ॥[৬৬]

এ পর্যন্ত যে-সব গান নিয়ে আলোচনা করা হলো তার সবটাই হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব উপলক্ষে অথবা তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত। তিরোভাব পর্যায়ে কবির রচিত গানের সংখ্যা অনেক কম। কবিতার সংখ্যাও অতি নগণ্য। 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' তিরোভাব' অংশে কবিতাটি ছাড়া নজরুল-কাব্যে আর কোনো তিরোভাব-সূচক কবিতা পাওয়া যায় না।[৬৭] এ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত গানটি উল্লেখযোগ্য—

সেই রবিয়ল আউলেরই চাঁদ এসেছে ফিরে
ভেসে' আকুল অশ্রুনীরে।

www.pathagar.com

আজ মদিনার গোলাপ বাগে বাতাস বহে ধীরে
ভেসে আকুল অশ্রুনীরে ॥
তপ্ত বুকে আজ সাহারার
উঠেছে রে ঘোর হাহাকার,
মরুর দেশে এলো-আঁধার-লোকের বাদল ঘিরে'
আকুল অশ্রুনীরে ॥৬৮

'জুলফিকার' গীতি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৬-সংখ্যক গানটিও মহানবীর তিরোভাব উপলক্ষে রচিত। এ গানের রচনাকাল, প্রকাশের তারিখ ও পত্র-পত্রিকার নাম জানা যায়নি। তৎকালীন মদিনাবাসীর শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের এক সকরুণ চিত্র ফুটে উঠেছে এ গানে। গানটির অস্থায়ী ও অন্তরা অংশটি নিম্নরূপ :

অসীম বেদনায় কাঁপে মদিনাবাসী।
নিভিয়া গেল চাঁদের মুখের হাসি ॥
শোকের বাদল আছড়ে প'ড়ে
কাঁদছে মরুর বুকের পরে,
ব্যথার তুফানে আরব গেল ভাসি ॥৬৯

'সঙ্গীতাঞ্জলি' গীতিগ্রন্থে তিরোভাব পর্যায়ের আরো দু'টি গান পাওয়া যায়। নজরুল একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ৫৬-সংখ্যক এবং পঞ্চম খণ্ডে ৭২-সংখ্যক ঐ গান দুটি সংকলিত হয়েছে বলে আবদুল কাদির লিখেছেন। এ গান দু'টিরও আর কোনো তথ্য সংগৃহীত হয়নি। ৫৬-সংখ্যক গানটিতে মহানবীর তিরোধানে নিখিল-বিশ্বের শোকের চিত্র কবির ভাষায় :

হায় হায় উঠেছে মাতম্
আকাশ পবন ভুবন ভরি'।
আখেরী নবী দ্বীনের রবি নিল বিদায়
বিশ্ব নিখিল আঁধার করি' ॥
অসীম তিমিরে পুণ্যের আলো
আনিল যে চাঁদ, সে কোথা লুকালো;
আকাশে ললাট হানি' কাঁদিছে মরুভূমি,
শোকে গ্রহ-তারকা পড়িছে ঝরি ॥৭০

৭২- সংখ্যক গানটিতে শোকের চিত্র :

বহে শোকের পাথার আজি সাহারায়।
"নবীজী নাই"- উঠলো মাতম্ মদিনায় ॥
আঁখি-প্রদীপ এই ধরনীর
গেল নিভে, ঘিরিল তিমির;

www.pathagar.com

দ্বীনের রবি মোদের নবী চায় বিদায়।
সইলো না রে বেহেশ্‌তী দান দুনিয়ায় ॥...
ধরার জ্যোতি হরণ করে
উজল হ'ল ফের বেহেশ্‌ত;
কাঁদে পশু-পাখী ও তরুলতায়,
সেই কাঁদনের স্মৃতি দোলে দরিয়ায় ॥[৭১]

লক্ষ্য করার বিষয়-আলোচ্য গান দুটি তিরোভাব পর্যায়ের হলেও কবি দুটি গানের বাণীতেই 'মাতম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারবালার হৃদয়-বিদারক শোকাবহ ঘটনাকে স্মরণ করে দশই মুহররম মাসে যে শোক-অনুষ্ঠান হয় (শিয়া মুসলিমরা এটা করে থাকে) সাধারণত: তাকেই 'মাতম' বা 'মর্সিয়া (শোকগীতি) বলা হয়ে থাকে। মহানবীর ওফাতের পর শুধু মদিনায় কিংবা মক্কায় নয়-সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোকের যে কালোছায়া পড়েছিল তারই অতলস্পর্শী ও মর্মবিদারী অবস্থাকে পরিস্ফুটনের জন্য তিনি সম্ভবত: 'মাতম' শব্দটি ব্যবহার করে ঘনীভূত শোকের ব্যাপকতা ও গভীরতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। শব্দটি প্রয়োগে একই সঙ্গে কারবালার নৃশংস ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞের নারকীয় চিত্র যেমন ফুটে ওঠে-- তেমনি মহানবীর ইন্‌তিকালে বেদনাহত মানুষের শোকোচ্ছ্বাসের সকরুণ বিলাপধ্বনিও গভীরতর হয়ে প্রতিভাত হয় পাঠক চিত্তে।

নজরুল মহানবীর তিরোভাবের উপরে খুব বেশি গান রচনা করেননি সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। সম্ভবতঃ শোকাবহ ঘটনার চেয়ে মহানবীর আবির্ভাব-অবস্থার মধ্যে বিশ্ব-জগৎকে বিচিত্রভাবে, গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার আকুল আগ্রহেই তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফূর্তি ঘটেছে সমধিক। তাছাড়া প্রয়াত মহানবীর চেয়ে জীবিত রসূলের জীবনাদর্শই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল সবচেয়ে বেশি। ঘুমন্ত মুসলিম জাতির মোহনিদ্রা ভাঙানোর জন্য, তার চিত্তে নব শক্তির আবাহনের জন্য মানুষের জীবন্ত-সত্তার প্রভাবকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর হাতে রসুল পর্যায়ের গানে বহু-ভঙ্গিম দৃষ্টিতে হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে দেখার ও গভীরভাবে অনুভব করার আন্তরিক প্রয়াস প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর আবহে রচিত নজরুল ইসলামের আরো একটি গান পাওয়া যায়। পদাবলীর বহিরাবরণে রচিত হলেও এর আন্তর-নির্যাস শক্তি কোরান এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন হজরত মোহাম্মদ (সা)—যাঁকে এ গানে 'মদিনাওয়ালা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ঐ গানটি—

কেন তুমি কাঁদাও মোরে, হে মদিনাওয়ালা।
অবরোধ-বাসিনী আমি কুলের কুলবালা,
হে মদিনাওয়ালা ॥
ঈদের চাঁদের ইশারাতে
কেন ডাক নিঝুম রাতে,

www.pathagar.com

হাসীন্ য়ুসোফ, জুলেখারে কত দিবে জ্বালা।
হে মদিনাওয়ালা ॥
বাজিয়ে শাহাদাতের বাঁশি
কেন ডাক নিত্য আসি',
হাজার বছর আগে তোমায় দিয়েছি ত মালা।
হে মদিনাওয়ালা ॥[৭২]

উদ্ধৃত গানটির 'অবরোধ-বাসিনী' 'কুলবালা', 'ডাক নিঝুম রাতে', 'হাসীন য়ুসোফ', 'জুলেখা', 'শাহাদাতের বাঁশী' এবং মহানবীর কণ্ঠে মাল্যদানের বিষয়টি স্পষ্টতই পদাবলীর 'রাধা-কৃষ্ণে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭৩]

এ গানে 'মদিনাওয়ালা' হজরত মোহাম্মদ (সা)- যিনি সত্য সাধক, তাঁর অনুসারিণী। অবরোধ বাসিনী' 'কুলবালা' প্রেম-দীওয়ানা 'জুলেখা' এবং কৃষ্ণপ্রেম সাধিকা সংসার চক্রে গৃহ-বন্দিনী রাধিকা কবির উচ্ছ্বসিত ভাবতরঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে। আরবীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে এই গানটিতে।

হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে আরো তিনটি স্বাতন্ত্র্যধর্মী গান কবি রচনা করেছেন। এ তিনটি গানের মধ্যে দুটি হজরত জননী আমিনার উক্তি এবং বাকিটি দুধমাতা হালিমার উক্তি। 'জুলফিকার' গীতিগ্রন্থের ৩৮ ও ৫২-সংখ্যক গান দুটি আমিনার উক্তি এবং একই গ্রন্থের ৩৩-সংখ্যক গানটি হালিমার উক্তি।

আরবের খান্দানী বা শরীফ পরিবারের প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুযায়ী বনি-সায়াদ গোত্রের হারেসের স্ত্রী হালিমার তত্ত্বাবধানে শিশুনবীকে লালন-পালনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়ে শিশুহারা জননী আমিনার যে দু:খ-ব্যথা-তাই ৩৮-সংখ্যক গানে ফুটে উঠেছে। হজরত জননীর মাতৃ-স্নেহের এ চিরন্তন দুর্বলতা প্রকাশে কবির সহজ আন্তরিকতা লক্ষ্য করার বিষয়। আমিনা খাতুন যখন বলেন :

তোরা যা রে এখনি হালিমার কাছে
লয়ে ক্ষীর সর ননী।
আমি খোয়াবে দেখেছি কাঁদিছে মা ব'লে
আমার নয়ন-মণি ॥....
পিতৃহীন সে সন্তান হায়
বঞ্চিত মা'র স্নেহে,
তারে ফেলে দূরে কোল খালি ক'রে
থাকিতে পারি না গেহে।[৭৪]

তখন হজরত-জননীর মধ্যে স্নেহ-কাতরা মায়ের শাশ্বত-রূপকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এতিম শিশুটিই প্রয়াত স্বামীর একমাত্র উত্তরাধিকারী, জননীর নয়নমণি, আঁচলের নিধি—

www.pathagar.com

তার দীর্ঘ অদর্শন জননীর কাছে অসহনীয় মনে হওয়াই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মায়ের এই সস্নেহ-সকাতর সহজ আন্তরিকতার রূপটি সারল্যে সুন্দর। স্নেহে-কাতরা জননীর বেদনাতুর অবস্থা পুত্র-অদর্শনে কেমন মর্মস্পর্শী হতে পারে ৫২-সংখ্যক গানটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মা রাতে ঘুমায় কিন্তু শিশু মুহাম্মদের জন্য হৃদয় জেগে থাকে কল্পনার দূরস্থিত আকাশে। মায়ের অসম্পূর্ণ বাসনা রূপ পায় নানা রঙের কল্পনার ডালি সাজিয়ে। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে জেগে ওঠে সুপ্ত মাতৃস্নেহের অথৈ সমুদ্র। কী মধুর মায়ের এই স্বর্গীয় মুরতি ও স্নেহার্দ্ররূপ। মা যখন বলেন :

ঘরছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে।
জাফরানী রঙের পরাব পিরান তোর গায় রে।
আয়রে ॥
আসমানে যেতে চায় তারা হয়ে আমার নয়ন-তারা
তোর খেলার সাথী কাঁদে শাপলার ফুল, ফিরে আয় পথহারা।
দু'নয়ন ঘুমে ঢুলে, হৃদয় ঘুমায় না, কাছে পেতে চায় রে ॥
চোখের কাজল তোর চাঁদ মুখে লেগেছে,
আয় মুছাব আঁচলে,
মায়ের পরানে তোর স্নেহের সাগর-তরঙ্গ উথলে
মোর মনের ময়না! ঘরে মন রয়না
পথ চেয়ে' রয়, রাত কেটে যায় রে ॥[৭৫]

তখন এ মা জগজ্জননীস্বরূপা-মায়ের বিভায় বিভূষিত চিরকল্যানী মাতৃমূর্তিরূপ ধারণ করে পাঠক-চিত্তের নিঃশেষিত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। স্নেহ-মায়া-মমতার এমন আন্তরিক অভিব্যক্তি কবির অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থ 'মরুভাস্কর' ও ব্রজের গোপাল নন্দ দুলাল শ্রীকৃষ্ণজননী যশোদার প্রসঙ্গে কয়েকটি গানে ছাড়া আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রথম গানটিতে যে 'ক্ষীর সর ননী'র কথা বলা হয়েছে— সেখানেও কৃষ্ণের 'ননীচোরা' প্রসঙ্গটিকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

হালিমা ধাত্রীমাতা-গর্ভধারিণী নন। তাঁর উক্তিতে হজরতের জন্ম-মুহূর্তের সেই সব ইসলামী মিথ-ঐতিহ্যপুষ্ট কাহিনীই রূপালঙ্কিত হয়েছে— যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নিম্নোদ্ধৃত গানটির আভোগ অংশটি চমৎকার। দুধমাতা হালিমার উক্তি :

সে চলে যায় যাবে মরুর উপরে,
বস্‌রা গোলাপ ফোটে থরে থরে,
তার চরণ ঘিরিয়া কাঁদে গুলবনে
অলিকুল গুঞ্জরি, ॥[৭৬]

www.pathagar.com

মায়ের কল্যাণী-দৃষ্টির মোড়কে শিশুর পরিভ্রমণের জগৎ উদ্ধৃত অংশে মনোরম চিত্রকল্পে মরুভূমিকে পর্যন্ত জীবন্ত করে তুলেছে। এ কবি-কৃতি নিঃসন্দেহে অসাধারণ।

জননী আমিনার কোলে শিশু মুহম্মদ (সা) যে কত সুন্দর নজরুল ইসলামের অসংখ্য গানে তা প্রমাণিত হয়েছে। 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে/ মধু-পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে/ যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে' অথবা 'নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া/ কে এল মক্কায় আমিনার কোলে/ ফাগুন-পূর্ণিমা নিশীথে যেমন/ আসমানের কোলে রাঙা চাঁদ দোলে'--- মায়ের কোলের এই অসাধারণ শিশুকে বিচিত্র অনুভবে কবি আর একটি গানে প্রকাশ করেছেন। সেই গানটি,—

আমিনার কোলে নাচে হেলে' দুলে'
শিশুনবী আহমদ রূপের লহর তুলে' ॥
রাঙা মেঘের কাছে ঈদের চাঁদ নাচে
যেন নাচে ভোরের আলো গোলাব গাছে।
চরণে ভোমরা গুঞ্জরে গুল ভূলে' ॥...
চাঁদনী-রাঙা অতুল মোহন মোমের পুতুল
আদুল গায়ে নাচে খোদার প্রেমে বেভুল।
আল্লাহর দয়ায় তোহ্ফা এল ধরার কূলে ॥[৭৭]

উদ্ধৃত গানটির নিম্ন-রেখাঙ্কিত চরণ-সমষ্টিতে কী অপূর্ব্ব চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। নাতে-রসূল পর্যায়ের অজস্র সঙ্গীতের মধ্যে নজরুল ইসলাম ভাবের গভীরতায়, ভাষার কারুকার্যে ও কখনো সারল্যে রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে, উপমা ও চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যে, নানা অনুষঙ্গে ও অনুভবের আন্তরিকতায় মহানবীকে বহু মাত্রিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। বরং বলা চলে কবি তাঁর নাম, নামের অজস্র বিশেষণ, গুণ ও তার বিচিত্র উপলব্ধি তার অন্তর ও বাইরের রূপ-সৌন্দর্য ও পূর্ণ অবয়বকে নব নব নিরিখে আবিস্কার করার সযত্ন প্রয়াস পেয়েছেন, সূক্ষ্মদর্শী তাত্ত্বিকের মতো সব কিছুকে ব্যাখ্যা করেছেন।

এ লেখা হজরত মোহাম্মদ (স:)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নয়, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে যেভাবে তাঁকে চিত্রিত করেছেন—এখানে সেই মহান ব্যক্তিত্বের কবি কল্পিত রূপই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। হজরতের শ্রেষ্ঠ জীবনীকাররা নানা তত্ত্ব ও তথ্য সম্ভারে এবং সহী হাদিস ও কোরানের আলোকে যেভাবে তাঁর সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ ও চরিতাদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন— কবি সেই গাণিতিক সূত্রকে অসম্মান না করেও সঙ্গীত ও কবিত্বের পরিচর্যায় কিছুটা স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন এ কথা সত্য। তবে তত্ত্ব ও তথ্যের মারাত্মক বিভ্রান্তি কোথাও ঘটেছে এমন প্রমাণ তাঁর রসূল বিষয়ক কবিতা ও গানে অনুপস্থিত। শুধু নাতে-রসূল পর্যায়ের দু'একটি গানে এবং 'মরুভাস্কর' কাব্যের 'শৈশব লীলা,'[৭৮] প্রত্যাবর্তন,'[৭৯] 'শাক্কুস্ সাদর'[৮০] ও 'কৈশোর'[৮১] কবিতায় বাঁশীর প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

এসেছে। কবিতায় ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা যখন হজরত মোহাম্মদ (সা)-কে দেখতে আগ্রহী তখন আমাদের মধুসূদনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি "When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias.[৮২] স্মরণ রাখা সমীচীন।

নজরুল ইসলাম নিজেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। একদা বাঙলার অশিক্ষিত, মূর্খ, গোঁড়া ও ঈর্ষাপরায়ণ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে জনাব আন্‌ওয়ার হোসেনকে ১৩৩২ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ, হুগলী থেকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছিলেন :

"মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দু:খ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ।... মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে– আমরা কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান-কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়ে এত ভুলের সৃষ্টি।

আমি আপাতত শুধু এইটুকুই বলে রাখি যে, আমি শরিয়তের বাণী বলিনি— আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ আরবদেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর থেকে আর সেথা কবি জন্মাল না। এটা সত্য।"[৮৩]

বাঙলার দুই শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী-বিপ্লবী কবির উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়— ধর্ম-ধর্মই এবং সাহিত্য মূলত: শিল্পকর্ম। কোনো মহৎ শিল্পকর্ম ধর্মদ্বারা আচ্ছন্ন কিংবা শাসিত হলে তার প্রাণের স্বত:স্ফূর্ত চিরন্তনের আবেদন ও রূপ-অন্বেষা ও তার চেতনার মানসিক-শৃঙখলা ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। নজরুল ইসলাম তাই 'শরিয়তের বাণী' বলেননি 'কিংবা জৈগুণ বিবির পুঁথি'-ও রচনা করেননি— এক্ষেত্রে বিচিত্র অনুষঙ্গে ও অনুভবে শিল্পচর্চাই করেছেন। নাতে-রসূল রচনায় তাঁর উদ্দেশ্য, সিদ্ধি ও সার্থকতা মূলত : এখানেই। এ বিষয়ে তিনি আজো অনন্য ও অনতিক্রম্য।

তথ্য নির্দেশ

১. আব্বাস উদ্দীন আহমদ, আমার শিল্পী জীবনের কথা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, ঢাকা, পৃঃ ৫৭-৫৮

২. ঐ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮-৫৯

৩. ঐ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০

৪. ঐ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১

৫. ঐ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০-৯১

৬. ঐ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩

৭. ঐ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ২-এ প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ

সেমিনার ২-এর শ্রোতাদের সংগে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ ইউনুছ

www.pathagar.com

কবিকে শেষ দেখার জন্য বিশাল জনতার একাংশ

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী এ্যালবাম

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ১-এ প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ১-এর দর্শক-শ্রোতার একাংশ

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী এ্যালবাম

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ১-এ প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ১-এর দর্শক-শ্রোতার একাংশ

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ৩-এর দর্শক-শ্রোতার একাংশ

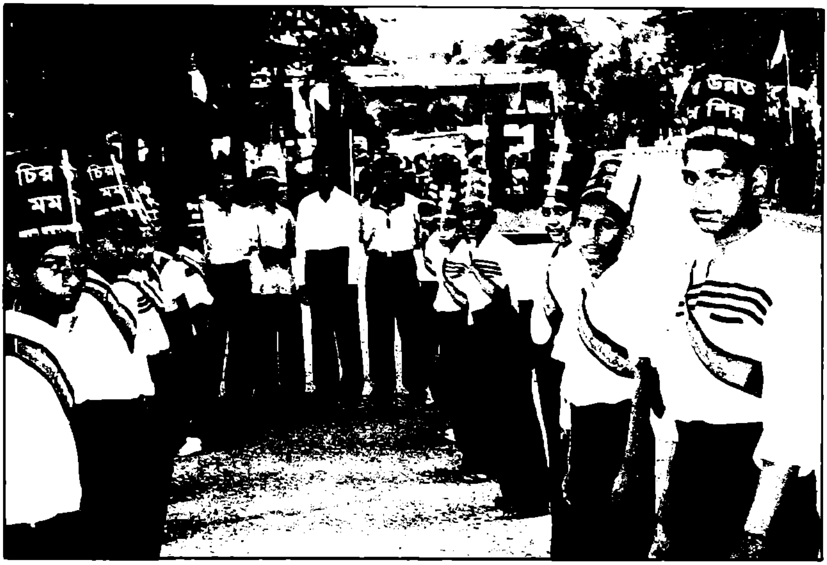

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির অভ্যর্থনা বিভাগের সদস্যবৃন্দ

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ৩-এ প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যাপক গোলাম আযম

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ৩-এর মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

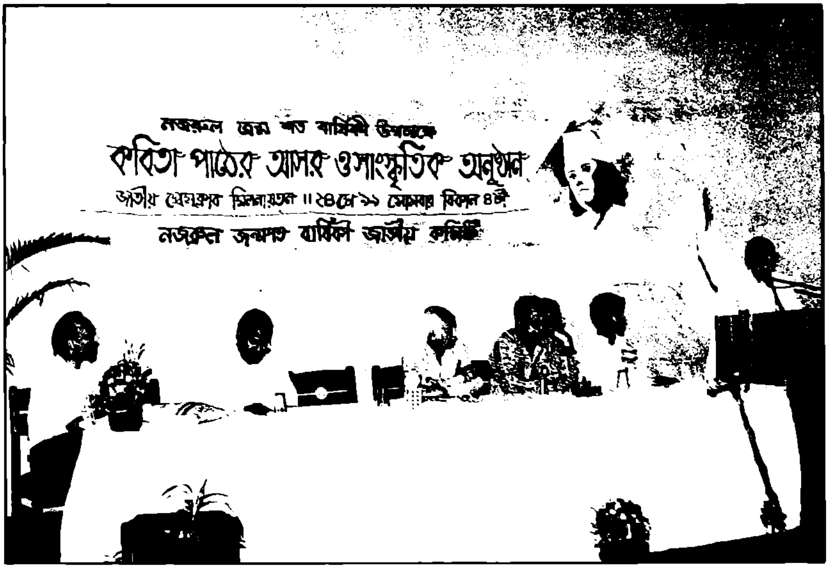

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী কবিতা পাঠের আসরে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন কবি আল মাহমুদ

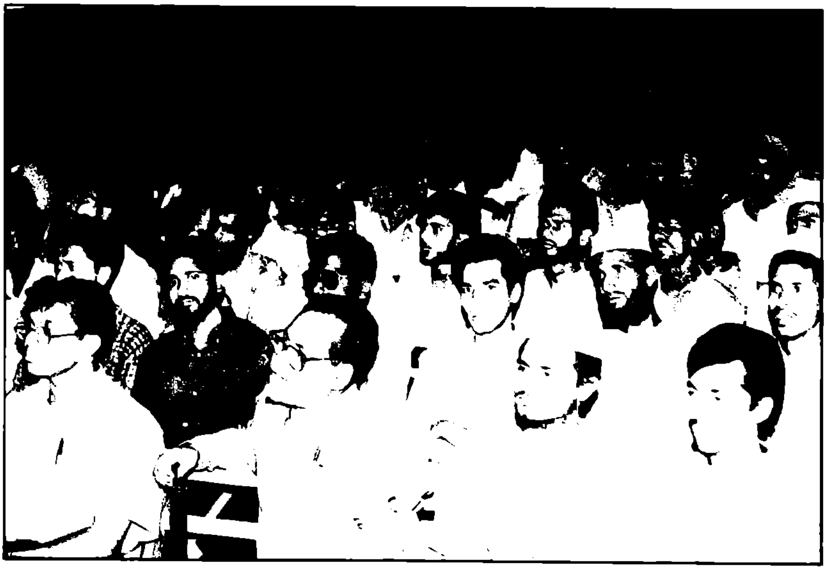

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত কবি ও শ্রোতাবৃন্দ

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ২-এ বিশেষ অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনারে ভাষণ দিচ্ছেন নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির সভাপতি কমোডর এম আতাউর রহমান

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ৩-এর বিশেষ অতিথি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান বক্তব্য উপস্থাপন করছেন।

সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক জনাব আরিফুল হক

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা এম.পি. মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনারে সংগীত পরিবেশন করছেন মহানগর সংস্কৃতি সংসদের শিল্পী জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর, নাঈম আল ইসলাম মাহিন, বায়জীদ মাহমুদ প্রমুখ

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার ৩-এর সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন রাবেতা আলম
আল-ইসলামীর ডিরেক্টর মীর কাসেম আলী

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সেমিনার অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনায় নিয়োজিত স্বেচ্ছা-সেবকবৃন্দ

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত নজরুল-র‍্যালি উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক ও দারুল ইহ্সান ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ আলী আহসান। পাশে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির সদস্য আবদুল হাই শিকদার

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী র‍্যালি শুরুর দৃশ্য

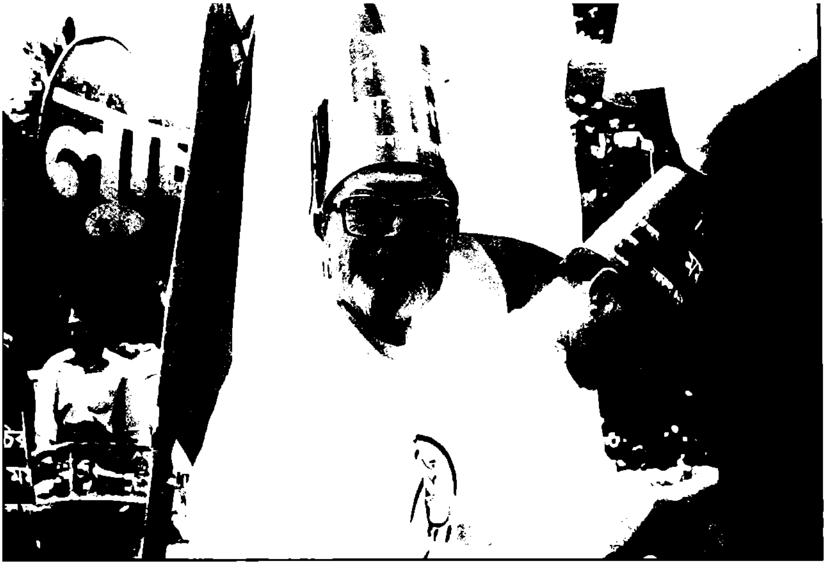

নজরুল-র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির দুই সদস্য
কবি আল মাহমুদ ও বিশিষ্ট অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকার

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী র‍্যালির একটি দৃশ্য

www.pathagar.com

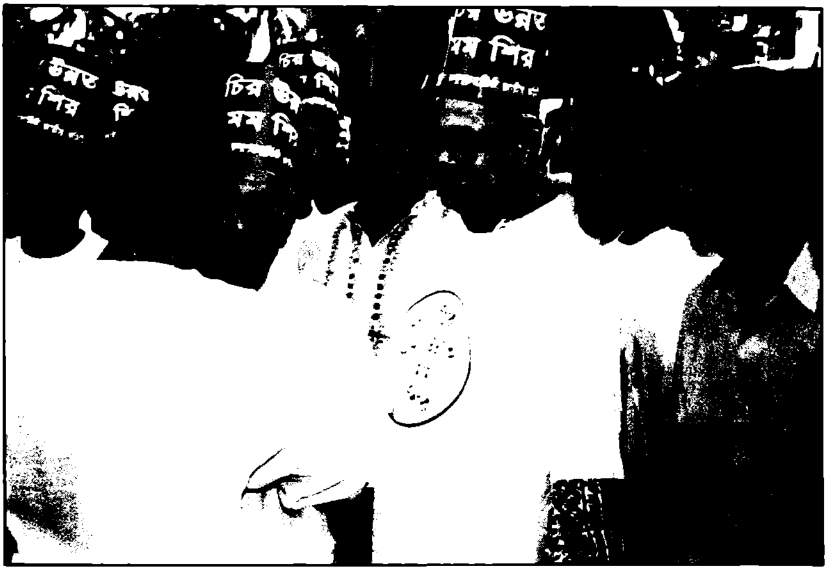

নজরুল-র‍্যালি শুরু হবার কিছুক্ষণ আগে আলাপ করছেন নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আরিফুল হক ও নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির সদস্য গিয়াস কামাল চৌধুর

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী র‍্যালি শেষে দোয়া অনুষ্ঠানের একাংশে গিয়াস কামাল চৌধুরী, শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি আসাদ বিন হাফিজ প্রমুখ

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী র‍্যালির একটি দৃশ্যে আরিফুল হক, শাহাবুদ্দীন আহমদ,
আবদুল হাই শিকদার ও মতিউর রহমান মল্লিক

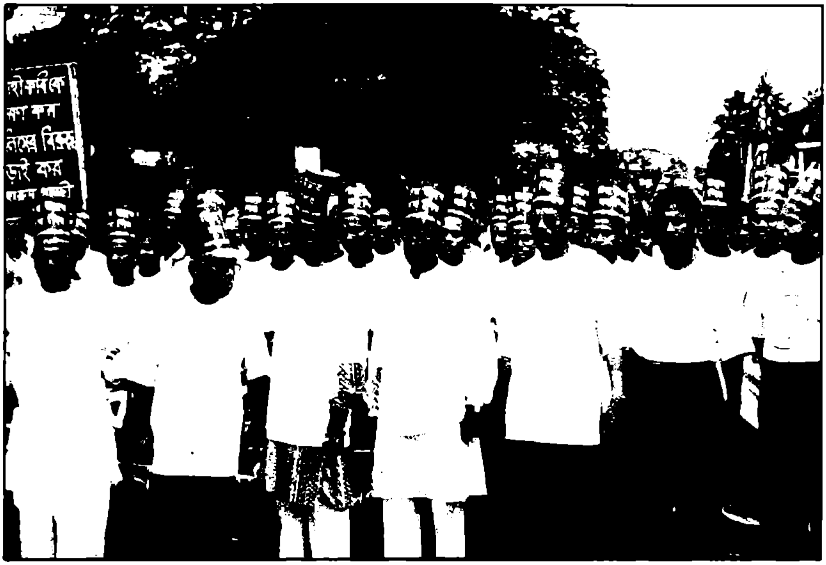

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী র‍্যালির একাংশ

www.pathagar.com

নজরুল-র‍্যালির সম্মুখভাগে দৃপ্তপদভারে এগিয়ে চলেছেন নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির সদস্য মীর কাসেম আলী

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী র‍্যালির প্রস্তুতিপর্বের দৃশ্যে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আরিফুল হক ও নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব কবি মতিউর রহমান মল্লিক

www.pathagar.com

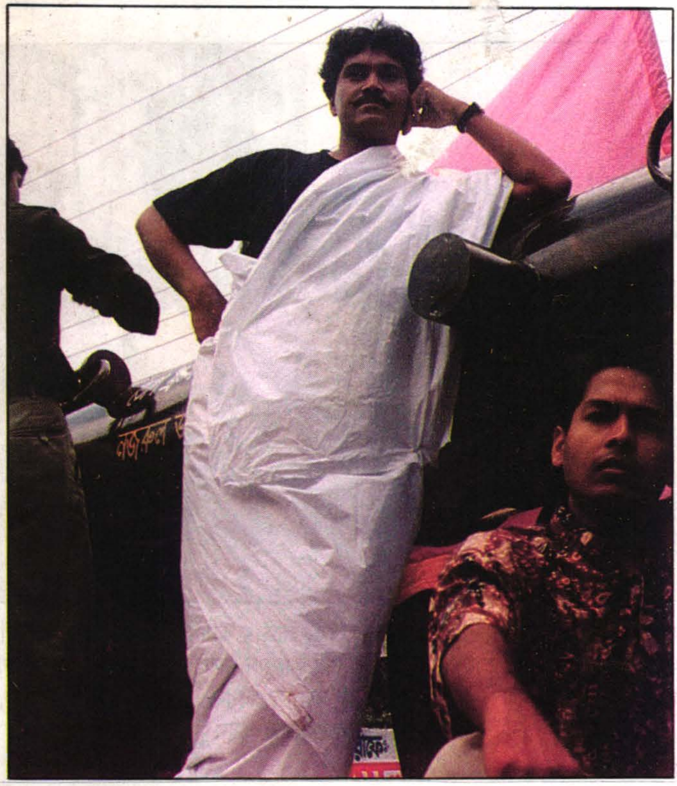

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী র‍্যালিতে কামান বহনকারী শকটে দাঁড়িয়ে নজরুল-প্রতীকী দৃশ্যে জাকির আবু জাফর

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী র‍্যালির একাংশ

www.pathagar.com

পিলু, গারা, জিলা, ধানী, বিহারী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত হাল্কা কিন্তু প্রাণমাতানো রাগ-রাগিণীগুলিকে অবলম্বন করেই নজরুল তাঁর গজল গানের কলেবর গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সব রাগ-রাগিণীর ভিতর যে-একটা Waiting বা কান্নাপ্রবণতার ভাব নিহিত আছে সেইটেকে তিনি গজলের মত প্রেমগীতির ভাব পরিস্ফুটনের সমধিক উপযোগী হবে না মনে করেই বারে বারে তিনি এই সব রাগ-রাগিণীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রেও দেখতে পাই নজরুল আমীর খসরুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। কেননা খসরুও তাঁর গজল গানের সুর রূপায়াণে পিলু, গারা বা খারা, সুহা, সুখরাই, ফেরদৌস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত লঘু রসের হৃদয়কাড়া রাগ-রাগিণীগুলিই ব্যবহার করেছিলেন, আর এই সব রাগের প্রায় সব কটিই তিনি স্বয়ং উদ্ভাবন করেছিলেন। (পারসিক 'মোকাম' কিংবা স্বরভঙ্গীর দ্বারা কমবেশী প্রভাবান্বিত হয়ে,) সুরের সম্যক মনোযোগী পরীক্ষণে। এবারে গজল গানের কাব্যের কাঠামোটির আরও একটু কাছে এগিয়ে সামগ্রিক মনোযোগী পরীক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। ঐ প্রসঙ্গটির আভাস গোড়ায় কিছু দিয়েছি ; এখন সেটিকে আরও একটু বিস্তারিত করবার পালা।

গজল গান একটি বিশেষ রীতিতে রচিত ও গীত হয়। এর অস্থায়ী অংশ ছন্দোবদ্ধ ও মোটামুটি মধ্যম বা দ্রুত লয়ে গেয়। পরের অংশগুলি কয়েকটি অন্তরার সমষ্টি মাত্র। এই সব অন্তরার পদ গাইবার সময় তাল থেকে সরে যাওয়া হয় এবং কতকটা বিলম্বিত ঢংয়ের আবৃত্তির ধরনে সুর করে কথাগুলি উচ্চারণ করা হয়। বলা যেতে পারে এই অংশগুলি হলো সুরবদ্ধ আবৃত্তি। গজলের এই অংশগুলোকে বলা হয় শ্যের' বা 'শেয়র'। 'শ্যের' অংশ এক -এক দফা গাইবার পর অস্থায়ীতে ফিরে যাওয়া হয় এবং অস্থায়ীর 'মুখপাতটি' আরম্ভ হওয়ার পর পুনরায় তালের আবর্তন শুরু হয়ে যায় এবং তাতে করে গানের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে বেশ একটা ছন্দোঝঙ্কারের সূত্রপাত হয়। গানের সঙ্গে তবলার ঠেকা চলতে থাকা কালে এই পর্বে তবলিয়ার মনে বিশেষ একটা স্ফূর্তির ভাবের সঞ্চার হয়, কেননা সঙ্গতকারের এই অংশে তাঁর স্বকীয় নৈপুণ্য দেখাবার সবিশেষ অবকাশ ঘটে। এ অনেকটা ঠুংরীর মুখপাতের অংশ চক্রাকারে পুনরাবৃত্ত হওয়ার সময় ছন্দের নিপুণ কাজের মত। তবে ঠুংরীর সঙ্গে গজলের এই অংশের তালক্রিয়ার প্রধান তফাৎ এই যে, ঠুংরী গাওয়া হয় সাধারণত দাদরা বা আদ্ধা তালে, আর গজল গাওয়া হয় প্রায়শঃ সাদামাটা কাহারবা তালে।

নজরুল তাঁর গজল গানগুলির প্রচার করেন বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিরিশের দশকের গোড়ার কয়েক বছর পর্যন্ত। মুখ্যতঃ তাঁর নিজের গলা এবং সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠের দৌলতে গানগুলি সাধারণ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আর গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবী, শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী ও শ্রীমতী কমলা ঝরিয়ার অপূর্ব কণ্ঠসম্পদ মারফৎ গানগুলির প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত হয়, সকল স্তরের মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হয়। গানগুলি তাদের সহজ কথা ও সুরের আবেদনে এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, কলকাতা শহরের উচ্চশিক্ষাভিমানী ধনাঢ্যের ড্রয়িং-রুম থেকে শুরু করে শহর

www.pathagar.com

ও শহরতলীর কারখানার শ্রমজীবী মানুষের স্তর অতিক্রম করে গ্রামের গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মুখে পর্যন্ত এসব গানের কলি সতত গুঞ্জরিত হয়ে ফিরতে থাকে। নজরুল-সৃষ্ট গজলে সুর ও তার স্বরমাধুর্যে উচ্চ-নীচের ব্যবধান ঘুচে যায়— বালীগঞ্জের সচ্ছল গৃহস্বামী বা স্বামিনীর রুচিশোভন বৈঠকখানায় পিয়ানো বা অর্গানে যেমন এ গানের সুর ধ্বনিত হওয়াটা কারও কাছে আশ্চর্য ঠেকে না তেমনি আশ্চর্য ঠেকে না গ্রামগঞ্জের বিড়িমজুরের মুখে ওই সুরের নিয়ত সঞ্চরণ। শ্রম-অপনোদনের এক মোক্ষম দাওয়াই তুলে দিয়েছিলেন শ্রমিক বন্ধুদের হাতে নজরুল এই বিনোদনী গানগুলির মাধ্যমে।

এক সময়ে নজরুল অগণিত গজল গান লিখেছিলেন। হাটে মাঠে ঘাটে গৃহকোণে সর্বত্র এই গানগুলির সুর ভেসে ভেসে ফিরছে। একটা সময় গেছে যখন আকাশে বাতাসে কান পাতলেই গজল সুরের অনুরণন শুনতে পাওয়া যেত। নজরুলের এই জাতীয় রচনার মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল তার কয়েকটির প্রথম কলি একটু আগে উল্লেখ করেছি, আরও কয়েকটির উল্লেখ করছি,– 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল', 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা', 'কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে', 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরনে চল লো গোরী', 'কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি', 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, অতীত দিনের স্মৃতি', 'পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয় পরাণ প্রিয়', 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল', 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সুরের ছোঁয়ায়', 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নম', ইত্যাদি।

এর ভিতর বাণীর দ্যোতনার দিক দিয়ে শেষোক্ত গান দুটিকে কাব্যগীতির পর্যায়ে ফেলা যায়, তবে সুরের চালে গজলের আমেজ অতি স্পষ্ট। আর এক অর্থে সব প্রেমগীতিই তো কাব্যগীতি তা সে গজল শ্রেণীর হোক আর অন্য কোন শ্রেণীরই হোক। গজল গানের বৈশিষ্ট্য মূলত: তার সুরের চালে, গায়নের পদ্ধতিতে। সেই বিচারে শেষের গান দুটিকে গজল আখ্যা দেওয়া যাবে।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে এখানে তিনটি গজলের অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি তাদের স্বরূপ বোঝানোর জন্য। অবশ্য উদ্ধৃতিতে শুধু কথার সৌন্দর্যই ধরতে পারা যাবে, সুরের সৌন্দর্য কানে না শুনলে অনুধাবন করা অসম্ভব। গান শ্রুতিসাপেক্ষে শিল্প, আলোচনায় তার সামান্য অংশই অনুভবগম্য —

চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এই নয়ন পানে।
জানিতে নাইকো বাকী সই ও আঁখি কী জাদু জানে।
একে ঐ চাউনি বাঁকা সুর্মা আঁকা তায় ডাগর আঁখি,
বাধতে তায় কেন সাধ, যে মেরেছে ঐ আঁখি বাণে?
কাননে হরিণ কাঁদে সলিল ফাঁদে ঝুরছে শফরী,
বাঁকায়ে ভূরুর ধনু ফুল অতনু-কুসুম শর হানে।

ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এই গানটির সুরে বাগেশ্রী ও পিলু রাহের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। বাগেশ্রী কাফি ধাঁচের রাগ, পিলু খাম্বাজ ঠাটের। দুইয়ের মধ্যে মিল বারণ না হলেও মিল খুব সুষ্ঠু হয় না। কিন্তু এই গানটিতে দুটি রাগের আশ্চর্য মধুর সংমিশ্রণ ঘটেছে। বাণীর পূর্বাঙ্গ বাগেশ্রী, উত্তরাঙ্গ পিলু। তাল কাহারবা। গোটা গানটিতে এক প্রেমিকের প্রেমতপ্ত হৃদয়ের হতাশা মথিত কাতরোক্তি কথার জাদুতে অনবদ্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

দ্বিতীয় গানটি লাউনী শ্রেণীর গীত। লাউনী উত্তর ভারতের একটি দেহাতী সুর। ভীম পলশ্রী, খাম্বাজ, বিহারী, ঝাঁঢ়, পাহাড়ী, পটদীপ প্রভৃতি সুরের সঙ্গে তার গোত্র-সযুজ্য। এই সব কটি সুরই কান্নার সুর, এ গানের সুরভঙ্গির মধ্যেও কান্না মেশানো আছে —

পাষাণের ভাঙালে ঘুম
কে তুমি সুরের ছোঁয়ায়,
গলিয়া সুরের তুষার
গীত-নির্ঝর ব'য়ে যায়।
উদাসী বিবাগী মন,
যাচে আজ বাহুর বাঁধন,
কত জনমের কাঁদন
ও পায়ে লুটাতে চায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এ গানটি নজরুল স্বকণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছেন। তার থেকেই গানটির প্রতি নজরুলের পক্ষপাতী অনুরাগ অনুমান করা যায়। এই রেকর্ডটির উল্টো পিঠে আছে—

দিতে এলে ফুল হে প্রিয়, কে আজি সমাধিতে মোর।
এতদিনে কি আমারে পড়িল মনে মনোচোর?

শীর্ষক অনবদ্য গানটি। গজল অঙ্গের এই গানটির ভোরবেলাকার রাগিণী যোগিয়ায় বিধৃত। যোগিয়ার সঙ্গে গজল গান — এ একটি অভিনব প্রকৃতির সুর সৃষ্টি বটে। নজরুলের পক্ষেই কেবল এমনতর সুরসিদ্ধি সম্ভব।

তৃতীয় গানটি একটি ভৈরবীর রপাশ্রিত গজল অঙ্গের অবিস্মরণীয় রচনা। রুচিভেদে কেউ কেউ এই রচনাটিকে কাব্যগীতির কোঠায়ও ফেলতে পারেন, তবে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের গজল গানে আর কাব্যগীতিতে সতত আনাগোনা- অবাধ আসা-যাওয়া লেগেই আছে— একটি থেকে আরেকটি বিশ্লিষ্ট করা কঠিন—

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নম, নমো নম, নমো নম।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম।
শিয়রে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন
মোর শিহরিল আবেশে তনু নীপ সম নিরুপম মনোরম।।
ইত্যাদি।

www.pathagar.com

অসামান্য ভাবের আবেদনমণ্ডিত একটি ভৈরব রাগের গীতরচনা, যার বয়ানের ভিতর গজল ও কাব্যগীতির আমেজ যুগপৎ বিধৃত! প্রেমগীতি আর কাব্যগীতির মধ্যেও সতত আলো-ছায়ায় লীলার সঞ্চরণ তাদের ভাবতনুকে আলাদা করে নিরীক্ষণ খুব সহজ কাজ নয়।

গজল গানের সুরগঠন আপাত বিচারে সহজ আর অজটিল বলে মনে হলেও তার বাঁধুনির ভিতর প্রায়ই রাগ-রাগিণীর আমেজ বেশ অনুভবগ্রাহ্যভাবেই লুক্কায়িত থকতে দেখা যায়। কথাটা যে অদৌ মিছে নয় তার সঠিক আন্দাজ পেতে হলে আমরা সবাইকে সমসাময়িক কালের প্রসিদ্ধ দুজন গজল গায়কের গান শোনার পরামর্শ দেব। এঁদের একজন হলেন পাকিস্তানের প্রথিতযশা গজলশিল্পী মেহেদী হাসান খাঁ, অপরজন ভারতের ছোটে গোলাম আলি। দুয়ের গজল গানের পরিবেশন- পদ্ধতির মধ্যেই রাগ-রাগিণীর প্রভাব অতি-প্রত্যক্ষ। এঁরা ইচ্ছা করলে সার্থক খেয়াল-গাইয়েও হতে পারতেন, ভুলক্রমে গজলের আঙিনায় চলে এসেছেন।
নজরুলের আরও কয়েকটি গজল গানের অন্তর্লীন রাগস্বরূপ এক-নজর পরখ করে দেখা যেতে পারে। যেমন শ্রীমতী কমলা ঝরিয়ার গ্রামোফোন ডিস্কে গাওয়া এই গানটি—

প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না এ মিনতি করি হে।

এই গানটির ভিতর আছে পিলু। বিপরীত পিঠের গান 'কাহার তরে কেন ডাকে', 'পিয়া, পিয়া পাপিয়া'-তে আছে পিলু-বারোয়াঁ রাগের নির্ভুল অনুরণন। রাগের সুস্পষ্ট আমেজ। তেমনি এর 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা' গানটির ভিতর একই রূপ পিলু রাগের দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায়। গানটি কাহারবা ও দাদরার মিশ্র লয়ে বদ্ধ। 'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি' গানটিতে আছে মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজের লক্ষণীয় প্রভাব। তাল দাদরা। কেন আনো ফুলডোর আজি এ বিদায় বেলায় গানটিতে আছে ভীম-পলশ্রীর সুস্পষ্ট আমেজ। 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল' গানটি দুর্গা রাগে সংবদ্ধ। অন্যপক্ষে 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী' গানটিতে আছে জৌনপুরী-আশাবরীর মিশ্র লীলা। তাল কাহারবা । 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' গানটি পরিষ্কার ভৈরবীর রাগরূপের স্মারক। 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরন চলে লো গোরী' গানটির ছন্দের মধ্যে পাই ইমনের পরোক্ষ লীলা। তাল কাহারবা। 'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে' গানটিতে আছে সিন্ধু-সুরটের মিশ্র স্বাদ। 'কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে' গানটি ভৈরবী আশাবরীর মিশ্র রসে ভরা। তাল কাহারবা। 'পথ চলিতে যদি চকিতে' গানটিতে আছে বারোয়াঁর সঙ্গে দরবারী- কানাড়ার মিশ্রণজাত সূক্ষ্ম প্রভাব। দরবারী-কানাড়ার মত ভারী রাগেও গজল যে হতে পারে তা শুধু নজরুলের নব নব গঠনশীল প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

www.pathagar.com

নজরুলের গান

সাজজাদ হোসাইন খান

বেশ কয়েক বছর আগে একটি সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম, আঙুরবালা দেবীর। প্রকাশিত হয়েছিলো পশ্চিম বাংলার একটি দৈনিকে। প্রসঙ্গ ছিলো কবি নজরুলের গান। উল্লেখ্য, আঙুরবালা দেবী নজরুল সঙ্গীতের একজন বিশ্বস্ত উদাহরণ। কারণ নজরুল নিজে তাঁর কণ্ঠে গান তুলে দিতেন। নজরুলের অনেক আদি রেকর্ডই আঙুরবালার। তাই তাঁর উক্তি বিশেষ করে নজরুল সঙ্গীত প্রসঙ্গে যথেষ্ট ওজন বহন করে বৈ-কি। গানের রাজা নজরুল। সংখ্যার দিক থেকে তো তুলনারহিত। ভাব-ভাষা এবং সুর-বৈচিত্র্যেও নজরুলের গান নিজস্ব পরিচয়ে উজ্জ্বল। কিন্তু যথাযথ পরিচর্যা আর একক অভিভাবকত্বের অভাবে এ গান পাল্টে যাচ্ছে। সুর এবং গায়কী ঢং এমনকি শব্দের অদল-বদল পর্যন্ত। একথা বললাম এজন্যে যে, রবীন্দ্র-সংগীতের বেলায় যেমন বিশ্বভারতীর খবরদারি আছে নজরুল-সংগীতের বেলায় তেমনি আছে বলে মনে হয় না। আর এ সুযোগে নজরুল-সংগীত নিয়ে যথেচ্ছাচার ঘটেছে। এ বিষয়ে আঙ্গুরবালার ভাষ্য: 'নজরুলের গান নিয়ে এখন যাচ্ছেতাই হচ্ছে। যার যেমন খুশি সে তেমন গাইছে। তিনি অকালে অসময়ে নিজের কিছু ঠিক মতো গুছিয়ে রেখে যেতে পারেননি বলে এটা হচ্ছে। আমি কাজিদার কাছে শিখে যেমন রেকর্ড করেছি এখন অন্য লোকে সেই রেকর্ড শুনে আবার রেকর্ড করছে, কিন্তু আগেকার কিছুই রাখছে না, একেবারে কিছুই না। একবারে অপভ্রংশ হয়ে যাচ্ছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি-আমার "ভুলি কেমনে" গানটার কথা আগে বলেছি। আমি কারও নাম করবো না। নামজাদা গাইয়ে একজন গানটা যে কি বিকৃত করে গায় আমি ভাবি কান বন্ধ করবো, না রেকর্ডখানা বন্ধ করবো। মূল বিকৃতসুরেই'।

আদতে এ একটি গানেই কেবল নয় বিকৃতির স্পর্শ আরো অনেক গানেই লেগেছে— রবীন্দ্রসংগীতের বেলায় যা চিন্তার বাইরে। অই যে বললাম সুষ্ঠু লালনের অভাব। এ প্রসঙ্গে একটি খবরের কথা উল্লেখ করছি। দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৯৮৯-এর ২৬শে মে। শিরোনাম ছিলো, 'নজরুল-সংগীত নিয়ে ভারতীয় ষড়যন্ত্র।' এতে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, ভারতের রেকর্ডিং সংস্থাগুলো নজরুল ইসলামের বেশ কিছু গান ভারতীয় শিল্পীদের আধুনিক গানের ক্যাসেটে ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলো দিব্যি তাদের বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া এখানেও নাকি হারানো দিনের গান এবং পুরানো দিনের গানের ক্যাসেটে নজরুলের নাম উল্লেখ না করে বাজারে ছাড়া হয়েছে। ভারতীয় শিল্পীদের গাওয়া আধুনিক গানের ক্যাসেট নজরুল সংগীতের উপস্থিতি এখন মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ হিশেবে চারটি গানের উল্লেখ করা হয়েছে। 'শাওন রাতে যদি', 'এনেছি আমার শত জনমের', 'ভালোবাসা মোরে ভিখারী করেছে', এবং 'আমার এ ভালোবাসা জানিগো'। এসব গান জগন্ময় মিত্র, মান্না দে, অনুপম ঘোষাল বা অন্য কোনো শিল্পীর নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। এর কারণ ক্যাসেটে গীতিকারের নাম থাকে না। অবশ্য এখানে উল্লিখিত চারখানা গানের মধ্যে প্রথম দুখানাই কেবল নজরুলের। বাকি দুটি নয়। 'শাওন রাতে যদি' নজরুলের এ গানটি জগন্ময় মিত্র প্রথম রেকর্ড করেন। MARS জগন্ময় মিত্রের যে ক্যাসেট বাজারে ছেড়েছে এর ভলিয়্যুম-১ এ নজরুলের এ গানটি রয়েছে। এ ক্যাসেটে আরো একটি নজরুল সংগীত আছে, আর তা হলো 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়।' আধুনিক গানের ক্যাসেটে এ গানগুলো কম্পোজ করার কারণে বিভ্রান্ত হবার অবকাশ অনেক। অবশ্য 'এনেছি আমার শত জনমের' এ গানটি নিয়ে নানা মত আছে। যদিও নজরুলের গান বলেই গীত হয়। অবশ্য এ গানের ভাষা, ভাব আর সুরের কারুকাজে নজরুলের উপস্থিতিই একশো ভাগ।

নজরুলকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক ভারত তথা পশ্চিম বাংলার বাবুদের। এ অভ্যাস তাদের বরাবর। কলকাতার 'দেশ' পত্রিকার কথাই যদি ধরি, জন্মাবধি নজরুলকে নিয়ে কোনো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেনি 'দেশ'। অনেক ক্ষুদ্র হিন্দু সাহিত্যিককে নিয়েও 'দেশে'র বিশেষ আয়োজন-উৎসাহের কমতি দেখা যায় না। কিন্তু নজরুলের বেলায়? এক প্যারা লিখতেও যেন 'গো-মাংসের' গন্ধ পান। বিপরীতে 'দেশে'র প্রতিটি সাহিত্য, সংখ্যাই-রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে। কেবল বিশেষ সংখ্যাই নয়, প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়ই রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে আবিস্কার করে 'দেশ'। ভালো কথা; রবীন্দ্রনাথ বড় লেখক; এ তার প্রাপ্য। এই তো গেলো পঁচিশে বৈশাখেও তারা স্মরণ করেছে 'দেশ। এমনকি বিজ্ঞাপনেও যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতি ছিলো সে নিয়েও সুন্দর একটি লেখা দেখলাম। সম্পাদকীয় তো আছেই। কিন্তু এগারোই জ্যৈষ্ঠ বলেও যে একটা সময় আছে তা 'দেশ বেমালুম চেপে যায়।

কাননবালা দেবী আরো একজন গায়িকা, যিনি নজরুলের অনেক গানেই কণ্ঠ দিয়েছিলেন। নজরুল-সংগীতের অনেক আদি রেকর্ড এ কাননবালা দেবীর। সম্প্রতি তাঁর একটা ক্যাসেট বাজারে এসেছে, 'আধুনিক বাংলা গান' শিরোনামে। এখানেও নজরুলের দুটি গান রয়েছে। 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ' এবং 'আমি বনফুল।' এই ক্যাসেটটি কনকর্ড প্রডাক্টের। এ গান দুটি আছে প্রথম ভলিয়্যুমে।

www.pathagar.com

আব্বাসউদ্দীনও নজরুলের অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন। বিশেষ করে নজরুলের ইসলামী গান পল্লীগীতিগুলো। তাঁর একটি ক্যাসেটেও নজরুলের তিনখানা গান দেখলাম। সে গান তিনটি হলো 'গাঙে জোয়ার এলো', 'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান' এবং 'যে আল্লার কথা শোনে।' এমন নজির হয়তো আরো তুলে আনা যাবে। কিন্তু এতে লাভ? যদি ত্বরিত এর কোনো বিহিত না হয়? নজরুল সংগীত নজরুল-সংগীতই। কণ্ঠ এখানে গৌণ। যেমন রবীন্দ্র-সংগীত। এখানে স্মরণ করার বিষয় যে, কোনো রবীন্দ্র-সংগীত কিন্তু আধুনিক গান বলে বাজারে চালু হয়নি।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলার একজন বিখ্যাত গায়ক। কি আধুনিক কি নজরুল সংগীতে। মানবেন্দ্রের প্রথম নজরুল সংগীতের রেকর্ড ছিলো, 'ফিরিয়া ডেকো না মহুয়া বনের পাখী।' রেকর্ড হয়েছিলো চুয়ান্ন শালের দিকে। কিন্তু ইদানীং নজরুল-সংগীতটি মানবেন্দ্রের একটি লংপ্লে রেকর্ডে সংযোজিত হয়েছে। সে রেকর্ডে নজরুলের পরিবর্তে প্রণব রায়কে গীতিকার হিশেবে দেখানো হয়েছে। নজরুলের আর একটি গান 'বসন্ত এলো এলোরে', সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় রেকর্ড করেছেন আধুনিক বাংলা গান রূপে। সেখানে নাকি গীতিকারের নামও পাল্টে গেছে। আরো একটি গানের গীতিকার হিশেবে দেখানো হয়েছে প্রণব রায়কে। এ গানটি আধুনিক বাংলা গান বলে রেকর্ড করেছে, শেফালী ঘোষ। গানটি হলো 'প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না।' এ নজরুল সংগীতটি ঊনিশশ' তিরিশ শালে প্রথম রেকর্ড করেছিলেন কমলা ঝরিয়া। নজরুলের আর একটি বিখ্যাত গান 'তোমার আকাশে এসেছিনু হায় আমি কলঙ্কী চাঁদ।' ফিরোজা বেগম এবং ড. অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড রয়েছে এ গানটির। কিন্তু অনুপ ঘোষাল সম্প্রতি এ গানটি প্রণব রায়ের বলে রেকর্ড করেছেন। এমনি অনেক ব্যাপার ঘটছে নজরুলের সৃষ্টিকে নিয়ে ভারতে। ভারতীয় শিল্পীদের গাওয়া নজরুল সংগীত শুনলে অনেক সময় মনেই হয় না নজরুল-সংগীত শুনছি। সেখানে সুরের বিকৃতি এমনকি শব্দের বিকৃতিও ঘটছে অহরহ। বিশেষ করে আরবি-ফারসি শব্দগুলো। এও যে ষড়যন্ত্রের কোনো অংশ নয় তা কি করে বলি?

নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর সৃষ্টিকে বাঁচাবার দায়িত্ব আমাদের। তাই তাঁর গানের সুর এবং বাণী অবিকৃত রাখার ব্যাপারে একক অভিভাবকত্বের প্রয়োজন। রবীন্দ্র-সংগীতের বেলায় যেমন বিশ্বভারতী। এ বিষয়ে দেশের নজরুল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া উচিত। সম্ভব হলে নজরুল-সংগীতের আদি রেকর্ডগুলোর রিপ্রিন্টের ব্যবস্থা করা। নজরুল একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট নজরুলের গানের ক্যাসেট বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে পারেন। এতে করে নজরুলের গান বিকৃতির হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাবে। তাছাড়া নজরুলের যেসব গান আধুনিক বাংলা গান নামে বাজারে চালু রয়েছে এর একটা বিহিত বন্দোবস্ত করা। ত্বরিত এ ব্যাপারে একটা পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এ দায়িত্বটাও নজরুল বিষয়ক প্রতিষ্ঠান দু'টির উপরই বর্তায়। আর তা না হলে কেবল নজরুলের গানই না পশ্চিম বাংলার বাবুরা নজরুলের অনেক কবিতাকেও অন্যের নামে চালিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না।

www.pathagar.com

কবির সমাধি-সৌধ

মসজিদেরই পাশে আমায়/ কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের/ আজান শুনতে পাই। — কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

উর্দু ভাষায় নজরুল সঙ্গীত

আবদুল ওয়াহিদ

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। দুখু মিয়া। সত্যিই তিনি দু:খী–অন্তত এই দুর্ভাগা জাতির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করার দায়ে। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। জনগণ ঘোষিত। সরকার ঘোষিত নন। তবে পরোক্ষভাবে স্বীকৃত। জাতীয় কবি হিসেবে তাঁর বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসা এবং শিল্পকর্মের আমরা কতটুকু মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছি–এ ব্যাপারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আর কিছু না হোক, আত্মসমালোচনা তো করা যায়।

আমাদের জাতীয় কবিকে অন্য ভাষাভাষীদের কাছে পরিচিত করানোর জন্য এযাবৎ আমরা কী-ইবা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি? তেমন উদ্যোগ নেয়া আমাদের এই দীনহীন জাতির পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারপরও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিতান্ত আন্তরিক উদ্যোগে বিভিন্ন ভাষায় নজরুলের জীবন ও কর্মের ওপর কাজ হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম হয়েছে ভাষান্তরিত।

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলার ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনসহ কেউ কেউ ইংরেজীতে নজরুলের কবিতা ও গানের অনুবাদ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভগের প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ সেই কাজের আলোকেই উর্দু ভাষায় নজরুলের জীবন ও কর্মের ওপর রচনা করেন অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। প্রখ্যাত উর্দু কবি এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সফল অনুবাদক জনাব ইউনুস আহমারও নজরুল জীবনী লিখেছেন উর্দু ভাষায়। এছাড়া প্রখ্যাত উর্দু গল্পকার ও অনুবাদক ড: আখতার হোসেন রায়পুরীসহ অনেকেই নজরুলের কবিতা, সঙ্গীত ও উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ করেছেন। স্বয়ং নজরুল এসব অনুবাদ শুনেছেন, খুশী হয়েছেন বলে ইউনুস আহমারী দাবী করেছেন তাঁর লেখা নজরুল জীবনীগ্রন্থে।

ঢাকাস্থ ইরানী কালচারাল সেন্টার দেশের প্রখ্যাত ফারসীবিদ ও গবেষক কবি মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহিদী সম্পাদিত নজরুলের জীবন ও কর্মের ওপর প্রকাশ করেছে একটি গ্রন্থ ফারসী ভাষায়। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীর কাছে নজরুল উপস্থাপিত হচ্ছেন

www.pathagar.com

বেসরকারী উদ্যোগে। সরকারী উদ্যোগ-আয়োজন কি-তা জানার অধিকার অন্তত এদেশের আপামর মানুষের আছে।

অবশ্যই আছে।

পাকিস্তানের করাচীতে অবস্থিত নজরুল একাডেমী। ২৫,০০০-এর ওপরে বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাদি রয়েছে একাডেমীর লাইব্রেরীতে। একাডেমী নজরুলের জীবন ও কর্মের ওপর বহুমুখী কাজ করার জন্য নিবেদিত। জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী ছাড়াও রয়েছে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় স্মারক প্রকাশের কর্মসূচী। এছাড়া "নজরুল-রচনাবলী" প্রকাশের কর্মসূচীও রয়েছে। নজরুল বিষয়ক গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ রয়েছে পুরস্কারেরও কর্মসূচী। ইতোপূর্বে একাডেমীর বিভিন্ন কর্মের উপর নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম। ইউনুস আহমারের "কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কর্ম" শীর্ষক বইয়ের উপরও করেছি আলোকপাত। এ পর্যায়ে নজরুল গীতির উর্দু অনুবাদ প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

করাচীস্থ নজরুল একাডেমী 'নজরুল-গীতি' শিরোনামে প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। মূল্য ১.২৫ রুপী। এতে স্থান পেয়েছে নজরুলের ১০টি বাংলা গানের উর্দু অনুবাদ। এছাড়া দিক-নির্দেশ স্বরূপ রয়েছে প্রতিটি গীতের অনুবাদের পরই স্বরলিপি ও সারগাম। প্রকাশকের 'আরজ'-এর মাধ্যমে এই মহৎ বিষয় সম্পর্কে আমরা যৎকিঞ্চিৎ অবহিত হতে পারবো। প্রকাশক লিখেছেন :

"বক্ষ্যমান পুস্তিকায় কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা গানগুলোকে উর্দুতে ভাষান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সযত্ন চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাংলা শব্দগুলোর বিপরীত উর্দুর এমন শব্দাবলী সংযোজন করা যে-সব শব্দ অর্থের সাথে সাথে উচ্চারণের নিরিখেও পরস্পরের পাশাপাশি হবে। একই সাথে কাজী সাহেব সৃষ্ট ধ্বনির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে করে উর্দুভাষী মানুষ কাজী সাহেবের কবি সুলভ কাব্য-কবিতা, চিন্তা-ভাবনা এবং গানের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। পুস্তিকাটি উর্দুর প্রখ্যাত কবি নজরুল কার্‌রার নূরী সাহেব এবং বাংলার শীর্ষস্থানীয় গীতিকার জনাব নাসীরুদ্দীন হায়দার সাহেব একত্রে সম্পাদনা করেছেন। তাঁদের সহকারী হিসেবে জনাব মুহাম্মদ ইহ্সানউল্লাহ্‌র নামও সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

এরপর রয়েছে সারগাম সম্পর্কিত দিক-নির্দেশক এক পৃষ্ঠা।

এ পর্যায়ে আমরা নজরুলের বাংলা গানগুলোর পাশাপাশি উর্দু তরজমার বাংলা উচ্চারণ উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো। এতে করে পাঠক কিছুটা স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হবেন হয়তো। নজরুলের নিম্নের গানটিই প্রথম গান হিসেবে পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে :

www.pathagar.com

১

রুমু ঝুমু রুমু ঝুম
কে এলে নূপুর পায়
ফুটিল শাখে মুকুল
ও রাঙা চরণ ঘায় ॥
সে নাচে তাটিনী জল
টল মল্ টল মল্
বনের বেণী উতল
ফুলদল মুরছায় ॥
বিজরী জরীর আঁচল
ঝলমল্ ঝল্মল্
নামিল নভে বাদল
ছলছল বেদনায় ।
দুলিছে মেখলা হার
শ্যামলী মেঘমালায়
উড়িছে অলক কার
অলকার্ ঝরোকায় ॥
তালীবন থৈ তাথৈ
করতালি হানে ঐ
কবি, তোর তমালী কই—
শ্বসিছে পূবালীবায় ॥

গানটির উর্দু উচ্চারণ এরূপ ঃ

১ গীত

ছম ছনা না না ছম ছনা না না
কোন আয়া পায়েল পেহ্নে
ফুটী হ্যাঁয় শাখোঁ মেঁ কালিয়াঁ
উস রঙিন পা কী ঠোকর সে ॥
নাচে জায়সে নাদী কা পানী
ডগমগ ডগমগ ডগমগ ডগমগ
লহ্লহাতা সারা বন্
ঝুম উঠে হ্যাঁয় তামাম ফুল ॥

www.pathagar.com

বিজলী কা সুনেহ্‌রী আঁচাল
ঝলমল ঝলমল ঝলমল ঝলমল
বারাস পাড়া ফালাক সে মেহঁ
ছলক পড়া গম সে ॥

তাড়কা বিন থাইয়াতা থাইয়া
বাজা রাহা হ্যায় তালিয়াঁ
শায়ের হ্যায় তেরা দিলবর কাঁহা
পুছতী হ্যায় পূরাব কী হাওয়া ॥

নজরুলের দ্বিতীয় গানটি হচ্ছে ঃ

২

বউ কথা কও, বউ কথা কও,
কও কথা অভিমানিনী।
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী ॥
সে কাঁদন শুনি, হের নামিল নভে বাদল,
এল পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী ॥
আমার প্রাণের ভাষা শিখে ডাকে পাখী 'পিউ কাহাঁ।'
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে আঁখি মোর সৌদামিনী ॥

এ গানের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে :

২

দুলহানিয়া বোলো দুলহানিয়া বোলো
কুছ্‌তো বোলো রুঠনেওয়ালী
মানাতে মানাতে রোতে রোতে
বিতে গী রাতেঁ কিতনি ॥

উও রোনা সুন বে দেখো বারাস রাহা হ্যায় ফালাক সে পানী
পান খড়িয়াঁ খিড়কি মে হ্যায় জুঁই চাম্‌বীলী কামিনী ॥
মেরে দিল বি বাত পা কার বোলে পাপীহা পী কাহাঁ
ঢুঁন্ডঢে তুঝকো বাদল বাদল আঁখ মেরি ইসপিরাই ॥

তৃতীয় এ গানটি চয়ন করা হয়েছে :

www.pathagar.com

৩

কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া ॥
এভরা ভাদরে আমার এ মরা নদী,
উথলি 'উথলি' উঠিছে নিরবধি।
আমার এ ভাঙা ঘটে আমার এ হৃদি-তটে
চাপিতে গেলে ওঠে দু'কূল ছাপিয়া ॥

নিষেধ নাহি মানে আমার এ পোড়া আঁখি
জল লুকাব কত কাজল মাখি 'মাখি'
ছলনা ক'রে হাসি অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া ॥

উর্দু অনুবাদ নিম্নরূপ :

৩

ক্যায়সে ছুপাওঁ আঁখ কে আঁসূ
সুবহে কোয়েল রোয়ে রাত কো পপীহা ॥
ইয়ে ঘটা ঘুন ঘুরিয়াহ মেরী সূখী নদ্দী

বাফর বাফর কে উবলে হার দাম
মেরা ইয়েহ বীরাঁ ঘাট মেরা ইয়ে টুটা দিল
রোকো তু নাহ রোকেঁ দোনোঁ কিনারে ॥

নাদাঁ আঁখে মেরা কাহনা নেঁহী মানেঁ
আসূ ছুপাওঁ কাব তক কাজল লাগা লাগা কে
হাঁসনা ভী চাহোঁ তো আঁসূ হী নিকলেঁ
খুদ কো ধোকা দেনে গিয়া আওর ডর কে কাঁপনে লাগা ॥

চতুর্থ গানটি হচ্ছে :

৪

নিরজনে সখি বোলো বঁধুয়ারে।
দেখা হ'লে রাতে ফুলবনে ॥
কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালী

www.pathagar.com

কে দেয় গহীন রাতে ফুলের কূলে কালি,
জেনেছে ফুলমালী গোপনে ॥

ও পথে চোর-কাঁটা, সখি তায় বলে দিয়ো,
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়,
এ বনফুল লাগি না আসে কাঁটা দলি,
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ-গলি,
বিকাব বিনিমূলে ও-চরণে ॥

উর্দু অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে :

গীত ৪

আকেলে মে সাখি কেহ্না ইয়েহ উন সে
আগার মিলে কাভী রাতকো গুলিস্তান মে ॥

কোন কারে ফুঁলো কো চোরি জানে হ্যায় উসকো মালী
কোন মিল তা হ্যায় আধী রাতকো গুলশান পার কালেক
দেখ লিয়া হ্যায় মালী নে চুপ কে ॥
রাস্তেমে চোর কাঁটা হ্যায় তুম উন্‌সে কেহ্না
চুভ না জায়ে চুভ না জায়ে তেরে দামন মে কাঁহী!
উস এক ফুল কি খাতির না আয়ে কাঁটো মেঁ সে
আপহী জায়ো নিগা মে খোদ উনকী গালী মে
বেচুঙ্গা বে মূল উনকে চার্‌নে মেঁ।

পঞ্চম গান এরূপ ;

৫

সাজিয়াছে যোগী বল কার লাগি তরুণ বিবাগী ॥
হের তব পায়ে কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের প্রিয়া তব প্রেম মাগি, তরুণ বিবাগী ॥
ফাল্‌গুন কাঁদে দুয়ারে বিষাদে,
খোলো দ্বার খোলো, যোগী যোগ ভোলো।
এত্ গীত হাসি সব আজি বাসি
উদাসী গো জাগো নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী, তরুণ বিবাগী ॥

www.pathagar.com

উর্দু অনুবাদ :

৫

বান গায়ে জোগী কিস কে লিয়ে এ্যায় জাওয়াঁ বৈরাগী
দেখো তোমারে পাওঁ পার রোয়ে লুট লুট কার
দুনিয়া কা সারা হুস্‌ন তুম সে পেয়ার মাঙ্গেঁ এ্যায় জাওয়াঁ বৈরাগী ॥

রো রাহা হায় ফাগুন উদাস দার পার
খোলো দুয়ার খোলো জোগী যোগ ভোলো
ইতনে গীত আওর হাসী সব হ্যায় আজ বাসী
আয় উদাসী জাগো লেকে উমাঙ্গে নাঈ- উমাঙ্গ ওয়ালে জাগো ॥

নজরুলের ষষ্ঠ গানটি :

৬

আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে।
হায় কি মনে প'ড়ে মন এমন করে ॥

হায় এমন দিনে কে নীড়হারা পাখী
যাও কাঁদিয়া কোথায় কোন্ সাথীরে ডাকি।
তোর ভেঙেছে পাখা কোন আকুল ঝড়ে ॥

আয় ঝড়ের পাখী আয় এ একা বুকে,
আয় দিব রে আশয় মোর গহন দুখে
আয় রচিব কুলায় আজ নূতন ক'রে ॥
এই ঝড়েতে রাতি নাই সাথের সাথী
মেঘ মেদুর গগন বায় নিভেছে বাতি।
মোর এ ভীরু প্রণয় হায় কাঁপিয়া মরে ॥

গানটির উর্দু অনুবাদ নিম্নরূপ :

৬

আজ মীহ্ঁ বরস রাহা মে হুঁ ঘরমে তানহা-
হায়ে ইয়াদ আগিয়া কিয়া দিল কো কেয়া হোগিয়া ॥

হায়ে আয়সে দিন মেঁ কোন বে ঘর পাঞ্ছি

www.pathagar.com

জাতা হায় রোত হুয়া কাঁহা কিস সাথী কো পুকার নে ॥

কিস ভাটকে তুফাঁ নে তেরা পার হায় তোড়া
আতুফা যুদাহ্ পানছী আ এস উইরাঁ সীনে মে
আ বানায়েঙ্গে ঘর আজ ফির নয়া।
ইয়েহ তুফানী রাত নেহী সাথ আপনা সাথী

বাদল ছায়া হুয়া ফালাক হাওয়া মে বুঝ গিয়া দিয়া
মেরা দূরান দেশ পিয়ার হায়ে থর থর গিয়া

সপ্তম গানটি হচ্ছে :

৭

এ আঁখিজল মোছ পিয়া, ভোল ভোল আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে ঝরে যে ফুল আঁধারে ॥

ফোটা ফুলে ভরি ডালা গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল ল'য়ে দিবে গো বল কারে!

স্বপনের স্মৃতি প্রিয় জাগরণে ভুলিও,
ভুলে যেয়ো দিবালোকে রাতের আলেয়ারে ॥

ঝুরিয়া গেল যে মেঘ রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তারে খোঁজ প্রাতে দূর-গগন-পারে ॥

গানাটির উর্দু অনুবাদ এরূপ :

৭

ইয়েহ আঁখকা পানী পোছো পিয়া
ভোলো ভোলো মুঝ কো ॥

ইয়াদ কোন রাখ্‌খে উনকো
ফুল যো গির গায়ে রাত কো ॥
গুল শেগুফতাহ্ সে ভারকে ঝোলি
গুন্দে হাসীনা আপনী মালা

www.pathagar.com

বাসী হো জানে ওয়ালে ফুল,
দিয়ে জায়েঙ্গে কেয়সে ॥

সাপনো কি ইয়াদে আয় পিয়া
জাগনে কে বাদ ভুল জানা
ভুল জানা রোয়ে রওশন
শবকে দিয়ে কি নো কো
বারাস গিয়া হায় জো বাদল
রাত তেরে আঙ্গিন মে
বেকার উসকা ঢুঁন্ডনা ছুবহ
দুর কাঁহী ফালাক কে পার ॥

অষ্টম গানটি হচ্ছে :

৮

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরনে চল লো গোরী।
চল জলে চল কাঁদে বনতল
ডাকে ছলছল জল-লহরী ॥

দিবা চলে যায় বলাকা পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়
কেঁদে চখা চখী মাগিছে বিদায়
বারোঁয়ার সুরে ঝুরে বাঁশরী ॥

বেল গেল বঁধু ডাকে ননদী
চলো জল নিতে যাবি লো যদি
কালো হ'য়ে আসে সুদুর নদী,
নাগরিকা সাজে সাজে নগরী ॥
ওগো বে-দরদী ও রাঙা পায়ে
মালা হ'য়ে কে গো গেল জড়ায়ে
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি ॥

উর্দু অনুবাদ এরকম :

www.pathagar.com

৮

ক্যায়সে আকেলে মে বেয়ঠী হ্যায় তানহা
পানী ভারনে চলো রে গোরী।
চলো পানী লেনে রাহ্ তাক জঙ্গল
বুলায়েঁ ছালাক ছালাক পানী কি লহরেঁ ॥

দিন চলা জায়ে, বগলা পার ফেলায়ে
বাদলকে সীনে মে পারিন্দে ছুপ গায়ে
রোকার চাহাচাহী মাঙ্গ রাহে হ্যায় জুদাই
বরওয়াকী ধান পার ফেল গায়ী বাঁসারী ॥

সে জায়ে বহু বোলায়ে ননদী
চলো পানী লেনে আগার হে চালনা
আন্ধেরা হোকে আয়ী দুরসে নদী
হুসন্ বেন সনূর গিয়া সাজগিয়া হায় শাহর সব ॥

আয় বেদারদী উও রঙিন পাউঁ হ্যায়
মালা হো কারা কোন লিপাট গিয়া
তেরে সাথ শায়ের ভী মুশকিল মে হ্যায়
পাঁও মে রাখখো উসকো ইয়া গালে মে পেহনো।

নবম গানটি হচ্ছে :

৯

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল।
মলিন হ'য়েছে ঘুমে চোখের কাজল ॥
হেরিয়া নিশি-প্রভাতে শিশির কমল প্রাতে
ভাব বুঝি বেদনাতে কেঁদেছে কমল ॥

মরুতে চরণ ফেলে কেন বন-মৃগ এলে,
সলিল চাহিতে পেলে মরীচিকা-ছল ॥
এ শুধু শীতের মেঘে কপট কুয়াশা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে এ নহে বাদল ॥

www.pathagar.com

উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে :

৯

নেহী নেহী পিয়া ইয়েহে নেহী আঁসু
ফায়েল গিয়া হায় সো জানে সে আঁখ কা কাজল ॥

দেখ কে রাত কে বাদ
সুবহ্ কম্বল কে পাত্‌তো পর শবনম-
সোচতে হো শায়াদ দরদ সে রো পড়া কমল

সহরা মেঁ রাখ কে পাঁও কিউ জাঙ্গলী হারিণ আয়া
পানি মাঙ্গনে সে মিলা সাহারা কা ধোকা ॥

ইয়েহ তো সারদী কা বাদল ঝোটি কোহর সে মেলা
ধোকা জাগ উঠা হায় ইয়েহ নাহী বারসাত ॥

দশম গানটি হলো :

১০

আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী
এ কোন-সোনার গাঁয়।
আমার ভাঁটীর তরী আবার কেন
উজান যেতে চায় ॥
আমার দুঃখেরে কান্‌ডারী করি'
আমি ভাসিয়ে ছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক্ দিলে কে স্বপন-পরী
নয়ন-ইশারায় ॥
আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
ডেকেছিল ঝড়ের রাতি
তুমি কে এল মোর সুরের সাথী
গানের কিনারায় ॥
ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
এবার ভাঙা তরী চল বেয়ে
রাঙা অলকায় ॥

www.pathagar.com

এ গানটির অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে :

১০

কিশতী আগঈ মেরে কিস কিনারে ইয়েহ কিস সুনেহ্রে গাঁউ মে
তুফাঁ সে লাড় কে আয়ী তুফের কেঁউ লওট কে জানা চাহে ॥

দুঁখু কো না খোদা কারকে কিশতী কো আপনী ছোড় দিয়া
কাবুঁকী রানী কেউ হায় বোলায়ে নয়ে ইশাঁরো মে ॥

সুনেহ্রী দেস কী সুনেহ্রী লাড়কী কেয় তু মাঝি কিশতী কি হোগী?
টুটী কিশতী লেকে চালেঁ জান্নাত জায়ে হাম ॥

বুঝা কে দিয়া তুনে মেরা তূফানী রাত বোলা ভী জা
কোন আয়া লিয়ে বেন কে ধন মে মেরী গীতো মে ॥

এই হচ্ছে ১০টি নজরুল সঙ্গীতের উর্দু অনুবাদ। অনুবাদ কতটুকু সার্থক হয়েছে- সে বিচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, সঙ্গীত সম্পর্কে আমি একেবারেই আনাড়ি। সুর-সঙ্গীত সম্পর্কে আমার কোন তালিম বা লেখাপড়া নেই। এগুলো আমার রুটিন ভুক্তও নয়। দু'চার শব্দ উর্দু যা শিখেছি, সে সুবাদে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাজগুলো অন্যান্য ভাষায় যে হয়েছে সে খবরটি দেশবাসীকে জানানোই আমার এ প্রয়াসের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। অনুবাদ সম্পর্কে এতটুকু বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে তাঁরা গানগুলো অনুবাদ করেছেন, সুর বেঁধেছেন। আমরা উদ্যোক্তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। জাতীয় কবির জন্য শতবার্ষিকীর প্রারম্ভে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নজরুল রচনাবলীর ভাষান্তরের বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার আহ্বান জানাই। নজরুল আমাদেরই শুধু নন, তিনি গোটা মানবতার সম্পদ।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

নজরুলের পত্র-সাহিত্য ও নজরুল

নজরুল জীবনপঞ্জি

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি

নির্বাহী কমিটি

সাবকমিটিসমূহ

ফিরে এলো আজ্ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুস্‌লিম কারো শির
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা!
—কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

দরিরামপুরের কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া 'সুতিয়া' – কবির স্মৃতিবাহী নদী

www.pathagar.com

গানের কবি নজরুল

কাজী কাদের নওয়াজ

'বুলবুল' আর 'চোখের চাতক' দিল্-চকোর
নাগ্‌মা শুনায় তব গানে কবি, ঝরে যে লোর।
'পাখায় পাখায় মাখামাখি' করে 'মানিক-জোড়'
ভালোবাসা-শাখে বাসা বাঁধে তৃতী হয়ে বিভোর।
নিশীথে পাপিয়া পিউ পিউ ডাকে নির্নিমিখ
'বকুলে আকুল' করি কেঁদে ওঠে বিরহী পিক্।
এলো খোঁপা হতে সোঁদা সোঁদা বাস্ মদির করে সে ভোরের বায়
ব্যথার গানের কবিরে স্মরিয়া বাঁশী বাজায়,
কোন্ সে উদাসী 'কেউ ভোলে কেউ ভোলে না' তায়
আঁখিজলে মোছ, ওঠ ওঠ প্রিয়ে! কবি জানায়।
'হাস্নুহেনা'রে ডেকে বলে– কেন ফুটলি আজ?
বেণু-বনে কাঁপে কালো-ছায়া, আসে ঘনায়ে সাঁঝ।
ম্লান হয়ে আসে কেয়াবন, ওঠে কাজরী গান।
'ও কাজল-চোখে এত জল' হেরি কাঁদে পরাণ।
কোথা সে পাষাণি! 'ঝালর পলকে যার আঁখি'র,
ঝলমল করে অশ্রুতে গাঁথা হার মোতির।
'রবি ডুবে যায় বলাকা পাখায়', 'পানিয়া ভরণে' 'গৌরী ধার
দূর অতীতের স্মৃতি স্মরি কবি! এ দীন অর্ঘ্য দেয় তোমায়।।

নজরুল

জসীমউদ্‌দীন

নজরুল ইসলাম
তসলিম ঐ নাম
বাংলার বাদলার ঘনঘোর ঝঞ্ঝায়
দামামার দমদম লৌহময় গান গায় ;
কাঁপাইয়া সূর্য ও চন্দ্রের বক্ষ
আলোড়িত আসমান ধরণীর বক্ষ
সেইকালে মহাবীর তোমাকে যে হেরিলাম,
নজরুল ইসলাম।

www.pathagar.com

হে কবি

বন্দে আলী মিয়া

জীবনের অপরাহ্ন আজ—চেয়ে দেখি সুদূর অতীতে
জনতার চলেছে মিছিল, চেনা আর অচেনার ভিড়—
কোলাহলমুখর সরণী, অনাহত বাণী চারি ভিতে
ছেয়ে আছ ধূসর ধুলায়—নাহি আর দীপকের মীড়।

সেদিন দেখেছি কবি, 'অগ্নি-বীণা' ছিলো তবে হাতে,
সে-অগ্নি করেছে দগ্ধ শতাব্দীর পাপের আঁধার,
বিষণ্ন সর্পিল ধোঁয়া বসুধার অন্তিম প্রভাতে
ফুঁসিছে দূরন্ত রোষে— কালাগ্নির আকুল পাথার।

'বিষের বাঁশি'র সেই সুর আজো শুনি-শুনি হাহাকার,
বেদনায় কাঁদে আর্ত নর-অপমান লাঞ্ছনা পীড়ন
নিরন্তর লভিতেছে যারা তব কণ্ঠে ধ্বনি শুনি তার;
—নিভে যাক বেদনা দহন-দূর হোক অন্যায় শোষণ।

আজি তুমি কত কাছে, তবু ভাবি কত না সুদূর,
অমৃত নির্ঝর-ধারা কণ্ঠে তবে থেমে গেছে, হায়!
বৈশাখী ঝঞ্ঝায় যেনো শুনি তব ভৈরবীর সুর—
তোমার আঁখির ভাষা লোকে লোকে দিগন্তে হারায়।।

নজরুল

গোলাম মোস্তফা

কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত
হেসে গান গায় দিন রাত।
প্রাণে ফূর্তির ঢেউ বয়
ধরার পর তার কেউ নয়।

www.pathagar.com

আমাদের কবি

ফররুখ আহমদ

সন্ধ্যার সূর্যকে
যা খুশী বলুক লোকে
দিয়েছে সে আলো সারাদিন।
তুলি বিদ্রোহ চূড়া
করেছে যে গুঁড়া গুঁড়া
আঁধারের মাঠ সীমাহীন।
মিথ্যা, অসাম্যের
যত সব কালো ঘের
দিয়েছে সে জ্বালায়ে আগুনে।
প্রভাতের বহু পাখী
উঠিয়াছে সাথে ডাকি'
শুধু তার আবাহন শুনে।
সে কথা ভুলেছে যারা
আজও ভুলে থাক তারা
বলিতে চাহি না তাহাদের।
শুধু ভালবাসে যারা
আজ শুনে নিক তারা
প্রয়োজন আছে সূর্যের।
সন্ধ্যার সূর্য সে
জানি আমি এ প্রদোষে
তবু তাতে নাই কিছু ক্ষতি।
সূর্যের রশ্মিকে
দেখি মোরা দিকে দিকে
তার গতি থেকে পাই গতি।
'অগ্নি-বীণা'র কাজ
শেষ হয় নাই আজ
'বিষের বাঁশী'ও মোরা চাই।
যে গান গেয়েছে কবি
সে তো জানি যুগ-রবি
কোনদিন তার শেষ নাই।
'ভাঙনের গান' শেষে
আঙনে উঠিবে হেসে
'দোলন-চাঁপা' ও 'ঝিঙেফুল'।
কালো মেঘে সাড়া পেয়ে
চাতক উঠিবে গেয়ে
চিরদিন গাবে বুলবুল।

www.pathagar.com

নজরুলকে মনে করে

আহ্সান হাবীব

(কী অসহ্য উজ্জ্বল এবং দুর্বার তোমার উপস্থিতি আমার জীবনে।)
তোমাকে উত্তীর্ণ হবো, এ আশায়
আর উত্তর কালের এক প্রতিনিধি হবো এ আশায়
আমি কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতীক।
বালখিল্য মত্ততায় কখন হঠাৎ
সব আলো নিবিয়ে পথের, একাই অগ্রসর হয়েছি
এবং ভেবেছি
আমি এক স্বনির্ভর আলোর জগৎ।

অথচ তোমার কিংবা তোমার কালের সব চিহ্ন মুছে ফেলে
যখনই এগিয়েছি—
মুখোমুখি হয়েছি এক অন্ধকার আকাশের
আর শূন্যতার।
এবং পশ্চাতে ফিরে তাকিয়েছি
স্তব্ধ ইতিহাসে শিখা জ্বলে আর নেভে—
আর আমার মগ্নতার লজ্জা ঢেকে দেয়
তখন তার আলোর দাক্ষিণ্য।

এবং বারবার তবু অস্বীকার করছে এক অনভিজ্ঞ মনস্বিতা
ভেবেছে কোথাও কোন অবিনশ্বর নদী নেই,
আমিই আমার নদী
আর তার গর্ভে মুক্তো অজস্র কুড়াব
কীর্তি রেখে যাব অনন্য।
দুর্বল আমার প্রতিরোধ ভেঙেছে বারবার,
অবিনশ্বর সেই নদীটি পাশে পাশে রয়ে গেছে;
আমাকে দিয়েছে সঙ্গ আমারো অজ্ঞাতে।
অত:পর আজ জানি
তুমি, আর তুমি যাদের সঙ্গী হয়ে এগিয়েছ
তাদের, এবং তারা যে নদীর সঙ্গী
তার সঙ্গ থেকে মুক্তি নেই আমারো।

তোমাকে ভুলতে গিয়ে বারবার পড়বে মনে
আমার কৈশোর আর সমগ্র যৌবন ঘিরে
তোমার নায়ক মূর্তি
যে আমাকে নায়কের অহংকার অর্জনের স্বপ্ন দিয়েছিল।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামের ছবি দেখে

আবুল হোসেন

নেহাত নসিব ভালো, এই শতাব্দীর উনত্রিশ
আটাশ সাতাশ সালে কেটেছে আমার ছেলেবেলা,
নয়তো আমিও ভেসে যেতাম সে দুর্বার বন্যায়
যে উন্মত্ত আকর্ষণে কুমিল্লা 'চাঁট'গা ফেনী ঢাকা
ভেঙে পড়েছিলো হলে, মাঠে-অবিরাম মজলিস—
হাসিতে হল্লায় গানে ছায়ার মতোন সারা জেলা
ছোটে তার পায় পায়, গজলে গল্পে ও কবিতায়
আচ্ছন্ন বাঙলা। এলো বের হয়ে নারী পর্দা ঢাকা।

নিবিড় ঘুমের রাত্রি হল দিন। ছুঁয়েছে আগুন
সারা দেশ। গান ধরে নির্ভয়ে ফাঁসির মঞ্চে ঢুকে
হাজারো তরুণ। পথে ঘাটে। তুমি সেই বিদ্রোহের কবি।
সে কথা যখনি ভাবি কী চাঞ্চল্য জাগে রক্তে বুকে,
বিমূঢ় বিস্ময়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি এই ছবি।

নজরুল

আবদুস সাত্তার

ফুলের ভিতরে ঘ্রাণ
        সে ঘ্রাণে আমরা মশগুল
কাব্যের সুরভি ভরা
        তুমি সেই ফুল নজরুল।

www.pathagar.com

নজরুল

সিকান্‌দার আবু জাফর

সারা দেশে মৃত্যুঘুম,— নিস্তব্ধ নীরব
জীবনের যত কলরব।
ঘরে ঘরে নিভে গেছে আয়ুম্লান দিবসের ভীরু দীপশিখা,
দিগন্ত-বিস্তৃত মাটি ঘিরে আছে অন্ধ মরীচিকা।
বিকলাঙ্গ রুদ্ধবাক শিশুটির মত
নিত্য অবিরত
সহস্র মানুষ শুধু অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপে
দ্বিধাহীন শাসনের নির্মম প্রতাপে।
তারি মাঝে মৌন দুরাশায়
কদাচিত মানুষের তিক্ত প্রাণ খুঁজে ফেরে— জীবনের আনন্দ প্রচ্ছায়।
এমনি কঠিন, এক দুর্যোগের বিষণ্ন প্রভাতে
বিদ্রোহের 'অগ্নিবীণা' হাতে
অজানা দিগন্ত হতে এসেছিলে অকস্মাৎ ঝড়ের মতন।
এসেছিলে জীবনের নতুন কম্পন
ব্যাধিজীর্ণ মানুষের প্রতি স্নায়ু ঘিরে;
কারামুক্ত করেছিলে ভয়ভীত মৃত্যুর বন্দীরে।
সমস্ত আকাশ ছাপি মেলেছিলো আশ্বাসের প্রশস্ত উত্তরী,
বলেছিলে 'ভয় নাই-আজো বেঁচে আছে প্রাণ
মানুষের জীর্ণ বক্ষ ভরি'।
সে আশ্বাসে উল্লসিত হয়ে
বহু ব্যর্থ বাসনার ক্ষুদ্র পুঁজি লয়ে,
আতঙ্কিত মানুষের দল,
সহসা উন্মাদ হয়ে হেলাভরে ছিঁড়ে ছিল
শতাব্দীর ভীতির শৃঙ্খল।
অগ্নিগর্ভ বাণীবাহী হে বীর বিপ্লবী
অসহায় নতমুখ দুর্বলের কবি,
সংগ্রামের পথে তব স্পর্ধিত নির্ভীক আমন্ত্রণে,
যত ভয়-ভয় পেয়ে কেঁপেছিল প্রাণের নির্জনে।

অগ্নি শুধু নয়—
অগ্নিবাহী তব চোখে বহুবার দেখেছি যে অশ্রুর বিস্ময়।

www.pathagar.com

যে প্রাণ উঠেছে জেগে উদ্ধত বিদ্রোহী নিয়ে অশনি ঝংকারে,
সেই প্রাণে ভেসে গেছে ক্রন্দনের খরস্রোতে
বেদনার সামান্য প্রহারে।
বহুবার বহু কাছে এসে
বহু ভালোবেসে,
তোমার প্রাণের দুইদিক
দেখে গেছি স্তব্ধ নির্ণিমিখ।
যতবার দেখেছি সম্মুখে
প্রলুব্ধ কৌতুকে,
চেয়েছি তোমার পানে ভীরু জিজ্ঞাসায়
কত প্রেম, কত ঘৃণা পাশাপাশি রাখো তুমি
হৃদয়ের গোপন প্রচ্ছায়।
বুঝিতে পারিনি তবু চোখে বাসা বাঁধে অগোচরে
এত প্রেম- এত অনুভূতি!
চির-যৌবনের কবি, মৃত্যুহীন প্রেমের কপোত
আজ থেমে গেছে তব অগ্নিবাহী সংগীতের স্রোত।
আজো তুমি ঘিরে আছো আমাদের সমস্ত প্রভাত,
তবু কেন ছেয়ে আসে এমন নিস্তব্ধ পায়ে
অন্ধকার রাত?

ওঠো কবি— ওঠো, কথা বলো,
সর্বাধিনায়ক হয়ে পুনর্বার আমাদের পুরোভাগে চলো।
পুনর্বার আনো নব জীবনের কুহু-কলস্বর
লভুক নতুন দীপ্তি আমাদের হৃদয়ের তৃষিত অম্বর।
তবু কি দেবে না সাড়া?
উদ্দাম প্রাণের পাখী আর কভু পাবে না কি ছাড়া?

তবে বুঝি ঝড় থেমে গেছে,
ঝড়ের পাখীর মতো তোমার গানের পাখী
তবে বুঝি ফিরে চলে গেছে?
ঝড় ফিরে গেছে তবু ধরণীরে ভরে গেছে অকৃপণ দানে,
মৃত্যুহীন স্মৃতির সম্মানে।
সেই দান ছেয়ে রবে প্রেমনত বিমুগ্ধ অন্তর,
হে কবি, গ্রহণ করো শ্রদ্ধার অঞ্জনে আঁকা আমার স্বাক্ষর।

www.pathagar.com

বিদ্রোহী কবিকে

আজিজুর রহমান

বাণী-বহ্নির
'বিদ্যুৎ-শিখা
রুদ্র-দীপক-তুমি।
ঘুমন্ত দেশে
জাগালে জীবন
দুরন্ত-ঝড়-মৌসুমী।

রুদ্ধ-কারায়
প্রাণ-চঞ্চল
আশা-অঙ্কুর
নব-তৃণদল
জনতা এনেছে
মহান মুক্তি
মুক্ত স্বদেশ-ভূমি।

দুর্যোগ-নিশি
হল না নিশেষ
আজো যত নিগ্রহ—
গরীব দুখীর
দুনিয়া করেছে
নিয়ত দুর্বিষহ।

'অগ্নি-বীণা'র
বিদ্রোহী কবি
বাজাও আবার
বিষ-ভৈরবী
শিরায় শিরায়
উষ্ণ শোণিতে
ফুটুক ছন্দ মুরসুমী।।

www.pathagar.com

নজরুল এবং একটি লাল চিরুনি

আবিদ আজাদ

কয়েক বছর আগে নজরুলের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল
প্রচণ্ড ভোরবেলার সাথে যেমন মাঝে মাঝে ঝড়ের দেখা হয়

ঢাকার পিজি হাসপাতালের একটা বিশেষ কেবিনে তখন ছিলেন নজরুল
ডেটল ও ফিনাইলের গন্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি তাকে দেখেছিলাম

মনে আছে, তারও আগে, বেঘোরে, পড়া কিশোর আর যৌবনে পা রাখা
স্বপ্নগ্রস্ত সব বাঙালি যুবকদের কাছে
এক সময় নজরুল প্রচুর বারুদ আর লাল চিরুনি পাঠাতেন গোপন পার্সেলে
ওরকম বয়সে আমিও সন্ধিবেলার স্তব্ধতায় পা রেখে একদিন পেয়েছিলাম
নজরুলের পাঠানো একটা লাল চিরুনি
এবং যথারীতি হারিয়েও ফেলেছিলাম এলোমেলো ঝাপসা পথে—

আমরা জন্মেই শুনেছি কলকাতায় সারাদিন শুয়ে বসে বিড় বিড় করেন
আর নিউজপ্রিন্ট ছেঁড়েন নজরুল—
হ্যাঁ, নজরুল তখন অপ্রকৃতস্থ—
তবে এই উপমহাদেশ কখনও নজরুলের বাবরি চুল আর লাল চোখের চেয়ে
বেশি প্রকৃতস্থ ছিল বলে কোনদিন মনে হয়েনি আমার

কয়েক বছর আগে নজরুলের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল
লালচে গোল চাঁদের সাথে যেমন একটা ভূতুড়ে জানালার দেখা হয়

সেই সাক্ষাতের সময় নজরুল আবার একটা চিরুনি দিয়েছিলেন আমাকে
খুবই টক্‌টকে লালরঙের একটা চিরুনি

নজরুল চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে প্রায়শই একটা চিরুনি ব্যবহার করতেন
বঙ্গীয় মুসলমান এবং হিন্দুদের চুলের যত্নের ইতিহাসে নজরুলের সেই চিরুনি
আজও এক দুর্মর স্মৃতি হয়ে আছে—
কে না জানেন নজরুল তার ঝড়ো হাতে সেই চিরুনির টানে
কীভাবে তছনছ করে দিতেন ব্রাহ্মণের টিকি আর মোল্লার দাড়ি
তাইতো এই শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের দিকে
বাংলা কবিতার উস্কোখুস্কো চুলের ভিতর থেকে হাওয়ার টানে উড়ে গেছে
প্রচুর মরা উকুন, নষ্ট চুলের গোছা আর খস্‌খসে সাদা খুশ্‌কি

সেই লালরঙের চিরুনিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি আবার
মনে হয় বাংলা কবিতার জন্য ও রকম লাল চিরুনির বড়ো প্রয়োজন আজ

লাল রঙের তীব্র একটা চিরুনি
আছে কারও কাছে?

www.pathagar.com

এসো মহাকবি

আবদুল মুকীত চৌধুরী

শতক পেরিয়ে বহু শতকের প্রান্তে
এসো মহাকবি, 'দেবো না ভুলিতে' জানতে
বিশ্ব অভ্যুদয়ের আলোক বিস্তার
আজ নেই নেই অন্ধকারের নিস্তার!

স্তব্ধ করেছো বলদর্পীর হুঙ্কার
অযুত মিছিলে জাগো মূর্চ্ছনা-গণরোল
তিমির বিনাশী এসেছো আলোক সূর্য
ছিন্ন আঁধার বাজাও তো রণ-তূর্য।

পাশব হিংস্র মহাকদারণ্যে শঙ্কা
'দাবানল-দাহ' সৃষ্টিতে বাজে ডঙ্কা
দন্ত-নখরধারী লুণ্ঠিত শতদল
পশু হত্যার উৎসব আনো উজ্জ্বল।

চেতনা-মশাল মুমূর্ষু আজ ক্লীবতায়
বিশ্ব কসোভো হত্যাযজ্ঞ পার পায়
মৌনতা বা সূক্ষ্ম 'বাণী'র কূটজাল
আশোষী সাপোষে আনো বৈশাখী উত্তাল

'জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে' বর্জ্যরা সব উড়ে যাক
মানবিকতায় মুক্তি-কপোত ঘ্রাণ পাক
দলিত-মথিত শত জনপদে উত্থান
সংহত হোক নির্যাতিতের জয়গান।
বহু বঞ্চিত স্বাধীনতা আজ কাম্য
আনো নজরুল মুক্তি ও শুভ সাম্য ॥

www.pathagar.com

নজরুলের ভালোবাসা

মতিউর রহমান মল্লিক

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো তৃণলতার আগে
মাটি ও পলিমাটি
মানবতার আগে মানুষ ও মহাজনতা
পৃথিবীর আগে প্রাণজ পরিব্যাপ্তি ও
প্রাণাত্যয় পরিপূর্ণতা

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো সাত সাতটি
সমুদ্র ও আকাশের আগে আরো সমুদ্র
এবং অনেক আকাশ
একটি চাঁদ কিম্বা একটি সূর্যের আগে
পুরাবৃত্ত ও প্রমাণিত আলোর অখন্ড

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো আনন্দের আগে
শতাব্দীর কান্না ও হাহাকার
পুষ্পের আগে
অনবরত কাঁটার আঁচড়ের মত
রক্তাক্ত ইতিহাস এবং
প্রাপ্তির আগে অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তির এক
মহাশূন্যতা

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো শরীরের আগে
অফুরন্ত হৃদয় ও মরুভাস্করের মত প্রেম
বিষের বাঁশীর মত অশেষ বিদ্রোহ এবং
অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দের মত
বীতিহোত্র বিপ্লব

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো আকারের আগে
নির্ভরযোগ্য অনাদি এবং নিগূঢ় নিরাকার
নিজের জন্যে উদ্বেগের আগে
আমাদের জন্য সান্দ্র, সমিদ্ধ
এবং উৎসঙ্গ
নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো চিত্রের আগে
চিত্রাঙ্কনের বিকশিত প্রতিভা
যেমন ঝড়ের আগে অসম্ভব সাহসের উৎকর্ষ
যেমন নিসর্গের আগে সৌন্দর্যের বর্ণালী রেহান
এবং বিস্তারের আগে প্রতীতি ও প্রত্যয়ের
উত্তরঙ্গ উত্থিতির মত
অনবরত বিজয় ॥

www.pathagar.com

দৌলতপুরে একদিন

সোলায়মান আহসান

'আজো মধুর বাঁশরী বাজে.......' —নজরুল

দৌলতপুর গিয়েছিলাম।
কালের সাক্ষী হয়ে আজো আছে
সেই 'খাঁ বাড়ি' পলেস্তরা খসা, সেই দীঘি, আম গাছ
তবে নেই আগের দৌলত—নেই কবি স্মৃতিধন্য সে আনন্দ
এক বিষণ্ণতা চারদিক ছায়া মেলে আছে।
কল্পকথার মতো তোমাদের প্রেম-গাথা আজো মিশে আছে
হু হু করে বাতাস নেভায় পিদিম
উদাসী রাখালের বাঁশির সুর, করে দেয় স্তব্ধ বিধুর
সকাল-বিকাল সন্ধ্যার কানে কানে।

তোমার দুরন্তপনা যে নারীর জীবনে বিষাদ চিহ্ন এঁকে দিলো
তাকে সুধিজন কিভাবে নেবেন জানি না, তবে—
আমরা কতিপয় কবি তোমার স্মরণ উৎসবে এসে
স্মৃতিময় জনপদে শুনেছি এক কিশোরীর চাপা কান্নার শব্দ :
কবিদের বিশ্বাস করো না— কবিদের দিয়ো না ভালবাসা .....
মনে হলো আমরা কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আর
বাদী দৌলতপুরবাসীর রোষানলে পতিত হবো
বিলুপ্ত হবে আমাদের অস্তিত্ব
কিন্তু না, দৌলতপুরবাসীর হৃদয়ের দৌলত আজো
উপচিয়ে পড়েছে আমাদের জন্য
কোন বেদনা গ্রাস করতে পারেনি।

শুনেছি তোমার বাউণ্ডেলে জীবনের সবাক কালে
যৌবনের প্রারম্ভিক এ শোক-স্মৃতি পুড়িয়েছে তোমাকে
আর সেই নারী যার হৃদয়ে তুমিও বেঁচে ছিলে
তোমার স্মৃতি চলার পথে আঁধারে ঢেকেছিল কতটুকু জানি না
জানি না কৈশোরিক দু:স্বপ্নের স্মৃতি পুড়িয়েছে কতদিন
জীবনের পড়ন্ত দিনেও নার্গিস আসার বেগম
আপনি আমাদের হৃদয়ের কবিকে শাপন্ত করেছেন কি না
জানি না আপনার হৃদয়ে সেই উদাসী কবির বাঁশি
কতদিন বেজেছিল মনে
এসব কিছুই জানি না আমরা, রাখিনি খবর
শুধু কবিকে নিয়েই থেকেছি মেতে
তবে আজ আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠে যে জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে
যে আনন্দ জেগে উঠেছে দৌলতপুরের আকাশে বাতাসে
তার মাঝে শুনেছি দ্বৈত সত্তার অপূর্ব কোরাস :
'কবিরা কখনো হয় না হৃদয় হন্তারক।'

•

www.pathagar.com

নজরুল

আসাদ বিন হাফিজ

তোমাকে চেনেনি মুর্দাফরাস, ইমাম, মোয়াজ্জিন
চেনেনি মূঢ়, অর্বাচীন এ স্বজাতির কাঠ মোল্লা
চেনেনি যাদের জন্য কেঁদে পার করেছ রাত্রদিন
কাফের বলে গাল দিয়ে ওরা করেছে শুধু হল্লা।

অথচ 'ওরা' তোমাকে চিনতে মোটেও করেনি ভুল
তোমাকে গ্রাস করার জন্য পেতেছে হাজার ফাঁদ
প্রমীলা নামের দৈত্য তোমার ছিঁড়েছে মাথার চুল
অন্ধকারের প্রবাল দিয়ে ঢেকেছে সৃজন চাঁদ।

মস্তকে হাত বুলিয়েছে রবি, স্নেহের এমন টান
নিজের লেখা বইয়ের মাথায় লিখেছে তোমার নাম
এই করে করে মেধা ও মননে ছুড়েছে কুটিল বান
তোমাকে মূক ও বধির করে পুরালো মনস্কাম।

জীবনে মরণে ষড়যন্ত্রের অক্টোপাসী থাবা
তোমাকে ঘিরে করেছে উল্লাস নিত্য ঝড়ো মেঘ
তবু হে কবি মানুষের মনে গড়েছ প্রেমের কাবা
ভাবোনি সমাজ করবে কি না সে সবের উল্লেখ।

বলেছ, 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে'
'ত্রিভুবনে প্রিয় মুহাম্মদ— এলরে দুনিয়ায়।'
'নবী মোর পরশমনি' আজ মানুষের ঠোঁটে দোলে
জেহাদের মাঠে, শহীদের খুনে আজকে জীবন পায়।

সমকালে এক কবি তো কেবল আবর্জনার ঢেলা
বুদ্ধিমানের(!) চোখে চিরদিন হদ্দ বোকার কাঠি
মহাজনদের বক্র চোখের এই নিদারুণ খেলা
শেষ হলে এই কবিরাই গড়ে জীবন পরিপাটি।

www.pathagar.com

তোমার হাতে অগ্নিবীণা

আহমদ মতিউর রহমান

তোমার হাতে 'অগ্নি-বীণা' ছিল বলেই
বাজিয়ে ছিলে তূর্য নিনাদ
সুখদ সময় হাসতে খেলতে কাটতো যাদের
তারাও শেষে দাঁড়ালো ঘুরে ভর দুপুরে
তুমিই শেষে হানলে আঘাত
তোমার হাতের অগ্নিবীণার মোহন মায়ায়
ছলকে উঠে তুললো কাঁপন
তরুণ যুবা
বাঁধার পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার মন্ত্র পেল
যেন তারা, লক্ষ অযুত
ঘোড় সওয়ারী।

ম্লেচ্ছ বলে হাজার গালি করলো হজম, খোদার কসম,
বলে তারা জঙ্গে নেমে
ধরলো পাড়ি, অথই নদী অথই সাগর
সামনে পড়ে রইলো তাদের।

বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ তুমি আনলে ডেকে
ভৃগুর বেশে হেনে পদাঘাত
জাগিয়ে দিলে 'ভগবান'কেই
ফিরিঙ্গিরা খুললো যে চোখ— এই জেগেছে বিপ্লবী এক
সাহসী কঠোর হাতেতে কুঠার।
এক হাতে তার রণতূর্য বেজেছে যদিও আর হাতে ছিল
বাঁশের বাঁশরী।
তোমার হাতে 'অগ্নি-বীণা' ছিল বলেই.......

নজরুল ইসলাম

আহমদ আখতার

উঠলো দুলে কখন আবার আমার ছোট্ট মৌন ঘর
তখন ঝড়
কখন আবার দুললো আকাশ কাঁপল ভুবন থরোথর
ভয়ংকর।

প্রাচীন কোন্ রাতের সীমা ভাঙলো খিমা আঁধার ঘোর
—কিসের জোর!

www.pathagar.com

কখন আবার তারার মালা পড়লো খ'সে দূরান্তরে
ভয়ের তোড়ে।
হাওয়ায় ওড়ে রঙধনুকের বর্ণমালায়
মৃত্যু পালায়
ঘুমের নেশায় যারাই থাকে তাদের ডাকে
জীবন বাঁকে।

তাই তো আবার প্রখর রোদের হট্টগোলে
সবাই ভোলে
মৃত্যু-কঠিন নির্মমতার রুক্ষস্বর
তখন ঝড় ....

নজরুল

গোলাম মোহাম্মদ

ছিলোনা রাতের শেষ; টানটান ব্যথা ছিলো বুকে
জুলুমের হায়েনারা—দমনে পীড়নে ভীতিকর
নদী বয় বেদনার—ফুলঝরে হাহাকারে ধুকে
প্রলয়ের সেই ঝড়ে উজাড় হলো যে কত ঘর।

কি সেই ভয়ের রাত! অধিকারহারা জনতার
মত্যুময় প্রহসন ছুঁড়ে দেয় বেনিয়া-বণিক
কে বইবে সেই ব্যথা নৃশংস পাশবিক ভার
বাঙলার মাটি কাঁদে! কোন বীর হাসাবে ক্ষণিক।

ছিলো না প্রাসাদ তার, ভালোবাসা ছিলো হাত ভরা
সুরের আগুন ঝরা; প্রতিবাদী উচ্চ আলাপনে
আকাশের মত মাথা সমুদ্রের মত নড়াচড়া
উঠে এলো সেই বীর, জনপদ দুলে ওঠে রণে।

যুগের কোরাস গেয়ে সাহসের সেই উপমান
প্রাণহীন জনপদে একদিন এনেছিলো প্রাণ।

www.pathagar.com

সেই সে দরাজ বুক

কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

হারিয়ে গেছে একটি উজ্জ্বল মুখ
দুখু মিয়ার সেই সে দরাজ বুক।
দু:খের সাগর দুখু মিয়ার ধন
সেই ধনেই কাটলো আজীবন।

গজল গাওয়া বুলবুলি তার নাম
তার সজলেই পাগল পাড়া, আকুল করা
সুরের শিরীন বইছে অবিরাম।

ব্যাথার ব্যথী সিন্ধুপাড়ের মন
ব্যাথার গানেই মুগ্ধ সারা বন।

নিজের মনের ব্যথা ঢেকে সব
মজলুমানের দিন ফেরাতে, এই ধরাতে
তুলতো তুমুল বিদ্রোহেরই রব।

সবার আশীষ লয়েই অবশেষে
লক্ষ তারার চাঁদের দেশে সে-
হারিয়ে গেছে একটি উজ্জ্বল মুখ
দুখু মিয়ার সেই সে দরাজ বুক॥

প্রেমিক তুমি, বিদ্রোহী

জাকির আবু জাফর

কতকাল পথ চাওয়া শেষ হলে পর,
নিয়ে এলে বাঁধভাঙা জোয়ারের স্বর।
অসুরের আক্রোশে, হৃদসীমা, লয়,
তুমি এলে কাব্যের সুর হিমালয়।
গর্জনে ডুবে যাওয়া আকাশের নীল,
একটানে ছিঁড়ে দিলে বজ্রের খিল।
ভেঙে গেলো জমকালো পোশাকের ঘুম,
মন খুলে বুলবুলি এঁকে দিলো চুম।
যখন তোমাকে দেখি মনের খাতায়,
আঁখি ভরা জল আসে চোখের পাতায়।
হায়রে আমার প্রিয় বিদ্রোহী বীর,

www.pathagar.com

কারো কাছে হয়নি তোমার নত শির।
সাহসের উচ্ছ্বাসে নির্ভিক মন,
ভেংগে দিলে বদ, জ্বরা, পচা-পুরাতন।
সাগর বিরাট—বড় হৃদয়। তুমি
এনেছিলে সত্যের সবুজ ভূমি।
পর্বত সম দৃঢ় অটল চলন,
অত্যাচারির বুকে পায়ের দলন।
বিদ্রোহী ছিলে তুমি, ছিলে প্রেম চাঁদ,
দ্রোহের খামারে ছিল প্রেমের প্রাসাদ।
এক হাতে প্রেম সুর, আর হাতে ঢাল,
খুলে দিলে জীবনের নতুন এক পাল।
দেখো দেখো আজ দেখো তোমার প্রেমে,
দলে দলে জোসনারা আসছে নেমে।
তোমার কানন ভরা সুবাসের ফুল
তুলে নেয় মুছে দিতে জীবনের ভুল।

বায়ুময় বৃষ্টির আগে

নাঈম মাহমুদ

সে এসেছিল বায়ুমুল বৃষ্টির আগে, যেভাবে
বৃষ্টির আগে আসে সনাতন মেঘ, আর
মেঘের আগে আসে ঘ্রাণময় বাতাস;
তার সাথে রয়েছে রোদের হৃদ্যতা, এবং
শত্রুতা শুধু আষাঢ়ের সাথে
প্রেমের আচার তার রোদেই শুকায়:

তার চাদরে বোনা বাবলার বন
তার জামায় আঁকা ধুতরার ক্ষেত
তার গায়ে পোড়া গন্ধের ঘ্রাণ
তার চোখে ভরা যমুনার রঙ ;

গ্লানিময় গোলামীতে তেতে আছে তার পায়ের জমিন
পরাজয়ে পুড়ে গেছে বহুচেনা আর মুখের আদল
কিন্তু সে নিয়ে এলো রোদেলা দ্রোহের প্লাবন
প্রতিক্ষিত প্রত্যাশার সুনিশ্চিত বিজয়ের গান,
ফলময় জীবনের কাঙ্ক্ষিত উপযোগ,

এবং সে চলে গেল সবুজাভ সময়ের আগে।

www.pathagar.com

ঘুমহীন ফুল

ওমর বিশ্বাস

ঘুমহীন ফুলগুলো চাঁদের মতন উদাসীন
কথা বলে আনমনা—অপরূপ গহীন রাত্রিরা,
ঘোমটা ঢাকা তারা বিগলিত জোছনায় লীন
দল বেঁধে বহুদূর চলে, খেয়াতরীর যাত্রীরা।

গানগুলো এলোকেশি খোঁপাবাঁধা চুলের যতন
একখোঁপা খুলে দিলে অজস্র গোলাপ ঘ্রাণ দেয়।
কবিতা মনের কথা দীলছোঁয়া হীরক রতন
সব মিলে বিদ্রোহীর ভালবাসা প্রেম কেড়ে নেয়।
আকাশে 'বিষের বাঁশি' বেদনায় দোল খাওয়া সুর
ভ্রমরের গুঞ্জরণ ডুবন্ত মাছরাঙার দল
মেতে থাকে সারাক্ষণ গুনগুন গানে সমধুর
অনুভূতির রূপালী কণাগুলো করে কোলাহল।

কোথাও কখনো কোন শূন্যতা অথবা অবহেলা
হয়নি উৎসব ম্লান। কাব্য ভুবনের অধিপতি
তুলে নেয় তুলি দিয়ে মেলে সংখ্যাহীন শব্দমেলা—
নজরুল আকাশের মুক্ত উড়ে চলা প্রজাপতি।

শতাব্দীর মোহন সমুদ্র

মৃধা আলাউদ্দিন

সৃষ্টির বিস্ময় তুমি বিস্ময়ের দ্যুতি
সে বিস্ময় (চির সুর) শুধু কাব্য হাসি;
কাব্য-ব্যথা, কত কথা—রৌদ্র রাশি রাশি—
বিদ্রোহী বিস্ময় তুমি মধুময় জ্যোতি।

তুমি পার হলে ভয়ে ভাঙ্গা যুদ্ধ রথ
অসম্ভব নিয়মের মসৃণ দেয়াল— ....
তোমার বিস্ময় দ্যুতি
স্বপ্নের খেয়াল ;
ভালোবাসা (ভয়ে ভেজা) বেদনার ঘর।
তুমি কোকিলের গান, শ্রাবণ ও জল
বিরহের অস্থিরতা—কঠিন হুঙ্কার;
মোহন সমুদ্র তুমি—
তোমার গজল-গান কী রৌদ্র উজ্জ্বল!

তুমি মহিরুহ বৃক্ষ—সবার নজরুল
লতা-গুল্ম-ঘাস—চির ফাগুনের ফুল।

www.pathagar.com

পাখি কাব্য

নিয়াজ শাহিদী

তেলাপোকা উড়ে যায়; নেমে আসে দীর্ঘ আবর্তন
ডানাগুলো কাগজের পাতার মতন উড়ে যায়
উড়ে যায় ইতিহাস; মানুষের চোখের মতন,
মিলে যায় শূন্যে; অন্য কোন ধ্যানে; নতুবা গুহায়

অথবা সে প্রাচীনত্ব ঘোচাতে পারে না বলে, ওড়ে
হাজার বছর ওড়ে সেই ডানা, সেই ইতিহাস
এবং লজ্জার ভারে আবর্তনহীন পাখি ঘোরে।
এক বৃত্ত; দুই ডানা; তেলাপোকা কাব্য বারো মাস।

এখনো রাতের গান কিংবা দিবা কাব্যের প্রহারে
আমি টিকটিকির পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওদিকে
আমার প্রতিকৃতির উপর আমিই হাঁটছি যেন
ধাবমান এক তেলাপোকা; অহর্নিশ শূন্যতার দিকে।

সমস্ত পাখির কাব্যে প্রতিদিন তেলাপোকা হাঁটে
আমি তার সহযাত্রী; নিয়ত যে প্রাচীনত্ব চাটে।।

বিদ্রোহী সুর

আমিন আল-আসাদ

কে ছিলো বিদ্রোহী উন্নত শির
কে গড়েছে বলো হৃদয়ে নীড়
বলোতো কে চির সংগ্রামী বীর
কার গানে জেগে ওঠে বোবা ও বধির

নাম ছিলো দু:খু মিয়া কণ্ঠ মধুর
চুরুলীয়া গ্রাম তার নয় বহুদূর
সত্যের কবি তিনি বিপ্লবী নূর
সাম্যের ছবি তিনি বিদ্রোহী সুর।

www.pathagar.com

একদিন নজরুল এসে

হোসাইন হাফিজুর রহমান

এমন মোহন দুর্দিনে দুখুর জন্য কিছু লিখবো ভাবতেই
দেখি কবিতার পংক্তিগুলো
নদীর কিনারে শাক তুলতে গেছে।
আমার ফিঙেদোল মন বোল পাবে
ঝিঙেফুলের কেশরে-পরাগে
তাই নদীর কাছে গেছে।
তখন নজরুল কি যেন ভাবতে ভাবতে
হেঁটে যাচ্ছিলেন নদীর পাশ দিয়ে পশ্চিমে।
আমার কুসুম কুসুম কবিতার দিকে চেয়ে
তিনি মুচকি হাসলেন।
আর আকাশের ফিরিঙ্গি মেঘের দিকে তাকিয়ে
ডমরু ডংকার মতো
ঘোর অমানিশার খবর শোনালেন,
এক দামামার মূর্ছনায়
আমার মৌজ মস্তির খোঁয়ারি টুটে গেলো।
দেখলাম উঁচু মেঘে
এক অগ্নিবীণার সুর ভৈরবে
নদীতে তুমুল বান।
নজরুলের মুখের দিকে চেয়ে
এমন তুফান দিনে আমার কবিতা
কিসের সাহসে নাইতে নামলো জলে,
জানিনা কিসের সাহসে।

www.pathagar.com

নজরুলের পত্রসাহিত্য ও নজরুল

মাহফুজুর রহমান আখন্দ

"গানের পাখি গান গায় খাবার পেয়ে নয়; ফুল পেয়ে আলো পেয়ে সে গান গেয়ে ওঠে। মুকুল-আসা কুসুম-ফোটা বসন্তই পাখিকে গান গাওয়ায়, ফল পাকা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় নয়।....... ফুল ফুটলে গায় গান, কিন্তু ফল পাকলে পায় ক্ষিদে; আমি পরিচয় করার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষের মাঝে, কিন্তু ফুল ফোটা মন মেলেনা ভাই, মেলে শুধু ফল পাকার ক্ষুধাতুর মন।" কথাগুলো আমার নয়, ফুলের পাখি, গানের পাখি কাজী নজরুল ইসলামের। লিখেছিলেন স্নেহধন্যা বেগম শামসুননাহার মাহমুদকে ১১-৮-২৬ তারিখে। এ লেখা শুধু চিঠির ভাষা নয়, কাব্যের ভাষা, মনের ভাষা, চরিত্রের ভাষা— তিনি নিজকে গড়ে তুলেছিলেন ঠিক এ মূলমন্ত্রেই।

"কাজী নজরুল ইসলাম কোন আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনা করেননি; তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য রচনায় কবির সংগ্রাম ও বর্ণাঢ্য জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং স্মৃতিচারণ ও আত্মজীবনের উপাদান থাকলেও, সেসব ধারাবাহিক বা অবিচ্ছিন্ন নয়, সবক্ষেত্রে সুগ্রথিতও নয়। তবুও যেসব রচনায় নানা ঘটনা ও চরিত্রের আদলে এবং প্রতীক রূপের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী নজরুল, সংগ্রামী ও স্বদেশ প্রেমিক নজরুল, প্রকৃতিপ্রেমিক ও মাবতাবাদী নজরুল, স্বাধীনতার সংগ্রামীও জাতীয় জাগরণের নায়ক নজরুল, কবি ও গীতিকার নজরুল, প্রেমিক নজরুল ইত্যাদি বহু বিচিত্ররূপে এক অখণ্ড নজরুলকে পাওয়া যায় যিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা কবি, অনন্য সাধারণ গীতিকার ও সুরস্রষ্টা এবং জাতির হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যক্তি নজরুল সংগ্রামী নজরুল, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের বাসিন্দা এবং নানা প্রতিকূল পরিবেশ ও দুঃখ-দৈন্যের শিকার রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত নজরুলের অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় বেশী মেলে তাঁর চিঠিপত্রে ভাষণ ও প্রতিভাষণে।" (নজরুলের পত্রাবলী : শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত) তাই চিঠি পত্রের মাধ্যমে নজরুল সত্তাকে আবিষ্কার করাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

www.pathagar.com

চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ এক জিনিষ নয়; তবে এটা একটি নির্ভরযোগ্য আত্মবিশ্লেষণী ডায়রী, নিজ হাতে চিত্রিত কবিসত্তা, সাহিত্য ও শিল্প; যা কীটস–কুপারের চিঠির মত নজরুল ইসলামের পত্রাবলীতেও পাই। তাই পত্র সাহিত্যের মাধ্যমে নজরুলকে আবিষ্কার করা মানে কবির নিজ হাতে লেখা জীবন ডায়রী খুঁজে পাওয়ার শামিল।

সাহিত্যিক মান-বিচারে নজরুলের পত্রসাহিত্য অনেক উঁচুমানের। জীবন নদীর জোয়ারভাটাসহ প্রত্যেক মোহনার বাস্তব সাক্ষী তাঁর চিঠিপত্র। আরবী, ফার্সী ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে তা হয়েছে আরো বৈচিত্র্যময় ও শৈল্পিক নৈপুণ্যে গাঁথা। পুঁথি সাহিত্যের পৌরানিক কাহিনী, রূপকথা, ধ্রুপদী সাহিত্যের যেমন ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় তেমনি হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর ভাষা ও মুসলিম সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ রয়েছে তাঁর পত্রাবলীতে। এ ছাড়া কাব্যের মত পত্র সাহিত্যেও তিনি ব্যবহার করেছেন অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা বাগধারা কিংবা উদাহরণের নানন্দিক অলংকার, যা তাঁর পত্র সাহিত্যকে করেছে রসসিক্ত, সৌন্দর্যমন্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী কবি কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। কবি তাঁর মনের কথাগুলো লিখতেন তাঁর কাছে একান্ত নিজের মনে করে । ৮-৩-২৮ তারিখে তাঁকে লেখা একটি চিঠিতে নজরুল ইসলাম তাঁর বাল্য-কিশোর জীবনের চিত্রাঙ্কন করেছেন স্বল্প কথায়

..... ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি। যে স্নেহে যে প্রেমে বুক ভরে ওঠে কানায় কানায় তা কখনো কোথাও পাইনি। শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? তাই হয়ত অল্পেই অভিমান হয়। বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে দেখা দেবার আগেই তাকে গলার কাছে প্রাণপণ বলে আটকিয়েছি। একগুণ দু:খ হলে দশগুণ হেসে তার শোধ নিয়েছি। সমাজ রাষ্ট্র মানুষ সকলের ওপর বিদ্রোহ করেই ত জীবন কাটল।"

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙা মানুষ। তাঁর প্রতিটি শিরা উপশিরায় ধ্বনিত হত স্বাধীনতার মিছিল, প্রতিটি রক্তকণা সে মিছিলের এক একজন নির্ভিক যোদ্ধা। তাই তাঁর জীবন কেটেছে কারাগারে, ব্যারাকে এবং "বার বাড়ি তের খামার, যে বাড়ি যাই সে বাড়িই আমার" ভিত্তিতে। ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত মানুষের অশ্রু মুছে বুক খুলে দাঁড়ানোর কাজে নিজকে সঁপেছিলেন পূর্ণাঙ্গরূপে। ফলে তাঁর প্রসবিত সন্তানসম বইগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিল সরকার। তাইতো কবির শ্রদ্ধাভাজন ও বন্ধুবর প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লিখেছিলেন—

"আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি— লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে

www.pathagar.com

কুণ্ঠিত কোনদিন হয়েছি, এ বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়। আমার এই দেশসেবার সমাজসেবার অপরাধের জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজীর আমার উপর দৃষ্টি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে। এই সে দিনও পুলিশ আবার জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্রমঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি ঃ

> Behold, I do not give a little charity
> When I give, I give myself.

তাহলে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভুল করবেন না। ..... আমি বিদ্রোহ করেছি- বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন— পঁচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।....... হনুমানের হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভাল।...... নতুন করে গড়তে চাই বলেইত ভাঙি-শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়।..... তৈমুর, নাদির সংস্কার প্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নতুন পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লী-আগ্রা-ময়ূরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্য।.....আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।"

ইসলামের সাম্য, শান্তি, প্রগতি ও তেজোদীপ্ত চেতনার পূর্ণ সম্মিলন ঘটেছিল কবির বাল্য জীবনেই। মক্তবে কুরআন শেখা— শেখানো,বাল্যবয়সেই মসজিদের ইমামতি করা প্রভৃতির মাধ্যমেই তিনি পেয়েছিলেন ইসলামের মুলশিক্ষা- উদারতার শিক্ষা, চেতনার শিক্ষা। তাই সবসময় নবচেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্য মুসলিম তরুণদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন , উৎসাহিত করেছেন। ১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জনাব এম সেরাজুল হককে লেখেন—

"বিশ্বজুড়ে আজ মহাজাগরণ। শিক্ষা ধর্মের নব নব স্ফুরণ। অভ্যুত্থানের বজ্রবিষাণ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত। বিশ্বব্যাপী মহাজাগরণের এই প্রদীপ্ত প্রভাতে বাঙলার মুসলিম তরুণেরা কি মোহ নিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয়েই থাকবে? ধর্ম অধর্মের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহাসংঘর্ষের এই মহাসন্ধিক্ষণে তৌহিদের শান্তি-সাম্য-ঐক্য-মন্ত্রে সে কি ক্লান্ত-শ্রান্ত ভ্রান্ত মানব-চিত্তের অবসন্নতা বিদূরিত করবে না? জাতি ও কওমকে ধর্মপথে সেরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত, সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াস পাবেনা? তরুণ বন্ধুরা কি মহা কোরানের বাণী পাবেনা? তরুণ বন্ধুরা কি মহা কোরানের বাণী 'কুম বে-ইজনিল্লাহ' ওঠো-জাগো, এ বাণী ভুলে গিয়েছে? আমি তো দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি ঐ স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমাদের

www.pathagar.com

কীর্তিমান পূর্বপুরুষগণ আকুল প্রাণে আমাদের কর্মের দিকে চেয়ে রয়েছেন। তরুণদের মনমন্দিরে তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্জলিত হউক। বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, সালাউদ্দিন, খালিদ, তারিক, মুসা, হাঞ্জেলা, ওকবার সাধনা তাদের কর্মে রূপলাভ করুক। শিক্ষা, কুশিক্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরবশ্যতার প্রাচীন প্রাচীর চূর্ণ করে বাঙলার মুসলিম তরুণেরা জ্ঞান, চরিত্র, নীতি, সখ্য ও মনুষ্যত্বের পথে কাতার বন্দী হউক এই আশা অন্তরে পোষণ করেই আপনাদের নির্ধারিত দিনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি।"

লেখা, কথা কাজ-তিনটির অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় কবির জীবনে। লেখনী ও কথায় যেমন বলিষ্ঠ, তেজোদীপ্ত তেমনি কর্মজীবনেও ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্ত, বাইশ বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি সুখের তখতে আয়েশে বসে পূর্ণ বিশ্রামে একান্ত নিরালায় বসে সাহিত্য সাধনা করেছেন এমন নজির বিরল। তিনি সবসময় কালবৈশাখীর মত ব্যস্ততম ঘূর্ণায়মান জীবন যাপন করতেন। আজ ঢাকায় কাল দিনাজপুর এই ছিল কবির জীবন।শুধু দর্শনধারীই নয়, স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও তিনি ছিলেন খুব বলিষ্ঠ। ১৯২৬ সালের ১লা মার্চ জনাব আনোয়ার হোসেনকে লেখেন—

"ভাই!

...... আমার স্বাস্থ্য ছিল অটুট,- জীবনে ডাক্তার দেখাইনি। এই আমার প্রথম অসুখ ভাই বড্ড ভোগাচ্ছে। প্রায় সাতমাস ধরে ভুগছি জ্বরে। বড্ড জীবনী শক্তি কমে গেছে। বাইরে থেকে খুব দুর্বল হইনি। এতদিন সুস্থ হয়ে উঠতাম কিন্তু অবসর বা বিশ্রাম পাচ্ছিনে জীবনে কিছুতেই। এই শরীর নিয়েই বেরুব ৬ই মার্চ দিনাজপুরে। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স, সেখান থেকে মাদারীপুর Fisherment's Conference-এ attend করতে যাব। ওখান থেকে খুব সম্ভবত ঢাকা যাব।"

৯-১০-২৬ তারিখে শ্রীমুরলীধর বসুকে লেখেন—

"প্রিয় মুরলীদা!

আজ সকাল ৬টায় একটি 'পুত্ররত্ন' প্রসব করেছেন শ্রীমতি গিন্নি। ছেলেটা খুব হেলদি হয়েছে। শ্রীমতিও ভাল। আমি উপস্থিত ছিলাম না। হয়ে যাবার পর এলাম খুলনা হতে। খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, দৌলৎপুর, বনগ্রাম প্রভৃতি ঘুরে ফিরলাম আজ।"

কবির মন ছিল ফুলের মতই কোমল। নিজের সুখের ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন—তবে কঠিন ভাবে ব্যথাতুর হতেন অন্যের কষ্টে। নিজির কলজে দ্বিখণ্ডিত, ফালিফালি অথচ অন্যের পায়ে কাটার আঁচর লেগেছে সেই তাঁর কাছে বেশী বড়ো মনে হতো। ছুটে যেতেন তাঁর সেবায়।

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁকে লেখা চিঠিতে তিনি লেখেন—- ...." সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলেছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণভরে যেন কাঁদতে পাই।"

www.pathagar.com

দারিদ্র্য কুফুরীর দিকে টেনে নিয়ে যায়, নজরুল ইসলাম তাকে টানার চেষ্টা করেছেন সমাজ উন্নয়নের হাতিয়র হিসেবে–জাতীয় জাগরণের বাঁশি ও বিপ্লবী গান হিসেবে। অর্থাভাব তাঁকে সার্বক্ষণিকভাবে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে। জীবনের কোন এক সময়ে কিছুটা স্বছলতার মুখ দেখেছেন— গাড়ীও কিনেছিলেন নিজে কিন্তু সে সৌভাগ্য বেশীদিন সয়নি, সখের গাড়িটাও তুলে দিতে হয়েছে সরকারের হাতে। খাবার কেনার পয়সা নেই, অসুস্থতায় ডাক্তার দেখানো, ঔষধ কেনার পয়সা নেই-হৃদয়ের উদারতার খোরাক যোগাতে পরিবারে বড় ভাই কিংবা অন্য কারো অসময়ে দু'হাত বাড়ানোর সুযোগ দেয়নি নিষ্ঠুর অর্থকষ্ট। নিজের প্রয়োজনে, বাইরের প্রয়োজনে বারবার অর্থের জন্য পত্র লিখতে হয়েছে বন্ধুদের কাছে, প্রকাশকদের কাছে। অবশ্য নজরুল বিনাশ্রমে হাত পেতে কারো কাছে টাকা চেয়েছেন- সাহায্য চেয়েছেন তা নয়। ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও সৌখিনতা এ তিনটিই ছিল কবির ভূষণ— অহংকার। ইচ্ছে করলেই তিনি অনেক বড় ধনী হতে পারতেন— পারতেন সমাজের অনেক সম্পদশালী উঁচুদরের আমলা হয়ে বেঁছে থাকতে। কবির কাছে এসব ঘৃণার বস্তু। শ্রমের বিনিময়ে কিংবা ঋণের জন্য তাঁকে যে দুঃখজনক কথাগুলো বারবার লিখতে হয়েছে— এটা শুধু নজরুলের মত একজন জাতীয় কবির জন্য নয়— আমাদের জন্য— গোটা জাতির জন্য অত্যন্ত দুভার্গ্যের কথা— লজ্জার কথা।

শ্রীব্রজবিহারী বর্মনকে পুত্র ল্যভের সুসংবাদ যেমন জানিয়েছেন, সে চিঠিতেই জানিয়েছেন অর্থকষ্টের দুলাইন- "স্নেহের ব্রজ। আজ সকাল ছটায় আমার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। .... টাকার বড্ড দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে পাঠাও। তুমি ত সব অবস্থা জান। বলেই এসেছি তোমায়। .... ভুলোনা যেন। টাকা কর্জ করেও পাঠাও। (৯.১০.২৬)

–টাকা ফুরিয়ে গেছে। আফজাল কিংবা খাঁ যেন শিগ্‌গির টাকা পাঠায় (১৯.১২.১৯২০)

– স্নেহের ব্রজ!

আজও আমি শয্যাগত। বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগের ও অন্যান্য চিন্তার জ্বালায়। চিন্তার মধ্যে অর্থ-চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়। কী করে যে দিন যাচ্ছে আল্লাহ জানেন।

"– কবি হওয়ার মত দু:খের বিষয় আমাদের দেশে আর নেই বলে এ কথা বললুম। এদেশে কবির কবিতার সব শব্দগুলো পাটকেল হয়ে ফিরে আসে, আর তা আঘাত করে তার বুকে। অবশ্য সব কবিই যে 'ইট' লেখে এবং তা পাটকেল হয়ে ফিরে আসে তা নয়। যারা ফুল ফোটাই তাদের মাথাই সবচেয়ে অনিরাপদ।" ..... (৩-১-২৭)।

"– আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। প্রায় প্রত্যহ Slow fever আসিতেছে। গোপালের টাকা পাঠাইবার কথা ছিল। আজও টাকা পাঠাইল না। বাড়ীতে একটা পয়সাও নাই।

তুমি পত্র পাঠমাত্রই অন্তত: কুড়িটি টাকা T.M.O করে পাঠাও। নৈলে বড় মুশকিলে পড়ব। বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সা নাই। টাকা না পাঠালে বড় বিপদে পড়ব। বহু দেনা করেছি, আর টাকা ধার পাওয়া যাবে না এখানে।"

www.pathagar.com

(বর্মনকে-২০.৪.২৭)

"– অন্য সব জায়গায় দশ টাকা করে দেয় আমার প্রত্যেকটা কবিতার জন্য, এ কথা ওদের বলো। গান দু'টি পেয়েই যদি ওরা টাকাটা দেয় আমার খুব উপকারে লাগে। আমাদের আর মান-ইজ্জত রইল না, মুরলীদা, না? অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকেও কেড়ে নেয় শেষে!..."

নজরুল ইসলাম তাঁর চাচাকে লেখা পত্রের এক জায়গায় লিখেছেন, "আমি আমার দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি, নতুবা আমি হয়তো সহজেই বেশ ধনীর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারতাম।"

কবির অর্থাভাব বা দুর্দিনের সময় প্রাকাশকদের কাছ থেকে যেমন ফাঁকি খেয়েছেন; তেমনি ফাঁকি খেয়েছেন নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে, জাতির কর্ণধারদের নিকট থেকে। "আমার পাবলিশাররাই আমায় ঠকিয়েছে।" (আব্দুল কাদিরকে ২-১-২৯)।

অর্থাভাব, বঞ্চনা, প্রতারণা, সমালোচনা, রক্ষণশীল মুসলমানদের কাফির ফতোয়া, হিন্দু লেখক-জমিদারদের নেড়ে মুসলমান হিসেবে অসহযোগিতা-তিরস্কার, সরকারী দণ্ডবিধি এ সবের মধ্যে নজরুল ইসলাম ছিলেন স্বীয় আদর্শে অটুট। আকাশের মত বুক, জমিনের মত পিঠ নিয়ে অবিচলভাবে কাজ করেছেন দেশের জন্য, জাতির জন্য, হেসেছেন-গেয়েছেন কাজ করেছেন-নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে। তাইতো তিনি লিখেছেন-"আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।" যেখানেই সমস্যা যেখানে নতুন সৃষ্টি এটাই নজরুল জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা। নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের প্রেম, পরিণয় ও বিবাহ বিচ্ছেদের সুদীর্ঘকাল পরে তাঁকে লেখা এক অনবদ্য পত্রে নজরুল লিখেছিলেন-"তুমি এই আগুনের পরশমণি না দিলে আমি অগ্নিবীনা বাঁজাতে পারতাম না; আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।"

নজরুল জীবনে দু:খ ছিল, কষ্ট ছিল-কিন্তু ছিল না হতাশা। মনোবল ছিল তাঁর ইস্পাতের মত শক্ত, বজ্রের মত কঠিন। এত সমস্যাতেও তিনি রসিকতা করতেন, নিজে প্রেরণা নিয়ে চলতেন। প্রেরণা দিতেন অর্ধচেতন জাতিকে। মোসলেম ভারত পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক সাহেবকে রসিকতা করে লিখতেন— "ভাই ডাবজল অন্যদিকে শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে রসিকতা করে লিখেছেন "তোর বৌ-এর খবর কি? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফতে আলাপ করিয়ে দিস। কালই চিঠি না পেলে কিন্তু তোদের মাঝে জোর কলহ বাধিয়ে দিব।"

অনেকে নজরুল ইসলামকে খণ্ডিতভাবে চিত্রিত করে তাঁর সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে অন্যদিকে মোড় ঘুরাতে চান। নিজেদের স্বার্থে তাঁকে ব্যবহার করতে চান। মূলতঃ নজরুল ইসলাম একজন খাঁটি মুসলমান কবি। ইসলামের উদারতার শিক্ষাই তাঁকে হিন্দুদের নিয়ে লিখিয়েছে, সাম্যবাদীদের নিয়ে লিখিয়েছে, লিখিয়েছে আপমর দুঃখী সাধারণ মানুষদের নিয়ে। একজন কবির লেখার তিনটি দিক থাকে; বিশ্লেষণ, চিত্রায়ণ ও প্রিসকিপশন।

www.pathagar.com

অন্যদের জন্য যা লিখেছেন তা পিসকৃপশন নয় বরং বিশ্লেষন বা চিত্রায়ন। অন্যদের ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখেছেন কিন্তু সে দিকে জাতিকে আহ্বান করেন নি । জাতিকে আহ্বান করেছেন; প্রিসকিপশন দিয়েছেন ইসলামের দিকে, সাম্যের দিকে, শান্তির দিকে। আশ্বিন-১৩৪৩ সালে একপত্রে বাঙলা মাদ্রাসা ও মক্তবের মৌলভী সাহেবানদের খেদমতে তিনি লেখেন-"আসসালামু আলাইকুম। কওমের খাদেম এই বান্দার নাম হয়তো আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আমি আমার কবিতায়, ইসলামি গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় আশৈশব ইসলামের সেবা করিয়া আসিতেছি। আমারই বহু চেষ্টায় আজ ইসলামী গান রেকর্ড হইয়া ঘুমন্ত-আত্মভোলা মুসলিম হাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছি। আরবি-ফার্সি শব্দের প্রচলন বাঙলা সাহিত্যে আজ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে-তাহাও এই বান্দারই চেষ্টায়। আমি কওমের নিকট হইতে হাত পাতিয়া কখনো কিছু চাহি নাই ইহার বদলাতে। কোন কিছু প্রতিদানের আশা না করিয়াই আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আমার যথাসাধ্য কওমের ও ইসলাম ধর্মের খেদমত করিয়া আসিতেছি।"

আজ নজরুল ইসলাম আমাদের চর্ম চোখের আড়ালে; কিন্তু প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, অনুভবে, স্বাধীন বাংলার প্রতিটি ফুলে-ফলে, পাতায়, মাটির কণায়, বাতাস ও মেঘের মিছিলে শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন তিনি; জাগো-ওঠো-অর্ধচেতনকে জাগাও। আজ নজরুলকে জানতে হবে পড়তে হবে নজরুলকে জানার জন্য নয়, নজরুলকে পড়ার জন্য নয়-আমাদের জন্য, জাতির জন্য এ দেশের একমুঠো স্বাধীন মাটির জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর সভা হবে, তাঁকে খেতাব দেয়া হবে এটা তিনি আগেই জানতেন-কিন্তু তিনি মিটিং-মিছিল ও খেতাবের কাংগাল ছিলেন না—তিনি জাতীয় জাগরণের কাংগাল, জাতীয় মুক্তির কাংগাল। যদি কেউ হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এসব করে তবে এক্ষেত্রে তার একান্ত বন্ধু মোতাহার হোসেনকে চুপ থাকার পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন-"সে কোন এক ফ্যানির নিস্করুন নির্মমতায় হয়তো বা আমারও বুকের চাপ ধরা রক্ত তেমনি করে কোন দিন শেষ ঝলকে উঠে আমার বিয়ের বরের মত করে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

তারপর হয়তো বা বড় বড় সভা হবে। কত প্রশংসা, কত কবিতা বেরুবে হয়তো আমার নামে। দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, বীর, বিদ্রোহী, বিশেষণের পর বিশেষণ। টেবিল ভেঙ্গে ফেলবে থাপ্পর মেরে বক্তার পর বক্তা।

এই অসুন্দর শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধ দিনে বন্ধু! তুমি যেয়োনা। যদি পার, চুপটি করে বসে আমার অলিখিত জীবনের কোন একটি কথা স্মরণ করো। তোমার ঘরের আঙিনায় বা আশেপাশে যদি একটি ঝরা পায়ে পেষা ফুল পাও, সেইটিকে বুকে চেপে বলো-বন্ধু আমি তোমায় পেয়েছি।"

কবির এ অভিমান ভাংতে হলে আমাদের সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মতো জাগতে হবে- ঘা মেরে জাগাতে হবে অর্ধচেতন জাতিকে, গড়তে হবে স্বাধীন সার্বভৌম তৌহিদী চেতনার বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

নজরুল-জীবনপঞ্জি

নাসির হেলাল

আবহমান বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির আকাশে নজরুল ইসলাম একটি ব্যতিক্রমী নাম। যিনি মাত্র ২২ বছরের সাহিত্য জীবনে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন প্রচণ্ড বিস্ময় ও নতুন ইতিহাস! এই অসাধারণ কবি প্রতিভা 'ধূমকেতু'র মত আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির অংগনে ঝড় তুলেছেন এবং সে ঝড়ের প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির দুমড়ে মুচড়ে নিজের মত করে নতুনভাবে রূপ নিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর তিনি নিজেই। আর 'সাহিত্যের সব্যসাচিত্বের ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সঙ্গে শুধু তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন বাঙালি লেখকের সঙ্গে তাঁর তুলনার কথা ভাবা অসম্ভব।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্বল্পপরিসর সাহিত্যজীবনে রচনা করেছেন ২২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩টি কাব্যানুবাদ, ২টি কিশোর কাব্য, ৩টি গল্পগ্রন্থ, ৩টি উপন্যাস, ১৯টি নাটক-নাটিকা, ২টি কিশোর নাটিকা, ৫টি প্রবন্ধগ্রন্থ, ১৪টি সঙ্গীতগ্রন্থ। এছাড়া তিনি রচনা করেছেন প্রায় পাঁচ হাজার গান। যা নাকি পৃথিবীর কোন কবিই এ যাবৎ রচনা করতে সক্ষম হননি।

আমরা বর্তমান রচনাটিতে কাজী নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও প্রকাশনা

নাম : কাজী নজরুল ইসলাম। ডাক নাম : দুখু মিঞা, নজর আলী।

জন্ম : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬; ২৪শে মে ১৮৯৯। গ্রাম : চুরুলিয়া, থানা: জামুরিয়া, মহকুমা: আসানাসোল, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

পিতার নাম : কাজী ফকির আহমদ, মাতার নাম : জাহেদা খাতুন, দাদার নাম : কাজী আমানুল্লাহ, নানার নাম : তোফায়েল আলী।

১৯০৩ সালে গ্রাম্য মক্তবে পাঠ শুরু। ১৯০৮ সালে কবির পিতা কাজী ফকির আহমদের ইন্তেকাল। এ সময় কবির বয়স ন বছর।

www.pathagar.com

১৯০৯ সালে নিম্ন প্রাথমিক পাস এবং মক্তবে শিক্ষক হিসেবে যোগদান, মাজার শরীফের খাদেমগিরি, মসজিদের ইমামতি ও চাচা বজলে করীমের কাছে আরবী, ফারসী পাঠ গ্রহণ। ১৯১০ সালে লেটো দলে যোগ দেন।

১৯১১ সালে বর্ধমানের মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি, প্রধান শিক্ষক হিসেবে পেলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে। এ সময়ে লেটো দলের সাথে সম্পর্ক গভীর এবং অনেকগুলো পালাগানে অংশ গ্রহণ। রাণীগঞ্জে বাবুর্চিগিরি, আসানাসোলে রুটির দোকানে চাকুরী, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় এবং ময়মনসিংহে গমন।

১৯১৪ সালে ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি। বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে পালিয়ে রাণীগঞ্জে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৫ সালে শিয়ারসোল হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন। মাসিক সাত টাকা বৃত্তি লাভ। লেখায় হাতে খড়ি, চড়ুই পাখির ছানা, করুণাগাথা, করুণ বেহাগ, রাজার গড়, রাণীর গড় ইত্যাদি কবিতা রচনা।

১৯১৭ সালে প্রিটেস্ট পরীক্ষা না দিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান, নৌসেনার ট্রেনিং শেষে ৪৯নং বাঙালি পল্টনের অন্তর্ভুক্তি ও করাচীতে প্রেরণ।

১৯১৮-১৯ সালে করাচিতে গাজা বা আবিসিনিয়া লাইনে অবস্থান, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার 'মাস্টার হাবিলদার' পদে পদোন্নতি, গল্প, কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ সালের জানুয়ারীতে এক সপ্তাহের ছুটিতে কলকাতায় ফিরে আসেন, বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ এবং মুজফ্ফর আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মার্চ মাসে ৪৯ নং বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে প্রথমে শৈলজানন্দের মেসে পরে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে অবস্থান।

১৯২১ সালের ১৭ জুন কুমিল্লার দৌলতপুরের আলী আকবর খানের ভাগ্নি সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার বেগমের সাথে বিয়ে। বিয়ের রাতেই দৌলতপুর ত্যাগ এবং কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে সেনগুপ্তদের বাড়িতে গমন। ১০ জুলাই কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১৯২২ সালে পুনরায় দৌলতপুর গমন এবং চার মাস অবস্থান। এ সময়ে তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' ও অন্য একটি রচনার জন্যে সম্পাদক নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা। নভেম্বর মাসে কবিকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার।

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে বিচারে কবিকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। জেলে বসে ৭ই জানুয়ারী লেখেন সেই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ "রাজবন্দীর জবানবন্দী"। ১০ই ফাল্গুন, ১৩২৯ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বসন্ত' নাটিকা কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। জেল পীড়ানর বিরুদ্ধে কবির ৩৯ দিন অনশন। কবি জেল থেকে এ বছর ১৫ই ডিসেম্বরে মুক্তি পান।

www.pathagar.com

১৯২৪ সালে কলকাতায় ইসলামী শরীয়ত মতে প্রমীলা সেনগুপ্তা ওরফে আশালতা সেনগুপ্তার সাথে বিয়ে হয়। ২২ অক্টোবর 'বিষের বাঁশী' বাজেয়াপ্ত হয় এবং ১১ নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয় 'ভাঙার গান'।

১৯২৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ লাভ। এ বছরে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি'র অন্তর্ভুক্ত 'মজুর স্বরাজ পার্টি" গঠনে অংশগ্রহণ। ঐ ১৯২৫ সালের ১২ জানুয়ারী 'রিক্তের বেদন', আগস্টে 'চিত্তনামা', ২২ সেপ্টেম্বর 'ছায়ানট' এবং ২০ ডিসেম্বর 'সাম্যবাদী' গ্রন্থ্ চারটি প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'লাঙল' এ বছরেই প্রকাশিত হয়, যার প্রধান পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯২৬ সালে ৩ জানুয়ারীতে হুগলীর বসবাস ছেড়ে কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে বসবাস শুরু। ২২ মে তারিখে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে বসে রচনা করেন কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। মুসলিম সাহিত্য সমাজের ১ম বর্ষের ৪র্থ অধিবেশনে যোগদানের জন্য ২৭শে জুন প্রথম বার ঢাকায় আগমন। ৯ই অক্টোবর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। এ বছরের ২৬শে জানুয়ারী 'পূবের হাওয়া', ২৪শে এপ্রিল 'ঝিঙে ফুল', অক্টোবরে 'দুর্দিনের যাত্রী' (প্রবন্ধ), 'রুদ্র মঙ্গল' (প্রবন্ধ) এবং 'সর্বহারা' (কাব্য) এই পাঁচটি গ্রন্থ্ প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকায় আগমন।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঢাকায় আগমন এবং উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে 'নতুনের গান' চল্ চল্ চল্-এর রচনা, সুরযোজন ও পরিবেশনা। মে মাসে মাতা জাহেদা খাতুনের ইন্তেকাল। এ বছরে 'সিন্ধু হিন্দোল', 'সঞ্চিতা', 'বুলবুল' ও 'জিঞ্জীর' গ্রন্থ্ চারটি প্রকাশিত।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে কৃষ্ণনগর থেকে বাসা উঠিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। সেপ্টেম্বরে পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলামের জন্ম। ১৫ই ডিসেম্বর জাতির পক্ষ থেকে কবিকে জাতীয় কবি হিসেবে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন, সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এ বছরে 'সন্ধ্যা', 'চক্রবাক' কাব্য গ্রন্থ্ ও সংগীত সংকলন 'চোখের চাতক' প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ সালের মে মাসে চার বছরের শিশু পুত্র বুলবুলের ইন্তেকাল। এ বছরে প্রকাশিত গ্রন্থ্, মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস), রুবাইয়্যাৎ-ই হাফিজ (অনুবাদ), প্রলয়-শিখা (কাব্য), নজরুল-গীতিকা (সংগীত) ও ঝিলিমিলি (নাটিকা)। 'প্রলয় শিখা' কাব্য-গ্রন্থটি ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৩১ সালের জুন মাসে বর্ষবাণী'র সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং গমন। এখানে মন্মথ রায়, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, অবনী রায়, প্রবোধ গুহ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ। ডিসেম্বরের শেষে চতুর্থ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম। এ বছর কুহেলিকা (উপন্যাস), শিউলিমালা (গল্পগ্রন্থ্), আলেয়া (গীতিনাট্য), চন্দ্রবিন্দু (কাব্য

www.pathagar.com

সংকলন) ও নজরুল স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। ১৪ই অক্টোবর 'চন্দ্রবিন্দু' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের দিকে চট্টগ্রামের রাউজানে এক সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান, ৫/৬ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে মুসলিম তরুণ সম্মেলনে যোগদান, ২৫/২৬ ডিসেম্বরে কলকাতার এলবার্ট হলে মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান। এ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কবি কায়কোবাদ এবং তিনি নিজের গলার মালা খুলে কাজী নজরুলকে মাল্যভূষিত করেন। এ বছর 'সুর-সাকী', 'বনগীত' ও 'জুল-ফিকার' নামে তিনটি সঙ্গীতের বই প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে সভাতি হিসাবে যোগ দেন এবং অবিস্মরণীয় এক ভাষণ দান করেন।

১৯৩৯ সালে কবির স্ত্রী প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ছায়াচিত্রের জন্য 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা করেন। ১০ই ডিসেম্বর উস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের শোক সভায় সভাপতির ভাষণ দান। এ বছরে 'নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দান করেন। ১২ই ডিসেম্বর ঢাকা বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যোগদান করেন এবং ২৩শে ডিসেম্বর মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে 'কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের' দ্বিতীয় দিনে সভাপতির ভাষণ দান করেন।

১৯৪১ সালের শুরুতেই কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় আবার নবপর্যায়ে 'নবযুগে'র আত্মপ্রকাশ। ১৬ই মার্চ বনগাঁ সাহিত্যসভা'র চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দান। ৫ ও ৬ই এপ্রিল মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং সভাপতির ভাষণ দেন। কলকাতা ডেন্টাল হল প্রাঙ্গণে ২৫শে মে তারিখে যতীন্দ্রমোহন বাগচির সভাপতিত্বে 'নজরুল জন্ম-বার্ষিকী' পালন।

১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে ও রাঁচী মানসিক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়। অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না।

১৯৪৩ সালে 'নজরুল সাহায্য কমিটি' গঠন।

১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান। এ বছরে 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৪৬ সালে কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ হন।

১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কবির জন্য মাসিক দেড়শো টাকা ভাতা প্রদান করেন।

১৯৫১ সালে অসমাপ্ত 'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ সালে 'বুলবুল' দ্বিতীয় গীতি সংকলনের প্রকাশ, ২৭শে জুন কলকাতায় 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন, ২৫শে জুলাই রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ এবং চার মাস মেজর ডেভিসের চিকিৎসাধীন থাকার পর অপরিবর্তিত অবস্থায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

www.pathagar.com

১৯৫৩ সালের ১০ই মে 'নজরুল নিরাময় সমিতির' উদ্যোগে চিকিৎসার জন্য লন্ডন প্রেরণ ও পরে জার্মানির ভিয়েনায় প্রেরণ। সকল ডাক্তারের অভিমত— কবি 'পিকস ডিজিজ' নামক মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত যা চিকিৎসার অতীত। ১৪ই ডিসেম্বর সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারীতে 'মধুমালা' নাটক ও কবিতাসংকলন 'শেষ সওগাত' প্রকাশিত হয় ঐ বছর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় 'রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম' নামের অনুবাদ গ্রন্থ।

১৯৬০ সালে কবিকে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৬১ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয় 'ঝড়' (কবিতা সংকলন) ও 'ধূমকেতু' (প্রবন্ধ সংকলন)।

১৯৬২ সালের ৩০শে জুন কবির স্ত্রী প্রমীলা নজরুলের ইন্তিকাল।

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় শিশুতোষ গ্রন্থ 'পিলে পটকা' ও 'পুতুলের বিয়ে'।

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় কিশোর গ্রন্থ 'ঘুম জাগানো পাখি'।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় 'ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি' ও 'নজরুল-রচনা সম্ভার'।

১৯৬৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল- রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড।

১৯৬৯ সালে কবিকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি, লিট উপাধি প্রদান করা হয়।

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'নজরুল রচনাবলী'র ৩য় খণ্ড প্রকাশিত।

১৯৭২ সালের ২৪শে মে বাংলাদেশ সরকার কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ২৫শে মে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় কবির ৭৩তম জন্মদিবস পালিত হয়।

১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মাত্র ৪৩ বছর বয়সে কবির কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের ইন্তিকাল। ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি, লিট উপাধি প্রদান করা হয়।

১৯৭৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী বঙ্গভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবিকে ডিগ্রী পত্রটি প্রদান। ২২শে জুলাই স্বাস্থ্যের অবনতি এবং পিজি হাসপাতালের ১১৭ নং কেবিনে ভর্তি।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান, ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার, '২১শে স্বর্ণ পদক' প্রদান করা হয়, ২৪শে মে নজরুল জন্মোৎসব উপলক্ষে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক [হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে] সেনাবাহিনীর 'আর্মি ক্রেস্ট' উপহার প্রদান করা হয়। ২৯শে আগস্ট সকাল ১০টা ১০ মিনিটে ইন্তিকাল। কবির মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে দু'দিন শোক পালন করে। এ সময়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ এক মিনিট নীরবতা পালন করে কবির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কবির জানাযা অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ লোক অংশ গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবিকে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি

১. সৈয়দ আলী আহসান
২. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
৩. কমোডর (অব:) এম আতাউর রহমান- সভাপতি
৪. অধ্যাপক শাহেদ আলী
৫. ড. কাজী দীন মুহম্মদ
৬. অধ্যাপক আবদুল গফুর
৭. ড. আসকার ইবনে শাইখ
৮. ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ
৯. ড. এবনে গোলাম সামাদ
১০. এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান
১১. ওবায়দুল হক সরকার
১২. ড. এমাজউদ্দিন আহমদ
১৩. কবি আবদুস সাত্তার
১৪. আরিফুল হক- আহবায়ক
১৫. কবি আল মাহমুদ
১৬. গিয়াস কামাল চৌধুরী
১৭. ড. আশরাফ সিদ্দিকী
১৮. ড. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী
১৯. শাহ আবদুল হান্নান
২০. কবি ফজল শাহাবুদ্দীন
২১. কবি আফজাল চৌধুরী
২২. শাহাবুদ্দীন আহমদ
২৩. ড. এস এম লুৎফর রহমান
২৪. সানাউল্লাহ নূরী
২৫. আবুল আসাদ
২৬. মোহাম্মদ ইউনুস
২৭. অধ্যাপক আ. ন. ম জাহের
২৮. মীর কাসেম আলী
২৯. এম, কামালুদ্দিন
৩০. ইঞ্জিনিয়ার ইস্কান্দার আলী খান
৩১. ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা আনোয়ার
৩২. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এম পি

www.pathagar.com

৩৩. নুরল আমিন দুদু
৩৪. ড. মুস্তাফিজুর রহমান
৩৫. মোস্তফা জামান আব্বাসী
৩৬. কবি আল মুজাহিদী
৩৭. মহবুব আনাম
৩৮. আখতার-উল-আলম
৩৯. বিচারপতি আবদুর রউফ
৪০. এ টি এম আজহারুল ইসলাম
৪১. অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিউর রহমান
৪২. ড. এরশাদুল বারী
৪৩. ড. মিয়া মোহাম্মদ আইউব
৪৪. ড. আবদুল লতিফ মাসুম
৪৫. ড. আবদুর রব
৪৬. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
৪৭. ড. মাইমুল আহসান
৪৮. কবি আবু সালেহ
৪৯. অধ্যাপক মনিরুল হক
৫০. আসাদুল হক
৫১. অধ্যাপিকা আসমা আব্বাসী
৫২. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম
৫৩. অধ্যক্ষ চেমন আরা
৫৪. অধ্যাপিকা আয়শা খাতুন
৫৫. ড. রওজাতুর রুম্মান
৫৬. সালমা রহমান
৫৭. আঞ্জুমান আরা বেগম
৫৮. কবি জাহানারা আরজু
৫৯. ফেরদৌসী বেগম
৬০. প্রফেসর হোসনে আরা কামাল
৬১. ড. খালিদা হানুম
৬২. অধ্যাপিকা জোবায়দা গুলশান আরা
৬৩. অধ্যাপিকা খুরশিদ জাহান হক এম পি
৬৪. ড. আবুল হাসান শামসুদ্দিন
৬৫. কবি রুহুল আমীন খান
৬৬. আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

৬৭. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল বাশার
৬৮. প্রকৌশলী মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন
৬৯. দরবার আলম
৭০, খালিদ হোসেন
৭১. এম. এ. মান্নান
৭২. প্রফেসর হাবীবুর রহমান
৭৩. ড. হুমায়ুন কবীর
৭৪. ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক
৭৫. প্রফেসর আবু আহমদ
৭৬. খলিলুল্লাহ খান
৭৭. হাফিজ উদ্দীন
৭৮. সালাহউদ্দীন বাবর
৭৯. কবি আবদুল হাই শিকদার
৮০. মাসুদ মজুমদার
৮১. মতিউর রহমান মল্লিক
৮২. খন্দকার আবদুল মোমেন
৮৩. হামিদুর রহমান আজাদ
৮৪. আ জ ম ওবায়দুল্লাহ
৮৫. আমিরুল ইসলাম
৮৬. শেখ বেলাল উদ্দীন
৮৭. আবদুল ওয়াহিদ
৮৮. আজিজুল হক মানিক
৮৯. সরদার আবদুর রহমান
৯০. এ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল
৯১. ড. নাজিব ওয়াদুদ
৯২. ড. স ম রফিক
৯৩. এহ্সানুল মাহবুব জোবায়ের
৯৪. রিয়াজউদ্দীন আহমদ
৯৫. আমানুল্লাহ কবীর
৯৬. জয়নুল আবেদীন আজাদ
৯৭. শবনম মুশতারি
৯৮. ফাতেমাতুজ্‌জোহ্‌রা মুক্‌তাবিস-উন-নূর
৯৯. সাইফুল্লাহ মানছুর
১০০. রাগিব হোসেন চৌধুরী
১০১. মিন্টু রহমান

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় নির্বাহী কমিটি

১. জনাব আরিফুল হক– আহ্বায়ক
২. মতিউর রহমান মল্লিক – সদস্য-সচিব
৩. জনাব আল মাহমুদ
৪. জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী
৫. জনাব ওবায়দুল হক সরকার
৬. জনাব মীর কাসেম আলী
৭. জনাব আবদুল হাই শিকদার
৮. জনাব মাসুদ মজুমদার
৯. জনাব খন্দকার আবদুল মোমেন
১০. জনাব আবদুল ওয়াহিদ
১১. জনাব ড. স ম রফিক
১২. জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলাম
১৩. জনাব মতিউর রহমান শিকদার
১৪. জনাব রফিকুন্নবী
১৫. জনাব আনিসুজ্জামান
১৬. জনাব হামিদুর রহমান আজাদ
১৭. জনাব এহসানুল মাহবুব জোবায়ের
১৮. জনাব আহমদ সেলিম রেজা
১৯. জনাব আমিনুল ইসলাম
৩৯. সোলায়মান আহসান
৩৩. হাসান আলিম
৩৪. আসাদ বিন হাফিজ
৩৫. গোলাম মোহাম্মদ
২০. জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর
২১. জনাব সালমান আল আযামী
২২. জনাব হাফিজুর রহমান
২৩. জনাব ফখরুল ইসলাম
২৪. জনাব লুৎফুর রহমান
২৫. জনাব আবু সাঈদ মো. ফারুক
২৬. জনাব আবদুল্লাহ আল আরিফ
২৯. জাকির আবু জাফর
২৭. শাহীন হাসনাত

www.pathagar.com

২৮. শিবলি সোহায়েল আবদুল্লাহ
৩০. হাসনাত আ. কাদের
৩১. ফরিদী নু'মান
৩২. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
৩৬. শাহিদ মুবীন
৩৭. নাঈম মাহমুদ
৩৮. সুলতান আহমদ
৪১. রফিক মুহাম্মদ

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির সাব-কমিটিসমূহ

অর্থ কমিটি

◆ জনাব কমোডোর [অব:] এম আতাউর রহমান	সদস্য
◆ জনাব মীর কাশেম আলী	সদস্য
◆ জনাব এম, কামালউদ্দীন চৌধুরী	সদস্য
◆ জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ	সদস্য
◆ জনাব আ.ন.ম. আবদুজ্জাহের	সদস্য

স্মারক কমিটি

◆ কবি আল মাহমুদ	উপদেষ্টা সম্পাদক
◆ শাহাবুদ্দীন আহমদ	প্রধান সম্পাদক
◆ মাসুদ মজুমদার	সম্পাদক
◆ খন্দকার আবদুল মোমেন	নির্বাহী সম্পাদক
◆ জাকির আবু জাফর	সদস্য সচিব
◆ হাফিজুর রহমান	সদস্য
◆ আবদুল ওয়াহিদ	সদস্য
◆ আসাদ বিন হাফিজ	সদস্য
◆ মোশাররফ হোসেন খান	সদস্য
◆ হাসান আলীম	সদস্য
◆ গোলাম মোহাম্মদ	সদস্য
◆ মাহফুজুর রহমান আখন্দ	সদস্য

পোস্টার ও স্টিকার কমিটি

◆ এহসানুল মাহবুব জোবায়ের	আহ্বায়ক
◆ আবদুল্লাহ আল আরিফ	সদস্য সচিব

www.pathagar.com

◆	ফরিদী নু'মান	সদস্য
◆	কামাল আহমেদ শিকদার	সদস্য
◆	ফখরুল ইসলাম	সদস্য
◆	আবু সাঈদ মোহাম্মদ ফারুক	সদস্য

সেমিনার

◆	হাসনাত আবদুল কাদের	উপদেষ্টা
◆	মাহফুজুর রহমান আখন্দ	আহ্বায়ক
◆	আবদুল্লাহ আল আরিফ	সদস্য সচিব
◆	মতিউর রহমান মল্লিক	সদস্য
◆	খন্দকার আবদুল মোমেন	সদস্য
◆	আহমদ সেলিম রেজা	সদস্য
◆	সালমান আল আজামী	সদস্য
◆	শাহীন হাসনাত	সদস্য
◆	নাঈম মাহমুদ	সদস্য

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন কমিটি

◆	আরিফুল হক	উপদেষ্টা
◆	সাইফুল্লাহ মানছুর	আহ্বায়ক
◆	বায়জীদ মাহমুদ	সদস্য সচিব
◆	শিবলী সোহায়েল আবদুল্লাহ	সদস্য
◆	আবদুল্লাহ আল মাসুদ	সদস্য
◆	নাঈম আল ইসলাম	সদস্য
◆	গোলাম মাওলা	সদস্য
◆	মাহফুজুর রহমান আখন্দ	সদস্য

আপ্যায়ন

◆	হাসান আখতার	উপদেষ্টা
◆	তৌহিদুর রহমান	আহ্বায়ক
◆	লতিফুল ইসলাম	সদস্য সচিব
◆	মিজানুর রহমান	সদস্য
◆	শওকত আলী ভূঁইয়া	সদস্য
◆	শওকত আলী	সদস্য
◆	নিজামুদ্দীন	সদস্য
◆	আবদুছ ছালাম	সদস্য

www.pathagar.com

র‍্যালী

◆ মতিউর রহমান শিকদার	উপদেষ্টা
◆ এহসানুল মাহবুব জোবায়ের	আহ্বায়ক
◆ আবদুল্লাহ আল আরিফ	সদস্য সচিব
◆ হামিদুর রহমান আজাদ	সদস্য
◆ আনিসুজ্জামান	সদস্য
◆ রফিকুন্নবী	সদস্য
◆ আমিনুল ইসলাম	সদস্য
◆ হাফিজউদ্দীন	সদস্য
◆ লুৎফর রহমান	সদস্য
◆ মোহাম্মদ ফারুক	সদস্য

অফিস

◆ শাহিদ মুবীন	আহ্বায়ক
◆ নাঈম মাহমুদ	সদস্য সচিব
◆ নিয়াজ শাহিদী	সদস্য
◆ আজাদ ওবায়দুল্লাহ	সদস্য
◆ আহমাদ বাসীর	সদস্য
◆ ফয়েজ রেজা	সদস্য

পদক কমিটি

◆ আবদুল ওয়াহিদ	আহ্বায়ক
◆ মাহফুজুর রহমান আখন্দ	সদস্য সচিব
◆ গিয়াস কামাল চৌধুরী	সদস্য
◆ আ. ন. ম. জাহের	সদস্য
◆ মীর কাশেম আলী	সদস্য
◆ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান	সদস্য
◆ জাকির আবু জাফর	সদস্য

সমন্বয় কমিটি

◆ আবদুল হাই শিকদার	সদস্য
◆ মাসুদ মজুমদার	সদস্য
◆ মতিউর রহমান মল্লিক	সদস্য
◆ আবদুল ওয়াহিদ	সদস্য
◆ খন্দকার আবদুল মোমেন	সদস্য

www.pathagar.com

◆ আমিনুল ইসলাম	সদস্য
◆ আজিজুল হক মানিক	সদস্য
◆ এ্যাডভোকেট মুয়াজ্জাম হোসেন হেলাল	সদস্য
◆ শেখ বেলাল উদ্দীন	সদস্য
◆ ডা: নাজীব ওয়াদুদ	সদস্য
◆ ড: হুমায়ুন কবীর	সদস্য
◆ সোলায়মান আহসান	সদস্য
◆ মাহফুজুর রহমান আখন্দ	সদস্য
◆ জাকির আবু জাফর	সদস্য
◆ শিবলী সোহায়েল আবদুল্লাহ	সদস্য
◆ শাহিদ মুবীন	সদস্য
◆ মো: লুৎফর রহমান	সদস্য
◆ লতিফুল ইসলাম	সদস্য
◆ আবু সাঈদ মোহাম্মদ ফারুক	সদস্য
◆ মাসুদ	সদস্য

প্রচার

◆ সালাহউদ্দীন বাবর	উপদেষ্টা
◆ আবদুল ওয়াহিদ	আহ্বায়ক
◆ মোহাম্মদ বাকের	যুগ্ম আহ্বায়ক
◆ শাহীন হাসনাত	সদস্য সচিব
◆ রফিক মুহাম্মদ	সদস্য
◆ গিয়াস উদ্দীন রিমন	সদস্য
◆ রাশিদুল ইসলাম রুকন	সদস্য
◆ মাহফুজুর রহমান আখন্দ	সদস্য

অভ্যর্থনা

◆ জাকির আবু জাফর	আহ্ববায়ক
◆ এ বি এম মহিউদ্দিন	সদস্য সচিব
◆ হাসনাত আবদুল কাদের	সদস্য
◆ আবদুল্লাহ আল আরিফ	সদস্য
◆ আমিনুল ইসলাম	সদস্য
◆ নাঈম আল ইসলাম	সদস্য
◆ শিবলী সোহায়েল আবদুল্লাহ	সদস্য
◆ সিরাজ মোহাম্মদ	সদস্য

www.pathagar.com

ডেকোরেশন

◆	ইব্রাহীম মণ্ডল	আহ্বায়ক
◆	ফরিদী নু'মান	সদস্য সচিব
◆	গোলাম মোহাম্মদ	সদস্য
◆	আবদুর রহিম	সদস্য
◆	তানভীর	সদস্য
◆	শাহিদ মুবীন	সদস্য
◆	হুসাইন সৈয়দ	সদস্য
◆	জসীম	সদস্য

অডিও ভিডিও

◆	সাইফুল্লাহ মানছুর	সদস্য
◆	গোলাম মাওলা	সদস্য
◆	মাহফুজুর রহমান আখন্দ	সদস্য
◆	নাঈম আল ইসলাম	সদস্য
◆	আবদুল্লাহ আল মাসুদ	সদস্য
◆	শিবলী সোহায়েল আবদুল্লাহ	সদস্য
◆	বায়জীদ মাহমুদ	সদস্য
◆	হাসান আখতার	সদস্য
◆	শাহিদ মুবীন	সদস্য
◆	আমিনুল ইসলাম	সদস্য

কবিতা পাঠের আসর

◆	কবি আবদুল হাই শিকদার	উপদেষ্টা
◆	কবি হাসান আলীম	আহ্বায়ক
◆	কবি গোলাম মোহাম্মদ	সদস্য সচিব
◆	কবি জাকির আবু জাফর	সদস্য
◆	কবি ওমর বিশ্বাস	সদস্য
◆	কবি শাহীন হাসনাত	সদস্য
◆	কবি রফিক মুহাম্মদ	সদস্য
◆	কবি নাঈম মাহমুদ	সদস্য
◆	কবি আবদুল বাতেন	সদস্য
◆	কবি আতিক হেলাল	সদস্য
◆	কবি নিয়াজ শাহিদী	সদস্য

www.pathagar.com

প্রদান-উপলক্ষে পি জি হাসপাতালে তাঁকে সংবর্ধনা জানান নজরুল একাডেমীর সহ-সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক তালিম হোসেন। সঙ্গে নজরুল-সংগীতশিল্পী শবনম মুশতারী ও পারভীন মুশতারী

www.pathagar.com

জাতীয় সেমিনার-১
তারিখ : ২৫ মে'৯৯ বিকেল ৪টা
স্থান : জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তন

প্রধান অতিথির ভাষণ

জাগরণের বংশীবাদক কবি নজরুল

বেগম খালেদা জিয়া

বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম। কবি নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আজকের এই আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমন্ডলী, আস্‌সালামু আলাইকুম।

এতক্ষণ ধরে সম্মানিত আলোচকবৃন্দ যে আলোচনা করেছেন আমরা তাদের আলোচনা অত্যন্ত উপভোগ করেছি। আমার মনে হচ্ছিল আরো অনেক্ষণ ধরে তাঁরা যদি বক্তব্য রাখতেন, আমরা শুনতে পারতাম– নি:সন্দেহে আমরা অনেক বেশি লাভবান হতাম এবং জাতি অনেক বেশি লাভবান হত। আমি অনুরোধ করবো আমাদের সাংবাদিক ভাইদেরকে আজকে যে আলোচনা হয়েছে সে আলোচনা যেন তারা তাদের লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেন। যাতে আগামী দিনে আমাদের দেশের জনগণ, বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্ম কবি নজরুল সম্পর্কে জানতে পারে, পড়তে পারে.। কারণ বর্তমান সরকার কবির জন্মশতবার্ষিকী যেভাবে পালন করা উচিৎ ছিল সেভাবে পালন করছে না। এখানে আমাদের আলোচকবৃন্দ তাদের হীনমন্যতা, তাদের দৈন্য দশা সম্পর্কে বলে গেছেন এবং কেন এই লুকোচুরি সে সম্পর্কে আজকে জাতি জানে। সেজন্যই আমি সাংবাদিক ভাইদের অনুরোধ করবো তারা যাতে লিখেন। শুধু আজকে নয় এই আলোচনা নি:সন্দেহে আরো হবে। সেগুলিও যেন তারা যথাযথভাবে সংবাদপত্রে তুলে ধরেন। যাতে আমাদের দেশের জনগণ আমাদের প্রিয়কবি, আমাদের জাতীয় কবি সম্পর্কে জানতে পারে, বুঝতে পারে। আজকে আমি বর্তমান সরকার যে, শতবার্ষিকী যেন তেন প্রকারে অনুষ্ঠিত করার জন্য কর্মসূচী নিয়েছে তার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছি। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আজকের এই বেসরকারী জাতীয় কমিটি মাসব্যাপী নজরুল অনুষ্ঠান করার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটি জানতে পেরেই সরকার লজ্জিত হয়ে, বাধ্য হয়ে একটা যেন তেন প্রকারের কর্মসূচী তারা হাতে নিয়েছেন। অন্যথায় সেটিও সম্ভবত গ্রহণ করা হত না। সম্মানিত সুধীমন্ডলী, সময় খুব বেশি নেই। মাগরিবের আযান হবে। তাই আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আজ আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের

প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। কারণ আমি জানি এই সৌভাগ্য আমার আগামীতে আর হবে না। তাই আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। নজরুল ইসলাম সত্যের স্বপক্ষে ছিলেন, স্বাধীনতার স্বপক্ষে ছিলেন এবং নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর ছিলেন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরাধীনতার শৃংখল ভাঙ্গার জন্য বলিষ্ঠ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এবং সংঘর্ষকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। সকল মানুষের জন্য তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। পরাধীনতার যুগে, মানুষ যখন প্রতিবাদ করতে পারেনি এবং তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল তখন নজরল ইসলাম মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়ে ছিলেন। রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সামাজিক বিশৃংখলার বিরুদ্ধে এবং প্রতিদিনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রবলভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যে মানুষ প্রতিবাদ করতে পারে না, সে মানুষ নির্যাতিত হয়। আমাদের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা নজরুল ইসলামই এনে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন জাগরণের বংশীবাদক। বাংলা কাব্যের স্তিমিত রোমান্টিকতার মধ্যে তিনি মানব মুক্তির বলিষ্ঠ ভাবাবেগ এনেছিলেন। সেই জন্য তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। কাজী নজরুল ইসলাম মুসলমানদের জন্য মুক্তির বাণী এনেছিলেন। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ সাম্যের দিকে এগিয়ে যাবে এবং আমরা কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পেছনে পড়ে থাকবো এটা কখোনোই হতে পারে না। তাই তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, সকল মুসলমান যেন একত্রিত হয়ে সাম্যের দিকে অগ্রসর হয়। একটি গানে তিনি বলেছিলেন যে, আমরা ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করছি। আমাদের জেগে উঠতে হবে। এবং কর্মময় জীবনের উপযুক্ত হতে হবে। তিনি মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম বিশ্বাসে বলিয়ান হতে বলেছেন। এই আহ্বানে তাঁর গভীর আন্তরিকতা আমাদেরকে অভিভূত করে। মুসলমানদের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি অন্য কোন বিশ্বাসের মানুষের স্বপক্ষে কথা বলেননি। আবার একই সাথে নির্যাতিত মানবতার কবিও তিনি ছিলেন। তিনি মুসলমানদের কবি ছিলেন, তিনি তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় বলেছিলেন যতদিন না উৎপীড়নের ক্রন্দন রোল বন্ধ হচ্ছে, ততদিন তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এই সংগ্রামে কোন দিন বিরাম আসেনি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রিয় জীবনে, সমাজ জীবনে, এবং প্রাত্যহিক জীবনে নজরুল ইসলামকে স্মরণে রাখা। আমরা বর্তমানে এক বিপর্যস্ত সময়ের মধ্যে বাস করছি। এ বিপর্যস্ত সময়ে নজরুল কাব্যের প্রেরণা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তিনি তাঁর ভাষার সাহায্যে, শব্দ ব্যবহারের সাহায্যে এবং ছন্দের ধ্বনি ব্যঞ্জনার সাহায্যে মানব চিত্তকে উদ্বেলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সকল প্রকার অসহ থেকে মানুষকে তিনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন। বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছিলেন এবং পরাজয়ে যেন ভীত না হই, সেজন্য আশ্বাস বাণী এনেছিলেন। জীবনে পরাজয় আছে, সংকটও আছে। কিন্তু এগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য সাহসেরও প্রয়োজন আছে। নজরুল ইসলামের কবিতা আমাদেরকে সে সাহস যুগিয়েছে। একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই নজরুল ইসলামকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। তিনি আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে দিয়ে বলেছেন, বণিকের দুটো জাহাজ ডুববে বলে সমুদ্র তরঙ্গ কখনো স্থির হয়ে থাকে না। তাকে সামনের দিকে এগুতেই হয়। তেমনি আমাদের যুব শক্তিকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমি আজকের দিনে আমাদের দেশের মানুষকে

www.pathagar.com

এগিয়ে যাবার আহ্বান জানাচ্ছি। দুর্ঘটনায় মর্মাহত না হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করতেই হবে। নজরুল ইসলামের কাছে আমরা এ শিক্ষাই পেয়েছি। নজরুল ইসলামের বাণী অমর হোক— বাংলাদেশ শক্তিমান হোক— এই কামনা করি। মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য আপনাদের কমিটি বিশাল ও যথাযথ আয়োজন করেছে। আমি আপনাদের অনুষ্ঠানমালার সাফল্য কামনা করছি এবং আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। একথাগুলো বলেই দেশের সকল মানুষ এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি আপনাদের সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

www.pathagar.com

জাতীয় সেমিনার-২
তারিখ : ২৬ মে'৯৯ সকাল ৪টা
স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট

প্রধান অতিথির ভাষণ

কবি নজরুল আমাদের সংকট জয়ের দুর্বার প্রেরণা

হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম। নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এ মহতী সভায় আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এখানে যারা মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন সবাই বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, আমি একজন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ হিসেবে এই সব স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য আমার জন্য একটি গৌরবের কথা। নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির উদ্যোগে আজকের এই আলোচনা সভা জাতির জন্য, দেশের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। যখন স্কুলে পড়তাম কলকাতা থেকে নজরুলের কবিতার বই আনাতাম- বিষের বাঁশি, অগ্নিবীণা, সেই কবিতার বইগুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, উদ্দীপ্ত করেছিল, মাটি ও মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল, স্বাধীনতাকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল। তারপর স্কুল ছেড়ে কলেজে আসলাম। বাংলা শিখব বলে, মায়ের ভাষা শিখবো বলে, সাবজেক্ট নিলাম স্পেশাল বেঙ্গলি, খুঁজলাম নজরুলকে। নজরুলকে সেখানে পেলাম না। পেলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, পেলাম মাইকেল মধুসূদনকে, পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রা, সোনার তরী, মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য পেলাম কিন্তু নজরুলকে খুঁজে পেলাম না। আই.এ. পাশ করলাম। বি. এ-তে আবার স্পেশাল বেঙ্গলি নিলাম বাংলা ভাষাকে জানার জন্য, বাংলার মাটি ও মানুষকে ভালবাসার জন্য, আকাশ বাতাসকে চেনার জন্য। সেখানেও নজরুলকে খুঁজে পেলাম না। পেলাম সেই রবীন্দ্রনাথ, সেই মাইকেল, সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে। তারপরের জীবন এক করুণ কাহিনী। সাহিত্যের জগৎ থেকে লেখা পড়ার জগৎ থেকে চলে গেলাম সেনাবাহিনীতে। এমন এক সেনাবাহিনীতে গেলাম যেখানে বাংলা বলাই হচ্ছে অপরাধ। ইংরেজীতে কথা বলতে হত। আমার নিজের একটা সুপ্ত বাসনা ছিল বাঙালি হওয়ার বাসনা, বাঙালি হয়ে বাঁচার বাসনা, বাঙালি হয়ে মরার বাসনা- সে বাসনা সুপ্তই থেকে গেল, জাগ্রত করতে পারলাম না। তবু মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে রাতের বেলায় কবিতা লিখতাম, ডায়েরী লিখতাম, নিজের মনের কথা লিখতাম। লিখতাম আর ভাবতাম যে কবে সেই দিন আসবে। যখন আমরা মুক্ত মনে আবার বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারব, আবার কবিতা লিখতে পারবো, আবার আমার মায়ের ভাষাকে আদর করে আমার মুখে তুলে নিতে পারবো। রাষ্ট্রপতি হলাম। আমার অপরাধ নজরুল ইসলামের জন্য আমি

www.pathagar.com

যথেষ্ট করতে পারিনি। একটা নজরুল ইনস্টিটিউট করেছিলাম। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আশরাফ সিদ্দিকী সাহেব বলে গিয়েছেন, আমার আরো অনেক বেশি করার ছিল। কিন্তু একটা কথা আছে সেদিন নজরুল বিপন্ন ছিলেন না, নজরুলের অস্তিত্ব বিপন্ন ছিল না। নজরুলকে আমাদের বুক থেকে মুছে ফেলার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। আজ নজরুল বিপন্ন। আজ নজরুলের সাহিত্য বিপন্ন। তাঁর অস্তিত্বকে মুছে ফেলার আজ হীন প্রচেষ্টা চলছে। তাই এ জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। জাতীয় কমিটির যাত্রালগ্ন সম্পর্কে আমি জানি। কিন্তু ভাইয়েরা বন্ধুরা, তোমরা যে পথ বেছে নিয়েছ তার সাথে আছে বাংলাদেশের বারোকোটি মুসলমান, তার সাথে আছি আমরা সবাই; এগিয়ে চল, সৈনিকের বেশে এগিয়ে চল। দামামা বাজিয়ে এগিয়ে চল, আমাদের সঙ্গে পাবে, আমাদের সহযোগিতা পাবে। আমরা তোমাদের সাথে এ সংগ্রামে সাথী হলাম প্রয়োজন হলে রক্ত দিয়ে হোক, জীবন দিয়ে হোক নজরুলকে রক্ষা করবো। নজরুল সাহিত্যকে রক্ষা করবো, আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করবো। এদেশ এ জাতি, এই জাতীয় পতাকা, আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আমাদের কাছে যেমন প্রিয় তেমনি জাতীয় কবি নজরুল আমাদের কাছে প্রিয়, প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নজরুল আমাদের জাতীয় চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন, সামুদ্রিক প্লাবনের মত বেগবান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখি বিস্ময়কর প্রতিভার ভুবনে অনন্য সাধারণ সৃজনশীল প্রতিভার দ্বারা নজরুল স্বাধীন একটি স্বতন্ত্র বলয় সৃষ্টি করেছিলেন। সেই বলয়ে তিনি ছিলেন একমাত্র বিস্ময়। নজরুল প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন জেলে কবির অনশন ভঙ্গ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন- আমাদের সাহিত্য জগতে তোমার প্রয়োজন। নজরুল প্রতিভার উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর অনীহা, বোধের দীনতা শুধুই ধিক্কারের যোগ্য। নজরুল আমাদের অহংকার, আমাদের মহিমাদীপ্ত গৌরব, সংকট জয়ের দুর্বার প্রেরণা, সত্যপ্রকাশের দুরন্ত সাহসের উৎস, নির্যাতিত নিপীড়িতদের বিরুদ্ধে নজরুলের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সার্বভৌমত্বের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ঘষেটি বেগম, মীরজাফরদের ত্রাস। হঠকারী শাসকদের জন্য এক জ্বলন্ত অঙ্গার। ইনশাআল্লাহ এই জ্বলন্ত অঙ্গারের আগুনে তারা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। নজরুলের দক্ষ পদচারণা লক্ষ্য করেছি সাংবাদিকতার ভুবনে, চলচ্চিত্রের অঙ্গনে, রাজনীতির জটিল জগতে। নজরুল সুরকার, ভাষার রূপকার, নজরুল নাট্যকার, নজরুল গীতিকার, নজরুল গায়ক, নজরুল বিদ্রোহের কবি, বিরহের কবি, বেদনার কবি। নজরুল মানবতার কবি, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কবি। নজরুলের লেখা য় যে জীবন প্রাণ লক্ষ্য করি তা দীপ্ত বাস্তব ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল; তা গণমানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ। নজরুল যখন বলেন "হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!/তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান।" অথবা যখন বলেন- "অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ/ কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তিপণ।" অথবা- "প্রার্থনা ক'রো- যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস/যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।" এই আবেগ, এই আবেদন আজকে বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি। ভুখা নাঙা অসহায় মানুষের বেদনায় কাতর কবি যখন বলেন,- "মোর অধিকার আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ/পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ/আমার দুয়ার ধরি! কে বাঁজাবে বাঁশি?/কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?/কোথা পাব পুষ্পাসব? ধুতুরা-গেলাস/ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্যাস।"

www.pathagar.com

তখন নজরুলের মানব প্রেম, তাঁর সার্বজনীনতা, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অকৃত্রিম মমতা বোধ নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন— তারা ভণ্ড, তারা প্রবঞ্চক, তারা বিজাতীয় সংস্কৃতির স্থাপক। তারা একদিন ইতিহাসের দুর্গন্ধময় আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জেনে রাখা উচিত, সেই রবীন্দ্রযুগে ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নজরুল জাতীয় কবির দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোষ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঐ অনুষ্ঠানে নজরুলের উপর প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য রেখেছিলেন। বাংলাভাষী মুসলমানদের আত্ম জাগৃতির পথিকৃত আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে আছে। ঐতিহ্য ও আদর্শের ভিত রচনায়, স্বাধীনতা বোধে উদ্বুদ্ধ করার ইতিহাসে, স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে ধ্রুবতারার মত জ্যোতির্ময় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার মহা মহিমায় অধিষ্ঠিত। নজরুলের অতুলনীয় অবদানকে খাট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। যারা এই হীন প্রয়াসে লিপ্ত, জাতি তাদের কখোনো ক্ষমা করবে না। নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লগ্নে আমি বিবেকের কাছে অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় কবির জন্মশতবার্ষিকী কি প্রত্যাশিত মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে? হচ্ছে না। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে নজরুল ও তাঁর রচনাবলী কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে? কাজী নজরুল ইসলামকে আজো কেন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে না? সুলভ মূল্যে নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করে দেশের ঘরে ঘরে নজরুলকে আরো ঘনিষ্ঠ, আরো প্রিয়, আরো অন্তরঙ্গ করে গড়ে তোলা হচ্ছে না কেন? নজরুল একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমীতে নজরুলকে আবিষ্কারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে কিনা? এই প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সংকটে ভুগছে কিনা? নজরুলের সকল গান সংগ্রহ করে সুরের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা? নজরুল পরিচালিত, অভিনীত, সুরারোপিত চলচ্চিত্রগুলোকে সংরক্ষণের কোন পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা? আমি জানি এসব প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। আর সহজ নয় বলেই নজরুলকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের আজ সোচ্চার হতে হবে। এই জাতীয় কমিটি, যে প্রচেষ্টা আজ গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমাদের দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আপোষহীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। আসুন আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলি, কাজী নজরুলকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচীতে নজরুল সাহিত্যের জন্য স্বতন্ত্র বই নির্ধারণ করতে হবে। নজরুল মাজারে সুউচ্চ নজরুল স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ নজরুলকে আবিষ্কারের জন্য অন্বেষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক জেলায় নজরুল ভবন নির্মাণ করে নজরুল চর্চাকে জনপ্রিয় করতে হবে। নজরুলের ঐতিহ্য-বোধ, সংস্কৃতি-চেতনা, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। আজ জাতি এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত হয়েছে। জাতি এক ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে হারাতে চলেছি। আমাদের সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। আমরা জাতি হিসেবে আগামী দিন বেঁচে থাকবো কিনা সেটাও এক বড় প্রশ্ন। তাই আজ নজরুলকে স্মরণ রেখে, তাঁর সেই রণ দামামাকে স্মরণ রেখে, সকলকে কঠিন শপথ গ্রহণ করতে হবে। যদি নজরুলকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি আমাদের স্বাধীনতা বেঁচে থাকবে। যদি নজরুলের ঐতিহ্যকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি আমাদের সার্বভৌমত্ব বেঁচে

www.pathagar.com

থাকবে, আমাদের সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে, না হলে অপসংস্কৃতির স্রোতে আমরা ভেসে যাব। আমরা মর্যাদাশীল একটা জাতি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না। তাই আজ যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে, বিশেষ করে এখান থেকে একহাজার গজ দূরে নজরুল শায়িত আছেন তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমি ঘোষণা করতে চাই, আপনাদের সংগ্রামে আমরা সহযাত্রী। আপনাদের সংগ্রামে আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত। আপনাদের সংগ্রামে রক্ত দিতে প্রস্তুত। আপনারা পিছপা হবেন না। আপনারা এগিয়ে চলুন। আমরা আছি, জাতি আছে, বারো কোটি মুসলমান আপনাদের সাথে আছে। নজরুল ছিলেন কবি আমি তার তুলনায় ছোট একজন কবি। আমাকে কবি বল্লে কবিকে অপমান করা হবে। তবু আমি মনে করি আজকে তার এই জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর জন্য কবিতা উৎসর্গ করা উচিত। তাই তাঁর উদ্দেশ্যে আমি একটি কবিতা নিবেদন করছি। আমার কবিতাটির নাম :

'তুমি একটি বিশাল বিস্ময়'

তুমিতো ব্যক্তি নও
একটি বিশাল বিস্ময়
তুমিতো শুধু রচয়িতা নও
একটি ব্যতিক্রম বিপ্লব
তুমি দরিদ্র মানুষের দুর্জয় সংকল্প
একটি অকুণ্ঠ জীবন
তোমার বিস্তৃতি
দেশ , অঞ্চল পৃথিবী জুড়ে তৃণাদিত
তোমার ঝাকড়া চুলের নীচে ঘুমন্তভাবে ঝড়
চমকায় বিদ্যুৎ তোমার দু'চোখে
উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত খেলা করে স্ফুলিঙ্গ
তোমার চওড়া কপালে
উদ্যত শির তোমার
নতুন শক্তি সঞ্চার কর তুমি
নিপীড়িত প্রবঞ্চিত নির্যাতিত
মানুষের রক্তঝরায়
তুমিতো ব্যক্তি নও
একটি বিশাল বিস্ময়
শোষকের বিরুদ্ধে তুমি এক শাণিত তরবারী
তোমার চোখের তারায় জ্বলে আগুন
তোমার রুদ্র রোষে পুড়ে ছাই হয়
রক্তচোষা গোপন আস্তানা
তুমি দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে ফেল লুটেরা আগুন
তুমি কৃষকের শাণিত লাঙ্গল

www.pathagar.com

তুমি শ্রমিকের কঠিন হাতিয়ার
তুমি এক খরস্রোতা নদী
তুমি আঘাত, তুমি প্রতিঘাত
তুমি উচ্ছ্বাস তুমি হৃদয়ভাঙ্গ
তুমি প্রেরণা
তুমি যুগযুগ ধরে বেজে যাওয়া সুরের লহরী
তুমি একটি ব্যাপক বিস্ময়
তুমি একটি কাব্যের বিচিত্র ধারা
কবি, তুমি আজ নীরব কেন?
তোমার কণ্ঠে আবারো বেজে উঠুক দামামা
তুমিতো জানোনা ক্লান্ত হতে
তবে কেন ক্লান্ত?
আজোতো হয়নি শেষ
উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
তুমি জেগে ওঠ
তুমিইতো আমাদের গর্ব
তোমার কাছে শিখেছি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে
তুমি যে ব্যাপক
তুমি এক বিস্ময়

আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।

www.pathagar.com

জাতীয় সেমিনার-৩

তারিখ ২৬ মে'৯৯ বিকেল ৪টা

স্থান- ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট

প্রধান অতিথির ভাষণ

নজরুল আমাদের অহঙ্কার-আমাদের জাতীয় কবি

অধ্যাপক গোলাম আযম

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলা সাইয়্যেদুল মুরসালিন ওয়া-আলা আলিহী-অ আস্‌হাবিহী আজমাঈন।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আয়োজিত এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন কমিটির সভাপতি এবং তাঁর সাথীগণ, মঞ্চে উপবিষ্ট সকল সম্মানিত সুধীবৃন্দ এবং সমাগত আমার ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

এখন রাত সোয়া আটটা, ভাবছি কতক্ষণ আপনাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে। কিন্তু জরুরী কিছু কথা না বলেতো পারছি না। আমি সর্বপ্রথম এই উদযাপন কমিটিকে অভিনন্দন জানাই এজন্য যে, তারা শুধু সাংস্কৃতিক অঙ্গনেই একটা আন্দোলন খাড়া করেননি; রাজনৈতিক মঞ্চে যারা এই ভারতপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছে তাদেরকেও এ মঞ্চে হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন। এর দ্বারা একথাই প্রমাণ করা হল যে, নজরুলের পক্ষে সকল বিরোধী দল আছে। আর নজরুলের পক্ষে নেই শুধু এক সরকার। একটি রাজনৈতিক দল যারা সরকারে আছে তারা আমাদের দেশের গর্দানে চেপে বসেছে, সিন্দাবাদের দৈত্যের মত। এরা ছাড়া সকল রাজনৈতিক দল নজরুলের পক্ষে- আমি এটাকে ছোট ঘটনা মনে করি না। এদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে হাজির করতে পারা একটা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

আমি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা কোন প্রয়োজন মনে করি না। নজরুল বড় কবি এটা অস্বীকার তো কেউ করেন না। তবে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন যে কাব্যের জন্য সেটি কিন্তু আধ্যাত্মিক কাব্য- ধর্মহীন কাব্য নয়। আমি এককালে এই গীতাঞ্জলির সব কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। '৯২তে জেলে যাওয়ার পরে অনেকদিন চর্চা নাই আবার গীতাঞ্জলি এনে পড়লাম। আপনারা মাওলানা রুমীর কথা জানেন- 'মসনবী শরীফ' যাঁর রচনা। হস্তে কুরআন দর জবানে পাহলবী অর্থাৎ 'ফার্সী ভাষার কুরআন' এই পরিচয় যে গ্রন্থের। এই মসনবীর প্রভাব গীতাঞ্জলিতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু ছিলেন না, মূর্তিপূজক ছিলেন না । তার উপাধি মহর্ষি দেওয়া হয়েছিল যার অর্থ মহাঋষি। তিনি তার কনিষ্ঠ ছেলে রবীন্দ্রনাথকে সব সময় সংগে রাখতেন। তার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ছিল যে, তার সংস্পর্শে থেকে কিছু শিখুক, আজেবাজে লোকের সাথে তাকে মিশতে তিনি দিতেন না। আমার ধারণা তার পিতা ও মসনবীর প্রভাব তার উপর পড়েছে— যার জন্য গীতাঞ্জলির মত কাব্য তিনি লিখেছেন। আমার খুব চমৎকার লাগে–"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে/ অতি ইচ্ছার সংকট হতে ফিরায়ে মোরে।" অর্থাৎ আমি অস্থির হয়ে চাই, যা আমার জন্য কল্যাণকর নয়; তুমি আমাকে তা না দিয়ে অতি ইচ্ছার সংকট থেকে রক্ষা করেছ। এগুলি আধ্যাত্মিক কথা। কিন্তু তারপরও তিনি তার কাব্যে এমন কিছু রাখেন নাই, যার দ্বারা মুসলমানগণ তাকে তার আপন কবি মনে করতে পারে।

রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত হয়। এগুলো শোনার সময়ও পাইনা। মাঝে মাঝে শুনলে কানে বাজে। আমার কাছে সবগুলো একই রকম সুর লাগে। এর বিপরীতে দেখি নজরুলকে। তার প্রত্যেকটি গানের সুর ভিন্ন। এক একটা সুরের এক একটা ব্যঞ্জনা– এক একটা আবেদন– অদ্ভুত! আপনারা কি কেউ নজরুলের কোন গান রবীন্দ্র সুরে গাইতে পারবেন? পারবেন না, আর নজরুলের সুরও রবীন্দ্র নাথের কোন গানে ফিট হবে না। সুতরাং নজরুল নজরুলই; রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। এ দুইয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ! এই নজরুল জাতীয় কবি স্বীকৃত হবার পরে এখন বর্তমান সরকার মহাবিপদে পড়েছে। তাকে গিলতেও পারছে না ফেলতেও পারছে না।

আমার বুঝে আসে না এই দেশের সর্ব সাধারণের প্রাণের যে কবি, যার কাব্য যার সুর এদেশের মানুষকে জাগ্রত করেছে, সেই নজরুলকে যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে গণমানুষ থেকে সরকার কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল? আমি হিসেব করে দেখলাম আসল কারণ একটা, এই সরকার যে দলের সেই দল ঠিক করতে পারছে না জাতিসত্তার সংজ্ঞা কি? তারা বলে আমরা বাঙালি জাতি, আর বাঙালি জাতি হল কবে? বাংলা একটা ভাষা, আমরা বাংলাভাষী হিসেবে অবশ্যই বাঙালি। কিন্তু বাঙালি কি বাংলাদেশের ভিতরে শেষ? এর বাইরে বাঙালি নাই? তাদের সহ একজাতি বানাবেন কিভাবে, এক জাতি বানানোর কি পথ? সুতরাং বাঙালি জাতি বলে কোন জাতি নেই। তা হলে জাতিতে আমরা কি? রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী। জাপানের নাগরিকরা জাপানী বাংলাদেশের নাগরিকরা বাংলাদেশী। এই অর্থে জাতি হিসাবে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান উপজাতি যারা আছে সকলে মিলে আমরা বাংলাদেশী। কিন্তু আদর্শিক জাতি হিসেবে আমরা মুসলিম জাতি। আর এই মুসলিম জাতি হওয়ার কারণে এদেশ এখন স্বাধীন। আজ যে সাম্প্রদায়িক গালি আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এই গালি আমরা পাকিস্তান আমলেও কংগ্রেসের কাছ থেকে খেয়েছি। টু নেশন থিওরীতে মুসলমানরা আলাদা জাতি। একথা বলার কারণে গান্ধী নেহেরুরা কায়েদে আযমকে সাম্প্রদায়িক বলে নাই? আমাদের প্রধানমন্ত্রীও ঐ একই কারণে আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলছে।

তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ হচ্ছে গান্ধী ও নেহেরুর আদর্শ। এটা শুধু একটা অযৌক্তিক অভিযোগ নয় বাস্তব সত্য। '৪৬ এ আমি বি. এ. পাশ করলাম। এর পরপরই পাকিস্তান ইস্যুর উপরে সারা ভারতে নির্বাচন হল। খান সাহেব আওলাদ হোসেন ছিলেন মুসলিম লীগের মানিকগঞ্জ মহকুমার সভাপতি। তাঁর নেতৃত্বে এই নির্বাচনী অভিযানে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতক ছাত্র কর্মীও ছিলাম। সেই পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আমার মনে আছে গান্ধী নেহেরু তো এ কথাই বল্লেন যে, হিন্দু মুসলমান আমরা সকলেই এক ভারতীয় জাতি, ধর্ম আমাদের আলাদা, যার যার ধর্ম সে করবেন। মসজিদে মুসলমানরা নামাজ পড়বেন, হিন্দুরা মন্দিরে পুজা করবে, আমরা ধর্ম নিরপেক্ষবাদী। সারা ভারত এক রাষ্ট্র হিসাবে চলবে সেখানে ধর্মকে টানাটানির কোন প্রয়োজন

www.pathagar.com

নেই। এর অর্থ তো এই যে, আল্লাহর উপরে ১৪৪ ধারা জারী করে বলা হচ্ছে : তুমি মসজিদে থাক, নামাজের সময় সিজদা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, বাইরে আমরা কিভাবে দেশ চালাবো এটা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করবো না। এ বিষয়ে তুমি কিছু বলতে এসো না। সেই কালে ৪০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ১০ কোটি মুসলমানরা কি একথা মেনে নিয়েছিল? কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে ১০ কোটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে বলা হল আমরা আলাদা জাতি। এ টু নেশন থিওরীর দাবি নিয়ে যদি আন্দোলন করা না হত তাহলে কি ভারত বিভক্ত হত? আর ভারত বিভক্ত না হলে আমাদের এই বাংলাদেশ কি স্বাধীন হত? স্বাধীন দেশ তো দূরের কথা একটা প্রদেশও হত না। অবিভক্ত বাংলার একটি প্রদেশ হত মাত্র।

শেখ মুজিবুর রহমান '৭২ এর শাসনতন্ত্রে বাংলাদেশের আদর্শ হিসাবে এক নম্বরে স্থান দিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদকে, এটা কার মতবাদ? গান্ধী নেহেরুর মতবাদ নয়? এ মতবাদকে আমরা স্বীকার করতাম তো ভারত বিভক্ত হত? ভারত বিভক্ত করল যে টু নেশন থিওরী–আমাদের প্রধানমন্ত্রী তা স্বীকার করেন না। '৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের আমলে এই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ উৎখাত হল শাসনতন্ত্র থেকে গণভোটের মাধ্যমে। যে জনগণ গণভোটের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে উৎখাত করে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা শাসনতন্ত্রে লেখিয়েছে সেটাকে উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষমতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী উঠেপড়ে লেগেছেন। গণভোটে পরিবর্তন করা জিনিষ গণভোট ছাড়া পরিবর্তন করা যাবে না। অথচ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, গণভোটের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী তার অবস্থান ঘোষণা করেছেন। এরপরে এ দেশের প্রধানমন্ত্রীতো দূরের কথা– এদেশের জনগণের নিকট তিনি একজন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবেও স্বীকৃতি পেতে পারেন না।

আমি রাজনৈতিক বক্তৃতা করে বলছিনা, এটা তো আদর্শিক বক্তৃতা। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আপনারা যে জিহাদ করছেন সেই জিহাদের এটা অংশ। আপনারা নজরুলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। নজরুল কিসের প্রতীক? নজরুল কেন জাতীয় কবি? নজরুল তাঁর কবিতায় ঘোষণা করেছেন "আমরা সেই সে জাতি ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি..." এজন্যই বলছিলাম জাতিসত্তার ব্যাপারে তারা বিভ্রান্তিতে আছে। কোন হিসাব নেই তাদের, তারা কোন জাতি। মুসলমানের ঘরে পয়দা হয়ে বিপদে পড়ে গেছে, মুসলিম জাতি বলতে লজ্জা হয়। দুনিয়ায় নিজের পরিচয় দিতে যারা লজ্জা পায় তারা দুনিয়ায় কিছু করতে পারে না। তাদের গঠনমূলক কিছু করার যোগ্যতা নাই। ধ্বংস করার যোগ্যতা, ভাঙ্গার যোগ্যতা তাদের আছে।

বাংলাদেশ ভাঙ্গার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলে দিয়েছে বিদেশীদের হাতে, ভারতের দালালদের হাতে। বাংলাদেশ ভাঙ্গার জন্য বঙ্গভূমি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা কথা বলে না। এগুলো সত্য কথা কিনা? তারা আমাদেরকে বলে স্বাধীনতা বিরোধী। স্বাধীনতার সংজ্ঞা জানেন? স্বাধীনতা বিরোধী বলেন কাকে? এই দেশের জনগণ স্বাধীনতার রক্ষক এই সরকার স্বাধীনতার ভক্ষক। আমরা সেই জনগণের পক্ষ থেকে কথা বলছি। এ দেশের জনগণ নজরুলকে তাদের জাতীয় কবি মানে। আপনারা যেহেতু মুসলিম জাতি হিসেবে নিজেকে মনে করেন না। মুসলিম বলা মানে সাম্প্রদায়িকতা মনে করেন। কংগ্রেসের শেখানো সেই গালি আমাদেরকে দিচ্ছেন। এই গালি গোটা জাতির উপর পড়ছে। এ জাতি আপনাদেরকে ক্ষমা করবে না। আমি এ কথা না বলে পারছি না, এই দেশে ধর্ম নিরপেক্ষবাদ যদি সরকারী দলের আদর্শ হয় তাহলে এদেশকে ভারত থেকে

www.pathagar.com

আলাদা রাখার কি প্রয়োজন আছে? গান্ধী নেহেরুর আদর্শ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই দেশের স্বাধীনতার হেফাজত করার কোন ক্ষমতা রাখেন না। বরং ইনডাইরেক্টলি তিনি একথা বলছেন যে, এদেশটা ভারতের অংশ হয়ে যাক। এ কারণেই মুখ্যমন্ত্রী বলার কারণে তিনি রাগ করেননি। এটাই তার কামনা যে, ভারতের একটা প্রদেশ হিসেবে মেহেরবানী করে তারা এটাকে গণ্য করুক এবং তাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিক। এই প্রধানমন্ত্রীর আচরণ, তার কথাবার্তাকে আমি তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী মনে করি। এই ধৃষ্টতা দেখাবেন না। যারা মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তারাই এদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে। তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী বলবার ধৃষ্টতা দেখাবেন না। এই মঞ্চে বি.এন.পি নেত্রী এসে প্রমাণ করলেন যে তারা মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী, আর মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী যারা তারাই এ দেশের স্বাধীনতার হেফাজত করবে।

এই স্বাধীনতার বড় কাণ্ডারী হচ্ছে কবি নজরুল। তাই কবি নজরুলকে জনগণের সামনে শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরার জন্য যারা প্রেরণা যুগিয়েছেন বিভিন্নভাবে- কমোডোর সাহেব, মীর কাসেম আলী সাহেব, আমি সকলকে অভিনন্দন জানাই। আপনারা বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন জাতির পক্ষ থেকে। নজরুল ইসলামকে আপনারা যথার্থ রূপে জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ। এ বইটাতে (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার) অনেক কিছু আছে, আপনারা এ বইটা যোগাড় করে নিবেন। এটা নজরুলকে চিনবার জন্য জাতিকে চেনাবার জন্য। কাণ্ডারী হুশিয়ার নজরুলের কবিতারই দুইটি শব্দ, স্মারকগ্রন্থের নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নজরুল আমাদের প্রাণের কবি। আমাদের রক্তের কবি। তার এক একটি শব্দ আমাদের প্রাণ স্পর্শ করে। আমি আবার অভিনন্দন জানাই নজরুল জন্মশত বার্ষিকী জাতীয় কমিটিকে। তারা জাতির পক্ষ থেকে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। এই নজরুলকে নিয়ে গর্ব করার সাধ্য ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের নাই। এই নজরুলকে নিয়ে অহংকার করার মত বর্তমান সরকারের কোন মুখ নাই। তারা নজরুলকে উপহাস করছে। টিভিতে তার পরিচয় দিচ্ছে : তার স্ত্রী হিন্দু, তার শাশুড়ী হিন্দু, তার নাতি হিন্দু। বিটিভিতে নজরুলের এই পরিচয়ই আসল পরিচয় হিসাবে পেশ করা এই সরকার প্রয়োজন মনে করছে। শেম বল্লেও এদের কোন লজ্জা হয় না। এদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে এ জাতির ইতিহাস '৭১ সালে শুরু হয়েছে, বড় জোর '৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে-১২০১ সালে যখন ১৭ জন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বাখতিয়ার খিলজি এসেছিলেন তখন থেকে এ জাতির ইতিহাস শুরু হয়। নজরুল জন্মশত বার্ষিকী পালন করার দায়িত্ব ছিল জাতির পক্ষ থেকে এ সরকারের। সরকার জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই বিশ্বাস ঘাতক সরকারের জাতির উপর চেপে থাকার কোন অধিকার নাই। এই জাতির ইতিহাস আটশ' বছরের ইতিহাস। ৮০০ বছরের ইতিহাসের যে জাতি সেই জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রীর পিতা নয়। জনগণ পিতা বলে স্বীকার করেছে বলে আমি জানি না। প্রধানমন্ত্রীর পিতার মৃত্যুর পর জনগণ স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলেছে। কারণ তিনি একজন স্বৈরশাসক হিসেবে জনগণের উপর চেপে বসেছিলেন। একথা কি আমি অসত্য বলছি? আমি লণ্ডনে ছিলাম টাইমসে লিখেছে যে, ১৫ আগস্ট শুক্রবার শেষ রাতে এই সরকারের পতন হয়েছে। কারফিউ ছিল। শুক্রবারে জুমার নামাজের জন্য কারফিউ দুই ঘণ্টার জন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে। ...... লণ্ডনের পত্রিকা বলেছে দুই ঘন্টার জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করা হলে জনগণ দলে দলে নামাজে যেতে শুরু করলো। তাদের ভাবসাব ও চেহারা দেখে মনে হয় যেন তারা জাতীয় উৎসব পালন

www.pathagar.com

করছে। যে সরকারের পতনের পর জাতি উৎসব পালন করে বলে বিদেশী লোকেরা দেখতে পায়; সেই জাতি তাকে পিতা বলে স্বীকার করে তা কি প্রমাণ হয়? সুতরাং জবরদস্তি করে আপনার পিতাকে জাতির পিতা বানাবার চেষ্টা করবেন না। আপনার পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করেন ভক্তি করেন, ফুলের মালা দেন, আমাদের কোন আপত্তি নাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তার যে অবদান এটা আমরা স্বীকার করি। যার যা অবদান, যার যা খেদমত তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু জবরদস্তি করে তাকে জাতির পিতা বানাবার চেষ্টা করবেন না। যদি আপনি জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে চান তা হলে গণভোট করেন। গণভোট করে প্রমাণ করেন যে জনগণ জাতির পিতা বলে স্বীকার করে। আমি আমার শেষ কথা বলছি, যে উদ্দেশ্যে ভারত ভাগ করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতির আদর্শ ইসলাম আর বাংলাদেশ তত দিনই স্বাধীনতার ব্যাপারে পৃথিবীতে মজবুত থাকতে পারবে যতদিন এই ইসলামের ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখবে। সুতরাং এ দেশের স্বাধীনতার রক্ষা কবচ ইসলাম। ধর্ম নিরপেক্ষবাদ আপনার আদর্শ যদি হয়ে থাকে হোক। এই দেশের নেতৃত্বে এ আদর্শ নয়, জনগণের এ আদর্শ নয়, আপনি যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন সে আদর্শের জন্য আপনাকে দিল্লি ফেরত যাওয়া দরকার। এই দেশে এ আদর্শ চলবে না। কবি সাহিত্যিক কিছু লোক দিয়ে আর রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ায়ে এদেশের লোকদেরকে রবীন্দ্র ভক্ত বানাতে পারবেন না।

জনগণ নজরুল ভক্তই থাকবে, মুসলমানই থাকবে, ধর্ম নিরপেক্ষ হবে না। সারা বিশ্বের সকল ওলামা মুফতি– সকলের এক অভিমত যে, ধর্ম নিরপেক্ষমতবাদ সবচেয়ে বড় কুফরী মতবাদ। আল্লাহর একটি হুকুমকে অস্বীকার করলেও কাফের হয়। শুধু আল্লাহর একটি হুকুমকে অস্বীকার করে ইবলিশ কাফের হল। আর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অর্থ হচ্ছে যে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমরা কোরআনকে, রাসূলকে মানি। আর রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার, দেশ পরিচালনা– এসব ক্ষেত্রে আমরা ইসলামকে মানি না। তাহলে এর চেয়ে বড় কুফরী আর কিছুই হতে পারে না। এই কুফরী মতবাদ ত্যাগ করুন, প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমার এ দাবী। এই দেশে প্রধানমন্ত্রী ধর্ম নিরপেক্ষবাদ দাবি করতে পারেন না। এটা শাসনতন্ত্র বিরোধী। ধর্মনিরপেক্ষবাদ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা মুসলমানের কাজ না। প্রধানমন্ত্রী আপনি এটা ত্যাগ করুন এবং জনগণ যে আদর্শে বিশ্বাসী সেই ইসলামী আদর্শকে সর্ব ক্ষেত্রে গ্রহণ করুন। আপনি কোরআনের আইন জারী করুন। আল্লাহ্র আইন চালু করুন। আমরা সাহায্য করবো, সহযোগিতা করবো। কিন্তু জবরদস্তি করে আপনি ধর্ম নিরপেক্ষবাদ আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। জনগণ আপনাকে একাজে সাহায্য করবে না। ইতোমধ্যেই আমরা রোডমার্চ করে টের পেয়েছি জনগণ আপনার পক্ষে কতটুকু আছে।

আমি আবার মোবারকবাদ জানাচ্ছি নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটিকে। বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন তারা। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে গিয়াস কামাল চৌধুরী সাহেব আমাদেরকে অভয় দিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক নেতারা যদি পিছিয়েও যায় তারা পিছপা হবেন না। এই আশ্বাসে আমি অত্যন্ত সাহসী হয়েছি। আমি মনে করি যে, বিরোধী দলীয় যত রাজনৈতিক দল আছে সব রাজনৈতিক দল কবি নজরুলকে মেনে নিয়েছে। তাই যে কারণে নজরুলকে আমরা মানি, সেই ইসলামী আদর্শকেও তাদেরকে মেনে নিতে হবে।

আস্সালামু আলাইকুম।

www.pathagar.com

জাতীয় সেমিনার-৩
তারিখ : ২৬ মে'৯৯ বিকেল ৪টা
স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট

সভাপতির ভাষণ

বাংলাদেশই হবে নজরুলের স্বপ্নের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র

মীর কাসেম আলী

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলা সাইয়্যেদুল মোরছালিন অ-আলা আলিহী-অ আছহাবিহী আজমাঈন। মুহতারাম, আমীরে জামায়াত, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সুধী মন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, আমরা চেয়েছিলাম সাংস্কৃতিক আন্দোলন আর রাজনৈতিক আন্দোলন এক হয়ে যাক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোন অর্থই হয় না। তরবারীর ধার যে রকম প্রয়োজন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ঠিক তেমনি প্রয়োজন। যে সাংস্কৃতিক তৎপরতার কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য নাই, তা হচ্ছে কাঠের তরবারীর মত।

আমরা বাংলাদেশের এই সন্ধিক্ষণে এটা অনুভব করেছি যে, আমাদের সামনে একটি বিরাট যুদ্ধ রয়েছে। যে যুদ্ধের ইংগিত আমাদের বক্তাদের কথায় এসে গিয়েছে। নি:সন্দেহে বাংলাদেশ আজ অস্তিত্বের লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। এবং এই লড়াইয়ে আমরা বিজয়ী হব ইনৃশাআল্লাহ। বাংলাদেশের অস্তিত্বের লড়াই কি সমস্ত বক্তার কথায় আসেনি? এসেছে, বিশেষ করে আমাদের আমীরে জামায়াতের কথায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে। আজকে আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে একটি বড় রকমের যুদ্ধের, সে যুদ্ধ হচ্ছে সত্যিকার স্বাধীকারের যুদ্ধ। বাংলাদেশের সত্যিকার পরিচয় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। আমাদের বাংলাদেশকে হীনবল করে দেবার জন্য, আমাদের জাতির প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গন দিয়েই আক্রমণ শুরু করা হয়েছে। কাজেই আমরা এ কর্মসূচী হাতে নিয়েছি যেন সাংস্কৃতিক অঙ্গন দিয়েই আমরা এই স্বাধীকার যুদ্ধে অগ্রবর্তী বাহিনীর ভূমিকা পালন করতে পারি।

আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সাথে জাতীয় নেতৃবৃন্দ হাতে হাত মিলিয়ে আমাদেরকে দারুণ উৎসাহিত করেছেন। আজ আমরা ঘোষণা করতে চাই যুদ্ধ শুরু হলো মাত্র, আসল যুদ্ধ রয়েছে সামনে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সে যুদ্ধে বিজয় দান করুন। আমীন।

www.pathagar.com

আমি বিশ্বাস করি, নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান, ভারত বিভাগের সময় মুসলমানদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারের সময় এখন আসছে। নজরুল যে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছেন, নজরুল যে ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, তার জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমির প্রয়োজন ছিল। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ হচ্ছে সেই স্বপ্নের আবাসভূমি। আমীরে জামায়াত বলেছেন, বাংলাদেশে ইসলাম কারো ভিক্ষা বা অনুদান নিয়ে আসেনি। এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য বাংলাদেশে ইসলাম যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে এসেছে। বাংলাদেশ হচ্ছে ইসলামের সেই দেশ, যার সম্পর্কে বৃটিশরা লিখেছিলো এদেশ দখল করার আগে "Paradise of Nation". পাঁচশো বছর যে মুসলিম সালতানাত ছিলো সেটা ছিল সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় যখন এখানে শরীয়তের শাসন কায়েম ছিল।

বাংলাদেশ যাকে Paradise of Nation বলা হয়েছে সে বাংলাদেশ ছিল ভারতের সবচেয়ে ধনাঢ্য অংশ। এ ভূখন্ডের মানুষ কোন দিন কারো আধিপত্য স্বীকার করে নাই। এই স্বাধীন বাংলাদেশই হবে নজরুলের স্বপ্নের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ইনশাআল্লাহ।

আমরা সেই বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌছার জন্য সবাই হাতে হাত রেখে যুদ্ধ করে যাব ইনশাআল্লাহ। ততোদিন আমরা নীরব হবনা যতদিন আমরা লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব না। এ প্রসঙ্গে নজরুলের দুটো কবিতা পড়ে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করতে চাই। নজরুল বলেছেন–

বিশ্বাস করো এক আল্লাতে প্রতি নি:শ্বাসে দিনে রাতে.
হবে "দুলদুল" আসওয়ার পাবে আল্লার তলোয়ার হাতে।

ছোবহানাল্লাহ! প্রতি নিশ্বাসে যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করা যায় দুলদুল আসওয়ার হওয়া যাবে, আল্লার তরবারী আমাদের হাতে আসবে, ইনশাআল্লাহ্। সে কথা কোরানে আল্লাহ্ বলছেন "তোমরা নিক্ষেপ কর নাই, আমি নিক্ষেপ করেছি।"

যদি আগামী দিনে তথাকথিত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, ভারত ভীতি, ভারতের বিরাট আয়তন দিয়ে আমাদেরকে যে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার মোকাবেলায় আল্লার তরবারী কেবল আমাদেরকে বিজয়ের সাহস দিতে পারে। নজরুল সে স্বপ্ন দেখাবার জন্য আমাদেরকে আহ্বান করেছেন।

নিত্য সজীব যৌবন যার, এসো এসো সেই নৌ-জোয়ান,
সর্ব্বক্লৈব্য করিয়াছে দূর তোমাদেরই চির আত্ম-দান!
ওরা কাদা ছুঁড়ে বাধা দেবে ভাবে- ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ
মোরা ফুল ছুঁড়ে মারিব ওদের, বলিব– 'আল্লাহ জিন্দাবাদ।"

ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামী দিনের যুদ্ধে এই হবে আমাদের অস্ত্র। নজরুল কিন্তু শুধু একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেন নাই; তিনি বিশ্ব বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন। আশ্চর্য হয়েছি তাঁর একটি কবিতা পড়ে। একবিংশ শব্দীকে The century of Islam বলা হয়। এ শতাব্দীতে যে ইসলামী বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, বাংলাদেশ সেই বিশ্ববিপ্লবের মদীনা হোক। আমরা এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখতে চাই। [illegible] নজরুলও এ স্বপ্নই দেখেছেন। তিনি দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার জন্য বলেছেন :

www.pathagar.com

"বক্ষে আগুন আছে তোমাদের তোমরা অগ্নিগীরি
সে অগ্নিশিখা ভীষণ আত্মবিস্মৃতি আছে ঘিরি
পাষাণ হইয়া পড়ে আছ আজ হায়রে আত্মভোলা
তোমরা জাগিলে সারা পৃথিবীতে জাগিবে প্রবল দোলা'

আগামী শতাব্দীতে আমরা সারা বিশ্বে প্রবল দোলা সৃষ্টি করতে চাই। তাই আমাদেরকে এই পাষাণ ও স্থবির অবস্থা থেকে বেরিয়ে মুজাহিদের বেশ ধারণ করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এমন শাণিত অস্ত্র দিয়েছেন— আমাদের সাথে মোকাবিলায় ওরা কখনোই পারবে না। নজরুল ইসলাম হচ্ছেন সেই অস্ত্রাগারের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, এরপর রয়েছেন ফররুখ আহমদ, এরপর আরো অনেক কবি রয়েছেন, ইনশাআল্লাহ্ ভয়ের কোন কারণ নেই। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আমরা যে যুদ্ধ শুরু করেছি নি:সন্দেহে সে যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হবোই হবো এবং সেই যুদ্ধ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করবে রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে।

আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন হোক চূড়ান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রবর্তী বাহিনী। যেদিন আমরা সেই ভূমিকা পালন করতে পারবো সেদিন আমাদের স্বপ্ন সফল হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন।

আস্‌সালামু আলাইকুম।